শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ. (লণ্ডন),
এ. বি. পি. এস. (লণ্ডন)

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

শ্রীমতী সুরুচি চৌধুরী

করকমলেষু

ভূমিকা

বর্তমান কালে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা গতানুগতিকতার উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য-কারণ নির্ণয় করিয়া শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় পদক্ষেপ করিতে হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানগুলির মত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাকার্যে সংশ্লিষ্ট সকলেরই অন্ততঃ কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শিক্ষকদের পক্ষে ত ইহা অপরিহার্য।

জনৈক মার্কিন শিক্ষাবিদ, তাঁহার অধুনা প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকায় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরে প্রচুর পরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সামান্যতম মাত্র প্রয়োগ হইতেছে ; ইহা গুরুতর অপরাধ (crime)। প্রয়োগ ত দূরের কথা, আমরা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত পর্যন্ত নহি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতিগুলির আলোচনা প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিতে করা হইত। অধুনা ঐ নীতিগুলির আলোচনা সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে করা হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন শিক্ষার মূল নীতিগুলিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখনও শিক্ষানীতির আলোচনায় উপরি-উক্ত আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তাই যাঁহারা ভবিষ্যতে শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, যাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সরল ভাষায়, আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষাদান প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করণের মূলনীতি সম্বন্ধে একখানা পুস্তকের প্রয়োজন অনুভব করি। বিশ বৎসরের অধিককাল শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ এই প্রয়োজনের প্রতি আমার দৃষ্টি অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার পরম স্নেহাস্পদা ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তার সহযোগিতায় 'শিক্ষানীতি' নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রী মহলে সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা আমার আশানুরূপ হয় নাই। তাই নূতন নাম দিয়া শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে একখানি নূতন পুস্তক লিখিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আলোচ্য বিষয় মোটামুটি এক হইলেও পূর্বের পুস্তকখানি অপেক্ষা বর্তমান পুস্তকখানিকে সর্ববিষয়েই উৎকৃষ্টতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করিতেছি যে, শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং বি. এ. (এডুকেশন্) ক্লাসের ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। পিতা, মাতা বা অপর কেহ যদি শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া ভরসা করি।

পুস্তকখানি আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিরও বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করিতেছি। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিবার জন্য এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। উভয়বিধ কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিয়া দেখিতেছি যে, কার্যকরী বিস্তারিত জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ঐ কার্য দুইটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা-করণ সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিস্তারিত কার্যকরী আলোচনা করা হইয়াছে; ইহার সাহায্যে বিদ্যালয়গুলি উভয়বিধ কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১
লেক্‌প্লেস, কলিকাতা।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতির" পুনমু দ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইতিমধ্যে শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষণ-শিক্ষার নূতন পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হইয়াছে। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার পূর্বে বইখানিকে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিতে হইল। পুরাতন অধ্যায়গুলিকে আধুনিকতম জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইল এবং শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় এবং বি. এ. এডুকেশন-এর নূতন পাঠ্যসূচীর কথা বিবেচনা করিয়া, কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল।

আশা করি পুস্তকখানি পূর্বের মতই সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বলিতে কি বুঝি

শিক্ষার ব্যাপকতা—শিক্ষা সভ্যতার মতই প্রাচীন। শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভাষাগত, ব্যবহারগত ইত্যাদি যে সব সাদৃশ্য থাকে (ঐ সাদৃশ্যই সমাজ-জীবনের ভিত্তি) তাহা প্রধানতঃ শিক্ষার মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে। কাজেই সমাজ-জীবনের আরম্ভ এবং শিক্ষার আরম্ভ একসঙ্গে হইয়াছে, একথা বলা চলে। অবশ্য প্রাচীনতম সমাজে এখনকার মত বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষালাভ বাস্তবধর্মী ছিল এবং অধিকাংশক্ষেত্রে মাতাপিতাই সন্তানকে শিক্ষা দিতেন।

সমাজের দিক ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তির দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, শিক্ষা মানুষের ব্যাপকতম কর্মের মধ্যে অন্যতম। মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষাকার্য চলিতে থাকে। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই, হয় আমাদিগকে নূতন শিক্ষা দেয়, আর না হয় পুরাতন শিক্ষাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে সাহায্য করে। সমগ্র মনুষ্য-জীবন শিক্ষারই ইতিহাস। শিশু জন্মগ্রহণ করে, হাসিতে শিখে, কাঁদিতে শিখে, ভালবাসে, ভয় পায় এবং একটু একটু করিয়া কথা বলিতে পারে; কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ এসব জ্ঞানও তাহার কিছু কিছু হয়; বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত বিভিন্ন কৌশল সে আয়ত্ত করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পরও শিক্ষার শেষ হয় না; জ্ঞান সঞ্চয়ন, কৌশল আয়ত্তকরণ, চারিত্রিক গুণাবলীর পরিবর্তন প্রভৃতি সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই চলে। মোটকথা যতদিন মানুষের জীবনকাল ততদিনই তাহার শিক্ষাকাল। পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের দিক হইতে শিক্ষায় মানুষে মানুষে প্রচুর পার্থক্য থাকিলেও এমন কোন মানুষ নাই যে কখনও শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। যে কখনও বর্ণমালা চোখেও দেখে নাই

তাহাকেও শিক্ষাহীন বলা যাইতে পারে না ; হয়ত সে অনেক গ্রন্থকীট অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার অধিকারী।

আর একদিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে, সংসারে এমন কোন মানুষ নাই যে কোন না কোন প্রকারে অপরকে শিক্ষাকার্যে সাহায্য করে নাই। জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক আমরা সব সময়েই পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত করিয়া আসিতেছি; অনেক সময় জ্ঞাতসারেই আমরা উপদেশাদির দ্বারা অপরকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। শিক্ষা এত প্রাচীন এবং সর্বজনীন বলিয়াই হয়ত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক রহিয়াছে। তাই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইতে হইলে "শিক্ষা" শব্দটি বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি তাহা পর্যালোচনা করিয়া এসম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিতে হইবে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ—বিদ্যালয়ের কার্য এবং শিক্ষাকে অভিন্ন মনে করা আমাদের এক বড় ভ্রান্তি। সমাজের শুরুতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়) ছিল না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হওয়ার পর "লেখা" ও "পড়া" এই দুইটি কৌশল শিখানোর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধি যত বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই সে তাহা (বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য) লেখ্য ভাষার সাহায্যে পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ছাপান পুস্তক সহজেই সকলের হাতে পৌঁছান সম্ভব হইল। বিদ্যালয় "লেখা" ও "পড়া" শিক্ষাদানের সঙ্গে ঐসব সঞ্চিত জ্ঞান (অভিজ্ঞতা) পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। বিদ্যালয়ে যে সব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়, বিশ্লেষণ করিলে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে, জ্ঞান (Knowledge) এবং কৌশল (Skill)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের কোথায় কোথায় তুলার চাষ হয় ইহা যখন আমরা পুস্তকে পড়িতেছি তখন আমাদের জ্ঞান সঞ্চিত হইতেছে, আবার আমরা যখন মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছি তখন একটি কৌশল আয়ত্ত করিতেছি। "লেখা" ও "পড়া" শিক্ষা, যোগ-বিয়োগ কষা

শিক্ষা প্রভৃতিও কৌশল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিদ্যালয় ছাত্রদিগকে জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। বিদ্যালয় স্থাপনের পর সমাজে ইহার মর্যাদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই আমরা শিক্ষা আখ্যা দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে আমরা বিনা দ্বিধায় অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকি। কিন্তু শিক্ষা শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপকতর ; চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তা, যুক্তি, কল্পনা ইত্যাদি শক্তির যথাযথ স্ফুরণও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাই, কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় এবং কৌশল আয়ত্ত করা, শিক্ষার উদ্দেশ্য বা সংজ্ঞা বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না।

আমাদের নিকট শিক্ষা শব্দের অর্থ—নানাকারণে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুণ শিক্ষা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে সংকীর্ণতর হইয়া কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থিগণ শিক্ষালাভের জন্য তপোবনে গুরুগৃহে বাস করিতেন। তাহারা বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং গুরুগৃহের সাধারণ জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন জীবনে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করিতেন। অধ্যয়ন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উভয়কেই শিক্ষালাভের উপায় বলিয়া জ্ঞান করা হইত। এইভাবে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান যখন জীবনের অংশরূপে পরিণত হইত গুরু তখন শিক্ষার্থীকে সমাবর্তন দিতেন—অর্থাৎ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সামাজিক জীবন-যাপনের উপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গুরু ঘোষণা করিতেন। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার অধঃপতনের ফলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর নিকট অর্থহীন হইয়া পড়ে ; শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ নষ্ট হইয়া যায় ; ঐ জ্ঞান দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের সহিতও সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন মুখস্থ বিদ্যায় পর্যবসিত হয়। "আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরীয়সী" কথাটাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

মুসলমানগণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়া ইসলামিক শিক্ষার (মক্তব ও মাদ্রাসা) প্রবর্তন করেন। কিন্তু ভারতের সমাজ-জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। রাজসরকারে চাকুরী লাভের এবং ইসলামধর্মের অনুশাসনগুলি জানিবার জন্য লোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিত।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পরও এই অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইলেও তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের সহিত উহার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। চাকুরী-লাভের আশায়ই লোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। তারপর বিশেষভাবে দেশীয় শিক্ষকগণের উপরই ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দিবার ভার পড়িল : যাঁহাদের নিজেদেরই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা শিক্ষকরূপে কার্য করার ফলে ইংরেজী শিক্ষা আরও যান্ত্রিক হইয়া পড়িল। অপরদিকে ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা টোল বা মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা হইতে অনেক বেশী বিধিবদ্ধ ; কোন্ কোন্ জ্ঞান ছাত্রদিগকে অর্জন করিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া বিষয় (Subjects) অনুসারে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; বিদ্যালয়ের পাঠশেষে আশানুরূপ শিক্ষালাভ হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং ঐ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে কর্মপ্রার্থীকে কর্মে নিযুক্ত করা হইতেছে। একদিকে অর্থহীন শিক্ষা অপর দিকে তাহা আবার অত্যন্ত বিধিবদ্ধ (Systematic), এই অবস্থায় পড়িয়া আমাদের দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে তোতারৃত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থহীন শিক্ষা এবং ছাত্রদের তোতাবৃত্তি (Parrot learning) করিবার অভ্যাসের অপকারিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা কি এক—শিক্ষার সংকীর্ণতম অর্থ হইতেছে পুস্তক হইতে নির্দিষ্ট জ্ঞান মুখস্থ করা। দীর্ঘদিনের সংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আজও শিক্ষাকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ-পদ্ধতি, শিক্ষা সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাকেই সমর্থন করে। কিন্তু নিছক জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষা একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। জীবনে যে জ্ঞানের প্রয়োগ নাই—তাহাকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। ধরা যাউক, স্বাস্থ্যবিদ্যার পুস্তক হইতে খাদ্য হিসাবে অধিক পরিমাণ আলু গ্রহণের অপকারিতা মুখস্থ করিলাম, কিন্তু প্রত্যেক বেলা আলু ছাড়া অন্য কোন তরকারী হয়ত আমি খাই না ; ভূগোল পড়িবার কালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত সবগুলি স্টেশনের নাম হয়ত মুখস্থ করিলাম, কিন্তু কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে হইলে কোন্

স্টেশনে গিয়া টিকিট কাটিব তাহা স্থির করিতে পারি না। ইহাকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষা এক নহে ; জ্ঞানার্জন শিক্ষালাভের একটি উপায় মাত্র ; অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের পরিবর্তনই প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞানার্জন এক ধরণের অভিজ্ঞতা মাত্র ; এই অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষার্থীর ব্যবহারের পরিবর্তন না ঘটিলে উহা শিক্ষা অ্যাখ্যা পাইতে পারে না। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউয়ী (John Dewey) দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, (ক) নিষ্ক্রিয় জ্ঞান এবং (খ) সক্রিয় জ্ঞান। তোতাবৃত্তি দ্বারা শুধু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানই অর্জন করা যায় ; ঐ জ্ঞান মনকে ভারাক্রান্ত করে ; কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার করা চলে না। ফলে, ঐ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান আমাদিগকে "পণ্ডিত মূর্খে" পরিণত করে। সক্রিয় জ্ঞান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া পড়ে এবং জীবনের সব রকম প্রয়োজনেই তাহার ব্যবহার চলে ; ঐ ধরণের জ্ঞান আপনা হইতেই ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায়। ধরা যাউক, কোন শিক্ষক যদি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সক্রিয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন তবে তিনি আপনা হইতেই পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন। জ্ঞান উপলব্ধিগত হইলেই তাহা সক্রিয় হয়। আবার বলিতে হয়, জ্ঞানার্জন মাত্রেই শিক্ষা নহে ; ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অর্জন করা হয়।

কৌশল আয়ত্তকরণ (Acquiring Skill) ও শিক্ষা কি এক— জ্ঞানার্জন ব্যতীত নির্দিষ্ট কৌশল আয়ত্তকরণেও বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিয়া থাকে। যে সব কৌশল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও জ্ঞানার্জনের মত শিক্ষালাভের উপায় মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে পঠন শিক্ষা দেওয়া হয় একটা নির্দিষ্ট পুস্তক পড়িবার জন্য নহে ; ভবিষ্যতে যে কোন লিখিত জিনিস হইতেই ছাত্র যাহাতে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে ইহাই পঠন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। কৌশল শিক্ষাদানেরও মূল উদ্দেশ্য ছাত্রের ব্যবহারের পরিবর্তন—জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে আয়ত্তীকৃত কৌশলের প্রয়োগ করিতে পারিলে তবে উহাকে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অর্জিত জ্ঞান যেমন নিষ্ক্রিয় হইতে পারে, আয়ত্তীকৃত কৌশলও তেমনি যান্ত্রিক হইতে পারে। যান্ত্রিকভাবে কৌশল আয়ত্ত করিলে তাহাতে

ব্যবহারের পরিবর্তন হয় না এবং উহাকে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে না। ধরা যাউক, বিদ্যালয়ে ছাত্র যোগ অঙ্ক কষিবার কৌশল শিখিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া সে যদি ঐ কৌশলের সাহায্যে ধোপার বাড়ীতে একমাসে তাহাদের কতকগুলি কাপড় গিয়াছে তাহা বাহির করিতে না পারে, তবে যোগ অঙ্ক শিখিবার ফলে তাহার ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হইয়াছে বলা যায় না।

মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন (Training the mental faculties) ও শিক্ষা কি এক—বর্তমান যুগের প্রারম্ভে, মানসিক শৃঙ্খলাবাদের নীতি ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই নীতি অনুসারে, আমাদের মন স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক শক্তির সমষ্টিমাত্র। ঐ শক্তিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলে বা মনের আয়ত্তাধীন আনিতে পারিলে এবং উহাদিগকে যথাযথ ট্রেনিং দিতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে সফল হইল বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই শিক্ষা শব্দের অর্থ হইল মানসিক শক্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন। এই অনুশীলন. ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা, গণিতের অনুশীলন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন, ইত্যাদির মারফতে হইতে পারে বলিয়াও ঐ সময়ের লোকের বিশ্বাস ছিল। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে উহাদের বিশিষ্ট স্থান ছিল।

কিন্তু এই মতবাদের সত্যতা বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন না। মনের যে পৃথক পৃথক কতকগুলি ক্ষমতা রহিয়াছে এবং ঐ ক্ষমতাগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে ট্রেনিং দেওয়া চলে, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কতকগুলি বিশেষ বিষয় পাঠের ফলে যে মনের ক্ষমতার বিকাশ সাধিত হয়, ইহাও সত্য নহে। মানুষের ব্যক্তিত্ব সমগ্রভাবে বিকাশিত হয়; যে কোন অভিজ্ঞতাই মানুষের মনের উপর সমগ্রভাবে ক্রিয়া করে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মত মনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শান্ দেওয়া চলে না। অধিকন্তু মন, ব্যতিত মানুষের প্রক্ষোভ ইত্যাদির যথাযথ বিকাশ সাধন ও শিক্ষাদান কার্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য (সংজ্ঞা নহে) বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিলেও, মানসিক শৃঙ্খলা সাধন বা মানসিক ক্ষমতার অনুশীলনকে ঐ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না।

শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ—এতক্ষণ আমরা যে বিষয়ে আলোচনা

করিতেছিলাম তাহাতে মাত্র একটি বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—জ্ঞানার্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণকে শিক্ষা বলিয়া মনে করায় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছি। মুখস্থ করিয়া জ্ঞানার্জন এবং যান্ত্রিকভাবে কৌশল আয়ত্ত করিলে উহারা শিক্ষার পরিপোষক না হইয়া বরং পরিপন্থীই হয়। এই কারণেই মনীষী বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—ইংরেজী এডুকেশন (Education) শব্দকে যদি ল্যাটিন ভাষার Educere শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ধরা হয়, তবে তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায়, "e" অর্থ, "ভিতর হইতে" এবং duco অর্থ "বাহিরে আনি"। এক কথায়, "ভিতর হইতে বাহিরে আনি"। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলিকে বাহিরে আনা বা স্ফুরিত করার নামই শিক্ষা। জ্ঞান সঞ্চয় ও কৌশল আয়ত্ত করা অপেক্ষা ইহা শিক্ষার ব্যাপকতর সংজ্ঞা সন্দেহ নাই। ঠিক বটে, শিক্ষার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ হয়, কিন্তু ইহা ছাড়া মানুষ কি পারিপার্শ্বিক হইতে নূতন গুণ, নূতন চরিত্রগত অভ্যাস গঠন করে না? বিশেষ করিয়া, মানুষের অন্তরে কি কি গুণাবলী রহিয়াছে, আমরা যাহাকে অন্তর্নিহিত গুণ বলিতেছি, তাহা কতখানি পারিপার্শ্বিকের অবদান ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

তাই অনেকে বলেন, এডুকেশন Educare (Educere নয়) শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই শব্দের বাংলা অর্থ করিলে দাঁড়ায় "বড় করিয়া তোলা" (to bring up, to rear)। Oxford Dictionary, শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া এই অর্থই ব্যবহার করিয়াছেন। লালন-পালনের সাহায্যে শিশুকে বড় করিয়া তোলার নামই শিক্ষা। শিশু নিশ্চয়ই কিছু কিছু অন্তর্নিহিত গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তারপর পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে যে লালিত ও পালিত হয় (পিতা-মাতা এই পারিপার্শ্বিকের অন্যতম)—বড় হয়—তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ হয়, তাহার মধ্যে নূতন গুণাবলীর প্রকাশ হয়। ঐ সব স্ফুরণ ও বিকাশ যাহাতে "বাঞ্ছিত" পথে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য আমরা বয়স্করা সাধ্যমত পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করি। ইহার নামই শিক্ষা।

তাই, বর্তমানে, বাঞ্ছিত পথে মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তনকে আমরা শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি।

জন্ম হইতেই আরম্ভ হয় এই পরিবর্তন ; শিশু ধীরে ধীরে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন হইয়া থাকে :—

১। স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ফলে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে নানারূপ ক্ষমতা স্বতঃই বিকশিত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকের সহিত তাহার তেমন যোগ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মনস্তাত্ত্বিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ব্যাঙাচির স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক ক্রিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘদিনের জন্য দমন করিয়া রাখিয়া অবশেষে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেও সে জন্মগত ক্ষমতাগুণে সাঁতার কাটিতে পারে। আবার, সুস্থ সবল শিশুকে জন্ম হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশের ফলে হাঁটিতে শিখিয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণের ফলে ব্যবহারের পরিবর্তন

২। মানুষের অধিকাংশ ব্যবহারের সৃষ্টিই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিদত্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা লইয়া মানুষ পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মধ্যে নূতন নূতন ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। জন্মের সংগে সংগেই মানুষের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনের তাগিদ পরিলক্ষিত হয় (ভালবাসার প্রয়োজন, ভাল আহার্যের প্রয়োজন ইত্যাদি)। ঐ প্রয়োজনগুলি নিবৃত্ত করিতে গিয়া মানুষ পারিপার্শ্বিকের সংগে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপন করে ; এই পারস্পরিক সম্পর্কই তাহার পরিবর্তন ঘটায়। সে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জন করে, নূতন নূতন কৌশল আয়ত্ত করে এবং নূতন নূতন অভ্যাস গঠন করে ; তাহার মধ্যে নূতন নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং নূতন নূতন চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হয়। নবসৃষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে সে আবার নূতন পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয় এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে নূতন করিয়া তাহার ব্যবহারের

অভিজ্ঞতা বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন

পরিবর্তন হয়। এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, পরিবর্তন, পুনর্গঠন, ইহাই প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য।

ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনকে শিক্ষা আখ্যা না দিয়া স্বাভাবিক পরিণতি (maturity) বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু হাঁটিতে "শিখিল" (ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বলিয়া) ইহাকে শিক্ষা আখ্যা না দিয়া "স্বাভাবিক পরিণতি" আখ্যা দেওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আবার পারিপার্শ্বিকের সান্নিধ্যে আসিয়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু হয়ত জানিতে পারিল যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে—তারপর আগুন দেখিয়া সে সরিয়া বসিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে এই যে ব্যবহারের পরিবর্তন হইল ইহাই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপদবাচ্য।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যবহারের পরিবর্তনের নাম শিক্ষা

শিক্ষা এবং জীবন একসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষালাভ পদ্ধতি ও মানব-জীবনের বিকাশের পদ্ধতি পৃথক নহে। মানব-জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জীবনের চাহিদা (needs) এবং পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টাই ইহার প্রধান অবলম্বন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পারিপার্শ্বিকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই প্রয়োজন নিবৃত্তির চেষ্টায় তাহার মধ্যে আবার নূতন প্রয়োজন জন্মায়; ঐ নূতন প্রয়োজনের তাগিদে সে আবার নূতন করিয়া পারিপার্শ্বিকের সান্নিধ্যে আসে। এইভাবেই জীবনের গতি প্রবাহিত হয়—মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিকের সহিত নিমের সামঞ্জস্য বিধান (Adjustment) করে, শিক্ষার গতিও ইহা হইতে ভিন্ন নহে। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষের মধ্যে যে নূতন প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি হয় এবং তাহা নিবৃত্তি করার চেষ্টায় মানুষের মধ্যে যেসব জ্ঞান, কৌশল, অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে সেগুলিকেই শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে। যতদিন জীবন, ততদিন শিক্ষা—তাই বলা হয়, "জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন" ("Life is education and education is life")। শিক্ষার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের সহিত

শিক্ষা এবং জীবন পরস্পরের পরিপূরক

সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা সারা জীবনই চলে অর্থাৎ শিক্ষা কার্য, মানুষের জীবনকালে কখনও শেষ হয় না। নান্ সাহেব (প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিক্ষাবিদ্) তাই শিক্ষাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমপর্যায়ে ফেলিয়াছেন। শিশু যে-সব সম্ভাবনা লইয়া জন্মায় পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে তাহাদের পূর্ণ বিকাশেই শিক্ষার সার্থকতা। এই বিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বতঃপ্রণোদিত, স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাকার্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই—ইহা জীবনেরই ধর্ম। আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ জন ডিউয়ী পারিপার্শ্বিক কি করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি (Innate potentialities) সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। সামাজিক পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া তাহাদের বিকাশ ঘটে আবার সমাজ-জীবনের প্রয়োজন সাধনেই তাহাদের সার্থকতা। স্বকীয় অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এবং সমাজ লইয়াই মানুষের জীবন। পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে উভয়ের সংহত বিকাশকে আমরা শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি।

ক্রমাগত শিক্ষায় পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পুনর্গঠন

একবার কোন শিক্ষা গ্রহণ করিলে সমগ্রজীবনে সেই শিক্ষার আর কোন পরিবর্তন হইবে না ইহাও মনে করা ভুল। জীবনের এক স্তরের অভিজ্ঞতা অন্য স্তরের অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক হওয়ার দরুণ এক স্তরে লব্ধ শিক্ষা অপর স্তরে পরিবর্তিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে। ধরা যাউক, বাল্যকালে শিশুর ধারণা জন্মিল যে, রাত্রিবেলা সূর্য তাহারই মত ঘুমাইয়া থাকে, কিন্তু পরে বিদ্যালয়ে এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া রাত্রিতে সূর্যকে কেন আকাশে দেখা যায় না এ সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত শিক্ষা জন্মিল। আবার কোন ছাত্র হয়ত বিদ্যালয় জীবনে খেলাধুলা এবং সাহিত্যচর্চা করিয়া অবসর বিনোদন করিতে অভ্যস্ত হইল, কিন্তু পরে সে হয়ত কারখানায় শ্রমিকরূপে ঢুকিয়া মদ্যপানকে অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিল। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অভিজ্ঞতা তথা শিক্ষার পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ (Education & re-education) চলিতে থাকে।

শিক্ষাকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না

করিয়াও লোকে শিক্ষালাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে অধিক দিন লেখাপড়া না করিলেও তাঁহার মত শিক্ষিত লোক কয়জন জন্মিয়াছেন! বস্তুতঃপক্ষে জীবনের অধিকাংশ শিক্ষাই বিদ্যালয়ের বাহিরে হয়। শুধু তাহাই নহে অনেক শিক্ষা আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই হইয়া থাকে। কখন কোন্ অভিজ্ঞতার ফলে, কিভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তাহা সব সময় আমরা জানিতেও পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতায় ট্রামে-বাসে চলাচল করিয়া একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, আমার ভব্যতাবোধের পরিবর্তন হইয়াছে; বাস আসিলে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা সকলকেই নির্বিচারে ধাক্কা দিয়া ট্রাম-বাসে উঠিয়া পড়িতে কোথাও আমার বিন্দুমাত্র বাধিতেছে না। তাই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বলিয়া শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে কিছুটা জ্ঞাতে, কিছুটা অজ্ঞাতে আমাদের যে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ-শিক্ষা (Informal Education) বলা হয়। অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের কোন উদ্দেশ্য আমাদের মনের মধ্যে থাকে না; কোনরূপ বিধিবদ্ধ (Systematic) অভিজ্ঞতালাভের চেষ্টাও আমরা করি না। তথাপি শিক্ষালাভের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে, আমরা শিক্ষালাভ করি। ঐ ধরণের শিক্ষায় সবসময় যে বাঞ্ছিত পথে আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায় এমনও নহে। আমাদের মধ্যে যে-সব অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও প্রধানতঃ শিক্ষারই ফল। ধরা যাউক, কোন মন্দ ছাত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপর কোন ছাত্র যদি নকল করিতে শিখে, বা কলিকাতার ট্রামে, বাসে উঠার অভিজ্ঞতার ফলে কাহারও ভব্যতাবোধ যদি হ্রাস পায় তবে উহাদের কুশিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে।

অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা

অবশ্য শিক্ষা শব্দটি আমরা সাধারণতঃ ভাল অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি। অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তন হইলে তাহাকে আমরা কুশিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি। তাই বাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য সকল সমাজই বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে; বিশেষ করিয়া অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্যই ঐরূপ চেষ্টা করা

প্রত্যক্ষ শিক্ষা

হয়। এই উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিদ্যালয়ে ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোন্ অভিজ্ঞতার পর কোন্ অভিজ্ঞতালাভের ব্যবস্থা থাকিবে তাহা পূর্ব হইতেই অনেকটা নির্দিষ্ট থাকে। যুগযুগ ধরিয়া সমাজ যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, যে-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে এবং যে সব অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে তাহা নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করে। এইরূপ শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা (Formal Education) বলে। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকে ছাত্রকে শিক্ষালাভে সাহায্য করা আর ছাত্রের উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষকের সাহচর্যে ও পরামর্শে বাঞ্ছিত পথে নিজের ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু (পাঠ্যসূচীর সাহায্যে) পূর্ব হইতে নির্ধারিত থাকে এবং শিক্ষালাভ পদ্ধতিও (পঠন ও পাঠন) মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকে। ছাত্র, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অপরাপর কর্মিগণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিশেষ কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করা হয় (যেমন, বিদ্যালয় বসার এবং ছুটির সময় ইত্যাদি)। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিও করিতে চেষ্টা করা হয় (লাইব্রেরী, খেলার মাঠ ইত্যাদি)। এইভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্রের প্রত্যক্ষ শিক্ষা চলিতে থাকে।

বর্তমানে বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই জীবনের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও লোকে যাহাতে প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই কার্যের জন্য অগ্রসর দেশগুলিতে বিশেষ ধরণের বিদ্যায়তন স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশের সমস্যা কিন্তু একটু অন্যরূপ। অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা না লইয়াও সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহাদের অন্ততঃ কিছুটা প্রত্যক্ষ শিক্ষার

বয়স্কদের শিক্ষা

সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মত ঐসব কেন্দ্রও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে (যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি হইতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের চেষ্টা কর হয়। রেডিও আলোক চিত্রকে, বিশেষভাবে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। জীবনের যে-কোন সময় অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলে লব্ধ সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকায় জীবনের কোন স্তরেই মানুষকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাই অধিকতর প্রগতিশীল দেশগুলিতে বয়স্কদের জন্য নানা ধরণের প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ঐসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নিজ নিজ আগ্রহের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন ও কৌশল আয়ত্তকরণের সুযোগ দেওয়া হয়; অনেকক্ষেত্রে নানা ধরণের সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলায় যোগদানের সুযোগ দিয়া, মানুষের ব্যক্তিত্বকে অধোগতি হইতে রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হইতে সাহায্য করা হয়।

সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষা চলিলেও কেবলমাত্র উহাকে শিক্ষা বলিয়া মনে করিলে শিক্ষা শব্দের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। তারপর, প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর অপ্রত্যক্ষভাবেই হউক, শিক্ষাকে জ্ঞান অর্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণের সংগে অভিন্ন ভাবাও উচিত নহে। তোতা-বৃত্তির দ্বারা জ্ঞানলাভ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৌশল আয়ত্ত করাকে শিক্ষা না বলিয়া কুশিক্ষা বলাই অধিকতর সঙ্গত। অধিকন্তু জ্ঞানলাভ ও কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া আরও অনেক রকম শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। বুঝিবার সুবিধার জন্য মানুষের শিক্ষাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা

১। জ্ঞানলাভ—যথা, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান।

২। কৌশল শিক্ষা—যথা, পড়া শেখা, লেখা শেখা, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি কষার নিয়ম শেখা; জীবিকা-অর্জনের জন্য নানা ধরণের বৃত্তির কৌশল আয়ত্ত করা।

৩। অভ্যাস শিক্ষা—যথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ইত্যাদি।

৪। নানারূপ অনুভূতির উপলব্ধি এবং তাহাদের প্রকাশের ভঙ্গী শিক্ষা—যথা, ঘৃণা, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি।

৫। চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ—যথা, সত্যাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি।

মানুষের জীবনের সব রকম ব্যবহার পরিবর্তনকেই উপরোক্ত পাঁচ ভাগে আলোচনা করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম সংগ্রহ করিলে শিক্ষা শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়—

আলোচনার সারমর্ম এবং শিক্ষার সংজ্ঞা

১। শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি শিক্ষা শব্দের অর্থ তাহা হইতে অনেক ব্যাপক। অভিজ্ঞতার ফলে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহাই শিক্ষা। শিক্ষা এবং জীবন অভিন্ন।

২। যদিও ব্যাপকতম অর্থে বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত উভয়পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে, প্রকৃত পক্ষে শুধু বাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই আমরা "শিক্ষা" পদবাচ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি; অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকে আমরা "কুশিক্ষা" বলি। সামাজিক জীবনযাত্রার মাপকাঠিতেই সাধারণতঃ আমরা বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকি। যে ব্যবহার সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ এবং সফল জীবনযাপন করিতে আমাদের সাহায্য করে উহাই বাঞ্ছিত ব্যবহার; অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐ ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহারই নাম শিক্ষা।

৩। বিদ্যালয়ের কার্যের সংগে শিক্ষাকে অভিন্ন ভাবিলে আমরা ভুল করিব। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দুইভাবে শিক্ষা হইতে পারে; বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। বর্তমানে বিদ্যালয় ব্যতীত প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য অন্য ধরণের প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই শিক্ষা বিদ্যালয়ের কার্য হইতে বহুগুণে ব্যাপকতর।

৪। জ্ঞান অর্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণ শিক্ষা নহে; তাহারা শিক্ষালাভের উপায় মাত্র। তোতাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞান এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৌশল আয়ত্ত করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহারা অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি

করে—ঐ ধরণের ব্যবহারের পরিবর্তনকে শিক্ষা না বলিয়া কুশিক্ষা বলাই অধিকতর সঙ্গত। তারপর জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্তকরণ ভিন্ন আরও নানাভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন হইতে পারে (অভ্যাস গঠন ইত্যাদি)।

এখন এক কথায় শিক্ষা বলিতে কি বুঝি তাহা বলিতে হইলে বলিব যে, **পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ (satisfying) এবং সার্থক (successful) জীবনযাপনে সাহায্য করে তাহাই শিক্ষা।**

শিক্ষা ও কুশিক্ষায় পার্থক্য

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহার সু ও কু উভয় পথেই পরিচালিত হইতে পারে। যে অভিজ্ঞতা মানুষকে উন্নতির পথে, সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ সার্থক জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহার প্রভাবকেই শুধু শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ; বিপরীত দিকে পরিচালনকারী অভিজ্ঞতার প্রভাবকে **কুশিক্ষা** বলিতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিথ্যা কথা বলার অভ্যাসও অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল ; কিন্তু ইহা শিক্ষা নহে, কুশিক্ষা। এইরূপ, নিত্যই আমরা কতই না কুশিক্ষা পাইতেছি।

শিক্ষা দ্বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা কিভাবে সংঘটিত হয়, ইহা একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখিত পাইব যে, শিক্ষা একটি দ্বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি (Education is a bipolar process)। দুই ছাড়া, একে শিক্ষালাভ হইতে পারে না। এই দুই-এর প্রধান হইল শিক্ষার্থী (Learner)। তাহার মনে শিক্ষা লাভের তাগিদ না আসিলে কোন শিক্ষা হইতে পারে না। জন্মমাত্রেই শিক্ষার্থীর মধ্যে (মানুষ মাত্রেরই মধ্যে) কতকগুলি চাহিদা (needs) লক্ষিত হয়। বড় হওয়ার সংগে সংগে সমাজ তাহার মধ্যে আরও নানা-ধরণের প্রয়োজন সৃষ্টি করে, যেমন পরীক্ষায় ভাল করা, সহপাঠীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা ইত্যাদি। এইরূপ নানাধরণের প্রয়োজনের তাগিদেই

শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিকের স্মরণ লয় উহার সাহায্যে তাহার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে (যেমন,—নোট বই-এর সাহায্যে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে)। এইভাবে শিক্ষার্থী ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যখন পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখনই শিক্ষালাভ ঘটে।

কাজেই শিক্ষালাভ পদ্ধতির (Educative process) দুইটি কেন্দ্রের অপরটিতে রহিয়াছে পারিপার্শ্বিক (প্রথম কেন্দ্রে যে শিক্ষার্থীর স্থান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে)।
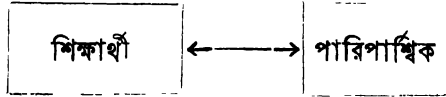
(শিক্ষা দ্বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি)

পারিপার্শ্বিক বলিতে এক সংগে অনেক কিছুই বুঝায়। যাহা কিছু, যে কোন সময় মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম (তাহার প্রয়োজন নিবৃত্তির সহায়তা বা বিঘ্ন ঘটাইতে পারে) তাহাই তাহার পারিপার্শ্বিক। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের ভিতর অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও, কেন নির্দিষ্ট চাহিদা নিবৃত্তির জন্য মানুষ তাহার একটি অংশের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। এই পারিপার্শ্বিক সজীব (living) বা নির্জীব (non-living) উভয়ই হইতে পারে। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখিতে যখন শিক্ষার্থী নোট বইএর সাহায্য নেয়, তাহার পারিপার্শ্বিক তখন অচেতন পদার্থ; কিন্তু একই উদ্দেশ্যে সে যখন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসে তাহার পারিপার্শ্বিক তখন সচেতন। অচেতন হউক আর সচেতন হউক পারিপার্শ্বিকও নিজ প্রয়োজনের তাগিদেই শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসে—পারস্পরিক সম্বন্ধের নিমিত্ত উভয় পক্ষেরই আগ্রহ আবশ্যক হয়। অচেতন পদার্থের বেলা এই আগ্রহের পশ্চাতে কোন সচেতন পদার্থ থাকে (যেমন, নোট বই-এর বেলা রহিয়াছে, তাহার লেখক বা প্রকাশক)। সচেতন পদার্থের বেলা আগ্রহের পশ্চাতে থাকে তাহার স্বকীয় প্রয়োজন নিবৃত্তির তাগিদ (যেমন, শিক্ষকের বেলা থাকে জীবিকার্জনের বা শিক্ষাদানের আনন্দলাভের প্রয়োজন)।

স্বভাবতই সচেতন পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা অধিকতর অন্তরঙ্গ হয় এবং ইহার মাধ্যমে পারস্পরিক প্রেষণার (Emotion) আদান-প্রদান হয়; ফলে এই ক্ষেত্রে শিক্ষাও দ্রুততর ও অধিকতর কার্যকরী হয়।

প্রকৃতপক্ষে সচেতন বা সজীব পারিপার্শ্বিক হইতেই আমরা বেশী শিক্ষা পাইয়া থাকি। পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির ভিত্তিতে মানুষ পরস্পরের সহিত কত রকমেরই সম্বন্ধ না স্থাপন করে (যেমন, মাতা ও পুত্র)। ঐসব সম্বন্ধের মাধ্যমে পরস্পর যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার ফলে উভয়েরই জ্ঞান লাভ হয় এবং উভয়েরই ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে (যেমন, স্তন্যপানের ফলে শিশু মাতাকে ভালবাসিতে শিখে এবং মাতা শিশুকে যথাযথভাবে স্তন্যদান করিতে শিখেন এবং ঐ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক জ্ঞান লাভ করেন)। কখনও কখনও বা নির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ বা কৌশল আয়ত্তকরণের বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (যেমন, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ)। এই ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে, নূতন জ্ঞান, নূতন কৌশল, নূতন অভ্যাস, নূতন চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। ফলে তাহার মধ্যে আবার নূতন প্রয়োজনবোধ জন্মায়। এই নূতন প্রয়োজনবোধের তাগিদে, সে আবার নূতন পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে (বা পুরাতন সম্বন্ধের নব রূপায়ণ করে) এবং নূতন জ্ঞান ইত্যাদি অর্জন করে। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া চলে প্রয়োজন নিবৃত্তির চেষ্টা এবং নূতন নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি; সংগে সংগে চলে নূতন নূতন পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং নূতন নূতন জ্ঞান ইত্যাদি অর্জন।

এই পারস্পরিক সম্বন্ধে, এখন যিনি শিক্ষক, কিছুক্ষণ পরে, অপর ক্ষেত্রে তিনিই হয়ত ছাত্র এবং আজ যিনি ছাত্র কাল তিনি হয়ত শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতেছেন; অর্থাৎ পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য, যৌথ কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টায় আজ হয়ত একজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছেন, কাল হয়ত নেতৃত্ব অপরের হাতে চলিয়া যাইতেছে, কখনও কখনও বা যৌথ নেতৃত্বেই কাজ অগ্রসর হইতেছে। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই এই দ্বিকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা চলিতেছে; আমরা হয়ত আপন শিক্ষা বা তাহার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিতও নহি।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য নিয়াই আমরা ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ স্থাপন করি। শিক্ষালাভ প্রচেষ্টার এক কেন্দ্রে থাকেন শিক্ষক এবং অপর কেন্দ্রে থাকে ছাত্র। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে (যে পদ্ধতি অনুসারে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রের

প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ হইয়া থাকে) শিক্ষাকার্যে ছাত্রও কখনও কখনও নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। যে শিক্ষক কখনও ছাত্রের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তিনি শিক্ষালাভে ছাত্রদের যথাযথ সাহায্য করিতে পারেন না বলিয়াই মনে হয়। ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ ব্যতীত ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ হইতেও বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। নানাবিধ পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্রদের মধ্যে নানাধরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। শিক্ষালাভ কার্যে এই সব পারস্পরিক সম্বন্ধের মূল্য ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ অপেক্ষা অল্প নহে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার পূর্ব সংজ্ঞাকে অধিকতর বিশ্লেষণ-ধর্মী করিয়া আমরা নিম্নলিখিত সংজ্ঞায় উপনীত হইতে পারি—**শিক্ষা একটি দ্বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি (Bipolar process); পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত সম্বন্ধ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ ও সার্থক জীবন যাপনে সাহায্য করে, তাহার নামই শিক্ষা।**

শিক্ষা সম্বন্ধে আরও দুই একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করিয়া, বর্তমান আলোচনা শেষ করা যাইবে। অনেকে মনে করেন যে, পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে বয়স্কেরা শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই, তাহাদের ব্যবহার বাঞ্ছিত পথে পরিবর্তিত হইতে পারে। শিশু যেন একতাল নরম মাটি, যে ছাঁচে তাহাকে ঢালা যাইবে সেই অনুকৃতিতেই সে গড়িয়া উঠিবে। বয়স্কেরা সমাজের প্রতিভূ; কাজেই সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তাহাদের অনুকৃতিতে গড়িয়া তোলার নামই শিক্ষা।

শিশুদের উপর বয়স্কদের প্রভাবই শিক্ষা

বয়স্কেরা শিশুদের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের সংস্পর্শে শিশুদের ব্যবহারের পরিবর্তনও হয় বটে, কিন্তু এই সংস্পর্শের ফলে শিশুরা যে বয়স্কদের অনুকৃতিতে গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই। শিশুদের নরম মাটির সহিত তুলনা করা ভুল। কারণ নরম মাটির মত আকৃতিহীন হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে না। জন্মমাত্রই তাহারা সহজাত ক্ষমতা এবং প্রবণতার অধিকারী হয়; ইহাদের বিপক্ষে তাহাদের প্রভাবিত করা কঠিন।

তারপর বয়স্কেরা ছাড়া শিশুরা অন্যান্যদের সংস্পর্শেও (ছোট, সমবয়সী ইত্যাদি) আসে এবং তাহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তবে বয়স্কদের প্রভাব যে শিশুদের উপর কাজ করে না, এমন নহে। যাহাদের সহিত শিশুদের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, শিশুরা নিজেদের অজ্ঞাতেই তাহাদের অনুকরণ করে ; কিন্তু যাহাদের সহিত তাহাদের প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অনেক সময় তাহাদের প্রভাব শিশুদের উপর বিপরীত কাজ করে। তারপর পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে শুধু যে শিশুরা প্রভাবিত হয় এমন কোন কথা নাই ; শিশুদের সংস্পর্শে আসিয়া বয়স্কেরাও প্রভাবিত হন। শিক্ষালাভ শিশু এবং বয়স্ক উভয়েরই ঘটিয়া থাকে। শিশুদের উপর বয়স্কদের প্রভাব অধিক পরিমাণে পড়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। ইহা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এবং সমাজের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক। সংক্ষেপে শিশুদের উপর বয়স্কদের প্রভাবের দ্বারা শিক্ষালাভ হয় ইহা আংশিক সত্য মাত্র।

সামাজিক রীতি, নীতি, জ্ঞান ও কৌশল সঞ্চারণই (transmission) শিক্ষা।

সমাজের পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের জন্যই শিক্ষা দান প্রচেষ্টা। তাই অর্জিত জ্ঞান, আয়ত্তীকৃত কৌশল ও গড়িয়া উঠা রীতি-নীতি, সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াকে অনেকে শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী এবং কার্যক্রম বিশ্লেষণ করিলে, ইহা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু সংজ্ঞা নহে—শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি বা কি করিয়া শিক্ষা লাভ হয় এ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইতে এই সংজ্ঞা আমাদের সাহায্য করে না।

আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবেও ইহা আংশিক সত্য মাত্র। সত্য বটে, শিক্ষার সাহায্যেই সমাজ টিকিয়া আছে ; সমাজ, তাহার নিজ প্রয়োজনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠে ; আর সমভাষা না হইলে, এবং রীতিনীতি, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাই সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্যরা

যাহাতে সমাজের ভাষা শিক্ষা করে, তৎকর্তৃক অর্জিত জ্ঞান, আয়ত্তীকৃত কৌশল ও গড়িয়া উঠা রীতিনীতির সহিত পরিচিত হয়, সমাজ শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করে।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ সমাজের হাতে যন্ত্র-বিশেষ মাত্র নহে। তাহার স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে এবং ঐ স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহাতে সমাজও লাভবান হইয়া থাকে; কারণ ব্যক্তিবিশেষের বিকাশ ও অবদানের মাধ্যমেই সমাজের বিকাশ ও উন্নতি হইয়া থাকে (ভারতীয় সমাজ উন্নয়নে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও অবদানের কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণ করা যাইতে পারে)। কাজেই 'সঞ্চারণ' শিক্ষার সংজ্ঞা বা পূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া "পড়া" এবং "পড়ানোর" দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনেকে উহাদিগকে শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন। পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক উভয়েই ছাত্রের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত। পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যাখ্যা প্রভৃতি শ্রবণের মাধ্যমে ছাত্র উহাদের সংস্পর্শে আসে; ফলে তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন হয় এরূপ বিশ্বাস করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ ধরণের নীতিকে 'শূন্য কুম্ভ' নীতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জ্ঞানহীন ছাত্রকে জলহীন কুম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক উভয়কেই জ্ঞানপূর্ণ কুম্ভের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এক কুম্ভের জলে যেমন অপর কুম্ভ পূর্ণ করা যায়, পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষকের নিকট হইতে তেমনি জ্ঞানও ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করা চলে। পুস্তকের জ্ঞান, চক্ষুর মাধ্যমে এবং শিক্ষকের জ্ঞান কর্ণের মাধ্যমে ছাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, শিক্ষা এবং শিক্ষক বা পুস্তকের উপদেশ (Instruction) অভিন্ন। এখনও অনেকে শিক্ষা ও উপদেশ দান সমার্থবাচক বলিয়া ধরেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, ছাত্র শূন্য কুম্ভ নহে; তাহার মধ্যে খুসীমত জ্ঞান ঢালিয়া দেওয়া চলে না। যে-কোন নূতন জ্ঞান তাহার পুরাতন জ্ঞানের অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত সে উহা গ্রহণ করিতে পারে না। তারপর চোখ বা কান কলসীর মুখের মত এমন কোন জিনিস নহে যে, যাহা খুসী ঢালিয়া দিলেই উহা ভিতরে প্রবেশ

শূন্য কুম্ভ নীতি

করিবে। চোখ দিয়া পড়া এবং কান দিয়া শোনা সত্ত্বেও ছাত্রের কোন বিষয়ে মর্মোপলব্ধি না হইতেও পারে ; আবার মর্মোপলব্ধি হইলেও বাঞ্ছিত পথে ছাত্রের ব্যবহার পরিবর্তিত বা শিক্ষা নাও হইতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে মানুষ শুধু আপন অভিজ্ঞতা হইতে নিজ চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে পারে। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসার ফলেই তাহার অভিজ্ঞতা জন্মায় এবং আপন প্রয়োজন নিবৃত্তির তাগিদেই সে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে। অনেক সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ বা শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণে প্রবৃত্ত হয় না ; ফলে অভিজ্ঞতা হিসাবে উহা তাহার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অভিজ্ঞতাকে আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। নিজে, ব্যক্তিগতভাবে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয় তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আর অপরের অভিজ্ঞতার কথা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তাহা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। পরোক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজে ব্যবহারের পরিবর্তনের আশা করা যায় না। পাঠ্যপুস্তক পাঠ বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনা ছাত্রের নিকট পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার মূল্য অল্প। কাজেই "শূন্য কুম্ভ" নীতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোতাবৃত্তিতে পরিণত হয়। তোতাবৃত্তিকে যে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

অনুশীলনী

1. Education has been used in a wide sense, as well as in a narrow sense. Explain the two uses of the word Education. (C. U. B. T. 1962).

2. Critically examine any of the following definitions of education—(a) Education is acquisition of knowledge. (b) Education is moulding the "young" after the "old." (c) Education is life. (d) Education is transmission.

3. "Education is a bipolar process." Discuss

4. Education is neither the mere acquisition of a body of knowledge nor the mere training of mental power through exercise. It is adjustment—a life to be lived. Examine the statement (C. U. B. T. 1965)

5. Define as precisely as you can each of the following terms and show how they are related :

Education, Instruction, Discipline, Development (C. U. B. T. 1961).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের প্রয়োজন—পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত নূতন নূতন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদিগকে নূতন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত বা নূতন নূতন ব্যবহারে দীক্ষিত করিয়া থাকে। কিন্তু বাঞ্ছিত পথে বা আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহারের পরিবর্তনকেই আমরা শিক্ষা নাম দিয়া থাকি। সব শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য নহে। আমরা সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদিও শিক্ষারই ফল, কিন্তু উহাদিগকে সুশিক্ষা না বলিয়া আমরা কুশিক্ষা বলিয়া থাকি। কিন্তু কাহাকে সুশিক্ষা এবং কাহাকে কুশিক্ষা বলিব তাহা স্থির করা সহজ কথা নহে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল শিক্ষাকেই প্রায় কুশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হইত। যে ছেলে খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদিতে কিছুমাত্র আকর্ষণ প্রকাশ করিত, শিক্ষক কিংবা পিতামাতা তাহার আচরণের সংশোধনে তৎপর হইতেন। বর্তমানে কিন্তু ঐগুলিকে সুশিক্ষা বলিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। মোট কথা, কাহাকে সুশিক্ষা এবং কাহাকে কুশিক্ষা বলা হইবে তাহা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া আমরা শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।

প্রত্যক্ষ শিক্ষাকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি প্রভৃতি যে স্থির করিয়া লইতে হয়, এই আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা হইয়াছে। সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া লওয়ার জন্য আমাদের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি প্রভৃতি এত ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাদের মধ্যে সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষাই বেশী হইতেছে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকার দরুণ আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের কার্য চালাইয়া যাইতেছি। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কার্য হয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল ফল প্রসব করিতেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাকার্যকে নহে, সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কারণ সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমাদের অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা হইয়া থাকে এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে উভয় শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। ধরা যাউক, বিদ্যালয় জীবন (প্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্র) যদি ছাত্র, শিক্ষক সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে এবং সমাজ-জীবন (অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্র) যদি পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে যাপন করিতে হয় তাহা হইলে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা কোনটাই চারিত্রিক গুণ হিসাবে প্রকাশ পাইতে পারিবে না। অধিকন্তু এই অবস্থার ফলে মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হইয়া মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবে। তাই প্রত্যক্ষ শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এইজন্য প্রাচীন ভারতে এমন নজির আছে যে, রাজা শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিরোধী আইন প্রণয়ন করিলে ব্রাহ্মণ (শিক্ষক) তাঁহাকে ঐ আইন প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। সংক্ষেপে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রের (সমাজ-জীবনের) অভিজ্ঞতাগুলিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

আর একটি কথা, শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল সংগে সংগে উপলব্ধি করা যায় না। আজ যাহাকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে ১২।১৪ বৎসর পরে সে যখন সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে তখনই শুধু তাহার শিক্ষার ভালমন্দ প্রত্যক্ষ ফলাফলের মানদণ্ডে বিচার করা যাইতে পারে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে প্রতিপদ অগ্রসর হইবার পূর্বে আমাদের প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করা যাইতে পারে। এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা শিক্ষাদান ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন প্রচেষ্টার অপরিহার্য অঙ্গ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে জীবনদর্শনের স্থান—শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য অভিন্ন। মানুষের জীবনদর্শনই তাহার জীবনের সব কিছুর ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি ; শিক্ষার ভালমন্দ বিচারের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষ শিক্ষার দ্বারা তাহার বংশধরকে নিজ জীবনাদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে চায়। জীবনদর্শন কথাটি খুব গালভারি

সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞাতে হউক বা অজ্ঞাতে হউক মানুষের সামান্যতম কার্যও তাহার জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হাক্সলি (Aldous Huxley) বলিয়াছেন—"মানুষ আপন জীবনদর্শন—জগৎ সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া থাকে। একেবারে চিন্তাহীন লোক সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। জগতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধারণা ব্যতীত জীবনযাপন সম্ভব নহে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনদর্শন থাকিবে কিনা ইহা বিচার্য বিষয় নহে, তাহার জীবনদর্শন ভাল হইবে কি মন্দ হইবে ইহাই বিচার্য বিষয়।" চার্বাক বা ওমর খৈয়ামের ভোগ-সুখমূলক জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে একরূপ, আবার জৈনধর্মের অত্যুগ্র শরীর নিগ্রহমূলক জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনদর্শন লইয়া মানুষে মানুষে এমন কি সমাজে সমাজে গুরুতর পার্থক্য আছে; ফলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমাদের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা যায়। এরিষ্টটল্ (Aristotle) লিখিয়া গিয়াছেন—"তরুণরা কি শিক্ষা করিবে এ সম্বন্ধে কোন মতৈক্য নাই, শিক্ষা-দানের কালে আমরা বুদ্ধির বা চরিত্র বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিব ইহা স্থিরীকৃত হয় নাই।" শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরিষ্টটলের কালে যেরূপ মতবিরোধ ছিল আজও প্রায় সেইরূপই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়া এবং আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বর্তমানে ভারতে আমরা সমাজ পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হইয়াছি: স্বভাবতই সংগে সংগে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে—সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে, নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আমাদের মনস্থির করা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দর্শনশাস্ত্র—মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পরিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করা কঠিন। আবার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে দৃশ্যমান জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি তাহা অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ এবং জগতের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া প্রধানতঃ তিনটি দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে—ঐ সব

মতবাদকে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) আখ্যা দেওয়া হয়।

জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ (Idealism) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদীরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জীবনের সমস্যাগুলির বিচার করিয়া থাকেন।

১। জড়জগৎ হইতে মানসিক বা অধ্যাত্ম জগৎ অধিকতর সত্য ইহাই ভাববাদের গোড়ার কথা। সমগ্র জগৎসৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন ভগবান বা এক ভাবময় সত্তা—একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আমাদের চতুর্দিকের জড় জগৎ আসলে অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

২। মানুষের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মার সন্ধান পাই তাহা ভগবানেরই প্রকাশ—জীবাত্মা পরমাত্মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পরমাত্মা সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতীক। জীবাত্মাতে ভগবদ্ গুণাবলী প্রতিফলিত হওয়াতেই তাহার সার্থকতা।

৩। জীবাত্মার মধ্যে অন্তরাত্মার অনুভূতির নামই আত্মদর্শন (Self-realisation)। আত্মদর্শনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মদর্শন ঘটিলেই মানুষ জড়জগতের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তাহার মধ্যে ভগবদ্ গুণাবলীর প্রকাশ হয় এবং সে আদর্শ জীবনযাপন করিতে সক্ষম হয়।

৪। ভগবানের গুণাবলী শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে জীবনের উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য হয় না। মানুষ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে থাকিলেও সকলেরই শেষ পরিণতি এক এবং অভিন্ন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষভাবে, ভাববাদের প্রভাবের ফলেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) রূপে গড়িয়া উঠে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে আধুনিকতম বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও এই ভাবধারার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—ইউরোপে, সভ্যতার বিকাশ হয় সর্বপ্রথম গ্রীসদেশে। গ্রীক মনীষীদের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারা আজও ইউরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সোফিষ্ট (Sophist) নামে প্রাচীন গ্রীসে একদল শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। ইঁহাদের মতে মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নিজ বুদ্ধির দ্বারা মানুষ সৎ-অসতের পার্থক্য নির্ণয় করিতে সক্ষম। কাজেই সোফিষ্টদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে, মানুষকে বাধামুক্ত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সাহায্য করা। সে নিজ যুক্তি এবং বুদ্ধি অনুযায়ী সামাজিক বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবে। উপরি-উক্ত ভাবধারা এক সময়ে গ্রীসের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। সোফিষ্টদের মুখপাত্র সক্রেটিস্‌কে তাই সমাজদ্রোহী ঘোষণা করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

সোফিষ্টদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ

সোফিষ্টদের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা (এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থাই ইউরোপের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে) সাধারণতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অনুগামী ছিল। এরিষ্টটল, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিগণ এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিলেন। এরিষ্টটল্ লিখিত পলিটিকস্ (Politics) এবং প্লেটো লিখিত রিপাব্‌লিক (Republic) গ্রন্থদ্বয় আজও শিক্ষাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় গ্রন্থ বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়।

এরিষ্টটলের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ

ভাববাদী দর্শনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এথেন্সবাসীরা স্থূল এবং বাহ্যজীবন অপেক্ষা মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মানসিক বা আধ্যাত্মিক দিকে মনুষ্য জীবনের চরমবিকাশকে তাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মধ্যে এরিষ্টটল বিশেষ করিয়া "সত্যম", "শিবম্" এবং "সুন্দরম্"-এর উপর জোর দিতেন। ঐ গুণগুলির উপলব্ধিকরণের ক্ষমতা মনুষ্য-প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত। এই ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের নামই আত্মানুভূতি বা আত্মদর্শন (Self-realisation)। কাজেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা আত্মানুভূতিই প্রাচীন এথেন্সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "জিমনাস্‌টিক্'

(Gymnastic)-এর সাহায্যে শরীরের এবং "মিউজিক" (Music)-এর সাহায্যে মনের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হইত। অবশ্য মানসিক বিকাশের দিকেই অধিকতর জোর দেওয়া হইত; তাই শিল্প, চারুকলা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা স্বভাবতই অধিক পরিমাণে করা হইত। শিক্ষা সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর রুচি অনুযায়ী হইত। নিজ রুচি অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজ শিক্ষক এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু বাছিয়া লইত। বিদ্যালয় রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত হইত না। শিক্ষকগণই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্রেরাও নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থে গমন করিত। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক দেশ এবং তাহার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে শিক্ষার উদ্দেশ্য যদিও ভাববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তবু নীতি শিক্ষার তাড়নায়, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কিছুটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

নবজাগরণের (Renaissance) সূচনাতে কিন্তু মানবতাবাদিগণ (Humanists) ইউরোপের সকল দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। একথা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও চিন্তাধারার পুনঃ-প্রবর্তনই ছিল নবজাগরণ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। মানবতাবাদিগণ ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শানুযায়ী মানবতাবাদিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকিবে ছাত্র নিজে। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তখনকার যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মনুষ্য-প্রকৃতির বিকাশ বলিতে তাঁহারা সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের মত অতিন্দ্রিয় কিছু মনে করিতেন না। মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশকেই তাঁহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ঐ সময় ইউরোপে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফেকাল্টি সাইকোলজির (Faculty Psychology) প্রাধান্য ছিল। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মনুষ্য মনের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে। মানবতাবাদিগণ ঐ শক্তিগুলির বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য

মানবতাবাদিগণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং ব্যাকরণ পাঠের দ্বারা ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই বাস্তবক্ষেত্রে ছাত্রকে শিক্ষার কেন্দ্রে না রাখিয়া মানবতাবাদিগণ গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বরং ব্যাহত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো মানবতাবাদিগণ প্রবর্তিত অর্থহীন শিক্ষার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করেন। প্রকৃতির

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইউরোপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য

সাহচর্যে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশকেই তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য সুইস্ শিক্ষাবিদ্ পেস্তলিভজীও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেন। গ্রীক শিক্ষাবিদ্‌দের মত, মানবতার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি প্রচার করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল বিদ্যালয়কে একটি বাগান ও ছাত্রদের চারাগাছের সহিত তুলনা করেন। প্রত্যেক চারাগাছ যেমন নিজ নিজ বীজ অনুসারে বিকাশ লাভ করে, প্রত্যেক ছাত্রও তেমনি তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী অনুসারে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে ; ইহাই ছিল ফ্রোয়েবেলের মত। বিংশ শতাব্দীতে ইটালীয় শিক্ষাবিদ্ মন্তেসরী ও ইংলণ্ডের নান্ সাহেবও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন। মানুষই থাকিবে সকল প্রকার শিক্ষা প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থলে, ইহাই ছিল নান্ সাহেবের দৃঢ় মত।

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে আত্মোপলব্ধিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত। সেযুগে জ্ঞানকে "পরা" ও "অপরা" দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অধ্যাত্মজ্ঞান বা "পরা" জ্ঞানলাভ করাকে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হইত। জড় বা "অপরা" জ্ঞানকে অবহেলা না করা হইলেও

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্বনিয়ন্তা বা ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন—জীবাত্মা পরমাত্মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বেদ, উপনিষদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য পালন এবং অন্যান্য ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়া গুরুগৃহে ছাত্রেরা পরমাত্মাকে

উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিত। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি (অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা Self-realisation) ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতার বিভিন্নতা অস্বীকার করা হইত না। মানুষ ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। তাই অধিকারী ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হইত। নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রবণতার বিভিন্নতা হিসাবে বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইত। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। সমাজে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সব জ্ঞানের প্রয়োজন (পরা জ্ঞান) তাহা প্রাসঙ্গিকভাবে দেওয়া হইত—শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইত না।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতনের পর সংস্কৃত শিক্ষা যে শাস্ত্রজ্ঞানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করিয়া মুখস্থ করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। মক্তব এবং মাদ্রাসার শিক্ষার উদ্দেশ্যও ভিন্ন ছিল না। ইংরেজ আমলে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হইল, তখনও ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মানবতাবাদীদের প্রাধান্য ছিল। ফলে, তাঁহাদের অনুকরণে মানসিক ক্ষমতাগুলির বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইল। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় মানসিক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। এই আশায় ঐগুলিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের জীবনের সঙ্গে ঐ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় বাস্তবক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করাই ঐ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক ভারতের চিন্তা-নায়কগণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন নাই এমন নহে। তাঁহারা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ বা আত্মোপলব্ধিকেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমরা যাহা চাই তাহা হইতেছে পরিপূর্ণ মানুষ করার শিক্ষা ("The aims of education is to make man grow. It is man-making education all round that we want")। আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি এবং

চরিত্র গঠন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য একথা স্বামীজী তাঁহার বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ বলিয়া গণ্য করা হয়। তাঁহার শিক্ষাদর্শনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিকেই তিনি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। তোতাবৃত্তির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, কারণ ইহা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বাধা দেয়। নৃত্য, গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের বিকাশে সাহায্য করে বলিয়া গুরুদেবের শিক্ষা-ব্যবস্থায় উহারা বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। জীবনে সত্যম্, শিবম্ এবং সুন্দরম্-এর উপলব্ধিই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা যদিও সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিল, তথাপি শিক্ষাদর্শনের দিক হইতে বিচার করিলে তাহাকেও প্রধানতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলিতে হয়। কারণ, মানুষের দেহ, মন ও আত্মার শ্রেষ্ঠতম যাহা কিছু তাহার বিকাশকেই তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দও বিশ্বাস করিতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পরমোৎকর্ষের বীজ নিহিত আছে এবং তাহার বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলনীতি—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করার পর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সর্বপ্রথম কথা হইতেছে যে, ব্যক্তি-জীবনের গৌরবকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর (ধর্ম বা সমাজ) কোন কিছুই অগ্রাধিকার পাইতে পারে না ("Human personality is of supreme value and constitutes the noblest work of God"—Ross)। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন গ্রীসে সোফিষ্টগণও অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রত্যেক মানুষকেই ভগবানের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য জীবনের মূল্য এবং তাহার গৌরব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিতেন।

উচ্চ, নীচ সকলের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক নান্ সাহেবের মতে মানুষের স্বাধীন কর্ম ব্যতীত মনুষ্য জগতে কোন কিছু ভাল প্রবেশ করিতে পারে না; এই সত্যের কথা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে (...that nothing good enters into the human world except in and through the free activities of individual men and women, and that educational practice must be shaped to accord with that truth)। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির উৎকর্ষেই সমাজের উন্নতি

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের উপর ব্যক্তির প্রাধান্যে বিশ্বাসী। ব্যক্তির দ্বারাই সমাজ গঠিত। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। ব্যক্তি ব্যতীত সমাজের কোন পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের তৃতীয় কথা এই যে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে; নিজ নিজ দেহ-মন অনুভূতি লইয়া প্রত্যেক মানুষই এক একটি পৃথক সত্তা। সমাজ, সংস্কৃতি যাহা কিছু মানুষ সৃষ্টি করুক না কেন সব কিছু তাহারই প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং সে উহাদের হইতে স্বতন্ত্র। নান্ সাহেব প্রত্যেক মানুষকে এক একটি দ্বীপের সহিত তুলনা করিয়াছেন; সে তাহার নিকটতম প্রতিবেশী হইতেও স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র রূপটির উপলব্ধি মানুষকে পরিপূর্ণতা (perfection) প্রদান করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। (The main task of education is to foster the realisation of that perfect pattern in each individual life)

মানুষকে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতে এবং গ্রীসে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের রূপের ধারণা করার চেষ্টা করা হইত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বকে ভগবৎ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন। নান্ সাহেব অবশ্য প্রাণি-বিজ্ঞানের (Biology) সাহায্যে মনুষ্য ব্যক্তিত্বের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

জীবন বিবর্তনের ফলে প্রত্যেক মানুষ বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে (নান্ সাহেব ইহাকে হর্মি আখ্যা দিয়াছেন); ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ রূপ। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের স্ব-রূপে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য (The aim of education is to enable each one to become his highest and truest self)। তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সর্বদেশে সর্বকালে আত্মোপলব্ধি (self-realisation) কে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎস স্থল

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের চতুর্থ কথা এই যে, মানুষের জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হইলেই তাহার ব্যক্তিত্ব স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতীয় দর্শনে আত্মার ক্রমবিকাশ এবং আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানে জীবনের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব অনুসারে জন্মমাত্রেই প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রবণতার অধিকারী হয়। উহাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of individual potentialities)। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতাগুলির বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা এই বিকাশকে সাহায্য করে মাত্র। ইহাদিগকে রুদ্ধ বা পরিবর্তিত করিতে গেলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বেশী। ফ্রবেল সাহেব তাই বিদ্যালয়কে বাগান, শিক্ষককে মালী এবং ছাত্রকে ফুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিজ নিজ বীজের পার্থক্যের জন্য ছাত্রেরা কেহবা গোলাপ কেহবা গন্ধরাজ কেহবা জবা হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। শিক্ষক মালীর মত তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতার সম্যক বিকাশেই মানুষের স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয়

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাপদ্ধতি—শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারেই শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির হইয়া থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিকট যে সব বিষয় ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের মূল্যই অধিক। প্রাচীন ভারতে বেদাদি শাস্ত্র এবং প্রাচীন গ্রীসে দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিষয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এই ধারণা হইতেই শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন

ভারতে "অধিকারত্ব" বিবেচনা করিয়া কে কোন্ বিষয়ে শিক্ষা করিবে তাহা স্থির করা হইত। প্রাচীন রোমের শিক্ষা-ব্যবস্থা 'লিবারেল' (liberal) আখ্যা পাইয়াছিল। কারণ তাহার উদ্দেশ্য ছিল মনকে স্বাধীন বা মুক্ত (liberate) করা। দর্শন, চারুকলা ইত্যাদি বিষয়ের চর্চার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এই ধারণায় ঐসব বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। নবজাগরণ আন্দোলনের পর ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চা মনকে মুক্ত (liberate) করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের (পরে পাঠভবন) প্রতিষ্ঠা করেন তখন 'আত্মাকে' মুক্ত করিবার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার (liberal education) প্রচলন করাই তাঁহারও উদ্দেশ্য ছিল। তাই পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের উপর ততটা জোর না দিয়া সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প, চারুকলা ইত্যাদিকে তিনি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। মোট কথা পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা বাস্তব জীবনে কার্যকরী হইবে একথা না ভাবিয়া, কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করিবে বা "মনকে" মুক্ত করিতে সাহায্য করিবে একথাই অধিক বিবেচনা করেন। ছাত্রকে নিজ নিজ পছন্দ অপছন্দ অনুসারে নিজের পাঠ্যবস্তু নির্ধারণে কতকটা স্বাধীনতা তাহারা দেন। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাত্রের স্বভাবদত্ত ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুসারে স্থির করাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নীতি।

শিক্ষার বিষয়বস্তুর মত, শিক্ষার পদ্ধতিও উহার উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে ছাত্রগণ শাস্ত্র অধ্যয়নের সংগে সংগে অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের অন্তরে জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্তরের উপলব্ধিই মানুষকে আত্মদর্শনের (self-realisation) পথে অগ্রসর করে ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। অধ্যয়ন, আবৃত্তি, মনন এবং বাস্তবজীবনে লব্ধজ্ঞানের অভ্যাসই ছিল শিক্ষালাভের পদ্ধতি। আধুনিককালে, ছাত্র নিজ ইচ্ছায়, নিজের কার্যের মাধ্যমে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিশ্বাস করেন। তাই ছাত্রের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কর্মের সুযোগ করিয়া দেওয়াই, শিক্ষাদানের প্রধান পদ্ধতি।

জড়বাদ—দর্শন হিসাবে জড়বাদ ভাববাদের সংগে চিরদিনই প্রতিযোগিতা করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতে চার্বাক জড়বাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহার মতে "সুখে থাকাই" জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; মৃত্যুর পর আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বর্তমান কালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জড়বাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে—জড়-প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বের ফলে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। পূর্বে যেসব বস্তু নৈসর্গিক বলিয়া অনুমান করা হইত তাহা বর্তমানে প্রাকৃতিক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ফলে, কোন কিছুই ইন্দ্রিয়াতীত বা নৈসর্গিক বলিয়া বিজ্ঞানীরা স্বীকার করিতেছেন না। মন, আত্মা সব কিছু জড়-প্রকৃতিরই প্রকাশ বলিয়া ইঁহারা মনে করিতেছেন। জড়বাদ ভগবান বা কোন ভাবসত্তায় বিশ্বাস করে না, দৃশ্যমান জড়জগৎকেই শুধু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই জানা সম্ভব; ইন্দ্রিয়াতীত কোন কিছু জানিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কাজেই ইহসংসারের মধ্যেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত—সার্থক এবং তৃপ্তিপূর্ণ জীবনযাপনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সু ও কু, ভাল ও মন্দ ইহাদের বিচার, পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ভিত্তিতেই করিতে হইবে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন না হইয়া পারে না। জড়বাদের প্রভাব শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মানুষের অন্তরের মধ্যে নিহিত দেখিতে পায়, সমাজতন্ত্রবাদ তেমনি উহাকে সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করে। বাস্তব জীবনে একক মানুষের কোন অস্তিত্বই নাই; সমাজের মধ্যেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষ বলিতে যেসব গুণাবলী বুঝায় ঐগুলি সমাজই তাহার মধ্যে সৃষ্টি করে। জন্মকালে মানুষের মন পুস্তকের শূন্য পৃষ্ঠার মত থাকে এবং তাহার মধ্যে পরে যাহা কিছু লিখিত হয়, সমাজই তাহা লিখিয়া থাকে। আমরা যাহা

মানুষের মনুষ্যত্ব সমাজেরই অবদান

কিছু নিজস্ব বলিয়া মনে করি, তাহার সব কিছুই সমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

মানুষ তাহার জীবনের সার্থকতা এবং তৃপ্তি সমাজের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। সমাজ হইতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই।

সমাজ-সেবক গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য

সমাজ-জীবন ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা ব্যাপকতর। সমাজের উন্নতিতেই ব্যক্তির উন্নতি। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে সে উপযুক্তভাবে সমাজের সেবা করিতে পারে—সামাজিক জীবনে মানুষের উপর যেসব কর্মভার পড়িবে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই শিক্ষা গ্রহণ করা। তাই সামাজিক কর্তব্য পালনে সুদক্ষ ব্যক্তি (socially efficient) গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া, আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম বাগলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সামাজিক কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মধ্যেই মানুষ তাহার নিজের জীবনের সার্থকতা ও পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইবে। ধরা যাউক, আমি যদি সমাজের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জন করি, আমি যদি উত্তম স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র বা কন্যারূপে পরিগণিত হইতে পারি, আমার যদি সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধতর করিবার যোগ্যতা থাকে, আমি যদি সুনাগরিক এবং উত্তম সমাজসেবক হইতে পারি তবে একদিকে সমাজ যেমন উপকৃত হইবে তেমনি আমিও জীবনে সার্থকতা এবং তৃপ্তির পথ খুঁজিয়া পাইব। প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবন এবং ব্যক্তিজীবন একসূত্রে গাথা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শিক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে কোথাও অতীন্দ্রিয়বাদের স্থান নাই।

শিক্ষা ব্যতীত সমাজ যে স্থায়ী হইতে পারে না সেদিকেও সমাজতান্ত্রিকবাদীরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এক সমাজের সভ্যদের

সমাজের স্থায়িত্বের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন

পরস্পরের ভাষা, আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ঐক্যই সমাজকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। সমাজ শিক্ষার সাহায্যে তাহার সভ্যদের মধ্যে এইরূপ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন বিদ্যালয় ছিল না, তখনও পরিবার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ তাহার ভবিষ্যৎ সভ্যকে সমাজজীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ নিজের প্রয়োজনে

বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে প্রধানত সামাজিক স্থিতিবিধান।

সমাজতন্ত্রবাদ ও পাঠ্য-সূচী

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদীরা শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ অবহেলা না করিলেও সামাজিক প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। অনেক সময় সমাজজীবনে মানুষকে যেসব কার্যে লিপ্ত হইতে হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদনুরূপ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হয়। সমাজ-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ করিতে সক্ষম বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার নীতি সমাজতন্ত্র-বাদীরা অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সমাজই শিশুর আদর্শ পুস্তক।

সমাজতন্ত্র-বাদ ও শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা এই যে, শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলেই শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ সমাজরূপে গ্রহণ করিয়া সভ্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা সমাজতান্ত্রিকগণ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে যখন প্রধানতঃ সামাজিক শিক্ষাদানের চেষ্টাই করা হয়, তখন উহা সমাজের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের মাধ্যমে যত হইবে ততই ভাল। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালেই ছাত্রদের কিছু না কিছু সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্পার্টার শিক্ষার সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রাচীনতম মতবাদের অন্যতম। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মতের সমর্থন করিত—এথেন্স ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী আর স্পার্টা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া নিজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল। রাষ্ট্রের সেবায়ই যে জীবনের সার্থকতা এ-কথায় স্পার্টানগণ বিশ্বাস করিত। মানুষের কোন স্বতন্ত্র জীবন বা সুখ-দুঃখ থাকিতে পারে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না। রাষ্ট্রের সেবার জন্য শিশুকে প্রস্তুত করাকেই স্পার্টানগণ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। জন্মমাত্র শিশুকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ

কোন কারণে যে সব শিশুর ভবিষ্যতে সমাজের বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাদের পৃথিবী হইতে সরাইয়া ফেলা হইত। যেসব শিশু বাঁচিয়া থাকিত, সাত বৎসর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইত। তারপর রাষ্ট্রের উপর পড়িত শিশুকে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। তখনকার দিনে সৈন্যবাহিনীর উপর রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিত বলিয়া, স্পার্টান শিশুদের বিশেষভাবে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত—শ্রেষ্ঠ সৈনিক হইবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষাদান এবং যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এমন কি, যেসব ব্যবহার বর্তমানে আমরা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি, সৈনিকজীবনে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া, স্পার্টান শিশুদের ঐ-সব ব্যবহারে উৎসাহিত করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, স্পার্টান শিশুকে অনেক সময় উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইত না; উদ্দেশ্য থাকিত যে, প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করিবার কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিবে। সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন প্রভৃতি মানসিক উন্নতিমূলক কোন বিষয়ের চর্চায় কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইত না। প্রতিটি স্পার্টান শিশুকে মোটামুটি একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত।

স্পার্টা ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের প্রসারের সংগে সংগে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব এবং তাহার আনুষঙ্গিক শ্রমবিভাগ (Division of labour) গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গ সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র একজনও যদি তাহার

গণতন্ত্রের প্রসার ও সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুত্থান

কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না করে, তবে তাহার ফলে অপরাপর সকলের কার্য অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফলে কাজে, কাজে গুরুত্বের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে—শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কাজের মূল্য যে একজন সাধারণ শ্রমিকের কাজের মূল্য অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী এসম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। সকল মানুষই যে মোটামুটি

সমান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই যে মানুষের জীবন সার্থক ও তৃপ্তিপূর্ণ হয়, এই ধারণা দিন-দিনই দৃঢ়মূল হইতেছে। উপরোক্ত অনুভূতিগুলির ভিত্তিতেই পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র প্রসারলাভ করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের কাল হইতে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের যুগ চলিতেছে একথা বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। গণতন্ত্র আবার ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য—ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

সমাজাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা

অপরদিকে সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান হইতেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যবহারবাদী (Behaviourist) মনস্তাত্ত্বিকগণ পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার ভিত্তিতে মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইকের (Thorndike) মতে যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি তাহা কতকগুলি স্টিমুলাস্ (stimulus) এবং রেস্পনসের (response) মধ্যে গ্রন্থিগঠনের (bond) ফলে সৃষ্ট হয়। কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। সমাজবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণের (Social psychologists) মতেও মানুষ বিশেষ করিয়া তাহার পারি-পার্শ্বিকেরই সৃষ্টি—তাহার আদর্শ, ভালমন্দের বিচার, চিন্তা, কল্পনা, প্রয়োজনবোধ, মানসিকভাব সব কিছুই পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলাফল। এই ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহাই শিক্ষাপদবাচ্য। আধুনিককালে বিজ্ঞানহিসাবে সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। সমাজের যে পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তির মত সমাজও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তাহারও উন্নতি-অবনতি, ধ্বংস ইত্যাদি আছে একথা অস্বীকার করা চলে না। নৃতত্ত্ব (Anthropology) হইতে সমাজবিজ্ঞানের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। এক কথায় সকল দিক হইতেই বর্তমানে সমাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রবাদের অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়া প্রভৃতি কমিউনিষ্ট (Communist) দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে গঠিত। কমিউনিষ্টগণ সম্পূর্ণরূপে জড়বাদে বিশ্বাসী। "আদর্শ" সমাজব্যবস্থা গঠনই তাহাদের মতে মনুষ্য-জীবনের পরমার্থ। তাঁহারা বিপ্লবের দ্বারা নিজেদের আদর্শানুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত ঐ সমাজব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। তাই বিপ্লবের সফলতার সংগে সংগেই তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করিয়া শিক্ষার সাহায্যে মানুষের চিন্তা এবং ভাবধারা নিজেদের আদর্শের অনুকূলে আনিতে চেষ্টা করেন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত নাগরিক প্রস্তুত করাই তাঁহাদের নিকট শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রবাদ

ভারত চিরদিনই ভাববাদের দেশ। এদেশে জড়বাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহাত্মা গান্ধীকেই ভারতের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ্ বলা যাইতে পারে। এক বিশেষ ধরণের সমাজব্যবস্থার (স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান গ্রামসমাজ) পরিপূরক হিসাবেই তিনি তাঁহার "বুনিয়াদী" শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জীবন, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাপদ্ধতি "আদর্শ" সমাজে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কথা স্মরণে রাখিয়াই মহাত্মাজী স্থির করিয়াছিলেন। শিক্ষার সংগে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধন করাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান নীতি। কিন্তু মহাত্মাজী গোঁড়া ভাববাদী ছিলেন। আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করাই তাঁহার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। আদর্শ সমাজ ব্যতীত আদর্শ মানুষ জীবনে সার্থকতালাভ করিতে পারে না বলিয়াই মহাত্মাজী শিক্ষা পরিকল্পনায় আদর্শ সমাজের কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মুদালিয়র কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলে মনে হয় যে, কমিশন, প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক গঠনকেই কমিশন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় শিক্ষা-দর্শনে সমাজতন্ত্রবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকে। একদল ব্যক্তিত্বের বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, অপরদল শিশুকে সামাজিক আদর্শে গড়িয়া তুলিবার নীতি সমর্থন করেন। একদল মনে করেন যে, শিক্ষা সমাজের রীতি-নীতি, চিন্তাধারা ইত্যাদির উর্ধ্বে থাকিবে (মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজ অপেক্ষা উর্ধ্বে) এবং শিক্ষার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই সমাজেরও উন্নতি হইবে। অপর দলের ধারণা এই যে, ব্যক্তি কখনও সমাজকে অতিক্রম করিতে পারে না; শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সমাজীকরণের (Socialisation) ফলে সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির (potentialities) পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে যুগ যুগ ধরিয়া সমাজ যে জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে এবং যে ভাবধারা এবং আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে শিশুমনে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকটা অতীন্দ্রিয়বাদের ভিত্তিতে গঠিত; উহার সবটা যেন ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাহিরে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের কোন স্থান নাই; উহার সবটাই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

আদর্শের দিক হইতে দ্বন্দ্ব

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মতে সমাজের সহিত শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে; শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে সমাজের অনুকরণ করিয়া স্থির করিলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এই যে, সমাজজীবনের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন কিছুকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত নহে। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত এই যে, ছাত্রকে যথাসম্ভব নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে; সমাজের সংগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের ফলে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হইতে

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক হইতে দ্বন্দ্ব

পারে। প্রাচীন ভারতে সমাজ হইতে দূরে তপোবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে দূরে শান্তিনিকেতনে তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা কিন্তু বিপরীত—সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ব্যতীত শিক্ষাকার্য চলিতেই পারে না। সমাজ হইতে দূরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে, ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইবে অবাস্তব। এমন কি বিদ্যালয়কে একটি ছোটখাটো সমাজরূপে গড়িয়া তুলিয়া উহার সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অবদান— পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কাহারও অবদান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষক এবং বিষয়-কেন্দ্রিক (Subject-centred) প্রতিষ্ঠান হইতে শিশু-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের জন্য আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বীকরণের (Psychologise) নীতিও আমরা উপরোক্ত মতবাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং শিক্ষাদানকার্যে মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকমের যুগান্তকারী পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হইতেছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। পূর্বে শৃঙ্খলারক্ষা অর্থে আমরা শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে দমন করাই বুঝিতাম। স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও শ্রেণীতে ছাত্রগণ জড়বৎ চুপ করিয়া থাকিবে, শিক্ষকের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক তাহা অনুধাবন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, ইহাই ছিল আমাদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিশু-প্রকৃতিকে দমন করার প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না; আগ্রহের অনুকূলে কাজের সুযোগ পাইলে শিশু নিজ হইতেই প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলারক্ষা করিয়া চলিবে। নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া শিক্ষকের বক্তব্য শুনা অপেক্ষা কর্মচঞ্চল হইয়া নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা করিলেই শিশু প্রকৃত শিক্ষা পাইবে, এই ধারণার ফলে পাঠদানকালে আমাদের শ্রেণীকক্ষগুলির রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। ইহাও অনেক-

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান

খানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা এবং আগ্রহের অনুকূলে তাহার শিক্ষা পরিচালিত হইবে এই নীতিও বিশেষভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ হইতেই প্রাপ্ত। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ঐ সব বিদ্যালয়ে সকল ছাত্র এক বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে পৃথক পৃথক বিষয় শিক্ষার সুযোগ পাইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের অবদানও খুব অল্প নহে। শিক্ষা যে বর্তমানে অধিকতর বাস্তবধর্মী হইয়াছে এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যে শিক্ষা-দানের চেষ্টা চলিতেছে ইহা প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রবাদেরই অবদান। মানুষকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে না পারিলে তাহার শিক্ষা যে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যাইবে—এই স্বীকৃতি সমাজতন্ত্র-বাদের প্রভাবের ফল। বর্তমানে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন-গঠনের জন্য যে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির উপর যে জোর দেওয়া হয় তাহা সমাজতন্ত্রবাদের প্রত্যক্ষ অবদান। সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ যে অনেকাংশে শিক্ষার ফল, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, চারিত্রিক গুণাবলী, আদর্শবাদ প্রভৃতি যে শিক্ষার সাহায্যে পরিবর্তন করা সম্ভব এই বিশ্বাস সমাজতন্ত্রবাদই আমাদিগকে দিয়াছে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে, বৃত্তি শিক্ষার উপর আমরা যে গুরুত্ব আরোপ করিতেছি, তাহা সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবেরই ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে, ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র ইত্যাদি পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর গুরুত্ব আরোপও সমাজতন্ত্র-বাদের আর একটি অবদান।

সমাজতন্ত্রবাদের অবদান

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান— শিক্ষা সম্বন্ধে সকলে একমত পোষণ করিবে ইহা আশাও করা যায় না এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। আমরা যাহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাহারা সকলকে এক ছাঁচে গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী নহি; তাই আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার পক্ষপাতী। তথাপি শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুতর মতদ্বৈধ থাকাও উচিত নহে। একই

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বাঞ্ছনীয় হইলেও পরস্পর-বিরোধী ব্যবহার কাম্য নহে

কার্যে ব্রতী বিভিন্ন লোকের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য না থাকিলে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। একই বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যদি পরস্পর-বিরোধী ধারণা থাকে তবে একের কার্যের প্রভাব অপরের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। বিশেষ করিয়া আমরা যখন আমাদের সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তখন ঐ সমাজব্যবস্থার গঠনের তথা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একমত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোনটাকেই আমাদের অবহেলা করা চলে না; শিক্ষাক্ষেত্রে উভয় বাদেরই যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তারপর কোন বাদের সমর্থক লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। তাই বাস্তবক্ষেত্রে এই দুই বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কিনা চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়—যাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরস্পর-বিরোধী ব্যবহারেরও সৃষ্টি না হয় তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ব্যক্তি যদিও সমাজ দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত তথাপি নিতান্ত একদেশদর্শী না হইলে, সমাজ হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। একই সমাজে একই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করিয়াও মানুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। সমাজজীবনের উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবনে পৃথক উদ্দেশ্যও বর্তমান থাকে। সে সমাজের অংশ হইয়াও স্বতন্ত্র। তাহার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা সমাজের সঙ্গে এক হইয়াও ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই যে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায় এ-কথা কোন আধুনিক বিজ্ঞানই আজ পর্যন্ত অস্বীকার করিতে পারে নাই। সমাজদ্বারা প্রভাবিত হইলেও প্রত্যেক মানুষের জন্মগত গুণাবলী তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। তারপর ব্যক্তি যে সমাজের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজ চেষ্টায় সমাজের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে ঐরূপ উদাহরণ কোন দেশেই বিরল নহে। উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী ব্যতীত অপর সকলেই উপরোক্ত বাস্তব সত্যগুলিকে স্বীকার করেন।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য

অপরপক্ষে সমাজকে ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র মনে করিলে ভুল করা হইবে। সমাজ

ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ; তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিণতি বিদ্যমান। মৃত্যু বা দেশত্যাগের ফলে সমাজের সভ্যের পরিবর্তন হইলেও সমাজের পরিবর্তন হয় না। সমাজ আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে আপন নিয়মে বিকাশলাভ করিতে পারে। ব্যক্তির বিকাশ এবং সমাজের বিকাশে যে পার্থক্য রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহাও সত্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের মত সমাজে সমাজেও পার্থক্য থাকে। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব গঠন ও বিকাশভঙ্গী আছে এবং উহাদের দ্বারা সমাজের সভ্যমাত্রেই প্রভাবিত হয়। মানুষ যে অনেকখানি সমাজের সৃষ্টি এ-কথা আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। সমাজজীবনের মধ্যেই ব্যক্তি নিজ জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পায়। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিত্বের কল্পনা করা অবাস্তব। উপরোক্ত বাস্তব সত্যগুলিও সর্বজনস্বীকৃত।

সমাজের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত সত্য

ব্যক্তি এবং সমাজ কাহারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না ; উভয়কেই আমাদের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককে উপেক্ষা করিয়া অপরের উপর সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা সঙ্গত নহে। বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একের উন্নতি অপরের বিনিময়ে সম্ভব নহে। ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—একের উন্নতি স্বাভাবিক নিয়মেই অপরের উন্নতির নিয়ামক এবং একের অবনতি একই নিয়মে অপরের অবনতির কারণ। আদর্শ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে তাহা অবশ্যই সমাজকে উন্নততর করিবে, আবার সমাজব্যবস্থা উন্নততর হইলে তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হইবে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অঙ্গা-অঙ্গী, গাণিতিক ভাষায় যাহাকে বলে ফাংশনেল রিলেসনসিপ্ (Functional Relationship) তাহাই রহিয়াছে। যেখানে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করা হয় সেখানে উভয়েরই পতন হয়। প্রাচীন এথেন্সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়া দেশের পতন ঘটাইয়াছিল। প্রাচীন স্পার্টায় সমাজের সংকীর্ণ প্রয়োজনে ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করার ফলে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের কৃষ্টির বিকাশলাভ ঘটে নাই ; ফলে দেশের সামরিক শক্তিও বেশী দিন স্থায়ী

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অঙ্গা-অঙ্গী সম্বন্ধ

হয় নাই। ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলিলে উভয়েরই মঙ্গল।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমাজ সব সময়ে হাত মিলাইয়া নাও চলিতে পারে। পরস্পরের প্রয়োজনেই হয়ত সাময়িকভাবে একের বিকাশ অপেক্ষা অপরের বিকাশের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বর্তমানে শিল্পবিপ্লবকে দ্রুততর করার নিমিত্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অধিক সংখ্যক কারিগরের প্রয়োজন। এই কার্যে সফল হইলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই মঙ্গল। কাজেই বিশেষ প্রচার দ্বারা এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দ্বারা আমরা যদি অধিক সংখ্যক লোককে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করি, তবে তাহাতে সমাজকে প্রাধান্য দেওয়া হইলেও, শেষ পর্যন্ত উহার ফলে ব্যক্তিরও মঙ্গল হইবে ; দেশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করিবে। সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে কখন কাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে তাহা বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে স্থির করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব এবং সমাজ উভয়ের বিকাশের কথাই একসংগে ভাবিতে হইবে। তাই এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আমরা নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি—**সমাজের সভ্যরূপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য** (The aim of education is the highest development of the individual as a member of the society).

বাস্তব ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ (Pragmatism)—ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার যে নীতি উপরে আলোচিত হইয়াছে তাহার দার্শনিক সমর্থন পাওয়া যায় প্রয়োগবাদের মধ্যে। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে সামঞ্জস্য বিধানই—এই মতবাদের প্রধান নীতি। প্রয়োগবাদের জন্ম আমেরিকায়। পরিবর্তনশীলতা (Dynamism) এবং আপেক্ষিকতা (Relativity) এই দুই নীতি প্রয়োগবাদের ভিত্তি স্বরূপ। পরিবর্তনশীলতার নীতি অনুসারে জীবন প্রগতিশীল ; আজ যাহা সত্য কাল তাহা সত্য নাও থাকিতে পারে।

পরিবর্তনশীলতা

জীবনের উদ্দেশ্যই হউক আর শিক্ষার উদ্দেশ্যই হউক পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখা সম্ভব নহে। জীবনের পথে চলিতে চলিতেই তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হইবে, শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে। কর্ম এবং তাহার উদ্দেশ্যকে পৃথক করা চলিবে না। আবার কোন কিছুরই উদ্দেশ্য স্থির থাকিতে পারে না—জীবনের চলার পথে বার বার তার উদ্দেশ্য নূতন নূতন রূপে দেখা দিবে—শিক্ষা গ্রহণকার্য অগ্রসর হওয়ার সংগে সংগে প্রতি পদে তাহার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটিবে। তাই প্রয়োগবাদের ঋষি ডিউই শিক্ষার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করেন নাই। তাঁহার মতে প্রতি স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহার পরের স্তরের শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সর্বকার্যে প্রগতিই একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যতিক্রমের কোন কারণ নাই।

আপেক্ষিকতার নীতি

আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে কোন কিছুই দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এক সমাজের পক্ষে যাহা সত্য অপর সমাজের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে; আজকের সত্য কাল মিথ্যা প্রতিভাত হইতে পারে; একজনের পক্ষে যাহা ভাল অপরের পক্ষে তাহা হয়ত ভাল নহে। তাই প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক সমাজের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। প্রয়োগবাদ "সর্বজনীন" শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী নহে।

বাস্তবক্ষেত্রে সফলতাই ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি

প্রধানতঃ বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রয়োগবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রয়োগবাদের মতে ভালমন্দের বিচার পূর্ব হইতে করা চলে না—প্রয়োগের দ্বারাই (Experiments) ভালমন্দ বিচার করিতে হয়। কখনও হয়ত সমাজের বিকাশের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিলে বাস্তবে অধিক লাভবান হওয়া যায়, আবার কখনও হয়ত ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে বাস্তব ফল ভাল হয়। সংক্ষেপে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা অবলম্বন করাই প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব।

জীবনদর্শন হিসাবে প্রয়োগবাদের প্রভাব খুব বেশী না হইলেও শিক্ষা-

ক্ষেত্রে ইহা প্রায় সর্বজন সমাদৃত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্র্যবাদের মধ্যে কার্যকরী সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষমতাই রহিয়াছে ইহার মূলে। উপরোক্ত উভয় মতবাদী লোকেরাই ইহাতে নিজ নিজ মতের সমর্থন দেখিতে পান।

প্রয়োগবাদের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য

শিক্ষাবিদ্ রাস্কের (Rusk) কথায় প্রয়োগবাদ "নয়া আদর্শবাদ" সৃষ্টির একটি স্তর মাত্র; এই আদর্শবাদ বাস্তবকে তাহার যথাযথ স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় না। উহা পার্থিব এবং অধ্যাত্ম আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং সার্থক সংস্কৃতির সৃষ্টি করিবে (Pragmatism is merely a stage in the development of a new idealism..... an idealism that will do full justice to reality, reconcile the practical and spiritual values and result in a culture which is the flower of efficiency and not the negative of it.) প্রয়োগবাদ মানুষকে কোথাও খর্ব করে নাই; এবং সোফিষ্টদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তাহার কার্যের দ্বারা নিজের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিবে ইহাই নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। অপরদিকে প্রয়োগবাদীরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, মানুষের ভালমন্দের বিচার সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের প্রধান মুখপাত্র ডিউই অনেক ক্ষেত্রেই সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। তিনি তাঁহার "ডেমোক্রেসি এণ্ড এডুকেশন" (Democracy and Education) গ্রন্থে সমাজের স্থিতিকরণ (Perpetuation of Society) যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ডিউই-এর "এক্সপিরিয়েন্স এণ্ড এডুকেশন" (Experience and Education) গ্রন্থের একমাত্র প্রামাণ্য বিষয়বস্তু হইতেছে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব তাহার নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সৃষ্ট হয় এবং সমাজজীবনই অভিজ্ঞতালাভের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। বিদ্যালয়ের জীবন সমাজজীবনের অনুসরণে গঠন করার নীতি প্রয়োগবাদীরাই প্রচার করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে বিশেষভাবে উহাকে সমর্থন করিবার জন্যই যেন প্রয়োগবাদের সৃষ্টি।

"করে শিখো" (Learn by doing) আধুনিক শিক্ষার এই নীতি

প্রয়োগবাদের আর একটি অবদান। এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষার বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে "প্রজেকট্ মেথড্" (Project Method) সমাদৃত হইয়াছে। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশকালে আমরা যে উহাকে একটি দ্বি-কেন্দ্রিক কার্য (Bipolor process) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি তাহাও বিশেষভাবে প্রয়োগবাদেরই ফল। তারপর সাধারণভাবে এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় না করিয়া বর্তমানে আমরা শিক্ষার স্তর হিসাবে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সমাজে সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে বিভিন্ন হইবে এই নীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সামাজিক পারিপার্শ্বিকের বিভিন্নতার জন্য সমাজে সমাজে ব্যক্তির চাহিদা (needs) বিভিন্ন হইবে। ঐ চাহিদা পূরণের ভিতর দিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে সকল সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও সমাজে সমাজে বিভিন্নতা দেখা যাইবে এবং ঐসব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শিক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করিতে হইলে সমাজে সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়নে উপরোক্ত নীতিগুলিকে আধুনিকতম নীতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নীতিগুলি বিশেষ করিয়া প্রগতিবাদেরই অবদান।

প্রয়োগবাদের অন্যান্য অবদান

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য মত—শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা প্রসঙ্গে নানা মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐসব মতামত সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজ-তন্ত্রবাদ এবং প্রয়োগবাদ হইতেই তাহাদের প্রেরণা পাইয়াছে; উহাদিগকে স্বাধীন মতবাদ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

সম্পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য—রুশোর প্রকৃতিবাদ যখন শিক্ষাকে বাস্তবতা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, মানবতাবাদ যখন শিক্ষার নামে পুস্তকের কতকগুলি অর্থহীন বুলি মুখস্থ করাইতেছে বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার তখন শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করার নীতি প্রচার করেন। তাঁহার মতে "সম্পূর্ণ জীবন" (Complete living) যাপনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞান

ও কৌশল আয়ত্ত করিলে এবং কোন্ কোন্ চারিত্রিক গুণাবলীর বিকশিত হইলে সম্পূর্ণ জীবনযাপনের উপযুক্ততা জন্মায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্পেন্সার পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—১। শরীরতত্ত্বের জ্ঞান, ২। সন্তান পালনের দক্ষতা, ৩। জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা, ৪। সুনাগরিক হওয়ার যোগ্যতা, ৫। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পেন্সারের উপরোক্ত মত সমাজতন্ত্রবাদধর্মী চিন্তাধারা-প্রসূত। সামাজিক জীবনে আমাদের যে সব প্রধান প্রধান দায়িত্ব (মাতা-পিতার দায়িত্ব, জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব, নাগরিকের দায়িত্ব) পালন করিতে হয় তাহাদের জন্য প্রস্তুতিকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করিয়া তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশকেও যে শিক্ষা অবহেলা করিতে পারে না সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু "সম্পূর্ণ জীবনের" প্রস্তুতির জন্য তিনি যে বিষয়বস্তুর তালিকা দিয়াছেন তাহা সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উভয়ের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হইবে। বস্তুতপক্ষে স্পেন্সারের মতবাদকেও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ক্রমবিকাশের একটি স্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ব্যাপকতর অর্থে "সম্পূর্ণ জীবন" উক্তিটির সাহায্যে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়কেই আমরা "সম্পূর্ণ জীবনের" অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি এবং উভয় জীবনের জন্য প্রস্তুতিকেই আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

সঙ্গতিবিধানই (Adjustment) **শিক্ষার লক্ষ্য**—শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষ করিয়া মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ত্ব, বায়লজি (Biology) দ্বারা প্রভাবিত হয়; ফ্রয়েড্, ম্যাকডুগেল প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকগণ, মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা (instincts) তাহার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যদিও সমাজই এই প্রবণতাগুলির পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র তথাপি ইহারা প্রকৃতিতে আত্ম-কেন্দ্রিক এবং সমাজবিরোধী। মানুষের, নিজের জন্য বস্তু সংগ্রহের (Acquisitive instinct) প্রবণতাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক। সমাজ

হইতেই নিজ প্রবণতার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, অথচ যথেচ্ছভাবে মানুষ যদি এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করে তবে সমাজ স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, মানুষকে সমাজ বা পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের প্রবণতার সঙ্গতিবিধান (Adjustment) করিয়া চলিতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান সমাজের জন্য যতখানি প্রয়োজন, মানুষের নিজের জীবনের জন্যও ততখানি প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের প্রবণতার সঙ্গতিবিধান না করিতে পারিলে মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্ব (mental conflict) দ্বারা পীড়িত হয়: এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছাইলে মানসিক বিকৃতি ঘটে। অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষের প্রবণতা এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সঙ্গতি ঘটিয়া থাকে। সাব্‌লিমেসন (Sublimation) এই সঙ্গতি-বিধানের প্রধান পদ্ধতি। ফলে, মানুষ পুরাতন আচরণ পরিত্যাগ করে এবং নূতন আচরণ গ্রহণ করে। সমগ্র জীবনব্যাপীয়াই চলে এই সঙ্গতি-বিধানের প্রচেষ্টা। শিক্ষা এবং সঙ্গতিবিধান প্রায় সমার্থবাচক। শুধু সামাজিক পারিপার্শ্বিক কেন, প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের সহিতও মানুষকে সঙ্গতি বিধান করিয়া চলিতে হয়। মানুষের দেহযন্ত্র আপন স্বভাবেই তাহা করিতে চেষ্টা করে। তারপর মানুষ নিজেও প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা করে—প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টার ফলে সামাজিক নিয়ম, আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু "সঙ্গতিবিধান" এই উক্তিটি মাত্র শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। কোন্ কোন্ প্রবণতার সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করা হইবে, ঐ চেষ্টাই বা কিভাবে করা যাইবে, কি ধরণের সঙ্গতি-বিধান আদর্শ সঙ্গতিবিধান বলিয়া গণ্য হইবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এই উক্তি হইতে পাওয়া যায় না। ইহা শিক্ষাকার্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনায় ইহার ব্যবহার সমীচীন নহে।

তারপর, যে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তিতে এই উক্তি করা হইয়া থাকে আজকাল তাহা সর্বজনস্বীকৃত নহে। মানুষের জন্মগত প্রবণতা যে স্বভাবতই সমাজবিরোধী হইবে ইহা সত্য নহে। ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর-পরস্পরের পরিপূরক, তাহাদের মধ্যে সব সময়ই দ্বন্দ্ব চলিবে ইহা অনেকেই অস্বীকার

করেন। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা "অসৎ" না হইয়া "সৎ" হওয়াই বেশী স্বাভাবিক, কারণ মানুষ সৃষ্টির অংশ, ভগবানের প্রতীক। কাজেই সঙ্গতি বিধানের প্রশ্ন না তুলিয়া বিকাশের প্রশ্ন তোলাই অধিকতর সঙ্গত। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সঙ্গতি ঘটিবে এই ধারণার পরিবর্তে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে উহাদের বিকাশ ঘটিবে এই ধারণা পোষণ করা অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

বৃত্তিসংস্থানের যোগ্যতা অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য—কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বৃত্তি সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকেই (vocational efficiency) শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আদর্শবাদ প্রভাবিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতবাদ বৃত্তিসংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকে কখনও বিশিষ্ট স্থান দেয় নাই। কিন্তু কোন শিক্ষাব্যবস্থাই কখনও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্যও করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতে বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকে যজন-যাজন ইত্যাদি বৃত্তির জন্য এবং ক্ষত্রিয়কে সৈনিক বৃত্তির জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্তমানে শিক্ষা যত সার্বজনীন হইতেছে বৃত্তিশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা ততই অধিক অনুভূত হইতেছে। প্রাচীন এথেন্স বা রোমে "নাগরিকেরাই" (Citizens) শিক্ষা-গ্রহণ করিতেন এবং দাসেরা (Slaves) তাহাদের জন্য (কৃষি, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা) জীবিকার্জন করিত। ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনায় জমিদারগণ এবং ব্যবসায়ীরা সামাজিক মর্যাদার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেন। জীবিকা অর্জনের জন্য ইহাদের কাহারও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তাই বৃত্তি সংস্থানের জন্য প্রস্তুত না করিয়া শিক্ষা ছাত্রদের মানসিক উন্নতির (liberate the mind) দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় সকলকেই ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কথা চিন্তা করিতে হয়। তারপর দিনদিনই বৃত্তিগুলি জটিল হইয়া পড়িতেছে। পূর্বের মত শিক্ষানবিশী করিয়া তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। প্রায় সকল বৃত্তির জন্যই দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষা (formal education) গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি অনেক সমাজেই (বিশেষ করিয়া আমাদের সমাজে) বর্তমানে বেকার সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে জীবিকা সংস্থানের

যোগ্যতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি না দিলে শিক্ষা যে অনেকখানি অর্থহীন হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভাবেই জীবিকার্জনের যোগ্যতা শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। একথা সত্য যে, জীবিকার্জন মানুষের সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান কার্য। কিন্তু জীবিকার্জন ব্যতীত সমাজজীবনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মানুষকে লিপ্ত হইতে হয় (যথা, মাতা বা পিতার কর্তব্য পালন, নাগরিকের কর্তব্য পালন ইত্যাদি)। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে ঐগুলির উল্লেখ না করিয়া শুধু বৃত্তি-সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে শিক্ষার লক্ষ্য যে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিসংস্থান মানুষের তথা সমাজজীবনের উদ্দেশ্য নহে; উহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে পারিলেই মানুষের জীবন সার্থক হয় না; শুধু সম্পদ সৃষ্টির দ্বারাও কোন সমাজের কৃষ্টির উন্নতি হয় না। মানুষ অর্থোপার্জনের যন্ত্রমাত্র নহে। মানুষকে ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে, তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নহে; আর ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট বিকাশ না হইলে শিক্ষা যে অনেকখানিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথাযথ ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে না পারিলে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত উভয় জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির ফলে অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা অধিকতর বৃত্তিমুখী হইয়া পড়িতেছে এবং অতি অল্প বয়স হইতেই আমরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছি। ফলে আমরা একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছি। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার দরুণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হইতেছে—পূর্ণ মানুষ হইয়া আমরা গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রকম শিক্ষায় বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিষয়ের (General subject) শিক্ষার উপরও গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে। সম্পূর্ণরূপে বৃত্তি শিক্ষার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিও (Polytechnique, Medical College ইত্যাদি) এই নীতি অনুসরণ করিতেছে।

অবশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিসংস্থান সমাজজীবনে যত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই হোক না কেন, অন্ততঃ, বয়ঃসন্ধির পূর্ব পর্যন্ত শিশুর এই সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বোধও থাকে না। তাই শিক্ষাকে যদি শিশুর চাহিদা (needs) অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় তবে বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

সুনাগরিক গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে সুনাগরিকতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনের প্রতি স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে হইলে উহার নাগরিকদের নানা ধরণের নির্বাচিত পদ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভোটদানের দ্বারাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উহার পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত উপরোক্ত দায়িত্ব দুইটি প্রতিপালন করা সহজ নহে। ভারত একটি নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র; ভারতের সমাজব্যবস্থা এখনও এমনভাবে গঠিত হয় নাই যাহাতে সমাজজীবনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করা যায়। তাই উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিবার বিশেষ দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ না করিলে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা হয়ত সফল হইবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক গড়িয়া তোলাকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সুনাগরিক গড়িয়া তোলাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করার মূলেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু, সুচারুরূপে নাগরিকের কর্তব্য পালন মানুষের সমাজজীবনের চাহিদার অন্যতম মাত্র। রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ব্যতীত মানুষের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও আছে এবং ঐসব জীবনের জন্য প্রস্তুতিও শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

তারপর ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সমাজজীবন ব্যতীতও মানুষের স্বতন্ত্র জীবন রহিয়াছে। সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে লাগুক আর নাই লাগুক মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে। কাজেই কেবলমাত্র সুনাগরিক গড়িয়া তোলাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (১৯৫২-৫৩) মতানুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক সৃষ্টি করা (Education in developing democratic citizenship)। দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ পর-পদানত ছিল। স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং দেশকে উন্নতির পথে পরিচালিত করাই ভারতের সম্মুখে তথা তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। অধিকন্তু আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছি। গণতান্ত্রিক রীতি, নীতি, আদর্শ, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশের জনসাধারণের জ্ঞান বা উপলব্ধি তেমন কিছু নাই। সব কিছুই, আমাদের কাছে প্রায় নূতন। তাই শিক্ষার মাধ্যম ব্যতীত ভারতে গণতন্ত্র কখনই দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার কাল, অর্থাৎ কৈশোর বয়সই আদর্শ সম্বন্ধে উপলব্ধি ও চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক সৃষ্টি করাকে, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ঠিকই করিয়াছেন।

গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ

গণতন্ত্র যে প্রধানতঃ একটি জীবনদর্শন—গণতান্ত্রিক নাগরিকের যে কতকগুলি আদর্শে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন এবং তাহার মধ্যে যে বিশেষ কয়েকটি চারিত্রিক গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক, একথাও কমিশন স্বীকার করিয়াছেন—প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন জটিল সমস্যা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা বিকশিত করিয়া দিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাহার চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ, বুদ্ধিনির্ভর, সত্যসন্ধ এবং অন্ধবিশ্বাস বিমুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। শুধু চিন্তা সম্বন্ধে স্বচ্ছতা থাকিলেই চলিবে না, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের আপন বক্তব্য প্রকাশেও স্পষ্টতা থাকা

গণতান্ত্রিক নাগরিকের প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা

প্রয়োজন। অধিকন্তু তাহার পরমত-সহিষ্ণুতা (Toleration) থাকা একান্ত আবশ্যক। গণতন্ত্রে আমরা পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে, মতৈক্য লাভ করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে চাই। তাই উপরোক্ত উভয় চারিত্রিক গুণই গণতান্ত্রিক নাগরিকের পরম সম্পদ। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে, যেখানে নানা মত এবং বিভিন্ন ধর্ম একত্র রহিয়াছে সেখানে পরমত-সহিষ্ণুতা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, সমাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের অনুভূতি তীক্ষ্ণতর (Social sensitiveness) করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ যাহাতে সহজেই অনুভূতির মধ্যে আসে ছাত্রদের সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। নিয়মনিষ্ঠা ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও দুইটি চারিত্রিক গুণ হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বশেষে, মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসাকে বিকশিত করিয়া তোলাও আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি ছাত্রদের মনে জন্মাইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

কর্মগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য

গণতান্ত্রিক নাগরিকের উপযুক্ত চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ব্যতীত, মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রদের কর্মগত যোগ্যতা (Vocational efficiency) বৃদ্ধির চেষ্টাও করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, প্রথমেই আমাদের কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিতে হইবে। যে-কোন কাজই (হাতের হউক আর কলমের হউক) যে সমান মর্যাদাপূর্ণ এই নীতিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে ; আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সুযোগ, সুবিধা, লব্ধজ্ঞান অর্জিত কৌশল ইত্যাদি অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাইব—তাহাতে আমাদের নিজেদের এবং দেশের মঙ্গল হইবে—এই বিশ্বাস আমাদের মনে জন্মাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। আপন আপন আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের প্রথম পর্ব হিসাবে ছাত্রেরা যাহাতে জ্ঞানলাভ ও কৌশল অর্জন করিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহা একান্ত আবশ্যক।

সর্বসাধারণের মধ্য হইতে নেতার (Leader) সৃষ্টি না হইলে, গণতন্ত্র অগ্রগতির পথে চলিতে পারে না। আমরা আশা করি যে, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া, যাহারা সমাজে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অনেকে সমাজে নেতৃপদে বৃত হইবেন। বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রে সমাজের সর্বস্তরে সর্বপ্রকারের (বড়, ছোট) নেতা থাকা আবশ্যক। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভবিষ্যতে যাহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে; ছাত্রদের নানাভাবে দায়িত্ব প্রদান করিয়া, তাহাদের সেই সব দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

নেতৃত্বগ্রহণের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন

কিন্তু ছাত্রদের ব্যক্তিগত বিকাশকে অবহেলা করিলেও চলিবে না। ছাত্রদের মধ্যে যে সৃজনীশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ সাধনও শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রচুর স্বাধীনতা দিতে হইবে।

ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তথা সৃজনী-শক্তি বিকাশে সাহায্য করা প্রয়োজন

উপরোক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি যে বিশেষ করিয়া সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি-প্রসূত ইহা বলাই বাহুল্য। কিভাবে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, কি উপায়ে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, কি করিলে ইহার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এই চিন্তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে কমিশনের সভ্যদের মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ব্যক্তির সুসম বিকাশ (Development of balanced personality) যে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাজ হইতে পৃথক সত্তা কল্পনা করিয়া তাহাদের শরীর ও মনের পূর্ণবিকাশের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে, একথা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা হয় নাই। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কেবলমাত্র সৃজনী শক্তির বিকাশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রাধান্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের চেষ্টার মধ্যে হয়ত কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু উভয়বিধ প্রচেষ্টাই যে একসঙ্গে চলিতে পারে বা চলিবে একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সংক্ষেপে

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সমাজের দিক যতটা প্রাধান্য পাইয়াছে ব্যক্তির দিক ততটা পায় নাই।

অপর দিকে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল অর্থাৎ কৈশোর নানাদিক হইতেই জীবনের সন্ধিক্ষণ। কৈশোরের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনকে (Needs) তৃপ্ত করিয়া, ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন যে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয় নাই (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৈশোরে ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি এবং যৌন জ্ঞানলাভের প্রয়োজনের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে)।

কৈশোরের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন নিবৃত্তিকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই

আবার, মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক অংশ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে ইহা আমরা আশা করি। কাজেই উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুতকরণ ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা কমিশন, কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করা হয় নাই

সর্বশেষে বলিতে হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যথেষ্ট কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ণয় করেন নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ণয়ের প্রধান প্রয়োজন এই যে, ইহা শিক্ষার বিষয়বস্তু (Contents বা curriculum) নির্ণয়ে, আমাদের সাহায্য করিবে। কিন্তু কমিশন এত সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের আলোচনা করিয়াছেন যে, উহা শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কাজে লাগান সম্ভব নহে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম বলিতে কি বুঝি—আমরা, শিক্ষকেরা পাঠ্যক্রম অনুসারে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়া থাকি। কোন্ শ্রেণীতে কোন্ বিষয়ে কি পড়াইব তাহা পাঠ্যক্রমই স্থির করিয়া দেয়; পাঠদানকালে আমরা উহাকে অনুসরণ করি মাত্র। দেশের সকল বিদ্যালয়ে যাহাতে পাঠের বিষয়বস্তু সমান এবং একই ধরণের থাকে তাহার জন্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ বা মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে শ্রেণী এবং বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রম স্থির করিয়া দেন এবং বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ানো হইতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।

সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ব্যতীত বিদ্যালয়ের পাঠ চলিতে পারে না। বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়; ছাত্রদের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারের সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য (যেমন, ছাত্রদের মধ্যে যোগ, বিয়োগ, গুণন এবং ভাগ অঙ্ক-কষার কৌশলের শিক্ষাদান করা হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য)। ছাত্রদের মধ্যে কি কি ব্যবহারের পাঠ্যক্রমের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শিক্ষাদানের প্রারম্ভেই স্থির করিয়া লইতে হয়; তারপর উদ্দেশ্য অনুসারে ছাত্রদিগকে কি কি অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। বিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে বহু রকমের ব্যবহার সৃষ্টি করিতে চায় এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের বহু অভিজ্ঞতা দিতেও চেষ্টা করে। কাজের সুবিধার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার এবং তাহাদের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা যে বিদ্যালয়ের স্তরে স্তরে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়; শিক্ষার প্রত্যেক বৎসরকে বিদ্যালয়ে এক একটি স্তর (শ্রেণী) বলিয়া গণ্য করা হয়। তারপর যে সব অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দিতে হইবে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন "বিষয়ে" বিভক্ত করা হয় (যেমন, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি গণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত)। ইহাই পাঠ্যক্রম। মনে রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধমাত্র কার্যের সুবিধার জন্য

উপরোক্ত ভাগাভাগি করা হয়। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে প্রতি বিষয়ে কি কি অভিজ্ঞতা ছাত্রদিগকে প্রদান করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট তালিকাকেই আমরা পাঠ্যক্রম আখ্যা দিয়া থাকি। পৃথিবীর কোন দেশে কোনরূপ বিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রম ব্যতীত শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয় না।

পাঠ্যতালিকা কতখানি সুনির্দিষ্ট করা উচিত—পাঠ্যতালিকা যতই সুনির্দিষ্ট হইবে, শিক্ষাদানে ঠিক কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে সে সম্বন্ধে শিক্ষকগণ ততই স্পষ্ট ধারণা পাইবেন। ফলে, বিদ্যালয়ে পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার মানের মধ্যে অধিকতর সমতা স্থাপিত হইবে। অপর দিকে পাঠ্যক্রম অতিরিক্তভাবে নির্দিষ্ট হইয়া পড়িলে শিক্ষাদানকার্য যান্ত্রিক হইয়া পড়িবে। প্রয়োগবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করিয়াছে। প্রয়োগ-বাদীদের মতে শিক্ষক পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিবেন, শিকারী যেভাবে তাহার লক্ষ্যকে অনুসরণ করে—দৌড়ের সময় ঘোড়া যেভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করে সেভাবে নহে (following the curriculum is a chase and not a race)। ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়ার লক্ষ্যস্থল যেমন সুনির্দিষ্ট, ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাহাকে যে পথ (course) অনুসরণ করিতে হইবে তাহাও তেমনি নির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট কোর্স ব্যতীত অন্য কোন পথ দিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিলে ঘোড়ার চলিবে না। শিকারীর ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষ্যই মুখ্য; যে-কোন পথ দিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিলেই হইল। শিকারী তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিবার নিমিত্ত কোন্ পথ অনুসরণ করিবে তাহা মোটামুটিভাবে স্থির করিয়া শিকারে অগ্রসর হয়। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে বার বার পথ পরিবর্তন করিতে হয়। তাহার লক্ষ্য সুনিশ্চিত হইলেও তাহা একস্থানে স্থির থাকে না। লক্ষ্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিকারীকে তাহার পথের পরিবর্তন করিতে হয়। শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকের নিকট লক্ষ্যই মুখ্য। তিনি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে চান—ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবহার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ ব্যবহারগুলি

পাঠ্যক্রম race নহে, ইহা chase.

সৃষ্টি করার উপায় হিসাবেই তিনি পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিতেছেন। উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা (পাঠ্যক্রম) কখনও মূল উদ্দেশ্যের (ছাত্রদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি) উপরে স্থান পাইতে পারে না। যখনই পাঠ্যক্রম মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে তখনই ইহা পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। আবার শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করে; সে পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিবেচনা করিয়া শিক্ষাদানের লক্ষ্যেরও অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করিতে হয়। এমন কি, প্রয়োজনবোধে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের জন্য পৃথক পৃথক লক্ষ্য স্থির করিতে হইতে পারে। লক্ষ্যের পরিবর্তন হইলে স্বভাবতই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথেরও পরিবর্তন হইবে। তাই বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠ্যক্রমকে অতিরিক্তভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার নীতি সমর্থন করেন না। ব্রিটেনে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম স্থির করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়-বস্তুর মধ্যে সমতা রক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাদপ্তর Handbook of Suggestions for Teachers নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় (বিদ্যালয়ে) বিভিন্ন বিষয় পাঠের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকে এবং ঐ সব লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে ছাত্রদের কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিলে সুবিধা হইতে পারে তাহার আলোচনাও করা হয়। তারপর কোন বিষয়ের লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ঠিক কি কি অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা বিদ্যালয় নিজেই স্থির করে।

পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠতালিকা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি (Co-relation of studies) : আমাদের পাঠ্যক্রমগুলি ছাত্রদের অভিজ্ঞতা অনুসারে রচিত না হইয়া "বিষয়" (subject) অনুসারে রচিত হয়। অর্থাৎ যে-কোন শ্রেণীর পাঠ্যক্রমকে প্রথমেই ইংরেজি, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়; তারপর প্রত্যেক বিষয়ে ঐ শ্রেণীতে কি কি পড়িতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরা পাঠ্যক্রম রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করি বলিয়া

এখনও "বিষয়" অনুসারে পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া থাকি। লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে; ঐসব লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার পরিমাণ যখন খুব বেশী হইয়া পড়িল তখন আলোচনার সুবিধার জন্য সমজাতীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহাদের এক একটি করিয়া নামকরণ করা হয়। এইভাবে সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সৃষ্টি হয়। শ্রেণী বিভাগ এবং নামকরণকালে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সম্বন্ধেই প্রধানতঃ বিচার করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অর্থভারাক্রান্ত সকল ব্যবহারকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাকে আখ্যা দেওয়া হইল অর্থনীতি (Economics); মানুষের দেহ-সংক্রান্ত জ্ঞানকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নাম দেওয়া হইল শরীরতত্ত্ব (Physiology) ইত্যাদি। বিষয়ে বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহের পন্থারও (Methods) পার্থক্য আছে। ধরা যাউক, সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের পন্থা হইতেছে কল্পনা, চিন্তা, বিচার ইত্যাদি; কিন্তু রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় হইতেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiments)। উপরোক্ত নীতিগুলির অনুসরণে মানুষের অভিজ্ঞতাকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—১। মানব-বিজ্ঞান (Humanities)—মানব-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ করিয়া মানুষের নিজের অন্তরের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ—যথা, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। ২। সমাজ-বিজ্ঞান (Social Sciences)—এই বিষয়ের জ্ঞান কিছুটা মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ, কিছুটা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে লব্ধ—যথা—মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি। ৩। প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Sciences)—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ—যথা, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি। উপরোক্ত তিনটি বিভাগকে আবার অনেক ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, যথা, সাহিত্য, চারুকলা, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন-জাতক জীবতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ঐ বিষয়গুলির অনুসরণেই করিতে হয়।

মানুষের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করার ফলে আমাদের মনে কিন্তু অনেক ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের

ধারণা জন্মাইয়াছে যে, অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা পাঠ করিলেই বুঝি শিক্ষালাভ হয়। তারপর আমাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষের অভিজ্ঞতাকে সত্য সত্যই বুঝি "বিষয়ের" ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায়; বিষয়গুলি যেন পরস্পর-পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দুই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতেই আমাদের পাঠ্যক্রম রচিত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠ্যক্রমে আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিষয় এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য কি কি পাঠ করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত তালিকা থাকে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা পাঠ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি মাত্র এবং ঐ ধরণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষালাভ সুকঠিন—উহা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী। আমাদের একথাও স্মরণে অভিজ্ঞতা থাকে না যে, অভিজ্ঞতাকে বিষয়ের গণ্ডি দিয়া আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে উহা কৃত্রিম হইয়া পড়ে। ধরা যাউক, দিল্লীর লালকিল্লা দেখার অভিজ্ঞতাকে আমরা যদি "বিষয়ে" ভাগ করিতে যাই, তবে দেখিব ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমরা এক সঙ্গে লাভ করিতেছি। আমরা যদি বিদ্যালয়ে অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা মুখস্থ না করিয়া ছাত্রকে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অপরের অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিতে চেষ্টা করি তবে বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

বিষয় কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রমের ত্রুটি

বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকার কৃত্রিমতা দূর করিবার নিমিত্ত উদ্যমশীল শিক্ষকগণ, পাঠদান কালে, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি (correlation) অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। বিভিন্ন পন্থায়, এই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে—১। বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ, অথবা যে সব বিষয়ের মধ্যে সাধারণতঃ অধিকতর পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে (যেমন, ইতিহাস, ভূগোল সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি) তাহাদের শিক্ষকগণ একত্র মিলিত হইয়া একটি মিলিত পাঠদান তালিকা প্রস্তুত করেন। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে

পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি অনুসরণ করার কয়েকটি পন্থা

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি, বিভিন্ন শিক্ষক দ্বারা হইলেও, যাহাতে মোটামুটি একই সময়ে পড়ান হয়, মিলিত পাঠদান তালিকা সেই বিষয়েই প্রধানতঃ দৃষ্টি প্রদান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যখন ইতিহাসের শিক্ষক, সাহজাহানের শিল্পপ্রীতি সম্বন্ধে পাঠদান করিতেছেন, তখন যদি বাংলার শিক্ষক তাহার ক্লাসে সাহজাহান কবিতাটি পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে।

বিষয় শিক্ষকদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া মিলিত পাঠদান তালিকা প্রস্তুতে অসুবিধা

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐ ধরণের পরিকল্পনা সফল হওয়া কঠিন। কারণ শিক্ষকদের মধ্যে উপরোক্ত ধরণের সহযোগিতা স্থাপন করা সহজ নহে। তাহাছাড়া ২।৩টি বিষয়বস্তু (topics) ব্যতীত, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, এরূপ পাঠ্যতালিকা কোন শ্রেণীতেই প্রায় দেখা যায় না। অর্থাৎ যে শ্রেণীতে ইতিহাসে সাহজাহান পড়ান হয়, সেই শ্রেণীর বাংলার পাঠ্যতালিকায় হয়ত সাহজাহান কবিতা পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি, বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিষয়বস্তু থাকিলেও, প্রতি বিষয়ের নিজস্ব পাঠদানক্রম রক্ষা করিয়া, পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে পড়ান সম্ভব নহে। তাই, বাস্তবক্ষেত্রে কোন বিদ্যালয়ই ঐ ধরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা বিধিবদ্ধভাবে করে নাই।

শ্রেণী-শিক্ষক প্রথা প্রচলিত করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করার অসুবিধা

২। বিষয়-শিক্ষক প্রথা তুলিয়া দিয়া, শ্রেণী-শিক্ষক প্রথা গ্রহণ করিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করা হয়ত সহজতর হয়। এই প্রথায় একই শিক্ষক, শ্রেণীর সকল বিষয়ই পড়াইবেন, তাই বিষয়ের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, যখন প্রয়োজন, তখন-ই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। পাঠদান আরম্ভ করিবার পূর্বে, কখন কোন্ বিষয়ের সঙ্গে কোন্ বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া লইতে পারেন। শ্রেণী-শিক্ষক প্রথায় পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করা সহজতর হইলেও, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করিতে হইলে, বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকদের

পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজন ; কিন্তু এক শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। তাই বর্তমানে প্রায় কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই শ্রেণী-শিক্ষক প্রথা প্রচলিত নাই।

বিষয়-শিক্ষক অপর শিক্ষকের সহযোগিতা ব্যতীতই প্রয়োজন মত পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন

৩। পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করার সহজতম পন্থা হইল, শিক্ষক যখন যে বিষয়বস্তু পড়াইতেছেন, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর প্রতি তিনিই ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন (উহা শ্রেণী পাঠ্যতালিকায় থাকুক আর নাই থাকুক)। যেমন সাহজাহান পড়াইতে গিয়া, ইতিহাস শিক্ষক, নিজেই 'সঞ্চয়িতা' পুস্তকখানা সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের সাহজাহান কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি অনুসরণ করা না গেলেও, ইহার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। একই বিষয়বস্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচিত হইলে, শিক্ষণে সংক্রমণের (Transfer in learning) নীতি অনুসারে বিষয়বস্তুতে অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বিষয়বস্তুর জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে। যেমন, ইংরেজীতে মাতৃস্নেহ-বিষয়ক কোন কবিতা পড়ানোর কালে, শিক্ষক যদি বাংলায় ঐ ধরণের কবিতা পড়িয়া শুনান তাহা হইলে ছাত্রদের কবিতার ভাবগ্রহণে সুবিধা হইবে এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাব্যশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। ঐভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি অনুসরণ করার ফলে, পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাহাদের জ্ঞানের প্রসার হয়। সর্বোপরি জ্ঞানের অখণ্ডতা সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা জন্মায়। তাই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে ঐ ভাবেই পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি অনুসরণ করিতে বলা হয়, অবশ্য ঐ ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করার নূতন নামকরণ হইয়াছে, আনুষঙ্গিক পাঠ (Collateral readings and activities)। যেমন, সাহজাহানের শিল্পপ্রীতি পড়াইতে গিয়া, ইতিহাসের শিক্ষক, ছাত্রদের সাহজাহান কবিতা পড়িতে বলিবেন এবং তাজমহলের মডেল প্রস্তুত করিতে বলিতে পারেন।

আনুষঙ্গিক পাঠ ও কাজ এবং তাহাদের গুণাগুণ

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকের নিজের জ্ঞান না থাকিলে এই পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব হয় না। বাস্তবক্ষেত্রে, ঐ ধরণের পাঠদানে সক্ষম শিক্ষক খুবই কম পাওয়া যায়। তাই আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিখিত পাঠ্যপুস্তকে, কোন পাঠে কি ধরণের আনুষঙ্গিক পাঠ ও কার্য করান যাইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত থাকে এবং প্রত্যেক বিষয়ের আনুষঙ্গিক পাঠসম্বলিত স্বতন্ত্র পুস্তক শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য রচিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় আনুষঙ্গিক পাঠ ও কার্যের উপর আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া এই কার্যে সাহায্যের জন্য পুস্তকাদিও আমাদের দেশে এখনও রচিত হয় নাই।

পাঠ্য পুস্তকে আনুষঙ্গিক পাঠের ইঙ্গিত ও আনুষঙ্গিক পাঠ সম্বলিত স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন

পাঠদান কালে পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি অনুসরণের উপর বর্তমানে তেমন গুরুত্ব দেওয়া না হইলেও, জ্ঞানের অখণ্ডতা রক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া, অপরাপর বিষয়ে পাঠদানের নীতি কোন কোন শিক্ষাবিদ্ প্রচার করিয়াছেন। জিলার (Ziller) সাহেবের মতে ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া সকল বিষয়ই পড়ান যাইতে পারে, কারণ ইতিহাস হইতেছে মানব সভ্যতার প্রগতির বিবরণ এবং সকল বিষয়ই, যথা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি মানব সভ্যতার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে, একটি কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অপরাপর সকল বিষয় পড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

কেন্দ্রীকৃত (Integrated) পাঠদান পদ্ধতি

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কি ইতিহাস, কি কোন কুটির শিল্প, কাহারও সহিত সকল বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পাঠদান সম্ভব নহে। ঐরূপ চেষ্টা করিলে, কেন্দ্রে অবস্থিত বিষয়টির সহিত অপরাপর বিষয়ের সম্বন্ধ নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়ে, এবং পাঠদানের ক্রম (Logical sequence) ইত্যাদি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তুলা চাষ করিতে করিতে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়া যদি তুলা চাষের ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করা হয়, তাহা

হইলে, ইতিহাসের পাঠক্রমের সহিত বিষয়বস্তুর যে একটা খুব সম্বন্ধ থাকিবে এমন নহে। আবার ছাত্রেরা সূতা কাটিতেছে বলিয়া, যদি বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে সূতা কাটার গল্প স্থান পায়, তবে ঐ ধরণের দুই বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনকে কিছুটা কৃত্রিম বলা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কুটির শিল্পের সহিত সকল বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, পরিবেশ প্রভৃতির সহিতও পাঠ্যবিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পাঠদানের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। মোট কথা কেন্দ্রীকৃত পাঠদান পদ্ধতি যদিও বা প্রাথমিক স্তরে কিছুটা চলিতে পারে, মাধ্যমিক স্তরে উহা অচল; কারণ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য-বিষয় অনেক জটিল হইয়া উঠে এবং উহার অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মধ্যে যথাযথ ক্রম (Proper sequence) রক্ষা করিয়া অগ্রসর না হইলে, বিষয়বস্তুর যথাযথ বোধ হওয়া সম্ভব নহে।

কেন্দ্রীকৃত পাঠদান পদ্ধতির অসুবিধা

আধুনিক কালে, আর এক ধরণের কেন্দ্রীকৃত পাঠ্যক্রম রচনার পদ্ধতি প্রচলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এই পদ্ধতি অনুসারে, কোন বিষয়কে কেন্দ্রে না রাখিয়া শিশুদের প্রয়োজনবোধ বা চাহিদাকে (needs) কেন্দ্রে রাখিতে হয়। প্রথমেই, ছাত্রদের প্রয়োজনবোধের একটা তালিকা করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজন-বোধকে তৃপ্ত করিবার জন্য কি কি অভিজ্ঞতা (Experience) দিতে হইবে তাহার তালিকা পাশা-পাশি রাখিতে হইবে। এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া, কোন অভিজ্ঞতা কোন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত (Subject) হইবে সে বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপন পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ছাত্রকে হয়ত বিজ্ঞান (যেমন বিজ্‌লিবাতি), ইতিহাস (যেমন সহরে বা গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন মন্দির,) সমাজবিজ্ঞান (যেমন সহরে বা গ্রামের বিভিন্ন ধরণের জীবিকা) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে হইবে এবং পাঠদানকালে ঐসব বিষয় নিজ নিজ বিষয়ের (Subject) গণ্ডি ডিঙ্গাইয়া পর পর আসিয়া হাজির হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশটি বিদ্যালয়কে লইয়া ঐ ধরণের পাঠ্যক্রম ও পাঠদান

প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীকৃত পাঠদান পদ্ধতি

পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফল ভালই হইয়াছে। কিন্তু এই নূতন পরিকল্পনা এখনও তেমন স্বীকৃতি পায় নাই। উহা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই আছে।

এই বিষয়ে আলোচনা পরিসমাপ্তির পূর্বে মনে রাখিতে হইবে যে— ১। বিষয়ে বিষয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতির উপর বর্তমানে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ২। তবে পাঠদানকালে আনুষঙ্গিক পাঠ ও কার্যকে, ছাত্রদের পাঠের বিষয়বস্তুতে আগ্রহ ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা মাধ্যমিক শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ৩। কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা কর্মকে কেন্দ্র করিয়া পাঠদানের প্রয়োজনীয়তাও বর্তমানে তেমনভাবে স্বীকার করা হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলে বিদ্যার্থীর ব্যক্তিত্বই বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানের অখণ্ডতা রক্ষা করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ৪। তবে, পাঠদানে বিষয়ের গণ্ডী উঠাইয়া দিয়া বিদ্যার্থীর প্রয়োজনবোধকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া পাঠদানে ফলাফল সম্বন্ধে অধুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

আলোচনার সারমর্ম

শিক্ষাশ্রেয়ী দর্শন ও পাঠ্যক্রম—শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারেই পাঠ্যক্রম রচিত হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ধারণা থাকিলে পাঠ্যক্রমও পৃথক পৃথক ভাবে রচিত হইবে। যুগ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যের যেরূপ পরিবর্তন হইবে পাঠ্যক্রমেরও সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিবে।

প্রাচীন যুগে মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিল—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত। মানুষের চরিত্র এবং ব্যবহারের ভিতর দিয়াই এই বিকাশ প্রতিফলিত হয়। তাই পাঠ্যক্রমে পুস্তক পাঠ এবং অভ্যাস উভয় সমান গুরুত্ব লাভ করিত। প্রাচীন ভারতে বেদাদি গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনা করা, সমিধ সংগ্রহ ইত্যাদি অভ্যাস গঠন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও দর্শন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চর্চার ব্যবস্থা ছিল। বস্তুত-পক্ষে প্রাচীন সভ্য দেশগুলির পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে তাহারা বিষয়-কেন্দ্রিক না হইয়া অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্যক্তিত্বের

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শন ও পাঠ্যক্রম
সমাজের দাবীর স্বীকৃতি

বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিলেও সমাজ-জীবনের প্রয়োজনও শিক্ষাক্ষেত্রে কখনও অবহেলিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতে "অধ্যাত্ম জীবন" এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলেই ছাত্র সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইত। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা শেষে সমাবর্তন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিবার অভিজ্ঞান (Certificate) বলিয়া গণ্য হইত। গুরুগৃহে ছাত্রকে যে সব বিষয় পাঠ এবং যে সব অভ্যাস গঠন করিতে হইত তাহা বাস্তবজীবনে পুরাপুরিই কাজে লাগিত ; এমন কি বৃত্তি শিক্ষাদানও (ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যাপনা এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবিদ্যা) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পাঠ্যক্রমে সমাজের দাবীর স্বীকৃতি

প্রাচীন গ্রীসে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্-এর উপলব্ধি করাইবার চেষ্টার সঙ্গে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও চলিত। এ্যারিস্টটল্ (Aristotle) তাঁহার 'পলিটিক্স' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন— শিশুকে প্রয়োজনীয় জিনিস, যাহা কার্যকরী তাহা শিক্ষা দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না (There can be no doubt that children should be taught those useful things which are really necessary)। প্রাচীন রোমে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিত্বের মুক্তিকামী (Liberal education to liberate the mind)। ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমে যে সাতটি বিষয়ের তালিকা থাকিত (Trivium and Quadrivium) তাহা বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমান নাগরিকদের সমাজ-জীবনে যে সব কার্যে ব্রতী হইতে হইত (সৈনিক, রোমান প্রদেশের শাসনকর্তা ইত্যাদি) তাহার জন্যও ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থাও কখনও তাহার পাঠ্যক্রম রচনায় সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই—প্রয়োজনীয়তার নীতিকে (Utility theory) পাঠ্যক্রম রচনায় যথাযথ স্থান দিয়া আসিয়াছে।

রুশোর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রকৃতিবাদীরা অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্র হইতে নীতি হিসাবে সমাজের দাবীকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চাহিয়াছেন।

পাঠ্যক্রমে এমন কোন বিষয় থাকিবে না যাহা শিশুর বর্তমান চাহিদা, বর্তমান আগ্রহের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কৈশোরের পর ছাত্রকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার নীতি রুশো নিজেই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক, উগ্র প্রকৃতিবাদী মতানুসারে সমাজের প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশের পাঠ্যক্রম রচিত হয় নাই।

রুশো ও পাঠ্যক্রম

একমাত্র মধ্যযুগে এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা বাস্তবজীবনের প্রয়োজন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। মধ্যযুগের শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন, কিন্তু ধর্মশিক্ষাকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র পন্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। ধর্ম ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবন উভয় হইতেই দূরে সরিয়া আসিয়াছিল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশও ঘটিত না, আবার বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুতিও হইত না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষা-দর্শনের দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীই ছিলেন; কিন্তু মানসিক শৃঙ্খলাবাদের (Mental Discipline) প্রভাবে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় (Latin, Greek ইত্যাদি) পাঠের দ্বারা মানসিক ক্ষমতাগুলি (Faculty) বিকশিত হইয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঐসব বিষয় পাঠের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশও হইত না, আর শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবনে ঐসব বিষয় পাঠ কোন কাজেই আসিত না। এক কথায় শিক্ষা যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে শুধুমাত্র সেইখানেই শিক্ষাদ্বারা বাস্তবজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই।

মধ্যযুগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে সমাজের দাবীকে অস্বীকার

বর্তমান যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পাঠ্যক্রম রচনাকালে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মত শিক্ষা এখন আর সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। শুধুমাত্র জীবিকার্জনের জন্য যাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইবে শিক্ষা তাহাদের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে। আবার সকল দিক হইতেই (আর্থিক,

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পাঠ্যক্রম

রাজনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত) সমাজ-জীবন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, পাঠ্যক্রম রচনাকালে কোন শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনই সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পারে না। ব্রিটেনের শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটামুটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের নীতিতে গঠিত। ব্রিটেনের শিক্ষাদপ্তর হইতে প্রকাশিত Handbook of Suggestions for Teachers পুস্তিকায় পাঠ্যক্রম রচনার নীতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের মনোভাব এই আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে যে, শিশুদের মধ্যে আমরা সেই ধরণের অভ্যাস, কৌশল, আগ্রহ, "সেন্টিমেন্ট" জন্মাইতে সাহায্য করিব যাহা তাহাদের নিজেদের এবং যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস করিবে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইবে। ("Our attitude towards to curriculum has been influenced by a desire to assist children to acquire or develop the habits, skills, interests and sentiments which they will need both for their own well-being and that of other people among whom they will live.") বাস্তবজীবনের প্রয়োজন অস্বীকার না করিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পাঠ্যক্রম রচনাকালে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনকেই কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব দেন। সমাজজীবনে মানুষের যে সব মহান্ কীর্তি (সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চারুকলায় ইত্যাদি) আছে উহাদিগকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। নান সাহেব লিখিয়াছেন—বৃহত্তর পৃথিবীতে মানুষের যে সব স্থায়ী এবং বৃহৎ কীর্তি আছে বিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রতিবিম্বিত করিবে। (The school must reflect those human activities that are of most greatest and most permanent significance in the world.) তাঁহার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া নান সাহেব লিখিয়াছেন যে, মানুষের বৃহৎ কীর্তিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—যে সব কাজ মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাহাদিগকে আমরা প্রথম ভাগে ফেলিয়া থাকি—ধরা যাউক, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক সংগঠন, নীতিবোধ, ধর্ম ইত্যাদি ; দ্বিতীয় ভাগে পড়ে মানুষের বিশেষ ধরণের সৃজনাত্মক কাজগুলি যাহা সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। ("In the first we place the activities that

safeguard the conditions and maintain the standard of individual and social life. Such as the care of the health and bodily grace, manners, social organisation, morals, religion; in the second the typical creative activities that constitute so to speak the solid tissues of civilization.") নান সাহেবের মতে প্রথম ভাগে বর্ণিত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ পাঠের বস্তু হইতে পারে না; বিদ্যালয়-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই শিশু ঐসব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়গুলিই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের (Complete education) নিমিত্ত নান সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন—১। সাহিত্য; মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অবশ্যই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ২। কোন রকমের চারুকলা তাহার মধ্যে সঙ্গীত অবশ্যই থাকিবে; ৩। হাতের কাজ; শিক্ষাদানকালে প্রতিটি কাজে সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ৪। অঙ্কসহ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোলও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন বিষয়কেই নান সাহেব তাহার স্বকীয় গুরুত্বের জন্য পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন নাই। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে ঐসব বিষয়ের গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়াই নান সাহেবের কাছে উহারা পাঠ্যক্রমে স্থান পাইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ ও পাঠ্যক্রম

সমাজতন্ত্রবাদীরা কিন্তু পাঠ্যক্রম রচনাকালে জীবনের প্রয়োজন তথা সমাজের প্রয়োজনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে সমাজ-জীবনে শিশুকে যেসব ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। হার্বার্ট স্পেনসার মানুষের কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তালিকা দেন—১। আত্মরক্ষা (Self-preservation); ২। জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহকরণ (Procuring necessities of life); ৩। শিশুপালন (Rearing children); ৪। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ (Social and political relations); ৫। সংস্কৃতি। আমেরিকার National Education Commission মাধ্যমিক শিক্ষার

বিষয়বস্তু নির্ধারণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সাতটি প্রধান নীতি প্রস্তুত করেন।—১। মূল প্রণালীগুলি (Fundamental processes); ২। স্বাস্থ্য (Health); ৩। পরিবারের সভ্য হওয়া (Home membership); ৪। বৃত্তি (Vocation); ৫। নাগরিকতা (Citizenship); ৬। অবসর বিনোদন (Leisure); ৭। নৈতিক সম্বন্ধ (Ethical relationship)। ববিট্ সাহেব (Bobbitt) মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে দশটি বড বড় ভাগে বিভক্ত করেন—১। সাহিত্য-সংক্রান্ত কার্য (Language activities); ২। স্বাস্থ্য (Health); ৩। নাগরিকতা (Citizenship); ৪। সাধারণ সামাজিক সংযোগ (General Social contacts); ৫। মনের দিক হইতে যোগ্য থাকা (Keeping mentally fit); ৬। অবসর সময়ের কার্য (Leisure occupations); ৭। ধর্ম-সংক্রান্ত কার্য (Religious activities); ৮। পিতামাতার দায়িত্ব (Parental responsibilities); ৯। অবিশেষ বাস্তব কার্যাবলী (Unspecialised practical activities); ১০। বৃত্তি-সংক্রান্ত কার্যাবলী।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত পাঠ্য-ক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য

সমাজতন্ত্রবাদীদের পাঠ্যক্রম রচনার নীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নীতি (utility) পাঠ্যক্রম রচনায় সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করে। শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদা, বা তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনের কথা পাঠ্যক্রম রচনাকালে সমাজতন্ত্রবাদীরা পৃথকভাবে বিবেচনা করেন না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি যেসব বিষয় ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে বলিয়া আমরা জানি সেইগুলি সমাজতন্ত্রবাদীদের পাঠ্যক্রমেরও অন্তর্ভুক্ত থাকে; কেবলমাত্র তাহাদিগকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হয়। সংক্ষেপে, উদ্দেশ্যের কথা না জানিয়া সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দ্বারা প্রস্তুত এক শ্রেণীর জন্য দুইটি পাঠ্যক্রম দেখিলে হয়ত কোন পার্থক্য ধরা পড়িবে না। উদ্দেশ্যের দিক হইতেও, প্রয়োগবাদীরা সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা

করিয়াছেন। প্রয়োগবাদীরা বিশেষ করিয়া বাস্তব প্রয়োজনবাদে (utility) বিশ্বাসী ; কিন্তু তাঁহাদের মতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া তাহার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিতে হইবে—পাঠ্যক্রম শিশুর আগ্রহ, কর্ম এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হইবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই—পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা সমাজের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া শিশুর জীবনের চাহিদার কথা চিন্তা করিব। পাঠ্যক্রম প্রধানতঃ হইবে শিশু-কেন্দ্রিক। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম রচনাকালে ডিউই সাহেব শিশুর চারিটি আগ্রহের ক্ষেত্রের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে লিখিয়াছেন—১। ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান (interest in conversation or communication) ; ২। বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ (interest in enquiry and finding out things) ; ৩। বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুত করিতে আগ্রহ (interest in making things or construction) ; ৪। চারুকলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে আগ্রহ (interest in artistic expression)।

শিশুর আগ্রহের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম রচনা করা হইলে সে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইল ; সমাজের প্রয়োজনে কোথাও তাহাকে খর্ব করা হইল না। অপর দিকে শিশুজীবনের চাহিদা সমাজনিরপেক্ষ নহে। সমাজই শিশুর জীবনের চাহিদা সৃষ্টি করে। সমাজের বিভিন্নতা অনুসারে শিশু-জীবনের চাহিদাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। ধরা যাউক, একটি ব্রিটিশ শিশু এবং একটি ভারতীয় শিশুর জীবনের চাহিদার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সমাজ-জীবনের প্রয়োজন শিশু-জীবনের চাহিদার মধ্যে প্রতিবিম্বিত না হইয়া পারে না। তাই পাঠ্যক্রম রচনার পূর্বে শিশু যে সমাজে বাস করিতেছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার জীবনে কি ধরণের চাহিদা জন্মাইতে পারে তাহা স্থির করিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ডে Council for Curriculum Reforms (১৯৪৫ খ্রী:) বর্তমান সমাজব্যবস্থার আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য সমাজের কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে নিম্নলিখিত চাহিদাগুলির সৃষ্টি হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—১। অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধীয় (Concerning economic life) ; ২। ব্যক্তিগত পরস্পর

সামাজিক পারিপার্শ্বিকে শিশুর মধ্যে সৃষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম রচনা

সম্বন্ধ সম্পর্কীয় (Concerning face to face personal relationships) ; ৩। ব্যক্তির সহিত দলের (সংঘবদ্ধ বা আংশিকভাবে সংঘবদ্ধ) সম্বন্ধ সম্পর্কীয় (Concerning relationpship of individuals to organised and semi-organised groups); ৪। ব্যক্তিগত এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োজন সম্বন্ধীয় (Concerning internal and individual needs)।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে সমাজ এবং ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হয় না—একেকে অপরের অবিভাজ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের মধ্যেও কোন পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয় না। বর্তমান জীবনের প্রয়োজন নিবৃত্তি স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন নিবৃত্তিতে সাহায্য করিবে। তাই বর্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিশু-চাহিদা-কেন্দ্রিক (Need centred) পাঠ্যক্রম রচনা করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সর্বপ্রথমে শিশুর বয়স অনুসারে তাহার চাহিদাগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়; উহাদের নিবৃত্তিকে ঐ স্তরের (শিশুর বয়স অনুসারে শিক্ষাস্তরকে ভাগ করা হয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তারপর প্রত্যেক প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য শিশুকে কি কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে এবং ঐ সব অভিজ্ঞতা দিলে তাহার মধ্যে কি কি ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি হইবে তাহারও তালিকা প্রস্তুত করা হয়। শিশু-জীবনের চাহিদা তাহাদের নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং উহার ফল হিসাবে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি ইহাদের সব কিছুই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। আমেরিকার Progressive Education Association ১৯৩০ খ্রীঃ হইতে আট বৎসর ধরিয়া ত্রিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপরোক্ত নীতিতে পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া পাঠদানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার (Experiment) ফলাফল উপরোক্তরূপ পাঠ্যক্রম রচনা করার নীতির সমর্থন করে।

পাঠ্যক্রম রচনার মুলনীতি—উপরোক্ত আলোচনা হইতে হয়ত এইটুকু বোঝা গিয়াছে যে, পাঠ্যক্রম রচনা করা খুবই জটিল কাজ এবং শিক্ষা-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অপর কাহারও উপর ঐ দায়িত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইলে আমাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা মনে রাখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে **উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী** গ্রহণ করিতে হইবে। কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করিলেই পাঠ্যক্রম রচনার কাজ শেষ হইবে না ; পাঠ্য বিষয় ব্যতীত, আরও নানা ধরণের যে সব অভিজ্ঞতা বিদ্যালয় জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদেরও উল্লেখ পাঠ্যক্রমে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, নির্দিষ্ট বিষয়ে, পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও স্পষ্ট উল্লেখ পাঠ্যক্রমে থাকা আবশ্যক। পাঠদানের উদ্দেশ্য, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পাঠ ও অভিজ্ঞতার তালিকা এবং ফলে ছাত্রদের মধ্যে যে সব ব্যবহারের উদ্ভব বা জ্ঞান সংগৃহীত হইবে সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে পাঠ্যক্রম রচনার কাজ শেষ হয় না।

পাঠ্যক্রম রচনায় **ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতার নীতি** (Individual relevance) সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন হইতেই শিক্ষার আরম্ভ—নিজ প্রয়োজনের তাগিদে অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিলে শিক্ষালাভ হয় না, ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। তাই প্রাচীন ভারতে নীতি ছিল যে, "জিজ্ঞাসু" ব্যতীত কাহাকেও কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। বর্তমানে আমরা বলিয়া থাকি যে, শিক্ষা গ্রহণের জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি (maturity) না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ শিক্ষাদান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তাই পাঠ্যক্রমের অভিজ্ঞতার তালিকায় এমন কোন অভিজ্ঞতার নাম থাকিবে না যাহার শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আমরা সাধারণতঃ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া, শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার কথা স্মরণে না রাখিয়া, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের নিকট হইতে কতকগুলি জ্ঞানভার শিশুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করি। এই ধরণের পাঠ্যক্রম ছিল যুক্তিতান্ত্রিক (Logical), মনস্তত্ত্বতান্ত্রিক (Psychological) নহে। শিক্ষাকার্য শিশুকেন্দ্রিক করিতে হইলে পাঠ্যক্রমকে সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক করিতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে পাঠ্যক্রম রচনা কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে শিশুর বয়স, তাহার শারীরিক এবং মানসিক পরিণতির স্তর, তাহার বর্তমান জীবনের চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদিগকে **সমাজ প্রাসঙ্গিকতার** নীতি (Social relevance)ও অনুসরণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিলে চলিবে না, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথাও ভাবিতে হইবে। শিক্ষা যদি শিশুকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত না করিতে পারে তবে তাহা অনেকাংশে ব্যর্থ একথা সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই পাঠ্যক্রমের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সমাজ-জীবনের সহিতও সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন এক-সূত্রে গাঁথা—বর্তমান জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করিবে। কাজেই তাহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের চাহিদার কথা এক সঙ্গে ভাবিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা কঠিন নহে। শিশুর জীবনের বিকাশ এবং পাঠ্যক্রমের বিকাশ পরস্পর-পরস্পরের সহিত তাল রাখিয়া চলিবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতা ও সমাজ-প্রাসঙ্গিকতার নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়।

শিশুতে শিশুতে পার্থক্যের কথা (Individual difference) স্মরণ রাখিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়। জন্মগত ক্ষমতায়, আগ্রহে, চারিত্রিক গুণাবলীতে শিশুতে শিশুতে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা (Tests) আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে, শিশুতে শিশুতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। সকল শিশুকে এক ছাঁচে গড়িয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে—ইহাতে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও মঙ্গল হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম রচনাকালে ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। ১৩ বৎসর বয়স হইতে পারস্পরিক ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদিতে পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। তাই বিশেষ করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলির পাঠ্যক্রমকে "Core" এবং "Perephery" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পাঠ্যক্রমের "Core" অংশের অভিজ্ঞতা সকল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে হয় (মাতৃভাষা, অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান), কিন্তু Perephery অংশে ছাত্র নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারে। তারপর যে কোন শ্রেণীর জন্য যে কোন বিষয়ের পাঠ্যক্রম রচনাকালে সম্ভব হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদিগকে নিজ নিজ ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুসারে

ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ দিতে চেষ্টা করিতে হয়। ধরা যাউক, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে scrap book রক্ষা করাকে যদি অভিজ্ঞতার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের রুচি অনুসারে নিজেদের scrap book ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূর্ণ করিতে পারে। এইরূপে প্রতি বিষয়েই ছাত্রদিগকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের **অবিভাজ্যতার নীতিরও** অনুসরণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার দ্বারা সমগ্র মানুষ (Whole man)কে গড়িয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজের সুবিধার জন্য আমরা শিক্ষাকে স্তরে স্তরে ভাগ করিতে পারি, প্রতি স্তরকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, কিন্তু শিক্ষার প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত আমরা একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেছি। কাজেই যে কোন স্তর বা যে কোন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে—প্রতি স্তর এবং প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের অপরাপর স্তর এবং শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোন শ্রেণীতে কোন বিষয়ে পাঠ্যক্রম রচনাকালেও এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, মানুষের অভিজ্ঞতাকে বিষয়ে বিষয়ে ভাগ করা একান্ত কৃত্রিম। অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষায় এইরূপ বিষয় বিভাগ একেবারেই অচল। তাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে মোটামুটিভাবে ভাগ করিলেও তাহারা যে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একথা মনে রাখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনশীলতার (dynamism) কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপায় মাত্র। আবার শিক্ষাদান কালে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব—বিশেষ করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক শিক্ষক এবং প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যখন পার্থক্য রহিয়াছে তখন একই পাঠ্যক্রম সকলক্ষেত্রে হুবহু অনুসৃত হইলে তাহা যান্ত্রিক হইতে বাধ্য। কাজেই পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয় এবং শিক্ষক তাহার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিতে পারেন। ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে এবং ঐসব

অভিজ্ঞতাকে কোন্ কোন্ স্তর পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে তাহার ইঙ্গিতমাত্র পাঠ্যক্রম প্রদান করিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র পাঠ্যক্রমকে শিকারীর মত অনুসরণ করিবে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সে পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করিবে না।

পাঠ্যক্রমকে আমাদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম আহরণীয় জ্ঞানের তালিকামাত্র এই ধারণা যে ভ্রান্ত এ আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। পাঠ্যক্রমকে কতকগুলি বিষয়-পাঠের তালিকায় পর্যবসিত করার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়াছে। পাঠকেই আমরা শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে যে সব কার্যের (Activity) সুযোগ দেওয়া হয় তাহা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া তাহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে ছাত্রেরা কিন্তু আপন আপন কাজ বা অভিজ্ঞতা দ্বারাই শিক্ষালাভ করে। পাঠও তাহাদের একটি কর্ম বটে ; কিন্তু এ ধরণের কর্ম দ্বারা সহজে শিক্ষা লাভ হয় না। বস্তুতপক্ষে শিক্ষালাভ ব্যাপারে পুস্তকপাঠ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্ম হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অধিক। তাই পাঠ্যক্রমে পাঠ্যবিষয়ের তালিকা না দিয়া বিভিন্ন ধরণের কার্য বা অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্র (Field of experience) সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান পাঠ্যক্রমে গলদ—পাঠ্যক্রম যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্যই সমান প্রয়োজনীয়। পাঠ্যক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া দেয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও সুনির্দিষ্ট করে। পাঠ্যক্রম হইতে শিক্ষক এবং ছাত্র নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা পাইয়া থাকেন। বাহ্যিক পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্র রচনাকারী পাঠ্যক্রম হইতে প্রশ্নপত্র রচনার বিষয়বস্তু পাইয়া থাকেন। তারপর একই সমাজের, একই স্তরের, একই ধরণের বিদ্যালয়ের কার্যের মধ্যে সমতা স্থাপনের নিমিত্তও আমাদের পাঠ্যক্রমের সাহায্য লইতে হয়। সমাজ, বিদ্যালয়ের কার্যাবলী পরিবর্তন করিতে চাহিলে তাহাও পাঠ্যক্রমের সাহায্যে করিতে পারে।

পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

এমন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পাঠ্যক্রম, ইহার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বর্তমান পাঠ্যক্রমের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—

১। আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনকেই উহা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত তাহাকে "প্রবেশিকা পরীক্ষা" (Entrance Examination) নাম দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় "প্রবেশের" যোগ্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান দেওয়ার নিমিত্তই ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। বর্তমানে পরীক্ষার নাম পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহার পরিচালনার ভার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে চলিয়া আসিলেও বাস্তবক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অতিরিক্ত মর্যাদার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। তারপর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করার দায়িত্বও এখনও প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহারাই আবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া থাকেন। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দাসত্ব করিতেছে—প্রাথমিক শিক্ষাও তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষার দাসত্ব করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া রচিত হইয়া থাকে।

২। এই অবস্থার আর একটি কুফল হইতেছে এই যে, আমাদের পাঠ্যক্রম **পুস্তককেন্দ্রিক** এবং **তত্ত্বকেন্দ্রিক** (Bookish and theoretical) হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম হইতেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। নানা কারণে বাস্তব জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইবার ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত "স্কলাস্টিক" (Scholastic) হইয়া পড়িয়াছিল—পুস্তক পাঠ এবং অর্থহীন বাক্যসম্ভার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অচল। ঐ স্তরের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই হয়ত পুস্তককেন্দ্রিক এবং তত্ত্বকেন্দ্রিক শিক্ষার যোগ্য নহে। তাহাদের হাতে-কলমে শিক্ষার প্রয়োজন। তার উপর মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া সরাসরি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে রচিত বর্তমান পাঠ্যক্রম তাহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। শিক্ষাকে যদি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করিতে হয় এবং তাহাকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পাঠ্যক্রম অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক হওয়া আবশ্যক।

পাঠ্যক্রমে শুধু পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের নাম থাকার দরুণ আমাদের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়াছে যে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠই শিক্ষা আখ্যাদানের যোগ্য। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে যে শিক্ষালাভ হয়, উহা যে পুস্তক পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষাদান কার্যে অনেক অধিক মূল্যবান একথা আমরা বিশ্বাসই করিতে চাহি না। তাই পাঠ্যক্রমে পাঠ্য বিষয়ের তালিকার সহিত প্রদত্ত অভিজ্ঞতার তালিকাও থাকা প্রয়োজন।

৩। একদিকে আমাদের পাঠ্যক্রম অনাবশ্যক বিষয়ে পরিপূর্ণ, অপরদিকে উহাতে ছাত্রদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সম্বন্ধশীল অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। জ্ঞানের ভাণ্ডার ছাত্রদের কাছে উজাড় করিয়া দিতে হইবে —বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উচ্চতম জ্ঞানের আস্বাদনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে আমরা শিক্ষার প্রতি স্তরে ছাত্রদের মনকে আবশ্যক, অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে চাই; তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতা, তাহাদের আগ্রহ, অনাগ্রহের কথা একবার চিন্তাও করি না। যে সব জ্ঞান দিতে চাই, ছাত্রদের বর্তমান জীবনের চাহিদা বা ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই প্রায় নাই। এই অবস্থায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোন স্বাভাবিক প্রেরণাই ছাত্রদের থাকিতে পারে না। অনিচ্ছুক ছাত্রদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিবার নিমিত্ত শিক্ষককে কখনও বা শাস্তি, কখনও বা পুরস্কারের আশ্রয় লইতে হয়। তাই পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদিগকে ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতা এবং সমাজ প্রাসঙ্গিকতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

৪। ছাত্রে ছাত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথাও আমরা পাঠ্যক্রম রচনাকালে স্মরণ রাখি না। এক শ্রেণীর সকল ছাত্রকে একই ধরণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হয়—তাহাদের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিভিন্নতা হিসাবে তাহারা পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা গ্রহণের কোন সুযোগই পায় না। পাঠ্যক্রমকে Core এবং Peripheryতে বিভক্ত করা হয় না। ফলে যাহাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রহণের ক্ষমতা বা আগ্রহ থাকে না তাহারা এইরূপ পাঠ্যক্রম অনুসরণের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা এত অধিক হওয়ার অন্যতম কারণ।

৫। কৈশোরে সাধারণতঃ ছাত্রেরা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ বয়সে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হয়।

কৈশোর জীবনের তিনটি প্রধান চাহিদা হইতেছে—(ক) ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা; বয়োপ্রাপ্ত হইলে কি করিয়া জীবিকার্জন করিবে এ বিষয়ে তাহাদের মনে চিন্তা জন্মায়। আমাদের মত বেকারসমস্যা-জর্জরিত দেশে ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের চিন্তা কিশোর মনের নিরাপত্তাবোধ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে। (খ) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধও কৈশোর জীবনের আর একটি সমস্যা। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। (গ) কিশোরেরা আদর্শবাদী হয়—এই বয়সে তাহারা নিজদিগকে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চায়। আদর্শের সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া কিশোর জীবনের একটি বড় সমস্যা। আমাদের বর্তমান সমাজে আদর্শবাদ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত বলিয়া কিশোর জীবনের এই সমস্যা আরও প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কিন্তু এই তিনটি চাহিদার একটিও পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ বৃত্তি, শিক্ষা, যৌন বিজ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।

৬। পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন একটি "পাপচক্রের" (vicious circle) সৃষ্টি করিয়াছে। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির জন্য আমাদের পাঠ্যক্রম অনেকটা দায়ী। পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের মনে যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইতেছে এই যে, ছাত্রদিগকে এইরূপ অভিজ্ঞতা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে।

পরীক্ষায় পাশ করানোকে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করায় আমাদের পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

৭। সর্বশেষে পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে আমরা যে ধরণের সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার অর্থনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অপরিহার্য যান্ত্রিক এবং বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম—উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমগুলি কিরূপ হইলে ভাল হয় তাহা আলোচনা করা হইল।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানত: তিনটি—১। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করা, ২। সমাজ-জীবনের সর্বনিম্ন চাহিদা মিটানোর উপযুক্ত করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলা, ৩। যে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদের ঐ স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধির জন্য আমরা নিম্নলিখিত-রূপ অভিজ্ঞতা শিশুকে দিতে চেষ্টা করিতে পারি।

১। বর্তমান সমাজে বসবাস করিতে হইলে, অপরের ভাবগ্রহণ করিবার জন্য **পঠন** এবং নিজের ভাব, প্রকাশ করিবার জন্য **লিখন** এই দুইটি কৌশল আয়ত্ত করা অপরিহার্য। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলি, দেশের প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে পঠন এবং লিখন শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া থাকে। পঠন এবং লিখন শিক্ষাদান ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও ভিত্তি গঠন করে। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পঠনের সাহায্যে যে কোন স্তরের জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়। সাহিত্য রসের মাধ্যমে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের উপলব্ধি জীবনে করা চলে। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে লিখন অপরিহার্য, তদ্‌ব্যতীত মানুষের কল্পনাশক্তির বিকাশ, মনের অনুভূতির প্রকাশের দ্বারা উচ্চতর স্তরের অনুভূতি লাভের জন্য প্রস্তুতি প্রভৃতির জন্যও লিখন কৌশল হিসাবে আয়ত্ত করা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য যে, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায়ই পঠন এবং লিখন আয়ত্ত করার চেষ্টা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পঠন এবং লিখনকে কৌশল হিসাবে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে জীবনের যে কোন প্রয়োজনে

তাহাদের ব্যবহার করা চলে। প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্রেরা সকলরূপ সামাজিক প্রয়োজনেই যাহাতে মোটামুটিভাবে পঠন এবং লিখনের ব্যবহার করিতে পারে এরূপ যোগ্যতা অর্জন করিবে ইহা আশা করা যায়। সাহিত্য রসের অল্প-স্বল্প অনুভূতি বা মনের সহজতম চিন্তা বা কল্পনা পঠন, লিখনের সাহায্যে প্রকাশ করার এক আধটু অভিজ্ঞতা ছাত্রেরা পাইলেও মন্দ হয় না। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বিভিন্ন ধরণের বিষয় পঠন এবং লিখনের (বিশেষ করিয়া সমাজ-জীবনের কথা মনে রাখিয়া) অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দিতে হয়।

২। সমাজ জীবনের সাধারণ প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য কিছুটা গণিত শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে (বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে) ছাত্রেরা যাহাতে গণিতের ব্যবহার করিতে পারে সেইরূপ যোগ্যতা তাহাদের অর্জন করা উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে, গণিত শিক্ষাও এক বিশেষ ধরণের কৌশল শিক্ষা। সামাজিক প্রয়োজনে তাহার ব্যবহারেই ঐ কৌশল আয়ত্ত করার সার্থকতা। শুধুমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণন এবং ভাগ কষিবার অভিজ্ঞতা দিলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

৩। যে সমাজে আমরা বাস করি জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাহার ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে এবং তাহার বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উহার রীতিনীতি, নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা ও প্রত্যেক নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। তাই সমাজবিদ্যা নাম দিয়া সমাজ-সংক্রান্ত উপরোক্ত ধরণের অভিজ্ঞতা ছাত্রদিগকে দিতে চেষ্টা করা হয়। ঐ সব অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সমাজ-জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়া হইলেও ব্যক্তিত্ব বিকাশেও ইহারা কম সাহায্য করে না। মনে রাখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে শিশুকে কতকগুলি নিষ্ক্রিয় জ্ঞান দেওয়াই যথেষ্ট নহে। সমগ্র অভিজ্ঞতাগুলিই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

৪। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কুটির শিল্প ইত্যাদির স্থানও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাদের মাধ্যমে আবেগ, অনুভূতি, সৃজনী শক্তি

ইত্যাদির প্রকাশের সুযোগ পাইয়া শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া থাকে। এখানে কুটির শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। ইহার মাধ্যমে সমাজে প্রত্যক্ষ মূল্য আছে এমন কোন কাজ করার সুযোগ পাইয়া, ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের স্মৃষ্টি হয়, এবং ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে কিছু কিছু পৃথক অভিজ্ঞতা দানেরও সুযোগ পাওয়া যায়। সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার নিমিত্তও ছাত্রদিগকে ঐসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা দান বাঞ্ছনীয়।

৫। স্বাস্থ্যবিদ্যা, শরীরচর্চা এবং গার্হস্থ্যবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্রদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা দেওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের শারীরিক দিক গড়িয়া তোলাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা না হইলে ছাত্রদের পক্ষে সফল ও সার্থক জীবন যাপন সম্ভব নহে। গৃহনির্মাণ, রান্নাবান্না, কাপড়কাচা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে; ছাত্রেরা যাহাতে ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবনে ঐ সব জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে পারে, তাহার জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা দেওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করা, উপযুক্ত অভ্যাস গঠন করা এবং যথাযথ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর (Mental attitude) স্মৃষ্টি অধিকতর মূল্যবান।

৬। সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের কিছুটা অংশও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। বর্তমান যান্ত্রিক সমাজে বাস করিতে হইলে, দৈনন্দিন কাজের জন্যও অনেক সময় বিজ্ঞানের শরণ লইতে হয়। তাই এ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপর দিকে নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝিতে হইলে, এবং তাহাকে প্রয়োজনমত কিছুটা কাজে লাগাইতে হইলে কিছুটা প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও চর্চা করিতে হয়।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ছাত্রদিগকে কি ধরণের শিখ-অভিজ্ঞতা (Learning Experience) দিতে হইবে তাহার তালিকা রচনা করিতে হইবে। পাঠ্যক্রমকে বিষয় এবং পাঠকেন্দ্রিক না করিয়া অভিজ্ঞতা এবং কর্মকেন্দ্রিক করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম—মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়াই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ পক্ষে অগ্রসর দেশগুলিতে ঐ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া উহাকে প্রাথমিক স্তরের (Elementary) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। এতটুকু পর্যন্ত শিক্ষা না হইলে কাহারও সমাজ জীবনে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতাও হয় না এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অনুরূপ হইবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে ছয়টি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমেও ঐ ছয়টিকেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমের জন্য নিম্নলিখিত সাতটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব প্রথমেই হইতেছে ভাষা শিক্ষা, প্রাথমিক স্তরে, যাহাকে আমরা পঠন-লিখন বলিয়াছি, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তাহাই ভাষা আখ্যা পাইয়াছে। মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করাও এই স্তরে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। তবে ইংরেজীর ক্ষেত্রে কমিশনের এই মত যে, অভিভাবকদের আপত্তি থাকিলে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হইবে না। ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মাধ্যমিক স্তরে হিন্দি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাহাদের ইংরেজী শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

তারপরে কমিশন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies), সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত, চারুকলা ও সঙ্গীত, কুটির শিল্প এবং শারীরিক শিক্ষার (Physical Education) নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সাধারণ ও প্রকৃত বিজ্ঞান যোগ করিলেই নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম পূর্ণাঙ্গ হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন এবং ঐ ধরণের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা অনুসরণ করিয়া, অল্ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন (All India Council of Secondary Education), একাদশ শ্রেণী বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি "আদর্শ" পাঠ্যক্রম রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ ঐ পাঠ্যক্রম ভিত্তি করিয়া আপন একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি নিজস্ব পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছেন।

পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলিকে বাধ্যতামূলক (Core) এবং ঐচ্ছিক (Elective) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমেই (ক) ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, নেপালী বা উর্দুর মধ্যে একটিকে "প্রথম ভাষা" (First Language) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) হইবে ইংরেজী (যাহারা প্রথম ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা করে নাই, তাহাদের জন্য) বা বাংলা (যাহারা প্রথম ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছে)। হিন্দী, বাংলা বা সংস্কৃত, অথবা আরবী, ফারসী এবং ল্যাটিনের মধ্যে যে কোন একটিকে তৃতীয় ভাষা হিসাবে লইতে হইবে (কিন্তু একই ভাষাকে দুইবার লওয়া চলিবে না)। তবে তৃতীয় ভাষাটি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত নহে। তিন বৎসরের পরিবর্তে, দুই বৎসর ঐ ভাষাটি পড়িবার নির্দেশ আছে এবং পাঠ শেষে বিদ্যালয়ই এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া নম্বর সেকেণ্ডারী বোর্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

(খ) তিনটি ভাষা ব্যতীত, সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies), সাধারণ বিজ্ঞান, এবং প্রাথমিক গণিত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পাঠ করিতে হইবে।

(গ) ১২টি কুটির শিল্পের (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ৯টি শিল্পের নাম উল্লেখ করেন) মধ্যে একটি শিল্পকে (যান্ত্রিক বিষয়—Technical, বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, Workshop practical অবশ্যই কুটির শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে) বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা

হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, "খ" এবং "গ"এ উল্লিখিত কোন বিষয়ই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে। তিন বৎসরের পরিবর্তে দুই বৎসর ধরিয়া ঐ বিষয়গুলি পঠিত হয়, এবং বিদ্যালয়ই নিজ নিজ ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।

ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটির নাম উল্লেখ করিয়া, ইহাদের মধ্যে একটি বাছিয়া লইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে:—

(i) Humanities, (ii) Science, (iii) Technical, (iv) Commerce, (v) Agriculture, (vi) Fine Arts, (vii) Home Science. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন ছেলে স্কুলে Home Science এবং কোন মেয়ে স্কুলে, Technical ও Agriculture গ্রহণের সুযোগ নাই। প্রত্যেকটি ঐচ্ছিক বিষয়ের আবার কয়েকটি করিয়া বিভাগ আছে; ঐ বিভাগগুলির যে কোন তিনটিকে পাঠের বিষয় হিসাবে ছাত্রদের বাছিয়া লইতে হয়। যাহারা Humanities গ্রহণ করিবে তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইবে।

অধুনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (১০ম শ্রেণী) পাঠ্যক্রমও, একই নীতি অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে; শুধু পাঠের সময় এক বৎসর কম বলিয়া, পাঠের বিষয় ও পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে।

বর্তমান পাঠ্যক্রমের গুণাগুণ—আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যে পাঠ্যক্রম রচনার বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমেই পাঠ্যক্রমে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির প্রবর্তন এবং উহাদের বৃত্তিনির্ভর করার উদ্দেশ্য হইল, পাঠশেষে ছাত্রদের সরাসরি সমাজে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ না পাইলেও, তাহারা তাহাদের শিক্ষাকে ব্যর্থ মনে না করে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছিল সম্পূর্ণভাবে উচ্চ শিক্ষা-নির্ভর। উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আধুনিক পাঠ্যক্রমে, মাধ্যমিক শিক্ষা যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের স্বয়ং নির্ভরত্ব স্বীকার

পাঠ্যক্রম রচনাকালে সাধারণ শিক্ষা (General Education) এবং বিশেষজ্ঞের শিক্ষা (Specialised Education) উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সমাজে সার্থক নাগরিকরূপে জীবন-যাপন করিতে হইলে যে সব বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহের প্রয়োজন, বা যে সব বিষয় বিশেষ করিয়া চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে, সকল ছাত্রেরই (বিশেষ বিষয় বা Field of Specialisation নিরপেক্ষভাবে)। বাধ্যতামূলকভাবে ঐ সব বিষয় পাঠ করা প্রয়োজন। ইহার ফলে ব্যক্তি এবং সমাজ, উভয়েরই কল্যাণ হয়। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ। অপর দিকে, বর্তমান বিশেষজ্ঞের যুগে, কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিলে, জীবিকা অর্জন কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এবং জ্ঞানেরও পূর্ণতা হয় না। অপর দিকে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অন্তর্নিহিত শক্তির পার্থক্য থাকার দরুণ, সকলে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভে সমান দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে না। তাই পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার সহিত, বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা নীতিগতভাবে প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে Core subjects-এর মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা এবং Elective subjects-এর মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা উভয়ের ব্যবস্থা

পাঠ্যক্রম রচনাকালে ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতার নীতিও রক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষাকে ছাত্রদের আগ্রহ ও ক্ষমতার অনুকূলে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এত দিন শুধু যাহাদের ভাষা বা গণিতের ক্ষেত্রে দক্ষতা আছে তাহারা নিজেদের ক্ষমতা এবং আগ্রহের অনুকূলে শিক্ষা পাইতে পারিত ; কিন্তু বর্তমানে ঐ সুযোগকে যান্ত্রিক, কৃষি, চারুকলা প্রভৃতি আরও পাঁচটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে, ঐ ধরণের পাঠ্যক্রমের ভিতর দিয়া ছাত্রদের বিভিন্নমুখী অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সম্যক বিকাশ হইবে।

ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতার নীতির স্বীকৃতি

সমাজের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াই, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী রচিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে তিনটি—
১। আমাদের দেশে যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা

হ্রাস করা। মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ না থাকায় এবং উহা উচ্চ শিক্ষা-নির্ভর হওয়ার দরুণ, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে, যে সব ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত, তাহাদের বেকার হইয়া কেরানীগিরির দরখাস্ত করা ছাড়া উপায় ছিল না। নূতন পাঠ্যক্রম কিছুটা বৃত্তিভিত্তিক হওয়ায়, আশা করা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে ছাত্রেরা কেরানীগিরি ব্যতীত, অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে। ২। উচ্চ শিক্ষায় প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র ব্যতীত অপরের ভিড় কমানোও আমাদের প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার পর, অন্য কোন পথ না পাইয়া, যে সব ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা লাভের যোগ্যতা নাই, তাহারাও উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রার্থী হয়। ফলে একদিকে, উচ্চ শিক্ষায় মানের অবনতি ঘটে, অপর দিকে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৃত্তি-নির্ভর করার চেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা শেষে অধিকাংশ ছাত্রই, নিজ নিজ বিশেষ শিক্ষা অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমাজ জীবনে প্রবেশ করিবে এবং কেবল মাত্র বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অল্পসংখ্যক ছাত্র উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হইবে।

৩। পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষিত লোকের অভাব দূরীকরণ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি গ্রহণের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিভিন্নমুখী (Multifaced) হইয়া পড়িয়াছে। কারিগরি, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক লোকের আমাদের প্রয়োজন—তাহা না হইলে আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হইতে পারিবে না। তাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

৪। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনাগরিক গড়িয়া তোলার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা-কালে ইহার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখ করিতে হয়। কুটিরশিল্প শিক্ষার মাধ্যমেও,

হাতের কাজকে যথাযথ মর্যাদা দান, প্রভৃতি গণতন্ত্রে প্রয়োজনীয় কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পাঠ্যক্রমের দোষ-ত্রুটি—দুঃখের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে গিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচয়িতাগণ গুরুতর ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটি কারণ হয়ত এই যে, পাঠ্যক্রম রচনার দায়িত্ব প্রধানতঃ পড়িয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপর, যাঁহারা শিক্ষাবিজ্ঞানী নহেন (অর্থাৎ ইঁহারা বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জীবন ব্যয় করেন নাই)। ফলে অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ইঁহারা পাঠ্যক্রম রচনার বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে সার্থক প্রয়োগে সক্ষম হন নাই।

১। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাদিগকে যথাযথভাবে পাঠ করিতে হইলে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির জন্য আর সময় বেশী থাকে না। তারপর যেসব ছাত্র Humanities ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাদের সমাজ-বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক পাঠ্য করার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না; অপর দিকে যাহারা বিজ্ঞান বা যান্ত্রিক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সাধারণ গণিত বা সাধারণ বিজ্ঞান, বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে পড়িবার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনটি ভাষা (যাহারা Humanities ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্য ৪টি ভাষা) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় ছাত্রদের উপর যে অধিক চাপ পড়িয়াছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। তারপর বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির পাঠ্যক্রমগুলির বাস্তব নির্ভর না হইয়া, তত্ত্ব নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা ব্যতীত, বাধ্যতামূলক অপর সকল বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃক আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করার দরুণ, ঐসব বিষয়ের পঠন-পাঠন বিদ্যালয়ে যথাযথরূপে হইতেছে না। কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিই বিদ্যালয়ে এবং ছাত্রদের নিকট পঠনীয় বিষয় হিসাবে যথাযথ গুরুত্ব পাইয়া থাকে।

৩। ঐচ্ছিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বপ্রধান বক্তব্য এই যে, উহাদের পাঠ্যক্রম ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত হইয়াছে, ঐ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া পাঠ শেষে কোন ছাত্রেরই সরাসরি বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। পাঠ্যক্রম পূর্বেরই মত তাত্ত্বিক রহিয়া গিয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। পাঠ শেষে ছাত্রদের কলেজের দরজায় পূর্বের মতই ভিড় জমাইতে হয়, নয়ত বেকার হইয়া কেরানীগিরির দরখাস্ত করিতে হয়।

৪। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা যখন, বৃত্তি অভিমুখী না হইয়া, পূর্বের মত কলেজে প্রবেশদানকারী শিক্ষা রূপেই রহিয়া গেল, তখন সাতটি ঐচ্ছিক বিষয় (7 streams) প্রবর্তনের কোন মনস্তাত্ত্বিক বা ব্যবহারগত যৌক্তিকতা দেখা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলী (abilities) ঐরূপ সাত ভাগে ভাগ করিবার সপক্ষে কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। কলেজে প্রবেশ করিয়া বিভিন্নমুখী তাত্ত্বিক বা কার্যকরী শিক্ষালাভের জন্যও ঐসব বিষয়ের অনেকগুলিরই প্রয়োজন দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেই, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, কৃষিকলেজে এবং গার্হস্থ্য বিদ্যা শিক্ষার কলেজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, ইহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে, যথাক্রমে যান্ত্রিক বিষয়, কৃষি বিদ্যা বা গার্হস্থ্য বিদ্যা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

৫। অবৈজ্ঞানিক পাঠদান-পদ্ধতি, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্য-পুস্তক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে, একেবারে অচল করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) পাঠ্য বিষয় হিসাবে প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছাত্রদের তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করা নহে—ব্যবহারগত জ্ঞানদান এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যথাযথ মনোভাব গঠন। কিন্তু পাঠদান কালে এবং পরীক্ষা গ্রহণের সময় তত্ত্ব মুখস্থ করার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সংস্কারের ইঙ্গিত— এই পাঠ্যক্রম সংস্কারের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। প্রথমেই, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুই ধারার পাঠ্যক্রম

প্রবর্তন করিতে হইবে (এই দুই ধারার পাঠ্যক্রম, একই বিদ্যালয়ে বা দুই বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইতে পারে)। এক ধরণের পাঠ্যক্রম ছাত্রদের বৃত্তিশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে ; অপর ধরণের পাঠ্যক্রম তাহাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে।

২। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকারী পাঠ্যক্রমে ৪টির বেশী (Humanities, Science, Commerce, Fine Arts) ঐচ্ছিকের বিষয় থাকার প্রয়োজন নাই।

৩। তিনটি ভাষা (বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী) পাঠ আবশ্যিক না করিয়া উপায় নাই বটে, তবে প্রত্যেক ভাষা পাঠের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করিয়া, আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে এতগুলি ভাষা শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব না হইয়া দাঁড়ায়।

৪। সমাজ-বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও সাধারণ গণিতকে একটি ব্যবহারিক বিষয়ে পরিণত করিয়া, "সুনাগরিকত্ব শিক্ষা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে আবার দুই ধরণের পাঠ্যক্রম হইবে—এক ধরণের পাঠ্যক্রম Science-এর ছাত্রদের জন্য এবং অপর ধরণের পাঠ্যক্রম Humanities Commerce ও Fine Arts-এর ছাত্রদের জন্য।

৬। প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যক্রম রচনার পূর্বে ঐ বিষয় পাঠের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট বা স্থির করিয়া দিতে হইবে এবং ঐসব উদ্দেশ্য পাঠের দ্বারা সার্থক হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে, কোন বিষয় কিভাবে পড়াইতে হইবে, তাহার কিছুটা ইঙ্গিতও পাঠ্যক্রমে থাকিতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা—পূর্বে আমাদের দেশে, ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৫ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষার রীতি ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি এক বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ৬ বৎসর হইয়াছে, এবং কলেজের শিক্ষা (ডিগ্রি লাভ পর্যন্ত) এক বৎসর কমিয়া তিন বৎসর হইয়াছে।

এই নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে এবং অনেকে পূর্ব ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইবার পক্ষপাতী। নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত হইয়া থাকে—

১। যথোপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের অভাবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে, এত দিন পর্যন্ত কলেজ যে শিক্ষাদান করিত, তাহার দায়িত্ব লওয়া সম্ভব নহে। নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। ফলে, উচ্চ শিক্ষাও সুচারুরূপে দেওয়া চলিতেছে না।

২। পূর্বে দুই বৎসরে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার কাল মাত্র এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া তাহা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। ফলে অতি অল্প বয়স হইতে (নবম শ্রেণী) ছাত্রদের দুরূহ বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা নানা দিক হইতে ক্ষতির কারণ হইতেছে।

৩। সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে, দূর ভবিষ্যতেও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার ক্ষমতা যে আমাদের হইবে, সেই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কোন কোন বিদ্যালয় দশম শ্রেণীই থাকিয়া যাইবে এবং কোন কোনটিকে একাদশ শ্রেণীতে পরিণত করা হইবে, ইহা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে।

তাই, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া, পুনরায় দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইতে অনেকে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি চালু রাখিবার পক্ষেও অনেক যুক্তি রহিয়াছে—

১। বর্তমানে জ্ঞানের পরিধি যতটুকু বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে ১০ বৎসরের শিক্ষা দ্বারা, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর শেষ করা সম্ভব নহে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে, অধিকাংশ ছাত্রই সমাজ জীবনে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু ১০ বৎসরের শিক্ষার দ্বারা তাহাদের বর্তমান জটিল সমাজ ব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে ; ঐ শিক্ষার সাহায্যে তাহাদের যথাযোগ্য বৃত্তি পাওয়াও সম্ভব নহে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ; সাধারণ সকল ক্ষেত্রে ইহারাই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যদিও আধুনিক সমাজে সর্বাধিক, তথাপি ঐ বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া বর্তমান সমাজে নেতৃত্ব করা সম্ভব নহে, সাধারণভাবে এ কথা বলা যাইতে পারে। অপরদিকে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, জ্ঞান ও গবেষণার

ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিলেও সংখ্যাল্পতার জন্য, গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ নেতৃত্ব তাহাদের হাতে থাকিতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইতে দেশের নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইলে, ঐ শিক্ষার কাল কিছুটা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। তবে মাত্র এক বৎসর শিক্ষাকাল বৃদ্ধি করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। এখন অনেকেরই মত এই যে, আরও এক বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি, দ্বাদশ বার্ষিক বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক।

৩। আমাদের দেশে নিতান্ত অল্প বয়সে ছাত্রদের পাঠ আরম্ভ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ফলে দশম বর্ষ শেষে, ছাত্র যখন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া, কলেজের শিক্ষা আরম্ভ করে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসরের বেশী হয় না। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত মনের বিকাশ এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তি তখনও তাহার গড়িয়া উঠে না। ফলে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার মান ক্রমাগত নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু, কলেজের স্বাধীনতা এবং শিক্ষা পদ্ধতিও, তাহাদের বয়সের উপযুক্ত নহে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, মাধ্যমিক শিক্ষার কাল বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

৪। রাধাকৃষ্ণান্ কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বলতর স্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের কোন সামাজিক মর্যাদা নাই—তাহারা সমাজে অবহেলিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নত নহে এবং তাহাদের বেতনও অতি অল্প। এই অবস্থা হইতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে উদ্ধার করিবার জন্যও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবর্তনের প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের পর হইতেই, শিক্ষকের যোগ্যতার মান, তাহার বেতন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

৫। ৫ বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া, কলেজের শিক্ষা (ডিগ্রি লাভের প্রস্তুতি) আরম্ভ করিবার পূর্বে, দুই বৎসরের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট্ শিক্ষার একটি স্তর গড়িয়া তুলা নিতান্তই কৃত্রিম। এই স্তরের শিক্ষা চলিতে দেওয়া হইলেও ইহা উচ্চ শিক্ষার স্তর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

স্বাভাবিক নিয়মেই এই দুই বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা পদ্ধতি ইণ্টারমিডিয়েট্ স্তরের ছাত্রদের যে অধিকতর উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা বলিতে পারি যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া: আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাস্তবে রূপায়িত করিতে গিয়া যে সব ত্রুটি ঘটিতেছে এবং যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহা দূর করা কিছু অসাধ্য নহে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণী না রাখিয়া, বরং দ্বাদশ শ্রেণী করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অধুনা গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা দুই ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা অনুমোদন করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে কোন ছাত্র ৫ বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তাহার স্বীকৃতির জন্য পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ, আবার আরও দুই বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা চালাইয়া, পরীক্ষায় উপকৃত হইতে পারে। এই দুই বৎসরের শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা কলেজ, উভয় স্থানেই হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, একাদশ বর্ষ বিদ্যালয়গুলি দ্বাদশ বর্ষ বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে এবং কলেজে P. U. ক্লাশ থাকিবে না।

ইণ্টারমিডিয়েট্ শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তন সম্বন্ধে মতামত—১০ম শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াই উচ্চ শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করা বর্তমানে প্রায় সকলেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকের মতে, ১০ম শ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করার পর, উচ্চ শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজে, আরও দুই বৎসর পড়া প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশে, বহুদিন পূর্ব হইতেই ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ স্থাপিত রহিয়াছে এবং ভারতের সর্বত্রই, ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হইবার পূর্বে, কলেজে দুই বৎসরের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট্ শিক্ষার ব্যবস্থা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে ছিল। কাজেই ইণ্টারমিডিয়েট্ শিক্ষা প্রবর্তনের অর্থ হইল পূর্ব ব্যবস্থায় পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া। গতানুগতিকের প্রতি জনসাধারণের চিরকালই আকর্ষণ রহিয়াছে—অধিকাংশ মানুষই বিগত জীবনের

মোহে মুগ্ধ—আমি যেভাবে শিক্ষা করিয়াছিলাম তাহাই ভাল এবং আমার সন্তানও অনুরূপভাবে শিক্ষা লাভ করুক। অপরদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের যাহারা কর্ণধার, তাহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষার চর্চা করিয়াছেন। তাহাদের প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা স্বল্প। ফলে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার প্রবর্তনের সম্ভাবনা খুবই বেশী রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ব্যবস্থার সপক্ষে বলা হয় যে, ইন্টারমিডিয়েট স্তর পড়াইবার মত যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাওয়া সম্ভব নহে। এই স্তরে কলেজের শিক্ষকগণ না পড়াইলে শিক্ষার মান নীচু হইয়া পড়িবে।

কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক যদি কলেজের জন্য পাওয়া যায়, তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া যাইবে না কেন? কলেজের সংখ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইতে অনেক অল্প বটে, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাস্তর যদি মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ শিক্ষা যদি কলেজে দিতে হয় তবে প্রচুর পরিমাণে কলেজ আমাদের স্থাপন করিতে হইবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। তারপর, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ দুই বৎসর (ইন্টারমিডিয়েট স্তর) যে শুধু উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইবে, এমন নহে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুই বৎসর বৃত্তি শিক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া হইবে। তাই কলেজে ঐ দুই বৎসরের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, কলেজগুলির দৃষ্টিভঙ্গীই পৃথক—উহারা শুধু উচ্চ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে। "ইন্টারমিডিয়েট" অর্থাৎ "মধ্যবর্তী", এই নামটাই আপত্তিকর। ঐ দুই বৎসরের শিক্ষা, বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তর নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া এই শিক্ষাস্তরের উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ না করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আমরা ঐরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছি। তারপর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি (Lecture method) এবং শৃঙ্খলা (পূর্ণ স্বাধীনতা) একটু বয়স না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের উপযুক্ত

বলিয়া বিবেচিত হয় না। সব চাইতে বড় কথা, মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ স্তরটি বিদ্যালয়ে না রাখিলে, বিদ্যালয়ের এবং উহার শিক্ষকের মর্যাদা উন্নততর হইবে না এবং বিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষক (সে দশম বর্ষ বিদ্যালয়ই হউক) আমরা কখনও পাইব না। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর হইতে, আমরা দেখিতেছি যে, অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে খণ্ডিত করিয়া, বিদ্যালয় হইতে উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া, কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন করা ভ্রান্তিমূলক হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অধুনা স্থাপিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মাধ্যমিক শিক্ষার অতিরিক্ত দুই বৎসর বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার পরামর্শই দিয়াছেন। অবশ্য ঐ কমিশন সাধারণ ছাত্রদের জন্য ১০ম বর্ষ বিদ্যালয়ই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অপর দিকে পি. ইউ. শ্রেণী তুলিয়া দিয়া তাহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে বলিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা শিক্ষা সমস্যা—মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা শিক্ষা সমস্যা বেশ জটিলরূপ ধারণ করিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন দুইটি মাত্র ভাষা শিক্ষার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ তিনটি ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহারা "মানবিকতা"কে বিশেষ বিষয়রূপে পাঠ করিবে, তাহাদের জন্য চারিটি ভাষা (সংস্কৃতসহ) শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। ভাষা শিক্ষা সমস্যা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইদানীং হিন্দীকে কার্যকরীভাবে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করা লইয়া যে আন্দোলন হইয়া গেল, ইহার পরিসমাপ্তিতেও, ইহাই স্থির হইয়াছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রকে, মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী এবং হিন্দী (হিন্দী ভাষা-ভাষীদিগকে হিন্দীর পরিবর্তে আধুনিক ভারতীয় একটি ভাষা শিখিতে হইবে) এই তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত মীমাংসা কতখানি যুক্তিসহ, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা

যাক। মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা যে শিক্ষণীয় ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত কি না, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত, ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য, কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইতে পারে। আমাদের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে, বর্তমানে ইহা সম্ভব নহে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া অনার্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা) অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনও ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করিতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে যে সব ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে না, তাহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন কি? কিন্তু মুস্কিল এই যে, যে সব ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহাদের সকলেরই উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা থাকে, অধিকন্তু, মাধ্যমিক শিক্ষার আরম্ভেই, কে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত, সে বিষয়ে স্থির করা কঠিন। তারপর আমাদের দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ইংরেজীর প্রয়োজন এতখানি রহিয়াছে যে, কিছুটা ইংরেজী না জানিলে, ঐসব ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের মনে হয় যাহারা হিন্দী ভাষাভাষী নহে, তাহাদের জন্য, ইংরেজী আরও বেশ কিছুদিন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রহিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু যে সব ছাত্রের নিকট ইংরেজী শিক্ষা দুরূহ, যাহারা হয়ত উচ্চ শিক্ষার চেষ্টা করিবে না বলিয়া মন স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজী শিক্ষা করিতে বাধ্য করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার অর্থ এই যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অগ্রসর ও অনগ্রসর এই দুই ধরণের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাহারা অগ্রসর ধরণের ইংরেজী গ্রহণ করিবে না, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

মাতৃ-ভাষা ও ইংরেজীর স্থান স্বীকৃত হইলেও, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দীর স্থান লইয়া মতানৈক্য এখনও রহিয়াছে। হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভাষাকে বাধ্যতামূলক না করা হইলে, বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা কখনও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইবে না। তাই, অল্প

দিন পূর্বের ভাষা আন্দোলনের পর, হিন্দীকে বাধ্যতামূলক ভাষারূপে গ্রহণ করিতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত ইত্যাদি) শিক্ষারও প্রয়োজন রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন ভাষার (সংস্কৃত) উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা না করিলে, ভারত তাহার ধর্ম ও ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। তারপর, চরিত্র গঠনের নিমিত্তও সংস্কৃত শিক্ষা অপরিহার্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাই বাংলাদেশে মানবিকতা পাঠরত ছাত্রদের জন্য একটি প্রাচীন ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

কিন্তু, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে অন্যান্য বিষয় যথাযথভাবে পাঠ করিয়া, এক সঙ্গে কয়টি ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব? অধিকাংশ দেশেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাতৃভাষা এবং অপর আর একটি ভাষা লইয়া, দুইটি ভাষা শিক্ষার নজির রহিয়াছে; সুইজারলেণ্ডে তিনটি ভাষা শিক্ষার নজির আছে বটে, কিন্তু, চারিটি ভাষা শিক্ষার গুরুভার ছাত্রদের মাথায় চাপাইয়া দিলে ইহা যে তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া, ইহাদের মধ্যে তিনটি ভাষাই যখন ছাত্রের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কথ্য ভাষা প্রচলিত নহে। অধিকন্তু ভাষা শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক এবং পাঠ্য-পুস্তকের আমাদের একান্ত অভাব এবং ভাষা শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও আমরা অবগত নহি। এই অবস্থায় প্রাচীন ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন মনে হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, প্রাচীন ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির বিধিবদ্ধভাবে অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি আমাদের তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে, কোন্ ভাষা কখন শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে এবং কতদিন ধরিয়া ঐ শিক্ষা চলিবে, ইহা লইয়াও সমস্যা দেখা দিবে। এই বিষয়ে দুইটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—১। একটি ভাষা মোটামুটিভাবে শিক্ষা শেষ করিবার পূর্বেই অপর ভাষা শিক্ষাদান আরম্ভ করিলে, ভাষা-শিক্ষাই ব্যাহত হয়। ২। আবার অন্ততঃ ৩।৪ বৎসর শিক্ষা না করিলে, কোন ভাষাই কার্যকরীভাবে শিক্ষা করা সম্ভব নহে।

বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক পাঠ্যক্রম (Vocational and liberal Curriculum)—আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁহারা কোন বৃত্তির (Vocation) জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। আবার এমন অনেক শিক্ষাবিদ্‌ও আছেন যাঁহারা ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করেন। পাঠ্যক্রম রচনাকালে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোম সর্বত্রই পাঠ্যক্রম ছিল বিশেষভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকারী। ছাত্রদিগকে এমন সব বিষয় পাঠ করিতে হইত এবং এমন সব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইত যাহাতে বিশেষভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয় এবং চরিত্র গঠিত হয়। বর্তমান যুগে শিক্ষা সর্বজনীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাজ-জীবনে বৃত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক অনুভূত হওয়ার দরুণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বর্তমান সমাজে বৃত্তিগুলিও অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রস্তুত না হইলে একটু উন্নততর বৃত্তিগুলির জন্য কাহারও যোগ্যতা জন্মায় না। তাই মাধ্যমিক স্তর হইতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরে সম্পূর্ণরূপে বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে জুনিয়র টেকনিকেল স্কুল ও পলিটেকনিক-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধুনা স্থাপিত বহুমুখী (Multilateral) বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য যদিও "সাধারণ শিক্ষাদান" (General Education) তথাপি উহারাও ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করে। বহুমুখী বিদ্যালয়ের "বিশেষ পাঠ্য" সাতটি বিষয়ের সব কয়টিই ছাত্রকে বৃত্তি অভিমুখী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে ইহা কেহই অস্বীকার করেন না।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন

এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার দরুণ পাঠ্যক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় দিন দিনই অধিকতর অবাস্তব বোধ হইতেছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের

সহিত বর্তমান যুগের বৃত্তিগুলির নিকটতম সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার পাঠের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইতেছে। যতশীঘ্র সম্ভব সাধারণ বিষয়গুলির পাঠ শেষ করিয়া বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি পাঠ আরম্ভ করিতে সর্বত্র চেষ্টা চলিতেছে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশকারী বিষয়ের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুতকরণ যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য একথা আমরা অস্বীকার করি না। সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিলে, সর্বাগ্রে নিজেকে কোন বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাও সত্য। শিক্ষিত বেকারগণ সমাজজীবনে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেন সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। আমাদের দেশের সকল স্তরের পাঠ্যক্রমই যে কিছুটা বৃত্তি অভিমুখী হইবে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

অপরদিকে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তি শিক্ষাদান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা আমরা অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষ প্রস্তুত করিতে চাহি না। মানুষের জীবনের সুখ, তৃপ্তি, সার্থকতা শুধু অর্থোপার্জনের উপর নির্ভর করে না। কেবলমাত্র জাতীয় সম্পদ (National wealth) বৃদ্ধি করিতে পারিলেই জাতি উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিবে এমন কোন কথা নাই। পরন্তু অর্থোপার্জন ব্যক্তি বা সমাজজীবনের পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্র—উহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র, মূল উদ্দেশ্য নহে। আত্মোন্নতি, শান্তি-তৃপ্তিই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত কাম্য ; সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশই সামাজিক উন্নতির প্রকৃত নিদর্শন। প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়াও মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি যদি জাগ্রত না হয়, তাহার চারিত্রিক গুণাবলী যদি বিকশিত না হয়, পরিবার এবং সমাজজীবনে সে যদি নিজের সহিত অপরের সম্বন্ধ মাধুর্যময় করিয়া তুলিতে না পারে তাহা হইলে তাহার জীবনে শান্তি, তৃপ্তি থাকিতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। অর্থোপার্জন মানুষের সমাজজীবনের অনেক-গুলি কর্মের মধ্যে একটিমাত্র ; শুধু অর্থোপার্জনের দ্বারাই সে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিতে পারে না—কেবলমাত্র অর্থোপার্জন করিতে পারিলেই সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্যের শেষ হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে অনেক পূর্ব হইতেই পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে এবং ইহার ফল ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও পক্ষে শুভ হয় নাই। মানুষ

গড়িয়া তোলাই যে শিক্ষার সর্বপ্রধান কাজ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

তবে বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, তাহা যে অনেকখানি কৃত্রিম ইহাতে সন্দেহ নাই। এমন কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই, যাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক নহে। যে নিতান্ত মোটর মিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা করিতেছে, তাহারও কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সৃজনীশক্তি ও বুদ্ধির চর্চা, যান্ত্রিক জ্ঞান বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশমূলক শিক্ষা হইতেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টি দ্বারা না দেখিলেই ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক শিক্ষায় পরিণত হইতে পারে।

অপরদিকে এমন কোন ব্যক্তিত্ব বিকাশমূলক শিক্ষা নাই যাহা, বৃত্তি লাভে একেবারেই সাহায্য করিবে না। যে ছাত্র চারুকলা বা সাহিত্য শিক্ষা করিতেছে সেও তাহার শিক্ষার সাহায্যে শিল্পী বা সাহিত্যিকের জীবিকা গ্রহণ করিতে পারে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অতিরিক্ত যান্ত্রিক না করিলে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক শিক্ষাতে সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত না হইলেই, উভয় ধরণের শিক্ষাই ক্রটিহীন হয়।

প্রয়োজনবোধে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সহিত কিছুটা ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক শিক্ষাকে যোগ করিতে হয় এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশমূলক শিক্ষায় বৃত্তির দিকে কিছুটা দৃষ্টি রাখিতে হয়। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কতখানি স্থান পাইতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তি শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমে সরাসরি বৃত্তি শিক্ষা-দানের কোন স্থান থাকিতে পারে না। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিশিক্ষা করিবার জন্য শারীরিক বা মানসিক যোগ্যতা জন্মায় না। প্রাথমিক শিক্ষার পর যেসব ছাত্র সরাসরি সমাজজীবনে প্রবেশ করে তাহারা কোন জটিল বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা যে ধরণের বৃত্তি গ্রহণ করে শিক্ষানবিসীর দ্বারাই তাহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া চলে। তাই বৃত্তি শিক্ষাদান এমন কি, ভবিষ্যৎ বৃত্তির গোড়াপত্তন করাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করার লক্ষ্য হইতে পারে না। ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাহাদিগকে

কোন "বিশেষ বিষয়" (বৃত্তিমূলক বিষয়) শিক্ষাদানের চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। সর্বপ্রথমে শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রদিগকে ব্যক্তিত্ববিকাশের পথে অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, তাহাদের চরিত্রের ভিত্তি গঠন করিয়া দিতে হইবে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত নিম্নতম যোগ্যতা অর্জন করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সংক্ষেপে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন স্থান নাই। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্প শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয় তাহা বৃত্তিশিক্ষা নহে। এখানে শিল্প শিক্ষার মাধ্যম মাত্র। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা দানের চেষ্টা করা হয়।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু মাধ্যমিক (বা উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষাস্তরে ছাত্রের ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতে হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে (মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের কাল) নিজেদের ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের, বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠা বোধ করে। এই বয়সে মানুষের অন্তর্নিহিত বিশেষ ক্ষমতা এবং আগ্রহ রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তি শিক্ষা

তাই ছাত্রের শিক্ষা বৃত্তি অভিমুখী করিবার নিমিত্তই আমাদের বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে "বিশেষ বিষয়"গুলি পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নহে। ছাত্রদের ব্যক্তিত্ববিকাশই বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তাই "কোর" (Core) বিষয়গুলির উপর পাঠ্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "পেরিফেরি" (Perephery)-র অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির (বিশেষ বিষয়) পাঠ্যক্রমও এমন নহে যাহাতে কোন বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা জন্মায়; ঐসব বিষয় "পাঠ" দ্বারা কতকগুলি বিশেষ ধরণের বৃত্তির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ জন্মানোই পাঠ্যক্রম রচনার লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে ছাত্র বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিল্পকে (Technical) বিশেষ বিষয়রূপে পাঠ করিতেছে সে ইঞ্জিনিয়ার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছে না; বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তি আছে তাহাদের কোনটির জন্য ভবিষ্যতে সে হয়ত প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিবে ইহাই মাত্র আশা করা যাইতেছে। এমন কি মাধ্যমিক

শিক্ষাশেষে সে যদি কোন ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তিই না গ্রহণ করিতে চায় তবে সে অন্য কোন ধরণের বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিতে পারে।

সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয়ও আমাদের মাধ্যমিক স্তরে আছে (Polytechnique, Junior Technical School etc.)। কিন্তু ঐসব বিদ্যালয়ও আত্মোন্নতিমূলক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না—প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগকে বৃত্তি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতিমূলক বিষয়গুলির (ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি) শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। এমন কি ছয় মাসের জন্য যেসব ট্রেড কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় ঐগুলিতেও আত্মোন্নতিমূলক বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষালাভের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান শব্দের অর্থ—মানুষ যখন পরস্পরের চাহিদা (needs) মিটাইবার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখনই হয় সমাজের সৃষ্টি। প্রত্যেক সমাজেই এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ "মিলনক্ষেত্র" গড়িয়া উঠে। ঐ মিলনক্ষেত্রগুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান (social institution) আখ্যা দেওয়া হয়। ধরা যাউক, পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষের পারস্পরিক চাহিদার (needs) ভিত্তিতে ইহার প্রথম সৃষ্টি। সন্তান-সন্ততির জন্মের পর হইতে ইহার পরিধি বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সকল সভ্যই পরস্পর পরস্পরের কোন না কোন চাহিদা নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। "ক্লাব"কে আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা যাইতে পারে—এখানে মোটামুটি একই ধরণে অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে সভ্যরা পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের চাহিদা নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করেন। সকল সমাজে যে একই ধরণের "মিলনক্ষেত্র" বা প্রতিষ্ঠান থাকে এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সকল সমাজে পরিবারের গঠনভঙ্গী একরূপ নহে (মাতৃপ্রধান, পিতৃপ্রধান পরিবার ইত্যাদিতে বিভিন্নতা রহিয়াছে)। সমাজ নিজ প্রয়োজনে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া থাকে,—যেমন কিছুদিন পূর্বে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠান হিসাবে "ক্লাবের" অস্তিত্বও ছিল না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা—প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্জাত হয় তাহা হইতেই আমরা শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। কাজেই প্রত্যেকটি সামাজিক মিলনের ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রও বটে। সুশিক্ষাই হউক আর কুশিক্ষাই হউক মানুষ যখন পরস্পরের প্রয়োজনে পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহার শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া নিষ্কৃতি নাই। ধরা যাউক "বাজার" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান; এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা একত্র মিলিত হইয়া

(নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত) সহজেই দরকষাকষি শিক্ষা করিয়া থাকে। সমাজের সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিলেও ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর সমাজ শিক্ষা বিষয়ে বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়—এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিদ্যালয় সর্বাগ্রগণ্য। সমাজে বিদ্যালয়ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা কেবলমাত্র শিক্ষার দাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের বিবর্তন—বিদ্যালয়ের বিবর্তনে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম বিদ্যালয় সমাজের বাস্তব প্রয়োজনে, মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিগত প্রেরণায় শিক্ষার্থীরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিত। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, উহা স্থাপন এবং পরিচালনের ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম প্রথম দেখিতে পাই যে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিত, কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষা সার্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ্য বিষয়ের দিকে বিবেচনা করিলে, বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষারই প্রচলন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখা দেয়। তারপর, শিক্ষায়, সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন ইত্যাদির প্রাধান্য দেখিতে পাই। কিন্তু বর্তমানে সমাজ-জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়ের আদর বিদ্যালয়ে অধিক হইয়াছে। তাই বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং পেশাদারি শিক্ষার স্থানও বিদ্যালয়ে হইয়াছে।

সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি এবং উত্তরোত্তর সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি

প্রাচীনতম সমাজে বিদ্যালয় ছিল না। সমাজে বসবাসের ফলে সঞ্জাত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ ঘটিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু ভবিষ্যতে আপন পরিবারের বৃত্তিই গ্রহণ করিত এবং পরিবারে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহার বৃত্তিশিক্ষা হইত। সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতিও সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ হইত।

প্রাচীনতম সমাজে বিদ্যালয়ের অভাব

কখনও কখনও দলনেতা, গ্রাম বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা এবং পুরোহিত, উপদেশের মাধ্যমেও শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেন।

বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়, সম্ভবতঃ লেখ্য ভাষার উদ্ভবের পরে। লেখা ও পড়ার কৌশল আয়ত্তকরণ সময়সাপেক্ষ—বিধিবদ্ধভাবে, দীর্ঘদিন ধরিয়া চেষ্টা না করিলে ঐ শিক্ষা সম্ভব নহে। তারপর লেখা আবিষ্কারের পর হইতে জ্ঞানের সঞ্চয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সব জ্ঞান আয়ত্ত করার নিমিত্তও বিধিবদ্ধ অনুশীলন প্রয়োজন। তাই শিক্ষাদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। হয়ত বা প্রাচীন মিশর বা প্রাচীন চীন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম গৌরব দাবী করিতে পারে। সে যাহা হউক মঠ-মন্দিরগুলিই প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের হাতেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন রহিয়া যায়। ভারতেও সুপ্রাচীনকালেই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং শিক্ষাদান প্রধানতঃ ব্রাহ্মণরাই করিতেন। বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত, বিদ্যালয়ের শিক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাই শিক্ষালাভের অধিকারী ছিলেন। যাহারা সাধারণ জীবিকা দ্বারা কালাতিপাত করিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের জন্য প্রয়োজনও ছিল না বা তাহাদের ঐ শিক্ষা গ্রহণের অবসরও ছিল না।

লিখন আবিষ্কারের পর বিদ্যালয়ের উদ্ভব

প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ

প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না—ছাত্রের শিক্ষা স্তর হিসাবে, প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়া হইত। বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক থাকিতেন না সাধারণতঃ একজন শিক্ষকই একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। রাজা, জমিদার এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা ছেলেদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষকও নিয়োগ করিতেন। বিদ্যালয় স্থাপনে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না।

প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক শিক্ষাদান

প্রাচীন ভারতবর্ষে আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের গুরুগৃহে বসবাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। শিক্ষাকালও ছিল সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর।

বিদ্যালয়ে আবাসিক রীতি গ্রহণ

ইউরোপে সর্বপ্রথম গ্রীসদেশে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিগণই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, সমাগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু গ্রীসের শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রাচীন মিশর বা ভারতের মত ধর্মনির্ভর না হইয়া সমাজ-নির্ভর ছিল। গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। গ্রীসের বিদ্যালয়গুলিকে আবার আধুনিক কালের মত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাগ করা চলিতে পারিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গ্রীসদেশে বিদ্যালয় অনেকটা আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীসেও শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। দাসেরা শিক্ষার সুযোগ পাইত না এবং বক্তা, যুদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন, নিম্নতর বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসে বিদ্যালয়

রোমক সাম্রাজ্যে বিদ্যালয়ের বিশেষ স্থান ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক রোমক শাসনকর্তা প্রস্তুত করণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। তাই রোমে, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায়, শিক্ষার তিন স্তরের জন্যই যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার নজির সর্বপ্রথম রোমক সাম্রাজ্যেই দেখা যায়। রোমক শাসক ও পৌর কর্তাগণ শিক্ষকদের সাহায্য করিতেন এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তাই রোমক বিদ্যালয়গুলিকে, অনেকাংশে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সব বিদ্যালয়েও ছাত্রেরা সাধারণতঃ আসিত জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের পরিবার হইতে। বিদ্যালয়ের পাঠের বিষয়বস্তুর সহিত সমাজের সাধারণ লোকের বৃত্তি বা জীবন সমস্যার সম্বন্ধ খুব অল্পই ছিল।

রোমে, রাষ্ট্রের পরিচালনায় বিদ্যালয়

মধ্যযুগে ইউরোপে শিক্ষার উপর ধর্মের প্রভাব খুবই প্রবল ছিল। ধর্মযাজক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাই তখন অধিক ছিল। ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। অপরদিকে মধ্যযুগে অনেকটা আধুনিক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষার সহিত দৈনন্দিন

মধ্যযুগের শিক্ষা

জীবনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। উচ্চ শিক্ষা, তর্কের জন্য অর্থহীন তর্ক করায় (Scholasticism) পর্যবসিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ জমিদার ও ধর্ম-যাজকগণই শিক্ষার সুযোগ লইতেন—সমাজের নিম্নতর স্তরের লোকেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসিত না।

কিন্তু আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে বিদ্যালয়ের রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষালাভের পিপাসা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত অনেক বিদ্যালয় দেখা দেয়। অধিক সংখ্যক সাধারণ শ্রেণীর লোক বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ লইতে আরম্ভ করার ফলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে, এমন কি অনেক বিদ্যালয়ে পেশাদারি শিক্ষারও প্রবর্তন হয়। রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, এমন কি, কোন কোন দেশে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে। অনেক দেশেই রাষ্ট্র অন্ততঃ কিছুটা শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে। সর্বশেষে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসার

এইরূপে ধীরে ধীরে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বিবর্তন আজও শেষ হয় নাই। সমাজের সহিত বর্তমানে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ার ফলে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের রূপেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের রূপেরও গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। প্রতি সভ্য দেশেই কত রকম উদ্দেশ্য লইয়া কত রকম বিদ্যালয় যে স্থাপিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে শিক্ষার স্তর হিসাবে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া লইতে হয়। শিক্ষাকে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই তিন স্তরে সাধারণতঃ ভাগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে যাঁহারা সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যও "সমাজ-কেন্দ্রে" বা বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে (যেমন, জনতা বিদ্যালয়) প্রত্যক্ষ শিক্ষার

ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ফলে তিন স্তরের পরিবর্তে চারি স্তরে (সমাজস্তর সহ) প্রত্যক্ষ শিক্ষার অয়োজন করা হইতেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—সমাজে জীবন যাপন করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রাথমিক বিদ্যালয় তাহাকে এমনভাবে প্রস্তুত করিবে যাহাতে সাধারণ সমাজ-জীবন যাপন করার কালে সে নিজ চেষ্টায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ সাধন করিতে পারে। প্রাথমিক স্তরে সকলকে মোটামুটি একই ধরণের বিদ্যালয়ে একই ধরণের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—সমাজের সকলে অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া একই ধরণের শিক্ষা পাইলে সমাজ জীবন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গণতন্ত্রের বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও শিক্ষার প্রথম স্তরে সকলের একই ধরণের সুযোগ পাওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ না দিলে সমাজে কখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে, এখনও তিন ধরণের বিদ্যালয় বর্তমান রহিয়াছে। প্রথমেই বলিতে হয়, গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে ঐ সব বিদ্যালয়, আজ পর্যন্ত প্রায় একইভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। মাতৃভাষায় লিখন, পঠন এবং গণিত শিক্ষাদানই ঐ সব বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। চারিত্রিক ও সামাজিক শিক্ষার উপর ঐ সব বিদ্যালয়ে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। ইহাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিও নিতান্ত যান্ত্রিক, মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হয়; শিশুর বাস্তব জীবনের চাহিদা ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ঐ সব বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। ছাত্রদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়ায়ই যেন ঐ সব বিদ্যালয়ের একমাত্র সার্থকতা।

মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায়, প্রাথমিক স্তরে আমাদের দেশে অধুনা অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় চারিত্রিক ও সামাজিক শিক্ষাকে আক্ষরিক শিক্ষার সহিত সমান মর্যাদা দিয়া থাকে। শিশুর বাস্তব জীবনের চাহিদা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাদান পরিচালিত হয়।

গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

সামাজিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত এবং চারিত্রিক বিকাশ ও যথাযথ জীবন-দর্শন গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি কুটিরশিল্প শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়—এমন কি ঐ কুটিরশিল্পকে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল সুনাগরিক গঠন, তাই পরিবেশ পরিচিতির উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ইহাছাড়া আমাদের দেশে আর এক ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যাহাদের প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উন্নততর দেশগুলিতে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেভাবে পরিচালিত হয়, ঐ সব বিদ্যালয়ও সেইভাবে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করা হয়। ইহাদের ঘর-বাড়ী, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষকদের জ্ঞানের মান ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নততর দেশগুলির প্রায় সমপর্যায়ের বলা যাইতে পারে। কিন্তু মাতৃ-ভাষার পরিবর্তে ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা সাধারণতঃ ইংরেজীর মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং ছাত্রদের নিকট হইতে উচ্চহারে বেতন আদায় করা হয়। বিশেষ অর্থশালী পিতামাতা ব্যতীত সাধারণ লোক ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পড়ানোর সুযোগ পান না।

প্রগতিশীল প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক স্তরে উপরি-উক্ত তিন ধরণের বিদ্যালয় থাকা যে গণতন্ত্র-বিরোধী ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ। আমাদের রাষ্ট্রও ঐ আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের ১৭ বৎসর পরেও শুধু ঐ আদর্শই যে বাস্তবে পরিণত হয় নাই তাহা নহে, প্রাথমিক স্তরে তিন ধরণের বিদ্যালয়ের অবস্থিতি শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে।

প্রাক্-প্রাথমিক বা নার্সারি বিদ্যালয়—আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্ত প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন উন্নততর দেশগুলিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও সহরে কিছু কিছু প্রাক্-প্রাথমিক

বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব বিদ্যালয় স্থাপন এখনও সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-বেতনের হারও খুব বেশী।

মাধ্যমিক শিক্ষা—আমাদের মত দরিদ্র ও শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে বেশীর ভাগ ছাত্রই সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে; এমন কি অনেক ছাত্রেরই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার সুযোগও হয়ত ঘটে না। যাহা হউক, যে সব ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহাদের বিদ্যা আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়াই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষা আধুনিক জটিল সমাজের প্রবেশপত্র মাত্র, এত সামান্য বিদ্যায় সমাজের উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষমতা সাধারণতঃ জন্মায় না।

মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যাহারা সমাজে প্রবেশ করিবে তাহারাই হইবে সমাজের মেরুদণ্ড। সর্বক্ষেত্রে সমাজের স্থিতি ও অগ্রগতি ইহাদের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। এমন কি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন (Specialised qualifications) যে সব লোকের প্রয়োজন তাহাদিগকেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রস্তুত করিয়া দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গ্রহণের যোগ্যতা অনেকেরই থাকে না। সমাজের সাধারণ কার্য-পরিচালনার জন্য ঐ শিক্ষার প্রয়োজনও হয় না। সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বিশেষভাবে গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ করার নিমিত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন। স্বভাবতই সমাজ মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কোন-না-কোন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী মোটামুটি সমাজের সকল কার্যেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও বলিতে হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যক্তিকে তাহার জীবনের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দিতে না পারিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার উপর নির্ভর না করাই উচিত। তাই সমাজের অধিকাংশ লোকই যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্ব

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ :—

১। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে নাগরিক হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন (training of character to fit the students to participate creatively as citizens in the emerging social order).

২। ছাত্রগণ যাহাতে দেশের সম্পদবৃদ্ধির কার্যে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য বাস্তব এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা ("improving their practical and vocational efficiency, so that they may play their part in building up the economic prosperity of the country.")

৩। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে সাহিত্য, চারুকলা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহ জাগাইয়া তোলা ("developing their literary, artistic and cultural interests which are necessary for self-expression and for the full development of human personality.")

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করিতে গিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উভয় মতের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উপরে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুইটি বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীরা এবং শেষেরটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমর্থন করিবেন।

মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক ধরণের হইলে চলে না। মানুষের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিভিন্নতার কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার দিন দিনই আমাদের সমাজে নূতন নূতন বৃত্তি সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের জন্য সাধারণভাবেও যদি কিছুটা প্রস্তুতি করাইতে হয় তাহাতেও বিভিন্ন ধরণের

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই। আমাদের দেশে বর্তমানে যেসব বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এইসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিন বৎসর পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ গ্রাম অঞ্চলেই:ঐ ধরণের বিদ্যালয় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থের অপ্রতুলতার জন্য পূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রথমে নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি খোলা হয় এবং আশা থাকে যে পরে উচ্চতর শ্রেণীগুলি খুলিয়া উহাকে পূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা যাইবে। কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি ব্যতীতও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থায় নিজস্ব স্থান রহিয়াছে। বর্তমানে সমাজ-জীবন যেরূপ জটিল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া) শেষ করিয়া সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবার প্রকৃত যোগ্যতা জন্মায় না। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে (সাধারণ শিক্ষা বা general education) আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য না থাকার দরুণ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোন বিভিন্নতা থাকে না—সকল ছাত্রই এখানে একই ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে এই স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে ঐরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা নিজ নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করা যায়। আবার কেহ কেহ বা সোজাসুজি সমাজ-জীবনেও প্রবেশ করিতে পারে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে, উচ্চ বুনিয়াদী (Senior Basic) ও সাধারণ নিম্ন-মাধ্যমিক এই দুই ধরণের বিদ্যালয় আছে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি পূর্বে বর্ণিত, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নীতিতে পরিচালিত হয়।

পলিটেক্‌নিক (Politechnic) বিদ্যালয়—আধুনিককালে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ঐ ধরণের বিদ্যালয় আমাদের দেশে স্থাপিত হইয়াছে। মাধ্যমিক

শিক্ষা কমিশন, মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষাদানের নিমিত্ত ঐ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। প্রথম, কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্যই পলিটেক্‌নিক স্থাপিত হয়। ইহাদের জনপ্রিয়তা এবং কার্যকারিতা দেখিয়া, বর্তমানে মেয়েদের জন্যও পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পলিটক্‌েনিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর যে সব ছাত্র উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার জন্য যোগ্য নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, বা যাহাদের ঐ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নাই তাহারা পলিটেক্‌নিকে নিম্নতর ব্যবসায়িক শিক্ষা (trade course) গ্রহণ করিতে পারে। ট্রেড্ কোর্সগুলিতে ছাত্র সাধারণতঃ তিন মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বৃত্তি শিক্ষাদানই ঐ সব কোর্সের একমাত্র উদ্দেশ্য—ছুতার, কামার, প্যাটার্নমেকার, মোল্ডার, মেসিনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। যন্ত্র সভ্যতার প্রসারের ফলে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঐ সব বৃত্তির জন্য যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু ঐ সব বৃত্তিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা চাকুরী ব্যতীত, স্বাধীন ব্যবসায়েও লিপ্ত হইতে পারে। তাই ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিম্ন মাধ্যমিক পাঠ শেষে ছাত্রেরা আর প্রায়ই ঐ সব কোর্সে প্রবেশের সুযোগ পায় না।

পলিটেক্‌নিকে উচ্চ ধরণের ইলেক্‌ট্রিকেল, মিকানিকেল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠের ব্যবস্থাও আছে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর তিন বৎসর ধরিয়া ঐ সব বৃত্তি শিক্ষা করিতে হয় এবং পরীক্ষা পাশ করিলে পাঠ্য বিষয়ে ডিপ্লমা প্রদান করা হয়। যাহারা ভালভাবে ঐ সব পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, তাহারা ইচ্ছা করিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও প্রবেশ করিতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ব্যতীত, পলিটেক্‌নিকে, উচ্চতর কোর্সগুলির মধ্যে ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানসিপ্, ওভারসিয়র প্রভৃতি কোর্সের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেয়েদের পলিটেক্‌নিকে অবশ্য মেয়েদের উপযুক্ত বৃত্তি অর্থাৎ টেলারিং, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

অল্পদিন স্থাপিত হইলেও, পলিট্যাক্‌নিকগুলি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়

স্থায়ী আসন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। ইহাদের জনপ্রিয়তা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পলিট্যাক্‌নিক ব্যতীত, কৃষি-বিদ্যালয় ও চারুশিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতেও মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৌমাছি পালন (Bee keeping), পশুপালন (Poultry), চারুকলামূলক শিল্প (Artistic handicraft) ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Senior Basic)—যে নীতির ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই নীতিরই ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে ঐ ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই অল্প।

সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সেগুলি ছাড়া কোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই। তবে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই সুনাগরিকতার জন্য প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তিস্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করিতে চেষ্টা করে। ফলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে কুটিরশিল্প শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ; উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকতর বাস্তবধর্মীও বটে। পাঠশেষে প্রায় সকল ছাত্রই সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে তাহারা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Rural University) (পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত ঐ ধরণের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে) প্রবেশ করিবে ইহাই অধিকতর সমীচীন। কিন্তু যাহারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। আশা করা যাইতেছে যে, ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ বুনিয়াদীর স্থান সম্বন্ধে আমাদের মনে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবে। গ্রামের জীবন এবং সহরের জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে যদি পার্থক্য কমিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে মোটামুটি একই

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দুই ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জুনিয়র টেক্‌নিকেল স্কুলের মত বিশেষ ধরণের বৃত্তিশিক্ষাদানমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে পারে। গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ঐসব বৃত্তিশিক্ষার কাজ উচ্চতর স্তরে চলিতে পারে। বর্তমান অবস্থায় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মোটামুটি একই ধরণের শিক্ষাদানের চেষ্টা করার নিমিত্ত নানারূপ বিভ্রান্তি এবং অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে।

জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুল (Junior Technical School)—এই ধরণের বিদ্যালয় এখনও পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে অনেকগুলি জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অষ্টম শ্রেণীর পর তিন বৎসরের জন্য যান্ত্রিক বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। পলিটেকনিক হইতে এইসব বিদ্যালয়ের পার্থক্য এই যে, ইহাতে ছয় মাস, তিন বৎসর এইরূপ বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের কোর্স নাই; উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মত ছাত্রগণকে ঐসব বিদ্যালয়েও তিন বৎসরের জন্য পাঠ করিতে হয়। তারপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগে সংগে "সাধারণ শিক্ষার" দিকেও পলিটেকনিক অপেক্ষা ঐসব বিদ্যালয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুলের পাঠশেষে (পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইলে) ছাত্রেরা পলিটেক্‌নিকের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে।

দশম শ্রেণী বিদ্যালয়—নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে (বৃত্তি-শিক্ষা নহে) আরও দুই বৎসর অগ্রসর করিয়া দেওয়াই ঐ সব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। চাকুরীতে নিয়োগ এবং বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ বা স্কুল ফাইন্যাল পাশকে শিক্ষার একটি স্তরের শেষ ধাপ বলিয়া আমাদের দেশে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এমন অনেক চাকুরী আছে যাহাতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশকে শিক্ষার নিম্নতম মান বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং পলিটেক্‌নিক ইত্যাদিতে অনেক কোর্স আছে যাহাতে ঐ পরীক্ষা পাশই ভর্তি হওয়ার নিম্নতম যোগ্যতা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দশম শ্রেণীর পাঠ শেষে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। পূর্বেও উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে আমাদের

দেশে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তি উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা আরম্ভ করার জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হইত না ; তাই ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে না করিয়া কলেজে করা হইয়াছিল। বর্তমানে দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে পাঠের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট বা প্রি-ইউনিভার্সিটি পাঠের ব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি কৃত্রিম সৃষ্টি। আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি উপযুক্ত ছিল না বলিয়া এবং তাহাদের সামাজিক মর্যাদা নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া, মাধ্যমিক শিক্ষারই একটি স্তরকে কৃত্রিমভাবে কলেজের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভয়ই আমাদের দেশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ; অবশ্য বেশী ক্ষতি মাধ্যমিক শিক্ষারই হইয়াছিল।

দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ের আর একটি ত্রুটি এই যে, ইহা ছিল একমুখী—অর্থাৎ ছাত্রদের জন্মগত ক্ষমতা ও রুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী এবং সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ইহাতে তেমন ছিল না। বর্তমানে অবশ্য এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া, দশম শ্রেণী বিদ্যালয়েও একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মাত্র দুই বৎসরের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে যে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইবে এমন মনে হয় না।

তাই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দুই বৎসরের জন্য দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ে দেওয়ার বিশেষ যৌক্তিকতা দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা এক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দিয়া যাহারা উচ্চ শিক্ষার্থে যাইবে না, তাহাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা যাইতে পারে এবং যাহারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য দ্বাদশ বার্ষিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া আরও চার বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা—নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও তিন বৎসর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত

পৌঁছাইয়া দেওয়াই এই স্তরের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা-শেষে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিলেও ছাত্রদের পক্ষে যাহাতে উন্নত ধরণের জীবিকা গ্রহণ সম্ভব হয়, সেদিকেও ইহারা দৃষ্টি দিয়া থাকে। দশম শ্রেণী বিদ্যালয়গুলির মত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলি একমুখী নহে। ছাত্রদের জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় পাঠের সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র একটি বিশেষ বিষয় (Special Subject) পড়িবার সুযোগ থাকে আবার কোনটিতে একাধিক "বিশেষ বিষয়" (Special Subjects) পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ধরণের বিদ্যালয়কে একমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় ধরণের বিদ্যালয়কে "বহুমুখী বিদ্যালয়" বলা হয়। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি একমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র "সাহিত্য"ই বিশেষ বিষয়রূপে পাঠের সুযোগ আছে; এবং বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে একাধিক বিষয়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুই, তিন বা চারিটি বিষয় হইতে যে-কোন একটি বিশেষ পাঠের সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা সাহিত্য (Humanity), বিজ্ঞান (Science), বাণিজ্য (Commerce), চারুকলা (Fine arts), কৃষি (Agriculture) ও যন্ত্রবিদ্যা (Home Technical)—এই ছয় রকমের বিশেষ বিষয়ের মধ্যে একটি পাঠ্য হিসাবে বাছিয়া লওয়ার সুযোগ পায়। মেয়েদের জন্য যন্ত্রবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা বিশেষ বিষয়রূপে পাঠের সুযোগ নাই, কিন্তু অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গার্হস্থ্য বিদ্যা (Home science) পাঠের সুযোগ আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরে করা হইবে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ (Senior Cambridge) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এখনও পশ্চিমবঙ্গে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলি ছাত্রদের ব্রিটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ সব বিদ্যালয় বিশেষ করিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের (Anglo-Indian) জন্যই স্থাপিত এবং উহাদের শিক্ষার মাধ্যম হইতেছে ইংরেজী। কিন্তু বর্তমানে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতীত আরও অনেকে (বিশেষ করিয়া ধনিসম্প্রদায়) এই শিক্ষার সুযোগ লইতেছেন। এই

শিক্ষাকে বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা বলা যাইতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার মান নামিয়া যাওয়ার ফলেই এইসব বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিলে ছাত্র ভারতীয় যে-কোন বিদ্যালয়ের ইণ্টার-মিডিয়েট স্তরের দ্বিতীয় বর্ষে (2nd year) ভর্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রথম বিভাগে পাশ না করিয়া অন্য কোন বিভাগে পাশ করিলে ঐ পরীক্ষার ফল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সমতুল্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে Indian School Certificate নামে আর এক নূতন পরীক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। ইহাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য ধরা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমও ইংরেজী। উপরি-উক্ত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বর্তমানে ঐ পরীক্ষার জন্যও ছাত্র প্রস্তুত করিতেছে। এই পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সর্বভারতীয় মান প্রবর্তিত হইবে, ইহাই আশা করা যাইতেছে।

পাবলিক্ স্কুল (Public School)—ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাবলিক্ স্কুলগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য নেতা প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া পাবলিক্ স্কুলগুলি দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সমাজের সর্বস্তরের অনেক প্রাক্তন নেতাই পাবলিক্ স্কুলের ছাত্র। পাবলিক্ স্কুলে শিক্ষকের যোগ্যতার মান, ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ, শিক্ষার সাজসরঞ্জাম উচ্চতম পর্যায়ের। অধিকন্তু ঐ বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণরূপে আবাসিক—ছাত্রদের সব সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাহচর্যে থাকিতে হয়। খেলাধূলা এবং অনুরূপ কার্যাবলীর মাধ্যমে তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক শিক্ষার উপর পাবলিক্ স্কুলগুলি বিশেষ জোর দেয়। তাহাদের দাবী এই যে, শ্রেষ্ঠ ছাত্র ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক একত্র জড় করিয়া এবং সর্ববিষয়ে লেখাপড়ার শ্রেষ্ঠ সুযোগ দিয়া তাহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গঠনের জন্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে ক্রিমিং থিয়রি (Creaming theory)—অর্থাৎ দুধ হইতে সরকে পৃথক করিয়া তাহাকে উন্নততর ধরণের বস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা করা। ভাল ভাল ছাত্র দুধের সরের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত পক্ষে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যাঁহারা নেতৃত্ব

ইংলণ্ডে পাব্লিক স্কুল

করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই পাবলিক্ স্কুলের ছাত্র। পাবলিক্ স্কুলগুলি বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের ব্যয় প্রধানতঃ ছাত্রদের পিতামাতাকেই বহন করিতে হয়। তাই অর্থশালী না হইলে ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠান সম্ভব হয় না।

ভারতে পাবলিক স্কুল

ইংলণ্ডের পাবলিক্ স্কুলের অনুকরণে ভারতেও কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ; ভারতীয় পাবলিক্ স্কুল সমিতিরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে সব স্কুল ঐ সমিতির সভ্য তাহারা নিজেদের পাবলিক্ স্কুল বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। অধিকাংশ পাবলিক্ স্কুলেই ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য আচার-বিচার ও জীবনাদর্শ ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে দুই একটি স্কুল (নরেন্দ্রপুর) স্থাপিত হইয়াছে, যাহারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেছে। অনেক পাবলিক্ স্কুলই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন স্কুল Indian School Certificate বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রস্তুত করিতেছে। স্বভাবতই আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পিতামাতার সন্তানই ঐ সব বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

মুদালিয়র কমিশন ঐ সব বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহারা ভাল কাজ করিতেছে এবং আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে কেবলমাত্র "বড়লোকের" ছেলেরাই ঐ সব বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবে, ইহা সঙ্গত নহে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরও ঐ সব বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। তাই ভারত সরকার মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের পাবলিক্ স্কুলে পাঠের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুদালিয়র কমিশনের মতে ঐ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন—ঐ সব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারায় আমাদের ছেলেমেয়েরা অভ্যস্ত হইলে, তাহারা জনসাধারণের সহিত মিশিতে পারিবে না। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও এই দিক হইতে পাবলিক স্কুলগুলির কোন সংস্কার এখনও হয় নাই। তবে আমাদের দেশীয় ভাবধারা লইয়া ২।১টি পাবলিক স্কুল অধুনা স্থাপিত হইয়াছে।

আবাসিক বিদ্যালয়—পাবলিক্ স্কুলগুলি ছাড়াও আমাদের দেশে কিছু কিছু আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মুদালিয়র কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কৈশোরের শিক্ষা, পিতামাতার নিকটে বাড়ীতে থাকিয়াই চলা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন কোন পরিবারের বাড়ীর পরিবেশ হয়ত আশানুরূপ নহে, অথবা বিদ্যালয় হইতে বাড়ী হয়ত অনেক দূরে। অধিকন্তু অনেক পিতামাতা হয়ত এমন ধরণের চাকুরী করেন যে প্রায়ই তাহাদের বদ্‌লী হইতে হয়। এই সব কারণে কিছু সংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের বা বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস সংযুক্ত করণের প্রয়োজন রহিয়াছে। গ্রাম দেশের এবং ছোট ছোট শহরের অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্রাবাস আমাদের দেশে রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক সম্পূর্ণরূপে আবাসিক বিদ্যালয় যে রহিয়াছে, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

সারাদিনের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় (Residential Day School)—মুদালিয়র কমিশন এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ-ভাবে পরামর্শ দিয়াছেন। এই ধরণের বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ভোরে আসিবে এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাইবে। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় আহারের ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই থাকিবে। বর্তমানে পঠন, পাঠন ও সুষ্ঠু পরিচালিত করিবার মত পর্যাপ্ত সময় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। ইহার উপর চারিত্রিক বিকাশ এবং ছাত্র-শিক্ষক পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত সময়ের প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয়ের সময় দীর্ঘতর করা ব্যতীত উপায় নাই। অধিকন্তু, প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে, ছাত্র-শিক্ষকের সাহচর্য যত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া হয় ততই ভাল। অপর দিকে শিশুর পক্ষে পিতামাতা এবং পরিবারের সঙ্গ বর্জিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। তাই আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে সারাদিনের আবাসিক বিদ্যালয় খুবই উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পূর্ণ আবাসিক বিদ্যালয় অপেক্ষা অর্থেরও প্রয়োজন কম হইবে। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যদি বিদ্যালয়ের চারিপাশে থাকিতে দেওয়া সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের বিশেষ দায়িত্ব এক এক শিক্ষক-পরিবারের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়,

তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত ঐ ধরণের কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

বিদ্যালয় এবং সমাজ—বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, এবিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আলোচনা হইয়া আসিতেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে। পারস্পরিক সম্বন্ধে, ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে কে প্রাধান্য লাভ করিবে ইহা লইয়াই যত মতদ্বৈধ। প্রকৃতপক্ষে, পারস্পরিক সম্বন্ধে সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে কেহই খাটো নয়—এক যে অপরের পরিপূরক--একের অস্তিত্ব যে অপরের উপর নির্ভরশীল, এ সত্য স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্যালয় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান—সমাজ যে নিজ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীনকালে কোন বিদ্যালয় ছিল না। সমাজ-জীবন জটিলতর হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয় সৃষ্টির প্রয়োজন সমাজ অনুভব করে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ব্যতীত সমাজের স্থিতি সম্ভব নহে।

সমাজের সংহতি ও স্থিতির জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধ সমাজের নিয়ামক। আবার পরস্পরের মধ্যে সমতাই (similarity) পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তি। ধরা যাউক, আমরা যদি একে অপরের ভাষা না বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কঠিন হইত এবং আমরা দুই জন এক সমাজের সভ্য হইতে পারিতাম না। শুধু ভাষা কেন, এক সমাজের অধিবাসী হইতে হইলে, আচার-ব্যবহার, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে সমতা অপরিহার্য। যে সমাজে ঐ সব বিষয়ে পার্থক্য যত বেশী সামাজিক সংহতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে সেই সমাজ তত দুর্বল; এমন কি সভ্যদের মধ্যে পার্থক্য বেশী হইয়া গেলে সমাজ ধ্বংস হইয়া বিভিন্ন সমাজ-সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবনদর্শন ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই শিক্ষাসাপেক্ষ। কাজেই সমাজ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে পরিবার, ধর্ম ইত্যাদি আরও নানা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে ঐসব প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে উহারা পূর্বের মত আর শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে না। কাজেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্যদের সমাজ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞান রীতিনীতি ইত্যাদিতে দীক্ষিত করিতে হইলে সমাজের সহিত বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের মত, বর্তমানে সমাজ হইতে দূরে তপোবনে বিদ্যালয় স্থাপনা করা চলে না। বিদ্যালয় পরিচালনের মূল দায়িত্ব সরকারের হাতে (সমাজের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে) ন্যস্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠকালে ছাত্রদের সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মান বাঞ্ছনীয়। ঐ সময়ই ছাত্রদের সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রাশিয়ায় প্রত্যেক ছাত্রকেই সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিন কোন কারখানায় বা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। বিদ্যালয় জীবনকে সমাজ-জীবনের প্রতিকৃতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হয়। বড় হইয়া ছাত্রদের সমাজ-জীবনে যে সব কাজ করিতে হইবে, সেই সব কাজের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা হয়। সমাজ-জীবনে যে ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে, বিদ্যালয় জীবনেও সেই ধরণের প্রতিষ্ঠান (ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত, বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক, দোকান ইত্যাদি) গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। সমাজ-জীবন এক-নায়কত্বের (Dictatorship) বা গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইলে বিদ্যালয় জীবনও এক-নায়কত্ব বা গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

সমাজ-জীবনের প্রতিকৃতি হিসাবে বিদ্যালয় জীবন

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে (রাশিয়া, চীন ইত্যাদি) বিদ্যালয়গুলি উপরি-উক্ত নীতিতে কাজ করিতেছে। কমিউনিস্ট দর্শনমতে বিপ্লবদ্বারা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তারপর শিক্ষার সাহায্যে উহাকে সংরক্ষণ করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবনকে কমিউনিস্ট সমাজ-জীবনের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয় জীবনে যাঁহারা হইবেন নেতা (অর্থাৎ শিক্ষক) তাঁহারা কমিউনিস্ট দর্শনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হওয়া অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের সকল কার্যের মূল উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদের কমিউনিস্ট দর্শনে

বিশ্বাসী করা এবং তাহাদিগকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজকে শিক্ষার দ্বারা শুধু সংরক্ষণ করিলে চলে না, তাহাকে উন্নততর করারও চেষ্টা করিতে হয়। অগ্রসর হওয়াই জীবনের ধর্ম, স্থিতি জীবন ধর্মের বিপরীত—যে অগ্রসর হইতেছে না সে মৃত। সভ্যতার ইতিহাস সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস। যে সমাজ উন্নতির পথে চলিবে না অদূর ভবিষ্যতে উহার পতন অনিবার্য।

সমাজের উন্নতি সাধন ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

বিপ্লবের দ্বারা সমাজের উন্নতিসাধনের নীতি অনেকেই গ্রহণ করেন না। সমাজ অধোগতির চরমে না পৌঁছাইলে সাধারণতঃ বিপ্লব সফল হয় না। বিপ্লব কোন সমাজের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যে নিজ আদর্শবাদ সমাজকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিলে শিক্ষাকে প্রোপাগাণ্ডার (propaganda) স্তরে নামাইয়া আনা হয়। বিপ্লব ব্যতীত স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজের অগ্রগতি হইয়া থাকে—পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজের প্রগতিই বিপ্লব ব্যতীতই হইয়াছে। বিদ্যালয় সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। একদিকে মানুষ যেমন অনেকখানি সমাজেরই সৃষ্টি, অপরদিকে তেমন অনেক সময় তাহার জীবন-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র—অনেক ক্ষেত্রে সে সমাজের রীতি-নীতি, ভাবধারা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠিতে পারে। বিদ্যালয় যদি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিতে পারে তবেই উহা সম্ভব হয়। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ যদি অগ্রগতির পথে চলিতে থাকে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজও অগ্রগতির পথে চলিবে। আবার অনেকে মনে করেন যে, বিদ্যালয় নৈর্ব্যক্তিকভাবে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ; সমাজের রীতিনীতি ভাবধারা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের জ্ঞানের আলোকে প্রতিফলিত হইলে উহাদের সংস্কারের পথ স্বতই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে। সমাজ সংস্কারকার্যে বিদ্যালয়ই হইবে আমাদের পথপ্রদর্শক। সমাজের স্থিতিই বিদ্যালয়ের একমাত্র কাম্য নহে, উহার প্রগতিও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। তাই বিদ্যালয় সমাজের প্রতীক হইলে চলিবে না—ইহা হইবে আদর্শ সমাজ। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন গ্রীস এই নীতিতেই বিশ্বাস করিত।

আদর্শ সমাজরূপে বিদ্যালয়কে গড়িয়া তুলিবার নিমিত্তই উহাকে বাস্তব সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া লওয়া হইত। সমাজের ভালমন্দ বিচারের ভার রাজনীতিকদের হাতে ন্যস্ত না থাকিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে মানবতাবাদ (Humanism), প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Mental Discipline বা Faculty School of Psychology) এর প্রভাবে শিক্ষা (ইউরোপে) সমাজ-জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সমাজ-জীবনের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঐসব মতবাদ স্বীকার করিত না। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় সমাজের অনুকরণে গড়িয়া তোলার (Socialise) আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। আমেরিকার জন ডিউই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার "স্কুল এণ্ড সোসাইটি" (School and Society) গ্রন্থে তিনি বিদ্যালয় এবং সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় এই সমস্যা লইয়া অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশেও বিদ্যালয়কে সমাজের অনুকরণে গড়িয়া তোলার চেষ্টা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ আমলের শিক্ষার সহিত আমাদের সমাজ-জীবনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। বর্তমানে আমরা নূতন সমাজগঠনের চেষ্টা করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত ঐ চেষ্টা যে সফল হওয়া সম্ভব নহে তাহা দিন দিনই আমরা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার সংঘটন দিন দিনই অধিক পরিমাণে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস

কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশই সমাজের স্থিতিকরণকে বিদ্যালয়ের একমাত্র কার্য বলিয়া গ্রহণ করে না। সমাজের স্থিতি এবং প্রগতি উভয়ই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। স্থিতি এবং প্রগতি একে উভয়ের বিপরীত না হইয়া বরং পরস্পর পরস্পরেব পরিপূরক। প্রগতিব্যতীত সমাজের স্থিতি হইতে পারে না। কারণ অগ্রসর না হইলে পশ্চাদপদ্ হইয়া পড়িতে হইবে, ইহা জীবনের

ধর্ম ; একমাত্র প্রগতির মধ্যেই স্থিতি সম্ভব। আবার স্থিতি ব্যতীত প্রগতি সম্ভব নহে। সমাজের সংগৃহীত জ্ঞান, আয়ত্তীকৃত কৌশল গৃহীত ভাবধারা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না জন্মানো পর্যন্ত উহাদিগকে উন্নততর করার কথা উঠিতেই পারে না। বিদ্যালয় এবং সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের পরস্পর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। ডিউই একদিকে সমাজের স্থিতিকে যেমন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অপরদিকে সমাজের অগ্রগতিকেও তেমনি বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ছাত্রেরা যেমন সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবে, বয়স্কগণও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সংস্রবে আসিবেন। সমাজের ভাবধারা যেমন বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করিবে বিদ্যালয়ের ভাবধারাও তেমনি সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে। বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে দ্বিমুখী রাজপথ (two-way traffic) থাকিবে— একটি দিয়া সমাজ হইতে ভাবধারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং অপরটি দিয়া বিদ্যালয় হইতে ভাবধারা সমাজে প্রবেশ করিবে (There should be a two-way traffic between the School and the Society)। তাই বিদ্যালয় তাহার পাঠ্যবিষয়ে, এবং সমাজ-জীবনের সংঘটনে যদিও সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলে, তথাপি কোন বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে সমাজের অনুকরণ করে না।

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে উভয় দিকগামী রাজপথ

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিমুখী রাজপথ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে।

১। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে সমাজের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিলে, সমাজের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং উহার ভাবধারা বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করিতে পারে। অবশ্য এই নীতির বাস্তবে প্রয়োগের ফলে, অনেক সময় বিদ্যালয় সামাজিক দলাদলির কেন্দ্র হইয়া পড়িতেছে এবং উহার পরিচালনা অবাঞ্ছিত হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি গঠনে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন ব্যবস্থা করিলে, বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ভাল হয় কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

২। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে, বিদ্যালয় সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারে। অভিভাবকগণ, শ্রেণী শিক্ষাদান, মনোগ্রাহী বিষয়ে বক্তৃতা, শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ (Excursion) প্রভৃতি নানা বিষয়ে, বিদ্যালয়কে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। বিদ্যালয়ের প্রতিটি সহ-শিক্ষা-ক্রমিক কার্যে (Co-curricular activities) অভিভাবকদের সংযুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা পরস্পরকে প্রভাবিতও করিতে পারেন।

৩। সন্ধ্যাকালে, বিদ্যালয় কমিউনিটি সেণ্টর (Community Centre) বা বয়স্কদের ক্লাবঘররূপে কাজ করিলেও মন্দ হয় না। ইহার ফলে বিদ্যালয়ের উপর সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং নানাভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়।

সমাজকে যেমন বিদ্যালয়ে টানিয়া আনিতে হয়, বিদ্যালয়কেও তেমনি সমাজে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে—

১। বিদ্যালয়ে সমাজসেবক সমিতি গঠন করিয়া, সমাজের প্রয়োজনে সর্বদা সাহায্য দানের চেষ্টা করিতে হয়। গ্রামের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা, পুষ্করিণী সংস্কার করা প্রভৃতি কাজে ছাত্রেরা অগ্রণী হইতে পারে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কালে তাহারা নানারূপ সেবাকার্যে ব্রতী হইতে পারে। যে সব ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের কিছু কিছু ছাত্রগণ কর্তৃক গ্রামেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই সব কার্যের ফলে একদিকে ছাত্রেরা যেমন সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিবে এবং তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হইবে, অপর দিকে সমাজ বিদ্যালয়ের ভাবধারায় প্রভাবিত হইবে।

২। বিদ্যালয়ে সমাজ-তথ্যানুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়া, ছাত্রেরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহার্থ গ্রামে গিয়া, আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাইতে পারে। ঐসব তথ্য চিত্রাকারে রূপায়িত করিয়া, গ্রাম্য মেলায় নানাভাবে পরিবেশণ করা যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদ্যালয় এবং সমাজ উভয়ই লাভবান হইতে পারে।

বিদ্যালয়ে পারস্পরিক জীবন—বর্তমানে বিদ্যালয়কে একটি বিশিষ্ট ধরণের সমাজরূপে পরিকল্পনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) দ্রুত অগ্রগতি "শিক্ষা লাভ করা" কার্যটি সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছি যে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে সঞ্জাত অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহারই নাম শিক্ষা। আবার যেখানে পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানে "সমাজের" সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষক-এর মধ্যে সব সময়েই পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। কাজেই বিদ্যালয় একটি সমাজ। অবশ্য বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র; যে-কোন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর আবার আলাদা সমাজও বটে; বিদ্যালয় ব্যতীত, পরিবার, দেবমন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদা সমাজরূপে কল্পনা করা যায়—তাহাদের প্রত্যেকেরই আলাদা জীবন, আলাদা সংঘটন রহিয়াছে। বৃহত্তর সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যেমন পরিবার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাজার প্রভৃতি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য শ্রেণী (class) কক্ষ, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, নাট্য-সমিতি, বিতর্ক-সমিতি ইত্যাদি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়। বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব জীবন আছে। উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জীবন প্রবাহিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন; দৈনন্দিন জীবনধারণের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা শিক্ষা লাভ করি। বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষভাবে সত্য। বিদ্যালয় জীবনের প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয় যাহাতে বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা শিক্ষার নিয়ামক হয়। বিদ্যালয় জীবন বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অংশ মাত্র হইলেও ঐ জীবনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং ইহার অভিজ্ঞতাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ শিক্ষাকার্যে উহারা অধিকতর ফলপ্রসূ।

স্বতন্ত্র সমাজরূপে বিদ্যালয়

বিদ্যালয়কে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ধরণের সমাজরূপে গড়িয়া তোলার উপরই নির্ভর করে উহার সার্থকতা। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহত্তর সমাজের মত বিদ্যালয় সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্ট নহে—ইহা অনেকটা কৃত্রিম। সকল ছাত্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজ অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদে যে বিদ্যালয় সমাজে যোগদান করে এমন নহে। অনেক লোক একত্র হইলেই যেমন সমাজের সৃষ্টি হয় না, তেমনি অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগ দিলেই বিদ্যালয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন জনসমাবেশ সমাজ না হইয়া জনতা হয় (crowd) মাত্র। বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশকালে ছাত্রেরা অনেকটা "জনতার" মত থাকে। বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ হইতে তাহারা বিভিন্ন অভ্যাস, চারিত্রিক গুণাবলী, চিন্তাধারা ইত্যাদি লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। যে একাত্মানুভূতি সমাজজীবনের প্রধান ভিত্তি বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশের কালে উহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা সত্য। তাঁহারা বিভিন্ন আদর্শবাদ ইত্যাদি লইয়া বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্যই হইল, ছাত্র এবং শিক্ষকের এই "জনতাকে" সমাজে পরিণত করা—তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য, আচার-ব্যবহার জীবন-সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে একাত্মানুভূতি সৃষ্টি করা। এই একাত্মানুভূতি না জন্মাইতে পারিলে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে একত্র সমাবেশের দ্বারা উহার সভ্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গ পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এই একাত্মানুভূতি জন্মাইবার পক্ষে বিদ্যালয়ের একটি প্রধান সুবিধা এই যে, প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক নূতন সভ্য যোগ দিলেও (নূতন ছাত্র, নূতন শিক্ষক) বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্যই "পুরাতন" থাকেন—দীর্ঘকাল প্রায় দৈনন্দিন পরস্পরের মধ্যে মিলনের ফলে তাহাদের মধ্যে কিছুটা একাত্মানুভূতি স্বতঃই জন্মাইয়া থাকে। "পুরাতন" সভ্যগণ সহজেই নূতন সভ্যদের বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি এই একাত্মানুভূতির সৃষ্টি এবং প্রসারের জন্য বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঐরূপ চেষ্টা না করিলে পুরাতন সভ্যদের মধ্যেও

বিদ্যালয়ের ছাত্র-জনতাকে ছাত্র-সমাজে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা

একাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া পড়ে এবং নূতন সভ্যদের মধ্যেও তাহা উপযুক্তরূপে সৃষ্টি হয় না। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এই কার্যে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে—

বিদ্যালয়ের পোশাক (School Uniform) সভ্যদের মধ্যে একাত্মানুভূতি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। "আমরা সকলে এক ধরণের পোশাক পরি, আমরা সকলে এক, যাহারা ভিন্ন ধরণের পোশাক পরে তাহাদের হইতে আমরা পৃথক"—এইরূপ মনোভাব নিজের অজ্ঞাতেই সৃষ্ট হয়। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশ সেনাবাহিনীর জন্য নিজস্ব পোশাকের (uniform) ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এক পোশাক পরিধান, পরস্পরের মধ্যে কতখানি একাত্মবোধ জাগাইতে পারে তাহা আমরা বিশেষ অনুভব করি যখন কোন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র সমাবেশ ঘটে—নিজ পোশাকের অনুরূপ পোশাক (uniform) পরিহিত সকল ছাত্রের প্রতি এক বিশেষ আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ই নিজস্ব পোশাকের প্রবর্তন করিয়াছে। একই কারণে শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য পোশাকের প্রবর্তন না করিয়া শিক্ষকদের জন্যও পোশাকের প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। ধরা যাউক, কোন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই এক নির্দিষ্ট ধরণের উত্তরীয় পরিধান করিতে স্বীকৃত হইলেন; বিদ্যালয় নিজ ব্যয়েই ঐ ধরণের উত্তরীয় প্রস্তুত করাইয়া শিক্ষকদের উপহার দিতে পারে। বিদ্যালয়ের পোশাক নির্বাচন-কালে উহা যাহাতে ব্যয়সাধ্য না হয় এবং উহা যাহাতে রুচিসম্মত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ছাত্র-জনতাকে ছাত্র-সমাজে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি—বিদ্যালয় পোশাক

নিজস্ব পোশাক ব্যতীত বিদ্যালয়ের নিজস্ব সঙ্গীত থাকাও বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আদর্শের প্রতি সভ্যদের আনুগত্য ও ভালবাসা জন্মাইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটতর করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গীত, বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রতীক হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের ছবি, উহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছায়াছবি ইত্যাদি প্রদর্শনের দ্বারাও বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যে একাত্মানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়।

বিদ্যালয় সঙ্গীত

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বারা ঘনিষ্ঠতা এবং একাত্মানুভূতি যতখানি

জাগ্রত হয় অন্য কিছুতে ততখানি হয় না। তাই প্রতি শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে এবং বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা স্থাপনের প্রচুর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়-জীবনে উপযুক্ত "প্রতিষ্ঠান্" (Institution) গঠনের দ্বারাই উপরি-উক্ত সুযোগ যথাযথভাবে সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে হাউস (House), ক্লাব (Club), ইউনিয়ন (Union) ইত্যাদি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। ঐসব প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দের উপর বিদ্যালয়-সমাজের ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয় সমাজের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় দুইটি নীতি প্রধানতঃ মনে রাখিতে হইবে—

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি

১। একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিদ্যালয়ের সকলের মিলনক্ষেত্র হইবে অপর দিকে আবার প্রতিষ্ঠানগুলি এমন ধরণের হইবে যে, সভ্যেরা তাহাদের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে (Group) অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইবে। ধরা যাউক, সমগ্র বিদ্যালয়কে চারিটি হাউস (House)-এ বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক হাউস আবার শ্রেণী হিসাবে, আগ্রহ হিসাবে বা অন্য কোন নীতির ভিত্তিতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত না হইলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ (Personal relationship) স্থাপন সম্ভব হয় না এবং সকলে বিদ্যালয়-জীবন হইতে সমানভাবে উপকৃত হইতে পারে না।

২। বিদ্যালয়ের সকল প্রতিষ্ঠানই গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়-জীবন পরিচালনে ছাত্রেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে ইহাই আশা করা যায়—তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবে ইহা সঙ্গত বিবেচনা করা হয় না। বিদ্যালয়-সমাজ ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত। তাহাদের সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষকগণ যে তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিতে পারেন এ ধারণা ভ্রান্তিপ্রসূত। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার সাধারণতঃ ছাত্রদের উপর থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনেকের এইরূপ ধারণা যে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মিলনেই শুধু শিক্ষালাভ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরা শিক্ষকদের নিকট হইতে যে পরিমাণ শিক্ষা পায় পরস্পরের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা অল্প শিক্ষা পায় না। তাই বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ, ছাত্র-শিক্ষক

সম্বন্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ছাত্রদের উপর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব থাকিলে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ অন্তরঙ্গতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পারস্পরিক সম্বন্ধ—পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠে। পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি ঘনিষ্ঠ হয় এবং উহারা যদি উদ্দেশ্যের পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে সমাজ-জীবন শিক্ষাপ্রদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে চলিতেছে, বলা যাইতে পারে।

পারস্পরিক সম্বন্ধ সাধারণতঃ তিন প্রকার হইতে পারে :—

(ক) মিত্রতা (Friendship), (খ) শত্রুতা (Hostility), (গ) নিরপেক্ষতা (Neutrality)। যখন পরস্পরের চাহিদা পরস্পরের নিকট পরিপূরক থাকে, অর্থাৎ যখন একের চাহিদা পূর্ণ হইলে, স্বাভাবিক ভাবেই অপরের চাহিদা পূর্ণ হয়, তখনই মিত্রতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। পুত্র তৃপ্তিপূর্বক আহার করিলে, মাতা এবং পুত্র উভয়ের চাহিদাই (বিভিন্ন হইলেও) একসঙ্গে পূর্ণ হয়; তাই মাতাপুত্রে মিত্রতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র সহজতর করার নিমিত্ত আন্দোলন চালাইয়া ছাত্রেরা সফলকাম হইল। সকল ছাত্র হয়ত আন্দোলনে যোগ দেয় নাই তবু সকলের চাহিদাই পূর্ণ হইল। এই ক্ষেত্রেও ছাত্রদের পারস্পরিক চাহিদার মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নাই, তাই তাহাদের মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে। মিত্রতার সম্বন্ধ আবার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। ইহার আলোচনা পরে করা যাইবে। মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই পারস্পরিক সম্বন্ধ শিক্ষাপ্রদ হয়—একে অপরের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে—আলোচনার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে সহজে অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়।

যখন পারস্পরিক চাহিদা বিরুদ্ধমুখী থাকে (Contradictory)—অর্থাৎ যখন একের চাহিদা পূর্ণ হইলে অপরের চাহিদা স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যর্থ হয়, তখনই শত্রুতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। বড় সন্দেশটি যদি ছোট ভাই পায়, তবে বড় ভাই তাহা পাইতে পারে না, শ্রেণীতে প্রথম পুরস্কার যদি একটি ছেলে পায় তবে অপরাপর প্রার্থীদের উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়—তাই তাহাদের মধ্যে শত্রুতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। যেখানে চাহিদায় চাহিদায় প্রতিযোগিতা, সেখানেই পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

মিত্রতার সম্বন্ধের মত শত্রুতার সম্বন্ধও বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। পারস্পরিক শত্রুতার সম্বন্ধ কুশিক্ষাপ্রদ ও অতৃপ্তিকর।

আবার একের চাহিদার সহিত, অপরের চাহিদার যখন কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন পরস্পরের মধ্যে নিরপেক্ষতার ভাব দেখা দেয়। পরস্পর নিরপেক্ষ থাকিলে, সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না এবং একের নিকট হইতে অপর কোন শিক্ষাই গ্রহণ করিতে পারে না।

বিদ্যালয় সমাজে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে—

১। **ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ**—ছাত্রে ছাত্রে পারস্পরিক সম্বন্ধ হয়ত বা ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা-অনুরাগ একস্তরের হওয়ার নিমিত্ত, ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ অন্তরঙ্গতর হয়। আবার, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ যত অধিক পরিমণে হওয়ার সুযোগ আছে, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ তত অধিক পরিমাণে হওয়ার সুযোগ নাই। অধুনা, অধিকাংশ ছাত্রই, নানা কারণে গুরুজনদের প্রতি (হয়ত বা নিজেরই অজ্ঞাতে) বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া বিদ্যালয়ে আসে; ইহার ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ, অনেক সময় আশানুরূপ হয় না। তাই, একথা বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ হইতে যে পরিমাণ শিক্ষা হয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ হইতে সেই পরিমাণ শিক্ষা হইতে পারে না। ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধকে কাজে লাগাইলে, শিক্ষালাভ যে অনেক সহজ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা যে, পরীক্ষার পূর্বে কয়েকজন সতীর্থ একত্র মিলিয়া আলোচনা করিলে শিক্ষালাভ দ্রুততর হয়।

ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের গুরুত্ব

কাজেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলে, বিদ্যালয়ের কাজ আপনা হইতেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে।

বিদ্যালয়ে, ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই **তারকা** সম্বন্ধের কথা বলিতে হয়। একটি ছেলে এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, অনেক ছেলেই তাহার বন্ধু হইতে চায়। যখন দেখা যায় যে, পাঁচ বা ততোধিক ছেলে একটি ছেলেকে বন্ধুরূপে পাইতে চায়, তখন ঐসব ছেলেদের মধ্যে তারকা

তারকা সম্বন্ধ

সম্বন্ধ (star relationship) গড়িয়া উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে। তারকা সম্বন্ধকে নক্সাকারে নীচে প্রকাশ করা হইল। এখানে এক-একটি বৃত্ত, এক-একটি ছাত্রের প্রতীক এবং তীর চিহ্ন (→) বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।
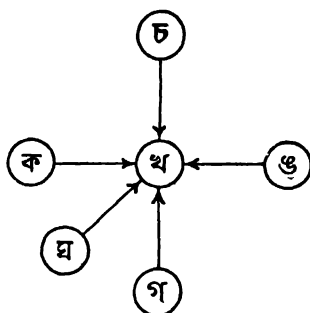
তারকা সম্বন্ধ

তারকাটি (খ) যদি ভাল হয়, তবে, তারকা সম্বন্ধ অনেক সময় শিক্ষাপ্রদ হয়। তারকার বন্ধুত্ব প্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে তাহার প্রভাব বিস্তারিত হয়; নিজের অজ্ঞাতেও উহারা তারকার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খুব বেশী ছাত্র একজনের বন্ধুত্ব প্রার্থী হওয়া ভাল নহে; তাহা হইলে, অনেক ছাত্রকেই বন্ধুত্বের প্রতিদান পাওয়ার আশায় নিরাশ হইতে হয় এবং উহার ফলে তারকার অনুগতদের মধ্যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। কাজেই অনুকরণযোগ্য ছাত্রকে ঘিরিয়া ছোট ছোট তারকাদল বিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠিলে ভাল হয়। কিন্তু, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একই শ্রেণীতে খুব বেশী তারকাদল থাকিলে, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতে পারে।'

বিপদ ঘটে, যখন অনুকরণের অযোগ্য ছাত্র তারকা হইয়া বসে। অনুসন্ধান করিয়া এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে-সব ছাত্র শিক্ষকদের যত অসুবিধায় ফেলিতে পারে, বা বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে তাহারাই তারকা হইয়া বসে। ঐরূপ ক্ষেত্রে তারকা-সম্বন্ধ কুশিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠে।

তাই শিক্ষকের কর্তব্য, কৌশলে, অনভিপ্রেত তারকা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া অভিপ্রেত তারকা সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা।

কৈশোরে ছাত্রদের মধ্যে **যুগল** (Pair) সম্বন্ধও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন দুইটি ছাত্র, পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুরূপে কামনা করে তখনই যুগল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে—

যুগল সম্বন্ধ

যুগল সম্বন্ধ
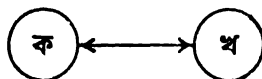
যুগল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিলে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মনে একটা নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের নিকট বিদ্যালয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এত সমাহিত থাকে যে, বিদ্যালয়ের অপরাপর বাঞ্ছিত প্রভাব উহাদের উপর অল্প ছাপ ফেলিতে পারে। অনেক সময় আবার যুগল সম্বন্ধের ভিত্তি হয়, কোন অবাঞ্ছিত ভাব, চিন্তা এবং বিষয় পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগ। ইহা খুবই কুশিক্ষাপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যুগল সম্বন্ধ যাহাতে খুব গাঢ় হইতে না পারে, এবং অবাঞ্ছিত বিষয়ের ভিত্তিতে যাহাতে উহা গড়িয়া না উঠে, সে দিকে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হয়।

ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের মধ্যে, শৃঙ্খল (Chain) সম্বন্ধেরও উল্লেখ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ছাত্রের মধ্যে এমন সম্বন্ধ দেখা দেয় যে তাহাদের একে অপরকে বন্ধু হিসাবে কামনা করিয়া থাকে।

শৃঙ্খল সম্বন্ধ

শিকল সম্বন্ধ
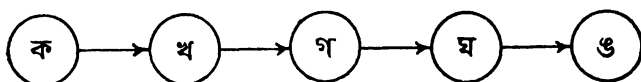
শৃঙ্খল সম্বন্ধ গাঢ় হয় না—তবে কোন উত্তেজনার কারণ ঘটিলে এবং কোন বিষয়ে স্বার্থের অল্প-স্বল্প সংযোগ থাকিলেই, ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছাত্রগণ দল হিসাবে কাজ করে। দলগত ভাবে ইহারা, অনেক সময়ই অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত হয়। তাই, ঐ ধরণের সম্বন্ধের প্রতি শিক্ষককে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। গাঢ় না হওয়ার দরুণ, ঐ ধরণের সম্বন্ধ শিক্ষা ক্ষেত্রে

খুব ফলপ্রসূ হয় না। তবে দলগত কাজের সময় শিক্ষক ঐ ধরণের সম্বন্ধ-যুক্ত ছাত্রদের একদলে রাখিলে হয়ত সুফল পাইতে পারেন।

উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের সম্বন্ধ-ই মিত্রতাপ্রসূত সম্বন্ধ। শক্রতা-প্রসূত সম্বন্ধও ঐ তিনরূপ ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ পাঁচ বা ততোধিক ছাত্রের মধ্যে এমন সম্বন্ধ হইতে পারে যে, তাহারা একটি ছাত্রকে বর্জন করিতে চাহিতেছে; আবার এমনও হইতে পারে যে, দুইটী ছাত্র, পরস্পরকে বর্জন করিতেছে; এমনও হইতে পারে যে ৫।৬টি ছাত্র একে অপরকে বর্জন করিতেছে। ছাত্রে ছাত্রে শক্রতার সম্বন্ধ খুবই ক্ষতিকর। ইহা বিদ্যালয়ের আবহাওয়া দূষিত করে এবং ছাত্রদের চারিত্রিক অধোগতি ঘটায়। বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য যে লেখাপড়া, তাহা দূরে সরিয়া যায়। দলগতভাবে, অর্থাৎ যখন এক তারকার দল, অপর তারকার দলের সহিত বা এক যুগলদল, অপর যুগলদলের সহিত শক্রতায় লিপ্ত হয়, তখন ইহা সর্বাধিক ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষককে, বিদ্যালয় হইতে শক্রতার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—যে সব কারণে শক্রতার সম্বন্ধ জন্মাইয়া থাকে, তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে।

শক্রতাপ্রসূত সম্বন্ধ

নিরপেক্ষতার সম্বন্ধও শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। কোন ছাত্রের সহিত যদি অপরাপর ছাত্রের নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কোন কারণে ছাত্রটি বিদ্যালয় সমাজের সভ্য হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহার মনে নিরাপত্তা-বোধের অভাব ঘটিবে। বিদ্যালয় সমাজ হইতে সে সকল প্রকার শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে—পুঁথিগত বিদ্যাব্যতীত, তাহার আর কোন শিক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষক মহাশয়দের চেষ্টা করিতে হইবে যে, কোন ছাত্র যেন বিদ্যালয় সমাজের বাহিরে পড়িয়া না থাকে—কাহারও সহিত অপরাপর ছাত্রদের যেন নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ গড়িয়া না উঠে।

নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ

ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ—বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকই বিদ্যালয় সমাজের নেতা। ছাত্রদের সহিত তাহার যথাযথ সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি নেতার কাজে কিছুতেই সফল হইতে পারেন না। ব্যক্তি হিসাবে, শিক্ষকই বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক। তাই তাঁহার সঙ্গে

যে ছাত্রের যথাযথ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে না পারে, তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ লওয়া সম্ভব নহে।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রথম বর্ণিত তিন ধরণের (মিত্রতা, শত্রুতা ও নিরপেক্ষতা) সম্বন্ধই হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সর্বদা মিত্রতার সম্বন্ধ থাকে ইহাই বাঞ্ছনীয়। যে সকল ছাত্র, একটু আত্মকেন্দ্রিক (Introvert)—বেশী কথাবার্তা বলে না এবং পড়াশুনায় তেমন ভাল নহে, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময়ই শিক্ষকের নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ জন্মিয়া থাকে। শিক্ষকও তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে মোটেই অবহিত থাকেন না। তাহারা প্রয়োজন বোধেও শিক্ষককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে ভয় পায়। ফলে অনেক সময়ই তাহারা পাঠ বুঝিতে না পারিয়া পিছাইয়া যায় এবং দুষ্টু ছেলেদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ না থাকায়, পাঠেও অনুরাগ রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয়। শিক্ষকের দ্বারা তাহারা প্রভাবিতও হইতে পারে না।

শিক্ষকের সহিত ছাত্রের নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ

কিন্তু নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ অপেক্ষা, শত্রুতার সম্বন্ধ আরও অনেক ক্ষতি-কর। বর্তমানে, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে, শিক্ষক এবং ছাত্রের চাহিদা যেন পরস্পর-বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষক যাহা চাহেন, ছাত্রদের বাসনা যেন তাহার বিপরীত। শিক্ষকের ছাত্রদের পড়াশুনা করাইতে ইচ্ছা, কিন্তু ছাত্রদের ঐ কাজেই মাথাব্যথা—শিক্ষকের ইচ্ছা ছাত্রদের পড়ার ফাঁকি ধরিবেন আর ছাত্রদের চেষ্টা, তাহারা ফাঁকি দিবেই। ছাত্রদের ইচ্ছা খেলা-ধূলা, গল্পগুজবে তাহারা দিন কাটাইবে আর শিক্ষক ঐ ধরণের জীবন কাটানোকে অবাঞ্ছিত মনে করিবেন। ছাত্রের চেষ্টা নকল করিয়া বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, কয়েকটি প্রশ্ন শিখিয়া পরীক্ষায় পাশ করিবে, আর শিক্ষকের চেষ্টা তিনি উহা কখনও হইতে দিবেন না। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে যেন সর্বসময়, সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। কঠিন শাসন, খাম খেয়ালী শাসন এবং পিতামাতার পরস্পর-বিরোধী শাসনের ফলে, অনেক সময় ছাত্রদের মনে তাহাদের সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং বিদ্যালয়ে

শিক্ষকের সহিত ছাত্রের শত্রুতার সম্বন্ধ

আসিয়া ঐ সম্বন্ধ পিতামাতার প্রতীক হিসাবে শিক্ষকের উপর আরোপিত হয়। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত শক্রতার সম্বন্ধ দূর করিয়া মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক এবং ছাত্রের চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি ঐ বিরোধ জন্মাইয়া থাকে, তবে উহা সর্বপ্রযত্নে দূর করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যে, ছাত্রেরা কেন পড়াশুনা করিতে চায় না? পূর্ব শ্রেণীর পাঠ যথাযথভাবে শিক্ষা না করার দরুণ সে হয়ত বর্তমান পাঠ বুঝিতেছে না। তাহাকে কেবলমাত্র শাসন না করিয়া, ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়া পূর্বের শিক্ষার দুর্বলতা দূর করিয়া দিতে পারিলে, হয়ত বা পাঠে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ফিরিয়া আসিতে পারে। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি দূর করিতে পারিলে হয়ত পরীক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষককে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হইবে না। সংক্ষেপে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি, বদ্‌লাইতে পারিলেই, ছাত্র-শিক্ষকে শক্রতার সম্বন্ধ দূর হইয়া মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ—বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধের গুরুত্বও কম নহে। শিক্ষকদের মধ্যে যদি নিরপেক্ষতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বিদ্যালয়ের কাজে আগ্রহশীল নহেন। কারণ বিদ্যালয়ের কাজে আগ্রহশীল হইলে, উহার মাধ্যমেই, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিত। অপর দিকে ইহাও বলিতে পারা যায় যে, শিক্ষকে শিক্ষকে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বিদ্যালয়ের কাজে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই বিদ্যালয়ে, শিক্ষকদের চায়ের ক্লাব (Tea club) প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়া, তাহাদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমানে শিক্ষকে শিক্ষকে কখনও কখনও শক্রতার সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর শিক্ষকদের মধ্যেও ঐ সম্বন্ধ খুব বেশী করিয়াই দেখা যায়। ইহার ফলে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া দূষিত হইয়া পড়ে, এবং অনেক সময় ছাত্রেরাও ইহাতে জড়াইয়া পড়ে। এই

অবস্থার পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপে বিদ্যালয়ের তিন ধরণের সম্বন্ধই (ছাত্র-ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষক) যথাযথভাবে গড়িয়া না উঠিলে, বিদ্যালয় সম্বন্ধ সুশিক্ষাপ্রদ হইতে পারে না।

সমাজ বিবর্তন (Social Change)

জীবের মতই সমাজ ও পরিবর্তনশীল; জীবের মতই সমাজের গঠন (structure) আছে; জীবে জীবে যেমন পার্থক্য থাকে সমাজে সমাজেও সেইরূপ পার্থক্য আছে। সমাজের গঠন (Structure), তাহার প্রতিষ্ঠানগুলির (Institutions) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরণের সমাজে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। যখন কোন সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধিত হয় বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের, গঠনভঙ্গী, রীতিনীতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হইয়া উহারা নবরূপ ধারণ করে, তখন সমাজের পরিবর্তন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসাধারণের জন্য প্রচুর মদ্যাগার (Pubs) আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান, এখনও গজায় নাই। আবার পাশ্চাত্য দেশের পরিবারের গঠনভঙ্গী, আদর্শ ইত্যাদির সহিত, আমাদের দেশের পরিবারের গঠনভঙ্গী ইত্যাদির অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানিক পার্থক্যের জন্যই পাশ্চাত্য সমাজ ও আমাদের সমাজের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজের গঠন উহার প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল

কোন সমাজেরই প্রতিষ্ঠানগুলি চিরদিন একভাবে থাকে না। আমাদের দেশের সমাজে বর্তমানে গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে (Factory, Joint Stock Company etc); সামাজিক ক্ষেত্রেও, ক্লাব্ প্রভৃতি নানা ধরণের নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। পরিবার প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাতন প্রতিষ্ঠান নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার ফল হইতেছে, আমাদের সমাজের বিবর্তন।

প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন

কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বা তাহাদের রূপ পরিবর্তিত হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সমাজ বিবর্তনের কারণ নিহিত রহিয়াছে। প্রথমত বলিতে পারা যায় যে, প্রাকৃতিক কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে যদি কোন সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়া যায়, তবে সেই সমাজের পরিবারের গঠনভঙ্গী এবং আদর্শের পরিবর্তন হইবে ইহা অপরিহার্য (উহা পুরুষপ্রধান পরিবার হইতে, স্ত্রীপ্রধান পরিবারে পরিবর্তিত হওয়া আশ্চর্য নহে); আবার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে হইতে থাকিলে, উৎপাদনে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রায় বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাকৃতিক কারণে সমাজের পরিবর্তন

প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত, সামাজিক কারণেও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ষ্টিম ইঞ্জিন এবং কাপড়ের কল আবিষ্কারের ফলে, ইংলণ্ডের উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বহু নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফলে সামাজিক বিবর্তন দেখা দিয়াছে।

সামাজিক কারণে পরিবর্তন

মনে রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ম একত্র কাজ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত করে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া বহু সময়সাপেক্ষ। বিশেষ করিয়া একবার যদি কোন সমাজ সুসংগটিত রূপ ধারণ করে, তবে, কালের প্রভাবে, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক কারণে পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন হইলেও, সমাজের লোকের মধ্যে রক্ষণশীলতার জন্য তাহা সাধন করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। বর্তমান ভারতীয় সমাজ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আবার, স্বাভাবিক নিয়মের উপর সমাজের পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে, ঐ পরিবর্তন সুসংহত হইতে পারে না। সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হইলে, অপরাপর

বিধিবদ্ধভাবে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন

প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশ সত্ত্বেও, স্ত্রী-লোকদের সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকারের পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই—বিবাহাদির নিয়ম এবং পরিবারের গঠনভঙ্গীর পরিবর্তন হইতেও সময় যাইতেছে। এইভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র নষ্ট হইলে, সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

এই সব কারণে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক হইতে, একনায়কতন্ত্রে পরিচালিত কয়েকটি দেশ (Russia, Germany, Italy) বিধিবদ্ধভাবে সমাজের পরিবর্তনের (Social change by Social Planning) চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট রাশিয়া, নাৎসি জার্মানি, এবং ফ্যাসিষ্ট ইটালি, নূতন সমাজদর্শন লইয়া জন্মলাভ করে, অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকই ঐ দর্শনে তখনও বিশ্বাসী নহে। দ্রুত ও সুসংহত পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য, তাহারা পূর্ব হইতে স্থির করিয়া লয় কি উদ্দেশ্যে, সমাজের কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করা হইবে এবং কি ভাবে ঐ পরিবর্তনের সূচনা হইবে।

বিধিবদ্ধভাবে সমাজের পরিবর্তন

এই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞান ঐ সব দেশগুলির বিশেষ কাজে লাগে—দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলে, মানুষের চিন্তায়, চরিত্রে এবং ব্যবহারে যে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনটি দেশের পরিকল্পনাই অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিষ্ট ইটালির সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইহার পর হইতে, অনেক অনুন্নত দেশই পরিকল্পনার সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিতেছে (ইজিপ্ট, চায়না)। আমাদের দেশই কিন্তু একমাত্র দেশ যাহা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেছে—আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি, স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, সমাজের সুসংহত পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টায় রত আছে।

কিন্তু এই ধরণের প্রচেষ্টার কিছু কিছু সমালোচনাও হইয়া থাকে।

প্রথমেই বলা হয় যে, একনায়কতন্ত্র ব্যতীত ঐ ধরণের পরিকল্পনা সফল হওয়া সম্ভব নহে। যে সব পরিবর্তনের জন্য, দেশের লোক এখনও প্রস্তুত হয় নাই, প্রথম প্রথম তাহাদের অনেকটা বাধ্যতামূলক প্রবর্তন করিতে হইলে, রাষ্ট্রের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি আশানুরূপভাবে যে সফল হইতেছে না তাহার অন্যতম কারণ এই যে রাষ্ট্রের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতার অভাব। অনেকে একথাও বলেন যে, গণতন্ত্রের বিনিময়ে, আমরা পাঁচশালা পরিকল্পনার সাফল্য চাহি না। তারপর দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইলে, স্বভাবতই তাহাদের স্থায়িত্বে সন্দেহ হয়। পরিবর্তনগুলি স্থায়ী না হইলে এবং রূপায়নে ত্রুটি থাকিলে, সমাজে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সর্বশেষে বলিতে হয় যে পরিকল্পনাকারীরা যদি ভ্রান্ত হন, তবে সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারেন।

দ্রুতভাবে সমাজ পরিবর্তনে অসুবিধা

কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলির দ্রুত পরিবর্তনের চেষ্টা না করিয়াও উপায় নাই। স্বাভাবিক পরিবর্তনের আশায় বসিয়া থাকিলে, ঐ পরিবর্তন সাধিত হইতে হইতে, অগ্রসর দেশের সমাজ আরও অনেকখানি আগাইয়া যাইবে এবং আমরা চিরদিনের মত যেমন পেছনে আছি তেমনি থাকিয়া যাইব। বর্তমানে যখন বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এক সমাজ অগ্রসর থাকিলে এবং অপর সমাজ পশ্চাৎপদ থাকিলে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজের পরিবর্তন আনিতে হইলে, রাষ্ট্রের দক্ষতা খুব বেশী থাকা প্রয়োজন।

সমাজ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ

সমাজ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজ-জীবনের মধ্যেই তাহার সুখ-দুঃখ ও সার্থকতা এবং সমাজের মাধ্যমেই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। একদিন ছিল যখন অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ যে দোষ বা গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, আপনা হইতেই সেগুলি বিকশিত হয়। সমাজের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা ইহাদের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপর দিকে, এমন সব দার্শনিকও ছিলেন যাহারা মনে করিতেন, যে জন্মকালে মানুষের মন একটি

পরিষ্কার স্লেটের মত থাকে—অর্থাৎ সে দোষ বা গুণ কিছু লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না; সমাজ তাহার উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে সেইরূপই গড়িয়া উঠে। বর্তমানে, আমরা বেশীর ভাগ লোকই মধ্যপন্থী—আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষ কিছুটা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমেই তাহার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ ঘটে।

সামাজিক সম্বন্ধের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে

শিশু জন্মগ্রহণ করে পরিবারে—পিতা, মাতা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিয়া একটি ছোট সামাজিক দলে (group)। সমাজবিজ্ঞান ইহাকে প্রাথমিক দল (Primary group) বলে। এই ধরণের দলে সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ (personal relationship) স্থাপিত হয়। সভ্যেরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে একত্র বসবাস করেন। মনুষ্য জীবনের যে অন্যতম প্রধান চাহিদা, নিরাপত্তাবোধ (Need of security) তাহা ঐ ধরণের বসবাসের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। প্রাথমিক দল বা পরিবার সর্বপ্রকার সমাজ সম্বন্ধের ভিত্তি। ঐ ধরণের দলে বসবাসের ফলেই শিশু সামাজিক (Socialised) হইয়া উঠে। পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের চাহিদা তাহার মধ্যে জন্মায়। অপর দিকে, পরিবারে বাস করার ফলে শিশু, অনেক জ্ঞান ও কৌশলও আয়ত্ত করে। কে বাবা, কে কাকা, কে দাদা ইত্যাদি অনেক জ্ঞান এবং কথা বলা, খাইবার পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক জ্ঞানও সে অর্জন করে। কাহার সঙ্গে কি ধরণের ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণার ফলে তাহার চরিত্র গঠনের ভিত্তিও স্থাপিত হয়। সে নিজে, ভাল কি মন্দ, কে তাহাকে ভালবাসে বা কে বাসে না, ইত্যাদি ধারণা জন্মানোর ফলে, তাহার মানসিক স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যের বীজও ঐ সময়ই রোপিত হয়।

পরিবারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ

এইভাবে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রধানতঃ পরিবারেই হইতে থাকে। ইহার পর সে বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয় একটি গৌণ দল (Secondary group)। এখানে পরস্পরের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক বা সহপাঠী সম্বন্ধ একটা কৃত্রিম পরিবেশে স্থাপিত হয়। ফলে এই

পরিবার ও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ

পরিস্থিতিতে শিশুর নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে এই সময় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। বিদ্যালয় বিধিবদ্ধভাবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা করে। সহপাঠীদের মাধ্যমেও শিশু ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচুর সুযোগ পায়—তাহার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক বিস্তারিত হয়। কিন্তু তখনও শিশু পরিবারের উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশের অংশ গ্রহণ

৯।১০ বৎসর বয়স হইতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী পরিবেশ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। শিশু তখন মায়ের কোল ছাড়িয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সহিত খেলাধূলা করিয়া অবসর সময় কাটাইতে চায়। পরিবার হইতে কিছুটা পৃথক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তখন শিশুর মনে দেখা দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া দল গঠনও সে তখন পছন্দ করে। ফলে, সে সমাজের ভালমন্দ ছেলের সংস্পর্শে আসে এবং পরিবেশের ভালমন্দও তাহার উপর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। পুস্তক পাঠ, সিনেমা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের প্রভাবও শিশুর উপর কিছুটা পড়ে।

বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশ

১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতে সমাজ শিশুর উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও তাহার অনেক বাড়িয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রভাবও ঐ সময় তাহার উপর খুব বেশী হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাহার বৃহত্তর সমাজের সহিত পরিচিতি হইলেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে মঙ্গলজনক। দেহে মনে শিশু এই সময় সব রকমের সামাজিক অভিজ্ঞতা গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠে। বয়স্কদের মত সমাজের সব কাজেই সে ছুটিয়া যাইতে চায়। বাহ্যতঃ পরিবারের উপর তাহার নির্ভরশীলতা কমিয়া যায়। সমাজ এবং বিদ্যালয়ে মিলিয়া শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দায়িত্ব এই সময় বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে হয়।

এইভাবে ধীরে ধীরে শিশু পূর্ণ বয়স্ক হয় এবং তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ

পূর্ণ হয়—অর্থাৎ সমাজের পূর্ণ বয়স্কদের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সে সমপর্যায়ে আসে। কিন্তু সমগ্র জীবন ধরিয়াই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে ভাঙ্গন-গড়ন চলিতে থাকে। যতদিন অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষমতা থাকে ততদিনই শিক্ষা চলিতে থাকে এবং যতদিন শিক্ষা চলে, ততদিনই ব্যক্তিত্বের ভাঙ্গন-গড়ন চলে।

সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার—বিদ্যালয়ের মত শিক্ষাদানের নিমিত্ত পরিবারের স্বষ্টি হয় নাই। পরিবার প্রত্যেক সমাজেরই আদি প্রতিষ্ঠান। জন্মমাত্রেই আমরা কোন বিশেষ পরিবারের সভ্য; সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া পরিবারই আমাদের জীবনের প্রধান পরিবেশ রচনা করে। প্রধানতঃ পরিবারকে ঘিরিয়াই আমাদের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে পরিবারের রূপ বা গঠন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন ধরণের পরিবার ব্যতীত আমরা মনুষ্যসমাজ কল্পনাই করিতে পারি না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য মানুষের নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক; পরিবারের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলেই মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধের স্বষ্টি হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলে শিক্ষাদান সহজ হয় না। প্রাচীন স্পার্টায় শিশুকে পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধ স্বষ্টি করা হইত; এমন কি প্রাচীন স্পার্টার নাগরিকদের পরিবার-জীবন বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু স্পার্টান শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল খুব শুভ হয় নাই। প্রাচীন ভারতেও ছাত্রেরা পরিবার হইতে দূরে তপোবনে গুরুগৃহে বসবাস করিয়া শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু তাহারা নিজ পরিবার হইতে দূরে থাকিলেও গুরুর পরিবারে সন্তানরূপে গৃহীত হইত। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই অনেক আবাসিক বিদ্যালয় (Boarding School) আছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পাব্লিক স্কুলগুলি (Public School) আবাসিক বিদ্যালয়। আমাদের দেশেও ঐ ধরণের বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, পরিবারের মধ্যে রাখিয়াই শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। ভালবাসা দেওয়া এবং নেওয়ার মধ্য দিয়াই জীবনের নিরাপত্তাবোধ জন্মায়;

পরিবার হইতে দূরে রাখিয়া শিশুর শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে হওয়া কঠিন

পরিবার ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মাইতে পারে না। কাজেই পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইলে ছাত্রের মানসিক অবস্থা শিক্ষার অনুকূল থাকিবে না। কেবলমাত্র বিশেষ কারণে বিশেষ পরিস্থিতিতে আবাসিক শিক্ষা সমর্থন করা যাইতে পারে।

শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত পরিবারের সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের জীবন পরিবার-কেন্দ্রিক এবং জীবনের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। তাই এখনও অধিকাংশ দেশে পরিবারই ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল স্তরেই পরিবার তাহার সভ্যদের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেছে। বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় নাই তখন পরিবারের মধ্যেই প্রায় সকল প্রকার শিক্ষা হইত। চরিত্রবিকাশ, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা প্রভৃতি পরিবারের মধ্যেই হইত। পরিবারে শিক্ষানবিসি করিয়া বৃত্তিশিক্ষা চলিত; এমন কি কিছু কিছু লিখন-পঠনের শিক্ষাও পরিবারের নিকট হইতে পাওয়া যাইত।

শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ পরিবার গ্রহণ করিত

এক হিসাবে বিদ্যালয় অপেক্ষা পরিবারের শিক্ষাদান ক্ষমতা অধিক। পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ত শিক্ষালাভ ঘটে; একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব অন্তরঙ্গ হয়। পরিবারের সভ্যগণ জন্মসূত্রে একাত্মানুভূতি লাভ করে; স্বাভাবিক নিয়মেই তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা গড়িয়া উঠে। অন্তরঙ্গ সহযোগিতার ভিত্তিতেই লোকে পরিবারের মধ্যে জীবনযাপন করে। ফলে পরিবারের মাধ্যমে লব্ধশিক্ষা অতি সহজেই শিক্ষার নিয়ামক হয়। উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে পরিবারকেই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলিতে হয়।

বিদ্যালয় অপেক্ষা পরিবারের শিক্ষাদান ক্ষমতা অধিক

কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক-সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষাদানে পরিবারের অংশ দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের সকল দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। অগ্রসর দেশগুলিতে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাকে (কোন কোন দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়াছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার জন্যও রাষ্ট্র এত অধিকসংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে যে, যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ছাত্রই, পরিবারের সাহায্য ব্যতীত

ঐ সব শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—পরিবারে শিক্ষানবিসির দ্বারা বর্তমান সমাজের জটিল বৃত্তিগুলির মধ্যে কোনটির জন্যই উপযুক্ত প্রস্তুতি সম্ভব নহে। চরিত্রের বিকাশ সাধন, সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বও দিন দিনই বিদ্যালয়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পরিবারের সভ্যগণের কর্মস্থল বিভিন্ন হওয়ার দরুণ পূর্বের মত আর অধিকাংশ সময়ই একত্র জীবনযাপন করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মাতাপিতা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বা ক্লাবে কাটান; সন্তানদের দিনও বিদ্যালয় এবং ক্লাবের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া কাটিয়া যায়। কেবলমাত্র এক বাড়ীতে সকলে নিদ্রা যান এবং প্রাতরাশ ও সান্ধ্যভোজন একত্র সম্পন্ন করেন। যান্ত্রিক সমাজে বাড়ীর পরিধিও নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—একখানা ঘর নিয়েই হয়ত বাড়ী। ঐ ধরণের বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকাও সম্ভব নহে। বাড়ীর পারিপার্শ্বিকও কুশিক্ষাপ্রদ। নানা কারণে পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন পূর্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। যৌথ পরিবার প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; যেখানে তাহাদের অস্তিত্ব এখনও আছে, সেখানেও সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক কলহের ফলে পরিবার শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক ছোট পরিবারের শিক্ষাদানের ক্ষমতা নানা কারণে খুবই কমিয়া গিয়াছে—পরিবারের মধ্যে ধর্মের অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উৎসবাদির অনুষ্ঠান দিন দিনই কমিয়া আসার দরুণ উহা ধর্মশিক্ষা এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে আর কাজ করিতেছে না। বর্তমানে পিতামাতার যে আর্থিক সামর্থ্য, তাহাতে বড় সামাজিক উৎসব কম লোকই করিতে পারেন। ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়ার দরুণ অনেক পরিবারেই কোন ধর্মাচরণের ব্যবস্থা থাকে না। দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের ফলে মাতাপিতা এবং সন্তানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এত পার্থক্য হইয়া পড়িতেছে যে, কৈশোরকাল হইতেই মাতাপিতার সহিত ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ তিক্ত হইতে আরম্ভ করিতেছে। তারপর জীবিকা সংগ্রহে পিতা দিন দিন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন যে, সন্তানদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিশেষ কিছু থাকিতেছে না। অধিকন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল

বর্তমান সমাজে পরিবারের শিক্ষাদান ক্ষমতার হ্রাস

সমাজে মানুষ হওয়ার দরুণ মাতাপিতার চরিত্রেও হয়ত আশানুরূপ গুণাবলী বিকশিত হয় নাই। ফলে, তাহাদের প্রভাব সন্তানদের মধ্যেও হয়ত অবাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করিতেছে। সর্বশেষে শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং (বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে) শিক্ষাদানকার্য জটিল হওয়ার ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না; অনেক সময়েই গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করার দরুণ মাতাপিতা সন্তানকে শিক্ষাদানের চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেছেন।

পরিবার ও বিদ্যালয়—যান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের স্থান যতই সংকুচিত হইয়া আসুক না কেন উহা যে মনুষ্যজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে আজও কোন সমাজ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। কোন সমাজই পরিবারকে উঠাইয়া দিবার কল্পনা আজও করে নাই। আমাদের জীবনে আজও পরিবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের সভ্যতা পরিবারকেন্দ্রিক—পরিবার বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক শাস্ত্রীয় অনুশাসন, নানা ধরণের গ্রন্থ, নানারূপ সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আজও আমাদের জীবনে কার্যকরী আছে। আমাদের সব রকম নীতিবোধ ভাঙ্গিয়া পড়া সত্ত্বেও পারিবারিক নীতিবোধ এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। এখনও আমাদের পারিবারিক জীবন অন্ততঃ কতকাংশে স্নেহ, প্রীতি ও ত্যাগের ভিত্তিতে গঠিত। এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের অধিকাংশ সময় পরিবারের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কাজেই পরিবারকে বাদ দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা কল্পনা করাও যায় না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও বর্তমানে পরিবারের সংহতি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা হইতেছে। পরিবারের সহিত অন্তরঙ্গ সংযোগ ব্যতীত কোন অবস্থায় কাহারও শিক্ষা অগ্রসর হইতে পারে না। তাই ছাত্রের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং পরিবারের অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করিয়া, বাড়ীতে ছাত্র সেই বিষয়ের পাঠ শেষ করিতে পারে। আবার বাড়ীতে কোন বিষয় জানার জন্য তাহার মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইলে বিদ্যালয়ে সে তাহার সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারে। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা বিপরীত হইলে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া ছাত্রের

আর গত্যন্তর থাকে না। ধরা যাউক, বিদ্যালয়ে যদি তাহাকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং বাড়ীতে যদি তাহাকে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখা হয় তাহা হইলে শিশু, বিদ্যালয় বা বাড়ী কোথাও আশানুরূপভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না। শিক্ষাকার্যে বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। যে সব ছাত্র আবাসিক বিদ্যালয়ে বাস করিতেছে তাহাদের পরিবারের সঙ্গেও বিদ্যালয়ের সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাকালে ছাত্র, মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবে এবং শিক্ষা শেষে সে আবার বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইবে। তাই বিদ্যালয় পরিবারের সঙ্গে তাল রাখিয়া না চলিতে পারিলে তাহার শিক্ষা পারিবারিক জীবনে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। বিদ্যালয় এবং পরিবার পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে একের দ্বারা অপরের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা হওয়া সম্ভব। পরিবারের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাই বিদ্যালয় কর্তৃক পরিবার প্রভাবিত হইলে সেই প্রভাব সহজে সমাজেও ছড়াইয়া পড়িবে। অপরদিকে সমাজের প্রভাব পরিবারের উপর প্রতিফলিত হইয়া বিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পরিবারের মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব।

সাধারণতঃ **অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (Parent-Teacher Association)** গঠন করিয়া বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের দেশে খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই ঐ ধরণের সমিতি সাফল্যের সহিত কার্য করিতেছে। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় খুব অল্পসংখ্যক অভিভাবকই উপস্থিত হন—আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ঐ সব সভায় অভিভাবকদের আগ্রহ জাগরিত করা সম্ভব হয় না। কোন সভায় যদি কিছু সংখ্যক শিক্ষক উপস্থিতও হন, তথাপি হয় তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করেন না, নয়ত শুধু বিদ্যালয়ের কার্যের ধ্বংসাত্মক (destructive) সমালোচনা করিয়া চলেন। এরূপ অবস্থায় অনেকে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন

সন্দেহ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে; আমরা যথাযথভাবে উহা গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়াই উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির সৃষ্টি হইতেছে। প্রথমতঃ, সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করিলে এবং বৎসরে একবার বা দুইবার উহার সভা আহ্বান করিলে ঐ সভায় সাধারণ আলোচনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ফলে, অভিভাবকগণ ঐ ধরণের সভায় উপস্থিত হইতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। পিতামাতা যদি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার আলোচনা হইতে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত পাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের গরজেই ঐ সব সভায় উপস্থিত হইবেন।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক শাখার (section) জন্য পৃথক পৃথক সমিতি স্থাপিত করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতির অভিভাবকদের তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাসমস্যা অনুসারে আবার ৪।৫ জনের ছোট ছোট দলে (group) বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। ধরা যাউক, অষ্টম শ্রেণীর "ক" শাখার পাঁচটি ছাত্র অঙ্কে পিছাইয়া পড়িয়াছে; ঐ পাঁচটি ছাত্রের অভিভাবকদের একদলভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া অঙ্কের শিক্ষকের সহযোগিতায় ঐ পাঁচটি ছাত্রের অঙ্কের জ্ঞান উন্নততর করিবার নিমিত্ত কি কি পন্থা অবলম্বন করা যায় তাহা স্থির করিবেন; ঐ পন্থাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি শিক্ষক এবং কোন্ কোন্‌টি অভিভাবক অবলম্বন করিবেন তাহাও আলোচনা সভায় স্থির হইবে। উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি পরিচালিত হইলে আশা করা যায় যে, অভিভাবকগণ ঐ সমিতির কার্যভার ধীরে ধীরে নিজেদের স্কন্ধেই গ্রহণ করিবেন। অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানের শিক্ষায় উদাসীন এই ধারণা সত্য নহে। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা অনেকটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের জীবন ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ; উদ্দেশ্য সাধনে বিফলমনোরথ হইলেই সংশ্লিষ্ট পক্ষ পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, অভিভাবক বা ছাত্র কাহারও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী চলিতেছে না বলিয়া শিক্ষক অভিভাবকের উপর এবং অভিভাবক শিক্ষকের উপর

দোষারোপ করিয়া থাকেন। পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা যদি সত্য সত্যই ছাত্রদের উন্নতির উপায় বাহির করা যায় তাহা হইলে আমরা আর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিব না। কাজেই সম্পূর্ণরূপে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তবে একথা সত্য যে, আমাদের দেশে এখনও অনেক অভিভাবক আছেন যাঁহারা উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু এমন কোন অভিভাবক নাই যিনি নিজ সন্তানের শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনও না কোনপ্রকারে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। অভিভাবকদের নিজেদের শিক্ষার স্তর বিবেচনায় অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। অভিভাবকগণ শিক্ষার যে স্তরেই থাকুন না কেন কিভাবে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতিতে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতেই অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার সার্থকতা। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং সাধারণভাবে শিক্ষা সমস্যার আলোচনার নিমিত্তও মধ্যে মধ্যে ঐ সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। ঐ ধরণের অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকিতে পারে ; ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। শিক্ষা-পদ্ধতি বা অন্য কোন দিক হইতে বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ সংস্কার প্রবর্তিত হইলে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় তাহার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, দিন দিনই শিক্ষাদান কার্য অধিকতর বৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িতেছে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করিতে হইলে অনেক সময় গতানুগতিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে ঐসব বিপরীত আচরণ সম্বন্ধে অভিভাবকদের সহিত আলোচনা না করিলে তাহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে পারে। আলোচনা সভা বা অনুরূপ মাধ্যমে অভিভাবকদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানদানের প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি ইহা নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মায়তন—বিদ্যালয়ে আমরা যে ধরণের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি তাহার নিমিত্ত ধর্মায়তনের সৃষ্টি হয় নাই।

ঈশ্বরকে যাহাতে মানুষ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার জন্যই ধর্মায়তনের সৃষ্টি। সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন সমাজ এখনও পৃথিবীতে নাই। প্রাচীনকালে ভগবানের সঙ্গে মিলনই মানুষ, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। ধর্মায়তনগুলি মানুষ কিভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারে এই শিক্ষাই প্রদান করিত। তাই ধর্মায়তনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন ভারতে সকল শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল (বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত)। ইউরোপে মধ্যযুগে গির্জা বা খৃষ্টীয় মঠগুলিই ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান যুগে ধর্মশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে করা হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যৎ সমাজের সভ্যদের ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা দান সামাজিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম প্রতিষ্ঠান-গুলি যদি ধর্ম শিক্ষাদানের কার্য যথাযথভাবে করিতে না পারে তাহা হইলে বিদ্যালয়কে আংশিকভাবে হয়ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অপর দিকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মশিক্ষা নীতিশিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে। অনেকে মনে করেন জীবনের আদর্শ নিরূপণ এবং ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে ধর্মশিক্ষার বিশেষ স্থান আছে। ভারতবর্ষে আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী এতদিন যে ধর্মশিক্ষার ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের পুরাণ পাঠ, কথকতা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্মায়তন ছাত্রদের চরিত্র বিকাশে বিদ্যালয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দ্রুত পরিবর্তনশীল। পুরাতন ধর্মের অনুশাসন, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমানে কালোপযোগী নহে। ফলে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস দিন দিনই শিথিল হইতেছে। দেবায়তনগুলি পূর্বের মত আর চরিত্র বিকাশে বা ধর্মশিক্ষা দানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আশা করা যাইতেছে যে, সংস্কারের দ্বারা যুগোপযোগী করিতে পারিলে দেবায়তন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান-গুলি পূর্বের মত আবার আমাদের চরিত্র বিকাশে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে। সমাজ হইতে ধর্ম লুপ্ত হইয়া গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ দুঃসাধ্য হইবে। বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে যে ধরণের সংযোগের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, বিদ্যালয় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও অনুরূপ সংযোগ

থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে। তাই এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংঘ ও যুব আন্দোলন—সংঘ এবং যুব আন্দোলন বর্তমান যুগে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্বে ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়াই সংঘ এবং যুব আন্দোলনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। একটা কোন বিশেষ আদর্শ লইয়া সমাজে সংঘ বা যুব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ধরা যাউক. সুস্থ, সবল শরীর গঠনের নিমিত্ত ব্যায়াম সমিতি অথবা গ্রাম সেবার উদ্দেশ্য লইয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইল। এই সংঘগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রাপ্ত-বয়স্কগণই হয়ত বিশেষভাবে উহাদের সভ্য। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসাবে ঐ ধরণের সংঘ বিদ্যালয়েও স্থাপন করা চলে। চরিত্র শিক্ষা দিতে এবং মনে আদর্শবাদ জন্মাইতে এইসব সংঘ বিশেষভাবে সাহায্য করে। ঐ সব সংঘের সাহায্যে বিদ্যালয় সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রক্ষা করিতে পারে।

বয়স্কদের জন্য সংঘ ব্যতীত বিশেষ করিয়া কিশোর ও যুবকদের জন্য নানাধরণের আদর্শবাদী আন্দোলন রহিয়াছে। উহাদিগকে যুব আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান স্কাউট, এন. সি. সি., আনন্দ মেলা, সি. এল. টি. ইত্যাদিকে আমাদের দেশের যুব আন্দোলন বলা যাইতে পারে। কৈশোরে এবং যৌবনে আমরা স্বভাবতই আদর্শপ্রবণ থাকি। ফলে অতি সহজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উপরি-উক্ত ধরণের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; বস্তুতঃপক্ষে ইহারা তাহাদের মনের স্বাভাবিক চাহিদা (needs) নিবৃত্ত করে। ঐসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ, সহযোগিতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হয়। ঐসব আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রেরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাতে জ্ঞান সংগ্রহও বড় অল্প হয় না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের যুব আন্দোলনের প্রবর্তন করা উচিত এবং যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রই কোনও না কোন আন্দোলনের সভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যে আন্দোলন সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে—বিদ্যালয় শুধু ঐসব আন্দোলনকেই উৎসাহ দিবে।

বিদ্যালয়ে ধর্মসংশ্লিষ্ট যুব আন্দোলনের প্রবর্তন করিবার পূর্বে (যেমন, "কুয়েকার" আন্দোলন) উহা দ্বারা অপরাপর ধর্মের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হইতে পারে কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক আদর্শবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আন্দোলনকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয় অনেক রাজনৈতিক দলই ছাত্রদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যুব আন্দোলন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালয়কে উহাদের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতার— বর্তমান কালে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতারকে বহু লোককে একসঙ্গে শিক্ষাদানের মাধ্যম (Mass media for education) বলিয়া গণ্য করা হয়। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের শিক্ষায়ই উহাদিগকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ অবসর বিনোদনের জন্যই সমাজ উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ অন্তরের চাহিদায় মানুষ ঐসব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করে বলিয়া উহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, কবিগান ইত্যাদির ব্যবস্থা অবসর বিনোদনের জন্যই করা হইত; কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের অবদান কিছু কম ছিল না। বর্তমান জগতে যান্ত্রিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে অবসর বিনোদনের নূতন মাধ্যমরূপে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতারের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী গঠন করিয়া দীর্ঘদিন হইতেই আমরা ছাপাখানাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতেছি। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী থাকিলেও দুঃখের বিষয় এই যে, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষাকার্যে ইহা আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করিতেছে না। বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি এত পুরাতন এবং সংখ্যায় এত অল্প যে, ছাত্রেরা ইহা প্রায় ব্যবহারই করে না। বর্তমানে সরকার উপযুক্ত লাইব্রেরী গঠন এবং তাহার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী গঠনের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাত্র লাইব্রেরী গঠন করিলে চলিবে না; শ্রেণী-লাইব্রেরী, হবিক্লাব লাইব্রেরী ইত্যাদি ছোট ছোট লাইব্রেরী

ছাত্রদের ছোট ছোট দলের (group) ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরীর অংশ হিসাবে স্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বাহিরে সমাজে যে সব ভাল ভাল লাইব্রেরী আছে তাহাদের সহিতও ছাত্রদের সংযোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া বিদ্যালয়েরই কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে যে, অবসর বিনোদনের জন্য, পাঠের জন্য পুস্তক নির্বাচনে রুচিবোধ জন্মানোর দায়িত্বও বিদ্যালয়ের উপরে পড়িয়াছে। শিক্ষার কোন শক্তিশালী মাধ্যম সৃষ্টি করার বিপদ এই যে, তাহা সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষা উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্তমানে এত সব অবাঞ্ছিত ধরণের পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে যে, অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ছাপাখানা কুশিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ সব বই ব্যতীত অন্য ধরণের বই পড়িয়াও যে আনন্দ পাওয়া সম্ভব এই অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে জন্মাইতে হইবে। কাজেই লাইব্রেরীতে বিদ্যালয়ের পাঠের পরিপূরক বই ছাড়াও ছাত্রদের অবসর বিনোদন করার উপযুক্ত বইও রাখিতে হইবে। শিক্ষাদান কালে শিক্ষকগণ শুদ্ধমাত্র "পাঠ্যপুস্তকের" উপর নির্ভর না করিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির প্রতিও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সংক্ষেপে লাইব্রেরীকে বিদ্যালয়ের সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং পাড়ায় যে-সব লাইব্রেরী আছে তাহাদেরও উপযুক্তভাবে শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে লাইব্রেরী

ছাপাখানার মত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানও বর্তমান সমাজে শিক্ষার এক প্রভাবশালী মাধ্যম। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; গ্রামেও ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন ধরণের চলচ্চিত্র হইতে পারে—১। ডকুমেণ্টারী-চিত্র (Documentary)। কোন ঘটনা বা কোন বাস্তব বস্তুর হুবহু বর্ণনার জন্য যে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহাকে ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র বলে। ধরা যাউক, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভার কোন অধিবেশনের ছবি তোলা হইল বা বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীর জীবন সম্বন্ধে কোন ছবি তোলা হইল। ভারত সরকার এবং বাংলা সরকার উভয়েই এই ধরণের অনেক ছবি তুলিয়াছেন এবং

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র

তুলিতেছেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সোজাসুজি ঐ ধরণের ছবিকে ব্যবহার করা চলে। সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া বিধিবদ্ধভাবে ঐ ধরণের চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই করা উচিত। ২। শিক্ষামূলক চিত্র। যে-কোন পাঠের বিষয়বস্তু লইয়া চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা চলে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয় শিক্ষাদানের জন্যই চলচ্চিত্রের ব্যবহার চলিতে পারে। ঐ সব চিত্র ক্লাসে শিক্ষক যেভাবে পড়ান, অনেকটা সেইভাবেই প্রস্তুত করা চলে, এবং শ্রেণী-কক্ষের ভিতরেই তাহা পাঠদানের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ঐ ধরণের চলচ্চিত্র নানাকারণে আমাদের দেশে এখনও খুব বেশী প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের এই অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই। চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যেও বিদ্যালয়ে নানারূপ "শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র" প্রদর্শন করা চলে। ৩। শিশুচিত্র—শিশু এবং বয়স্কদের আগ্রহের ক্ষেত্র ভিন্ন। তাই, সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিশেষভাবে শিশুদের উপযুক্ত সাহিত্য রচনা হইতেছে, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও বিশেষ করিয়া শিশুদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকার শিশু-চলচ্চিত্র প্রস্তুত করার নিমিত্ত বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। বয়স্কদের জন্য প্রস্তুত চলচ্চিত্র দেখিতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে শিশুর রুচির বিকৃতি ঘটিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইতেছে। ভাল ভাল শিশু-চলচ্চিত্রগুলি অবশ্যই বিদ্যালয়ে দেখান প্রয়োজন। ৪। ফিচার ছবি (Feature Film)—বয়স্কদের অবসর বিনোদনের জন্যই ঐ সব চলচ্চিত্রের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় ঐ ধরণের অনেক চলচ্চিত্রই সমাজকে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে; ছাত্রদের পক্ষে ঐ সব চিত্র দর্শনের ফল বিষময় হইতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যেও অনেক চিত্র আছে যাহা জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং চলচ্চিত্র দর্শন ব্যাপারে তাহাদের রুচিবোধ জাগ্রত করিতে পারে। কাজেই বিশেষভাবে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক ঐ ধরণের চিত্রও ছাত্রদিগকে দেখানো প্রয়োজন।

সংক্ষেপে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং বিধিবদ্ধভাবে চলচ্চিত্রকে শিক্ষার প্রয়োজনে নিয়োগ করা উচিত।

বর্তমানে বেতার, বিশেষভাবে শিক্ষার প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে। অনেক বিদ্যালয়েই এখন বেতারযন্ত্র আছে। বিদ্যালয় সময়ের ভিতরেই "বিদ্যার্থীমণ্ডল" নাম দিয়া স্কুলের ছাত্রদের জন্য বেতার হইতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এতব্যতীত "শিশুমঙ্গল" ইত্যাদি নানারূপ সংস্কৃতিমূলক এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বেতার হইতে প্রচার করা হয়। বিদ্যালয়কে শিক্ষাকার্যের জন্য বেতার প্রোগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বেতার

শিক্ষা-প্রদানকারী সমাজ—পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পরিবার, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, সংঘ এবং যুব-আন্দোলন, ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতার শিক্ষাদানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়কে উহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাদের সহিত যোগাযোগে কাজ করিলে সমাজের সহিতও বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হয়। উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সমাজের যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সবগুলিই শিক্ষামূলক—জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষা আবার সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার জনক। যে সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রহিয়াছে—যে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পরস্পরের পরিপূরক এবং ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যের অনুকূল সে সমাজকে শিক্ষা-প্রদানকারী সমাজ (Educative Society) বলা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সমাজ এমন হয় যে, এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা অপর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার বিপরীত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সমাজ-জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা পরস্পর বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে—অর্থাৎ সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সমাজ-জীবন বা ব্যক্তি-জীবন বিকাশের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া থাকে। তাই শিক্ষাদান আমাদের কাছে এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমাজের সবগুলি প্রতিষ্ঠানকেই সংস্কার দ্বারা আরও শিক্ষার অনুকূলে আনিতে হইবে।

যে-কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া পরিবার প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠানের সহিত শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে ঐগুলির সংস্কারের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে।

সরকার এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—এখানে সরকার (Government) এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় এ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার জন্যই সরকারের সৃষ্টি ; আবার সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যদি বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়া থাকে তবে তাহা কিছুটা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে ; সরকার ব্যতীত অপর কেহ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারে না এবং সকল বিদ্যালয়কেই সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়। প্রাচীন ভারত বা প্রাচীন গ্রীসে কিন্তু বিদ্যালয়ের সহিত সরকারের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। অধ্যাপকগণ স্বাধীনভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। রাজা বা সমৃদ্ধিশালী লোকেরা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমিদান করিতেন বটে কিন্তু বিদ্যালয়কে কখনও নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চেষ্টা করিতেন না। শিক্ষাদান ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজা প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না। অধ্যাপকগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অপ্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবার গ্রহণ করিত। আধুনিক কালে কোন সরকারই কিন্তু শিক্ষাদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সমাজকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। তাই অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশগুলি বহুদিন হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করিয়াছে। কেহ শিক্ষা গ্রহণ করিবে কি না তাহা ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের মতামতের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে রাষ্ট্র-জীবনের প্রয়োজনে তাহাকে

শিক্ষাগ্রহণ করিতেই হইবে। বর্তমানে এই নীতি পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই অস্বীকৃত নহে। প্রাথমিক স্তর ব্যতীত শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের চেষ্টার উপর বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে সমাজের সকলে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায় না। অথচ ধনী, দরিদ্র, নগরবাসী, গ্রামবাসী নির্বিশেষে সকলে শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ না পাইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ অবহেলিত হয়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন না করিলে রাষ্ট্রের সকলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাইবে এই আশা করা যায় না। তাই শিক্ষার সকল স্তরেই প্রয়োজনানুসারে যথাযথ বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব সকল গণতান্ত্রিক দেশের সরকারই নিজ দায়িত্ব বলিয়া বর্তমানে স্বীকার করেন। কিন্তু (কমিউনিস্ট দেশের মত) ইহার অর্থ এই নহে যে, সরকার ব্যতীত অপর কেহ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে না। দেশের সকলেরই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী সন্তান-সন্ততির শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে। গণতান্ত্রিক দেশে বে-সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাকে সাধারণতঃ উৎসাহই দেওয়া হয়। কিন্তু যেস্থলে বে-সরকারী প্রচেষ্টার অভাব সেস্থলে সরকারকেই অগ্রসর হইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। দেশের প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্বও সরকারের উপরই ন্যস্ত। বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত যেসব স্থলে উপযুক্ত বে-সরকারী প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকিবে সরকার হয়ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন কিন্তু যেসব স্থলে ঐসব প্রচেষ্টা বিদ্যমান নাই সে-সব স্থলে সরকারকে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে সকল দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট অথবা সরকার কর্তৃক স্থাপিত।

গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারকেই বহন করিতে হয়

কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার জন্মায় না। কমিউনিস্ট দেশে বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ "শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা"র Academic freedom) নীতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

নীতি স্বীকার করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতি স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সরকার নিজ প্রয়োজনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দিবার নিমিত্ত নিজব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন বা বিদ্যালয় স্থাপনের বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবেন কিন্তু শিক্ষাদানে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক দেশে সরকার সাধারণতঃ একটি রাজনৈতিক দল (Party) হইতে গঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার সরকারের হাতে দিলে এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে একটি দলের হাতেই পড়িবে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে ঐ দল উহার প্রাধান্য কায়েম করিতে চেষ্টা করিবে। আবার বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজের উন্নতি যদি আমাদের কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষাকে সরকারের, এমন কি সমাজেরও সম্পূর্ণ অধীন করিলে চলিবে না। অপরদিকে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতেও পারেন না। প্রতি সমাজে কতকগুলি সর্বজনস্বীকৃত নীতি আছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহাতে উহাদের বিপরীত শিক্ষা না দিতে পারে তাহার দিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে যদি কোন বিদ্যালয় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ-সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে ঐ চেষ্টায় বাধা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তারপর সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান যাহাতে মোটামুটি সমান থাকে সেদিকেও সরকারকে দৃষ্টি দিতে হয়। কাজেই আংশিকভাবে বিদ্যালয় যে সমাজের তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে একথা কেহই অস্বীকার করেন না।

বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার সরকারকে কতখানি দেওয়া যাইতে পারে

সরকার এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ক উপরি-উক্ত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে—১। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। সরকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকে না; উহারা সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। ২। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা করার প্রধান দায়িত্ব সরকার বহন

করিয়া থাকেন। কিন্তু বে-সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় বাধা না দিয়া বরং সাহায্যই করা হয়। বিদ্যালয়কে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেও সাধারণতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে উহার স্বাধীনতা খর্ব করা হয় না।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশের সরকার বিদ্যালয় স্থাপনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। বর্তমানে এই নীতির পরিবর্তন হইয়াছে। নীতি হিসাবে দেশের সকল নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল; তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সরকার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফলে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় সরকার তাহাতে সমপরিমাণ অর্থ যোগ করিয়া বে-সরকারী চেষ্টাকে সফল করিতে সাহায্য করেন। বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর উহা পরিচালনে যে পরিমাণ অর্থের অভাব হয় (Deficit grant) সরকার তাহাও পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ যদি সরকারী সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চায় তাহাতেও সরকার আপত্তি করেন না। ফলে পরিচালনার দিক হইতে বিবেচনা করিলে আমাদের দেশে তিন ধরণের বিদ্যালয় আছে, ১। সরকারী বিদ্যালয়, ২। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ৩। স্বাধীন বিদ্যালয়। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোনটি ধর্মসম্প্রদায়, কোনটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, কোনটি নাগরিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান আবার কোনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সরকার ছাত্রদের মাহিনা, শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদির হার বাঁধিয়া দেন। "স্বাধীন বিদ্যালয়ে সরকার কোন সাহায্যও করেন না এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেও চেষ্টা করেন না। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মত স্বাধীন বিদ্যালয়ও ধর্মসম্প্রদায়, সেবাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত হয়। মালিকানার (Proprietorship) ভিত্তিতে

বর্তমানে বিদ্যালয়ের সহিত আমাদের সরকারের সম্বন্ধ

স্থাপিত বিদ্যালয়ও আমাদের দেশে একেবারে বিরল নহে। সংক্ষেপে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকার এখনও বে-সরকারী প্রচেষ্টার উপরই অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি

যথোচিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষালাভ করাই মুখ্য—কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করা হইল ইহা গৌণ—আমরা অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। ধরা যাউক, ছাত্র "বিড়াল" সম্বন্ধে রচনা লিখিবে ইহাই আমার উদ্দেশ্য; এখন সে মুখস্থ করিয়াই রচনা লিখুক আর নিজের ভাষা এবং নিজের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যেই রচনা লিখুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। অনেক প্রাচীন শিক্ষক গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন—'মশাই, আপনাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির ধার ধারি না কিন্তু আমার ছাত্রেরা কখনও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করে না।' কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, কি শিখিলাম অপেক্ষা কিভাবে শিখিলাম তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। শিক্ষায় সংক্রমণ (Transfer in learning) না হইলে শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হয় না। আমরা সকলেই জ্ঞানসমুদ্রেব তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি। জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত যে, কাহারও পক্ষেই কোন বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করাও সম্ভব নয় —যদি একক্ষেত্র হইতে অপরক্ষেত্রে জ্ঞানের সংক্রমণ না হয়। 'বিড়াল' সম্বন্ধে রচনা লেখার ফলে যে-কোন গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু সম্বন্ধে রচনা লেখা আমাদের কাছে সহজতর না হইলে ঐ রচনা লেখার অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। জ্ঞানের একটু উচ্চতর স্তরে উঠিলেই দেখা যায় যে, যেসব ছাত্রের শিক্ষালাভের পদ্ধতি শিক্ষার সংক্রমণে সাহায্য করে না তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ক্রমেই দুরূহ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যাহারা মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে স্কুল ফাইন্যাল মোটামুটি ভালভাবেই পাস করিয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর (মুখস্থ করাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে) দেখা যায় যে, তাহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে

দেখিয়াছি যে, নিষ্ক্রিয় জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে না, কারণ পুস্তক হইতে শিক্ষার্থীর জীবনে ঐ জ্ঞানের সংক্রমণ হয় না। ধরা যাউক বিদ্যালয়ে ছাত্র অঙ্ক কষিতে শিখিল। কিন্তু বাড়ীতে সে মুদির দোকান হইতে ক্রীত জিনিসগুলির মূল্য কষিয়া দিতে পারিল না। আধুনিক কালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiments) করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার সংক্রমণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে শিক্ষায় বিন্দুমাত্রও সংক্রমণ হয় না। অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করিলে শিক্ষার সংক্রমণ' হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাদানকালে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি—প্রাচীন ভারতে পাঠ, আলোচনা, মনন এবং বারবার আবৃত্তি বা অভ্যাসকে শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হইত। অর্থাৎ ছাত্রকেই শিক্ষাকার্যে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইত। প্রাচীন গ্রীসেও পাঠ, আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ করিত। কিন্তু মানবতাবাদা এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদীদের প্রভাবে শিক্ষা যখন জীবনের সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া পড়িল তখন পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ শিক্ষালাভের উপায় বলিয়া গৃহীত হইল। ইহার ফলে "শূন্য কুম্ভ" বা শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ কিভাবে করা হইত তাহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ফরাসী দার্শনিক রুশো-ই প্রথম মানবতাবাদীদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় পুস্তক বা শিক্ষক উভয়েরই স্থান ছিল গৌণ। ছাত্র তাহার স্বাভাবিক প্রয়োজনে প্রকৃতির সংস্রবে আসিরা নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিবে ইহাই ছিল রুশোর শিক্ষাপদ্ধতি। ছাত্রকে শিক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তোলাই শিক্ষাদান প্রচেষ্টার মূল কথা।

তাই রুশো "নিগেটিভ এডুকেশনের" (Negative Education) উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কাজেই রুশোকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির জনক ধরা যাইতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে মন্তেসরী শিশুকে সর্বপ্রথম 'সেন্স ট্রেনিং' (Sense training) দিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ইন্দ্রিয়গুলিই শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম—উহাদের সাহায্যেই শিশু পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞত আহরণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

প্যাষ্টালজী এবং ফ্রবেলও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন। ফ্রবেল এবং মন্তেসরী তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ধরণের খেলা আবিষ্কার করেন এবং উহাদের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর স্থান শিক্ষকের পূর্বে। শিক্ষক তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে শিশুকে জ্ঞান দিতে পারেন না। শিশু তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে জ্ঞান লাভ করিবে—যে কার্য সে ভালবাসে তাহাই করিবে, যাহা সে ভালবাসে না তাহা সে করিবে না। বাধ্যতামূলকভাবে তাহাকে কোন শিক্ষাদান প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। যথাসম্ভব নিজের চেষ্টার দ্বারাই শিশু শিক্ষালাভ করিবে। শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানই শিক্ষাপদ্ধতির সারকথা বলিয়া প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করিয়া থাকেন। অধুনা ইংল্যাণ্ডে নিউ এডুকেশন ফেলোসিপ (New Education Fellowship) নামে এক আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে। উহারও সার কথা এই যে, শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করিতে হইবে।

আধুনিকতম কালে ডিউই সাহেব এই মত পোষণ করেন যে, কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারে না—শিক্ষার্থী কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে পারে। শিক্ষা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক এই কথাই ডিউই সাহেব তাঁহার বিভিন্ন শিক্ষা-সম্বন্ধীয় রচনার সাহায্যে আমাদিগকে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি তাহাতেও একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক না হইয়া শিশুকেন্দ্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক শিক্ষা দিবেন এবং শিশু তাহা গ্রহণ করিবে এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিপ্রসূত। শিক্ষক শিশুকে অভিজ্ঞতা-লাভে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সে গ্রহণ না করিলে তিনি তাঁহাকে কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না।

আধুনিকতম শিখণতত্ত্ব (Theory of Learning) উপরি-উক্ত মত

সমর্থন করে। থর্ণডাইক (Thorndike) কর্তৃক ব্যাখ্যাত শিক্ষণতত্ত্ব অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষণীয় বিষয় বারবার আবৃত্তি করাইয়া (Law of Repetition) এবং প্রয়োজনমত তাহাকে শাস্তি ও পুরস্কার দিয়া (Law of Effect) শিক্ষাদান করিতে হয়। কিন্তু আধুনিকতম শিখণতত্ত্ব আমাদিগকে শিখণসমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধারণা দিয়াছে। আমাদের সকল শিক্ষাই চাহিদা-কেন্দ্রিক--শিক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা মনে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ শিক্ষালাভই সম্ভব নহে। নিজের মনের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহার দ্বারাই সে শিক্ষালাভ করিবে। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ছাত্রেরই কার্য, শিক্ষক তাহার পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী মাত্র।

মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্যের (Individual difference) অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহাও শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করিবার নীতি সমর্থন করে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের দিক হইতে ছাত্রে ছাত্রে যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে। নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহের অনুকূলে শিক্ষালাভের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষালাভের চাহিদা ছাত্রের মনে জাগরিত হইবে না এবং শিক্ষালাভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কাজেই সকল ছাত্রকে একসঙ্গে এক রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। শ্রেণীকক্ষে আমাদের শিক্ষকগণ যেভাবে সকল ছাত্রকে এক বিষয়ে একসঙ্গে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। সংক্ষেপে শিক্ষাপদ্ধতি যে শিশুকেন্দ্রিক হইবে—এই বিষয়ে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন না—বাস্তবে এই নীতিকে কিভাবে রূপায়িত করা যায় ইহাই সমস্যা।

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা (Play way in Education)—শিক্ষাদানকে শিশুকেন্দ্রিক করিবার উদ্দেশ্যেই খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। সকলেই জানেন যে, খেলা শিশুর স্বাভাবিক কর্মের অন্যতম।

খেলা সম্বন্ধে মতবাদ

সকল শিশুই খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুরা কি কারণে খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে এ সম্বন্ধেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জার্মান কবি ও শিক্ষাবিদ্ শিলার (Schiller) এবং পরে ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার

(Spencer) প্রচার করেন যে, শিশুকালে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জীবন-সংগ্রামে ব্যয়িত হয় না। অতিরিক্ত শক্তি (Surplus Energy) নিষ্কাশনের চাহিদায়ই শিশু খেলাতে প্রবৃত্ত হয়। আমেরিকান্ মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্টান্‌লি হলের (Stanley Hall) মতে মানুষ যে সব বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে—মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তি (Recapitulation Theory) ঘটে। এই তত্ত্ব অনুসারে শিশুকে অসভ্য মানুষের স্তরে ফেলা চলে—কাজেই আদি মানব যেসব কার্যে ব্রতী ছিল শিশুও সেইসব কার্যে আগ্রহশীল হইবে। আদি মানবের কার্যগুলির অনুষ্ঠান বর্তমানে করিতে হইলে, তাহা খেলার মাধ্যমেই করা চলে; তাই শিশু খেলার দিকে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। সুইজারল্যাণ্ড নিবাসী কার্লগ্রস্ শিশুদের ক্রীড়া-প্রবণতা সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রচার করেন—তাঁহার মতে খেলার মাধ্যমে শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাই ছোট মেয়ে পুতুল লইয়া ভবিষ্যৎ ঘর-সংসার-বিষয়ক খেলা খেলিতে ভালবাসে এবং ছোট ছেলে প্রতিযোগিতামূলক খেলা পছন্দ করে। গ্রস্ সাহেবের মতে মানুষের জীবন অন্যান্য প্রাণীর জীবন অপেক্ষা জটিলতর; উহার জন্য প্রস্তুত হইতে অধিকতর সময়ের প্রয়োজন—তাই মানুষের 'শিশুকাল' অন্যান্য প্রাণীর শিশুকাল অপেক্ষা দীর্ঘতর। বিরেচন-তত্ত্ব (Theory of Catharsis) শিশুর ক্রীড়া-প্রবণতা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ—শিশু খেলার মাধ্যমে তাহার অবদমিত বাসনায় তৃপ্তিসাধন করিতে চায়। ধরা যাউক, পুতুল খেলায় মেয়ে হয়ত কোন পুতুলকে বাবা সাজাইয়া, তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাবার প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাবের কিছুটা বিরেচন (Catharsis) করিতে পারে। মনোবীক্ষণকারীরা (Psycho-analysts) শিশুর খেলা হইতে তাহার অবচেতন মনকে (unconscious) জানিতে চেষ্টা করেন।

শিশুর খেলা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সবগুলি মতবাদই ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য না লইয়া প্রত্যেকটি মতবাদই নিজেকে মনগড়া যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোন মতবাদের যুক্তিই ত্রুটিহীন নহে। কারণ যাহাই হউক, শিশুরা যে ক্রীড়াপ্রবণ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং শিশুর ক্রীড়া যদি এমনভাবে পরিকল্পনা করা যায় যে, তাহাদের মাধ্যমে শিক্ষালাভও ঘটে তাহা হইলে খুবই ভাল হয়।

কোন কোন শিক্ষাবিদ্ খেলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা শিক্ষাদানের অতি উত্তম মাধ্যম। প্রথমতঃ, খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। শিশু নিজ ইচ্ছায়ই খেলায় লিপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, খেলা সম্পূর্ণরূপে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। শিশু নিজেই ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে বয়স্কদের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক খেলারই (একক বা দলবদ্ধ খেলা) কতকগুলি নিয়ম বা অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা আছে ; খেলায় শিশুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে খেলার নিয়মগুলি মানিয়া চলে। চতুর্থতঃ, খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম বলিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই খেলায় শিশুর আগ্রহ এবং একাগ্রতা জন্মায়— আগ্রহ এবং একাগ্রতা ব্যতীত শিক্ষালাভ সহজ নহে। পঞ্চমতঃ, খেলায় শিশু আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায়—খেলা তাহার সৃজনপ্রবণতাকে সার্থক করিবার উত্তম মাধ্যম। সর্বশেষে খেলার পরিধি এত বিস্তৃত যে, যে-কোন প্রকারের অভিজ্ঞতা খেলার মাধ্যমে দেওয়া চলে। তাই শিক্ষাবিদ্গণ নানারূপ খেলা পরিকল্পনা করিয়া খেলাকে শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে খেলার উৎকৃষ্টতা

ফ্রবেল তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ খেলা প্রবর্তন করেন। মন্তেসরী বিদ্যালয়েও শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ ধরণের খেলার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে পাঠ্যক্রমের অনুসঙ্গ-কর্ম (Co-curricular activities) বলিয়া যে সব কর্মের ব্যবস্থা করা হয় তাহাদের অনেককেই খেলাভিত্তিক কর্ম (Play activity) বলা যাইতে পারে (Debate, Excursion etc.)। শিক্ষামূলক অনেক খেলা বর্তমানে বাজারেও বিক্রয় হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত— "জিজ্ঞাসা"—কতকগুলি প্রশ্ন এবং তাহাদের পার্শ্বে উত্তর লেখা থাকিল ; ইলেকট্রিক্ সুইস টিপিলে নির্দিষ্ট রঙ-এর বাল্ব জ্বলিয়া প্রশ্নের উত্তরটি শিশুকে দেখাইয়া দিবে ; শব্দ প্রস্তুত করা বা word-making খেলা ইত্যাদি)।

বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-ভিত্তিক খেলা

কিন্তু খেলাকে শিশু-জীবনের একটি বিশেষত্ব বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। শুধু শিশু কেন, বয়ঃজ্যেষ্ঠেরাও খেলা করিয়া থাকেন। তারপর খেলা এবং কর্মের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। ডিউই খেলার বিশ্লেষণ

করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, খেলা জীবনের সক্রিয়তার (Theory of Life Activity) প্রকাশ মাত্র। জীবন অর্থ ই সক্রিয়তা, অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করিয়া থাকে। খেলাই শিশুর কর্ম—তাহার সক্রিয়তার প্রকাশ। মনে রাখিতে হইবে যে, খেলা এবং কর্মের মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করিয়া থাকি তাহা কৃত্রিম। খেলা এবং কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে হয়। খেলার বেলা আমরা নিজেদের সাধ্যাতীত পরিশ্রমে লিপ্ত করি না এ ধারণা ভ্রান্ত। অনেক সময় খেলায় আমরা নিজেদের যতখানি পরিশ্রমে লিপ্ত করিয়া থাকি, কাজের বেলা ততখানি করি না! কাজের বেলা নিজেকে যতখানি নিয়মানুবর্তী করিতে হয় খেলার বেলায়ও তাহার চাইতে কম করিলে চলে না। কর্ম এবং খেলার মধ্যে একমাত্র প্রভেদ এই যে, মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যক্ষ আনন্দের নিমিত্ত খেলায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কর্মের বেলা বাহ্যিক (external) কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে সে কর্মে ব্রতী হয়। একই কর্ম উদ্দেশ্যের পার্থক্যে 'খেলা' বা 'কর্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধরা যাউক, শুদ্ধমাত্র আনন্দের জন্য যখন পথের পাঁচালী পড়িতেছি তখন তাহা খেলা এবং পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে যখন ঐ বই পড়িতেছি তখন তাহা কর্ম। আবার আজ যাহা খেলা, কাল তাহা হয়ত কর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ফুটবল খেলোয়াড় যখন পেশাদার (Professional) হইয়া পড়ে তখন খেলা তাহার নিকট কর্মে পরিণত হয়। সংক্ষেপে "খেলা" শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মনের আনন্দে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার নামই খেলা। ঐ কর্ম সমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত "খেলার" অনুরূপ না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

খেলা এবং কর্মের মধ্যে পার্থক্য নাই

শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করিতে হইবে এই কথার অর্থ এই নহে যে, বিদ্যালয়ে শিশু অধিকাংশ সময় খেলা করিয়া কাটাইবে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হয় না—কোনও না কোনরূপ শাসন বা পুরস্কারের প্রলোভন না দেখাইলে তাহারা শিক্ষা করিতে চায় না। এই অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্তই খেলাভিত্তিক শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শিশুকে এমন কার্যের ভিতর

দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে যে কার্য তাহার নিকট অপ্রীতিকর নহে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কর্মের সহিত শিশু-জীবনের চাহিদার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকিলে বিদ্যালয়ের কাজ তাহার নিকট খেলার অনুরূপ মনে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যদি শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক হয় এবং শিক্ষদান-পদ্ধতি যদি কর্মকেন্দ্রিক হয় তাহা হইলেই বিদ্যালয়ের কাজ শিশুর নিকট অপ্রীতিকর মনে হইবে না। ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে—শিক্ষক নানাভাবে, নানা কৌশলে বিদ্যালয়ের কাজ শিশুর জীবনের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঐ সব কাজে তাহার স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। খেলাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রসার প্রাথমিক স্তরের উপরের কোন শিক্ষাস্তরে কখনও হয় নাই; কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরেই প্রয়োগ করা চলে। বস্তুতপক্ষে বিদ্যালয় সমাজকে শিশু-জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে জীবন, তাহার চাহিদা এবং শিক্ষা এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িবে।

চাহিদাকেন্দ্রিক শিক্ষা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা সমার্থ-বাচক

কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি—আধুনিক শিখণতত্ত্ব (Theory of Learning) অনুসারে শিক্ষা একটি সমস্যামূলক কর্ম (Problem solving activity)। মানুষের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হইলে পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতায় সে ইহার সমাধান খুঁজিয়া থাকে। যখন সে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পায় তখন সে কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় এবং সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাহার শিক্ষালাভ ঘটে। সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার নামই শিক্ষা। শিক্ষাপদ্ধতিকে উপরি-উক্ত নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিলে ছাত্রের কর্মই হইবে শিক্ষার ভিত্তি। "শিক্ষাদান" শব্দটির উৎপত্তিই ভ্রান্ত ধারণা হইতে হইয়াছে। কেহ কাহাকেও শিক্ষা "দান" করিতে পারে না, নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে হয়। ছাত্র নিজের কর্মের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবে ইহাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষক কর্ম করিয়া যাইবেন (পাঠের ব্যাখ্যা) এবং ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকিয়া (পাঠের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া) শিক্ষালাভ করিবে এই প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষকের পাঠের ব্যাখ্যা শ্রবণের

দ্বারা আশানুরূপ শিক্ষালাভ হইতে পারে না এই ধারণা জন্মানোর ফলে বর্তমানে পাঠ্যক্রম রচনাকালে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ছাত্রেরা কি কি ধরণের কর্মে লিপ্ত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

প্রজেক্ট মেথড

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার নিমিত্ত আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ কিল্ পেট্রিক 'প্রজেক্ট মেথড' (Project Method) নামে এক বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে কয়েকটি সমস্যামূলক কর্মে বিভক্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ সমস্যামূলক কর্মগুলির ছাত্রের জীবনের এক বা একাধিক চাহিদার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকিতে হইবে। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্রেরা নিজেদের মনে সমস্যাগুলি অনুভব করিয়া তাহাদের সমাধানের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কর্মে লিপ্ত হইবে। প্রজেক্ট মেথড অনুসারে শিক্ষাদানকালে ছাত্রদের সম্মুখে শিক্ষক সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন; ছাত্রেরা আগ্রহসহকারে ঐ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবে বলিয়া স্থির করিলে পর, তবে ইহাকে বিদ্যালয়ের কর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের অনুভূতি জাগ্রতই থাকে; আবার (তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতার জন্য) কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের অনুভূতি জাগ্রত না থাকিলেও উপযুক্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহা জাগ্রত করা সম্ভব হয়। আর একটি কথা, যে সমস্যা সমাধান করিতে ছাত্রেরা লিপ্ত হইবে বলিয়া স্থির করে তাহা এমন হওয়া চাই যে, তাহা সমাধানের চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহার ফলে তাহারা (নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ে) শিক্ষালাভ করিবে। প্রজেক্ট মেথডের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। একটি সমস্যামূলক কর্মকে অনেকগুলি ছোট ছোট সমস্যামূলক কর্মে বিভক্ত করা চলে এবং কয়েকটি ছাত্র একত্র হইয়া এক একটি সমস্যামূলক কর্মে লিপ্ত হয়; পরে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ (Share the experience) করে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রজেক্ট মেথডের অর্থ বোঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। ধরা যাউক, শিক্ষকদের নেতৃত্বে সপ্তম

শ্রেণীর ছাত্রেরা স্থির করিল যে, তাহারা মহাত্মা গান্ধীর জীবনের উপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করিবে। নাটক মঞ্চস্থ করা কর্মটির ছাত্রদের বর্তমান জীবনের চাহিদার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের মনের ভাবগুলির বিরেচন (Cathersis) হইবে ; তাহারা বয়স্কদের অনুরূপ কর্মে স্বাধীনভাবে লিপ্ত হইতে পারিবে। তাহারা হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে ; নানাভাবে তাহারা নিজেদের অন্তর্নিহিত সৃজনাশক্তি প্রকাশ করিতে পারিবে। কাজেই তাহারা নিজেরাই হয়ত ঐ নাটক মঞ্চস্থ করিবার প্রস্তাব করিল বা শিক্ষক ঐ প্রস্তাব করিবামাত্র সাগ্রহে নিজেদের সম্মতি জানাইল। তারপর এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রত্যেক ছাত্রই হয়ত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিল। এর পর হয়ত ছাত্রেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নাটকের জন্য এক একটি দৃশ্য রচনা করিবে এবং উহার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবে। এই নাটক মঞ্চস্থ করিবার পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে মঞ্চস্থ করা পর্যন্ত নানা ধরণের কাজে ব্যক্তিগত এবং দলবদ্ধভাবে ছাত্রেরা লিপ্ত হইবে। গান্ধীজীর জীবন এবং কার্য সম্বন্ধে নানা পুস্তক-পত্রিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিয়া তাহারা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিবে। নাটকের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করিতে গিয়াও নানাবিধ বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং নানারূপ কৌশল আয়ত্ত হইবে ; তারপর নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে গিয়া চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্পের নানারকম কাজ ইত্যাদি ছাত্রেরা শিক্ষা করিবে। মোটকথা এক একটি প্রজেক্ট শেষ হইলে দেখা যাইবে, ছাত্রগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

প্রজেক্ট মেথডকে ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা বলা যাইতে পারে, কারণ ক্রীড়ার যতগুলি গুণের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে প্রজেক্টে তাহার সব কয়টিই আছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষাই প্রজেক্ট মেথড অনুসারে হইবে, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রজেক্ট মেথডের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষালাভ সম্ভব নহে। উচ্চতর স্তরে শিক্ষা অধিকতর তত্ত্বমূলক হইয়া পড়ে। প্রজেক্টে কর্মের প্রাধান্যের জন্য তত্ত্বমূলক পাঠ অপেক্ষাকৃত অল্প হয় ; ফলে ইহা অনেক সময় তত্ত্বমূলক শিক্ষার

প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। সে যাহা হউক প্রজেক্টের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের কৌতূহল একবার জাগরিত হইলে উহা ছাত্রদের বাস্তব চাহিদার অন্যতম হইয়া পড়ে। ঐ চাহিদার নিবৃত্তির জন্যও অনেক সময় ছাত্রেরা সমস্যামূলক কর্মে (পাঠ, আলোচনা, লেখা) ইত্যাদি লিপ্ত হইতে পারে।

দলবদ্ধভাবে শিক্ষার পদ্ধতি (Group Method or Workshop Method)—ওয়ার্কশপ মেথড (Workshop Method) বা দলবদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি (Group Method) প্রজেক্ট মেথডেরই আর এক ধরণের বাস্তব প্রয়োগ। এই পদ্ধতিতে কোন তত্ত্বমূলক সমস্যার সমাধানকে ছাত্রেরা প্রজেক্টরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে (ধরা যাউক, ভারত কি করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিল তাহার কারণ নির্ণয়ন)। তারপর প্রজেক্টটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া ছাত্রদের এক এক দল এক একটি ভাগের সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রজেক্ট নির্ণয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করা পর্যন্ত যেসব কর্মপন্থা বা নীতি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ওয়ার্কশপ মেথডে তাহাদের সবগুলিই অনুসৃত হয়। কিন্তু ওয়ার্কশপ পদ্ধতির কর্মগুলির অধিকাংশই হয় পাঠ, আলোচনা, রচনা (নিজেদের যুক্তি এবং মীমাংসা ভাষায় প্রকাশ করা) ইত্যাদি ধরণের। তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতে হইলে ওয়ার্কশপ পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। তাই বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুসরণে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজতর। এই পদ্ধতির অনুসরণে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের উত্তর যোগান সম্ভব হয়। অবশ্য ওয়ার্কশপ মেথড প্রজেক্ট মেথডের মত ততটা আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে না এবং উহাদের অভিজ্ঞতাগুলির বেশীর ভাগই অপ্রত্যক্ষ (পুস্তককেন্দ্রিক) বলিয়া শিক্ষালাভে উহারা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী হয়। প্রজেক্ট ও ওয়ার্কশপ মেথড উভয়কেই শিক্ষাকার্যে ব্যবহার করিলে যে-কোন ধরণের পাঠ্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা চলে। অগ্রসর দেশগুলিতে অধুনা দলবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে। আমাদের দেশের তাত্ত্বিক শিক্ষায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

শিক্ষালাভ কার্যে সৃজনাত্মক কর্মের স্থান—আমাদের দেশে অধুনা প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সৃজনাত্মক কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সৃজনীশক্তিই সৃষ্টির নিয়ামক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী শক্তি রহিয়াছে—সীমা হইতে অসীমে যাওয়ার বাসনা মানুষের জন্মগত

চাহিদা। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিশু বিশেষভাবে কল্পনাপ্রবণ থাকে —কল্পনার সাহায্যেই সে তাহার অনেক চাহিদার নিবৃত্তি করিয়া থাকে—সুযোগ পাইলেই সে কল্পনাপ্রবণ-খেলায় (Make-believe play) লিপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে খেলা, অভিনয়, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, গল্প লেখা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে শিশুর এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সৃজনাত্মক কর্মের স্থান অসীম। সৃজনাত্মক কর্মের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষালাভের কার্যে ব্যবহার করা চলে—

১। সৃজনাত্মক কর্ম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের অন্যতম।

২। সৃজনাত্মক কর্ম মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে —চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি সকল স্তরের অভিজ্ঞতাই সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

৩। আত্মার মুক্তি (Liberation of Soul) সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে আত্মোন্নতিমূলক।

তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে সৃজনাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হইবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়—প্রজেক্টগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা হয় যাহাতে তাহাদের মাধ্যমে ছাত্রেরা সৃজনাত্মক কর্মে লিপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ছাত্রদের সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এমনভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করা হয় এবং এই পরিবেশ রচনা করায় অংশ গ্রহণের সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হয় (বিদ্যালয়ের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন, ফুলের বাগান রচনা ইত্যাদি)। সৃজনাত্মক কর্মে সফলতা অর্জন করিতে হইলে সর্বপ্রথম শিশুকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিতে হইবে—বাধা-নিষেধের মধ্যে সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। শিক্ষক কেবলমাত্র কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন—শিশু নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় কর্মে অগ্রসর হইবে এবং তাহাকে রূপদান করিবে। একজন বড় শিল্পী লিখিয়াছেন—শিক্ষক শিশুর কল্পনাশক্তির ঢাকনা মাত্র খুলিয়া দিবেন, শিশু স্বাধীনভাবে কর্মে অগ্রসর হইবে, ফলে তাহার সৃষ্টি হইবে অপূর্ব।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এক হিসাবে সকল সমস্যামূলক কর্মই সৃজনাত্মক কর্ম। যেখানেই সমস্যা, সেখানেই পুরাতন হইতে নূতনে যাওয়ার

প্রশ্ন—সেখানেই মানুষের কল্পনা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি প্রয়োগের প্রয়োজন। তাই আলাদাভাবে সৃজনাত্মক শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া (কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র) কোন শিক্ষাপদ্ধতির নামকরণের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে শিশুশিক্ষার জন্য রচিত পাঠ্যক্রমে যে সৃজনাত্মক অভিজ্ঞতার স্থান বিশেষভাবে রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষ করিয়া কর্মভিত্তিক শিক্ষা। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক গঠন করার উপযুক্ত নহে তাহা সর্বজনস্বীকৃত। মহাত্মা গান্ধী যেমন আজীবন দেশকে স্বাধীন করিবার আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন তেমনি তিনি স্বাধীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং কি ধরণের শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমাজ-ব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক প্রস্তুত করা যাইবে সে বিষয়েও চিন্তা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর মধ্যে ভাববাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদী জীবনদর্শনের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি স্বাধীন ভারতের জন্য এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজন মিটিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে—সাংস্কৃতিক এবং অধ্যাত্ম-জীবন যাপনই হইবে মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য। ঐরূপ সমাজ-ব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিবার জন্যই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে দূর করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন—

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি

১। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য নাই। পরীক্ষায় পাস এবং অভিজ্ঞান লাভ ব্যতাত উহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। ফলে উহা সম্পূর্ণরূপে পুস্তককেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত ব্যক্তিজীবন বা সমাজজীবনের কোন সম্বন্ধই নাই। বাস্তবজীবনের সহিত শিক্ষা সম্বন্ধহীন হওয়ার দরুণ আমাদের দেশে দিন দিনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। আমাদের বর্তমান শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা হাতে-কলমে কাজ করাকে ঘৃণা করেন—শারীরিক পরিশ্রম করাকে তাঁহারা

অসম্মানজনক বলিয়া মনে করেন। ফলে, লেখাপড়া শিখিলে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া "বাবু" হইতে চান। ফলে, একদিকে যেমন বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর দিকে গ্রামগুলির তেমনি দ্রুত অবনতি হইতেছে। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যেও গুরুতর ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে।

৩। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। অর্থাভাবে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারার দরুণ আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে আজ পর্যন্ত সার্বজনীন করিতে পারি নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলি স্বাবলম্বী (Self-sufficient) নয় বলিয়াই এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক বা দেশসেবক গড়িয়া তোলার দিকে আমাদের শিক্ষা কখনও দৃষ্টি দেয় নাই। স্বাধীন ভারতের "নয়া সমাজে" বাসের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ছাত্রদের মধ্যে নূতন চারিত্রিক গুণাবলী, নূতন অভ্যাস ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

বিশেষ করিয়া শিক্ষার উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিবার নিমিত্তই মহাত্মা গান্ধী "নই তালিম"-এর পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২।২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারা শিক্ষা সম্মেলনে ভাষণদান কালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা সর্বপ্রথম দেশের কাছে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার মতে আমাদের নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরিলিখিত ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ঘোষিত বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি

১। সমাজজীবনের প্রধান তিনটি চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান) নিবৃত্তি করিবার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করাই হইবে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিক স্তর হইতেই শিক্ষাকে কতকটা বৃত্তিমূলক করিয়া তুলিতে হইবে। কৃষি, ছুতারের কাজ এবং বয়ন, বিদ্যালয়ে কুটিরশিল্প হিসাবে শিক্ষা করা প্রয়োজন। ইহার ফলে শিক্ষা শেষে ছাত্রেরা সমাজজীবনে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি সংগ্রহের ব্যাপারে এত অসহায় বোধ করিবে না।

২। সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামের এবং শহরের বিদ্যালয় এক ধরণের হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত

নহে। এমন কি গ্রামে গ্রামে পরিবেশের বিভিন্নতা হিসাবে বিত্তালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাও বিভিন্ন হইতে পারে। যে সমাজের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে তাহার প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়াই শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে।

৩। শিক্ষাপদ্ধতি পাঠভিত্তিক না হইয়া কর্মভিত্তিক হইবে। শুধু তাহাই নহে, কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পাঠ্যক্রম রচিত হইবে। প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে প্রত্যেক বিত্তালয়েই কোনও না কোন কুঠিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমগ্র পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে। এই শিল্পশিক্ষা করিতে করিতেই ছাত্র শিক্ষণীয় বিষয়গুলি (সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। প্রধানতঃ কর্মের ভিতর দিয়াই শিক্ষা অগ্রসর হইবে—মানসিক এবং কায়িক পরিশ্রম একসঙ্গে চলিবে ; মন এবং শরীর একসঙ্গে গড়িয়া উঠিবে। ফলে, বিত্তালয় এবং সমাজের কার্যের মধ্যে ব্যবধান কমিবে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদও এখনকার মত এত অধিক হইবে না।

৪। ৭ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হইবে। অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সার্বজনীন করিতে না পারিলে নয়া সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে সকলেরই প্রথম স্তরের শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন ; ইহার পরের স্তরের শিক্ষা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে হইবে।

৫। শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিতে হইলে আমাদের বিত্তালয়কে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করিতে হইবে। উৎপাদনাত্মক শিল্পের সাহায্যে বিত্তালয়ের ব্যয় অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্বাহ না হইলে আমাদের মত দরিদ্র দেশে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে। শিল্পের সাহায্যে কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিলে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজ ও বিত্তালয়ের সম্বন্ধ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৬। সমগ্র শিক্ষা মাতৃভাষায় দিতে হইবে।

৭। অহিংসা ও ত্যাগের আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার অনুকূল অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ে দিতে হইবে।

উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিবার নিমিত্ত ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Basic Schools) নাম দিয়া নূতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত সুপারিশ করেন। তারপর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) এই বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করেন। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে ঐ কমিটি সন্দেহ প্রকাশ করেন—ইহার মতে উৎপাদনাত্মক শিল্পের বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইবে, এই নীতি সমর্থনযোগ্য নহে। (জাকির হোসেন কমিটিও এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন)। যাহা হউক, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর সকল রাষ্ট্রেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকার প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিম্ন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী এই দুই স্তরে বিভক্ত করা হইতেছে। ৭ বৎসর বয়স হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদিগকে **নিম্ন বুনিয়াদী** বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ১২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহারা **উচ্চ বুনিয়াদী** বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলা যাইতে পারে। কোন রাষ্ট্রেই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এখনও ব্যাপক-ভাবে স্থাপিত হয় নাই ; সকল রাষ্ট্রই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ব্যাপকভাবে স্থাপন করিলেও কোন রাষ্ট্রেই তাহাদের সংখ্যা এখনও খুব বেশী নহে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ

বুনিয়াদী শিক্ষার সমালোচনা—বুনিয়াদী শিক্ষা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ইহার কারণ এই যে, অনেক শিক্ষাবিদ্ ইহার

বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন এবং সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা ইহাকে সমর্থন করেন না। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি যে, প্রাথমিক স্তরে দুই ধরণের বিদ্যালয় থাকা অগণতান্ত্রিক; ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার গণতান্ত্রিক নীতি ব্যাহত হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মনস্থির করিবার সময় আসিয়াছে।

সপক্ষে যুক্তি—১। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে সব দোষ-ক্রটির প্রতি মহাত্মাজী (পূর্বে আলোচিত) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হইলে এই সব দোষ-ক্রটি অনেকাংশে যে সংশোধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মোটামুটিভাবে, বুনিয়াদী শিক্ষা যে আমাদের শিক্ষা-সংস্কার সমস্যাকে ঠিক পথে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে ইহা অনস্বীকার্য।

২। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। সমাজ-জীবন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিশুর সৃজনীশক্তির বিকাশের চেষ্টাও উহাতে উপেক্ষিত হয় নাই। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যেও বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিশেষ সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

৩। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক। পুস্তকপাঠ অপেক্ষা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে উহা শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা নিষ্ক্রিয় না হইয়া সক্রিয় হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই বিদ্যালয় হইতে এই জ্ঞানের সংক্রমণ বাস্তব জীবনে হইয়া থাকে। তারপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষা কোন কুটিরশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া প্রদান করা হয়। ইহার ফলে লব্ধজ্ঞান সংহত হয়—জ্ঞান এবং জীবনের মধ্যে একটি সামগ্রিকতার সৃষ্টি হয়।

৪। তারপর, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়—উহা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শে "নয়া সমাজ" গঠন করিতে হইলে, বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যেই উহা গঠন করা সম্ভব। একদিকে বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন আমাদের চিরদিনের আদৃত চারিত্রিক গুণাবলী (e.g. plane living and high thinking) ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত করিতে

চেষ্টা করে, অপর দিকে আবার আধুনিক পৃথিবী এবং নয়া সমাজ ব্যবস্থার উপযুক্ত গুণাবলীও (e.g. Community feeling) তাহাদের চরিত্রে সৃষ্টি করিতে চায়।

৫। বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া থাকে—ছাত্রদের দেহ, মন, রুচিবোধ প্রভৃতি সব কিছুই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে পূর্ণতর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

৬। বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ এত নিকট যে স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা সমাজসেবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক দোষ-ত্রুটি বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যে সংশোধন করা চলিলেও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে উহা গ্রহণ করিবার পূর্বে উহার বিশেষ ত্রুটিগুলি সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে—

বিপক্ষে যুক্তি—১। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, উহাতে শিশুমনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদা উপেক্ষিত হইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান—যে তিনটি চাহিদা নিবৃত্তির নিমিত্ত বুনিয়াদী শিক্ষার আয়োজন—ঐ তিনটিই বয়স্কদের জীবনের চাহিদা, শিশু-জীবনের নহে। কাজেই বয়স্কদের জীবনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকার কথা নহে। ধরা যাউক, বয়ন শিল্প শিক্ষাকালে বিভিন্ন "ডিজাইন" তোলার ভিতর দিয়া শিশুমনের সৃজনী-শক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ধরণের কাপড় বোনা বা সূতা কাটা (বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাহা করা হয়) শিশুজীবনের কোন চাহিদা পূরণ করে না। ঐ সব কাজের একঘেঁয়েমি শিশুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে, শিল্প-শিক্ষার জন্য যে শারীরিক এবং মানসিক পরিণতি (maturity) প্রয়োজন ৭।৮ বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা যে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার কথা (ভবিষ্যৎ

জীবনের নহে) ভাবিয়া শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। বর্তমান জীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বলি দিলে শিক্ষালাভ ঘটে না।

২। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান নীতি হইতেছে শিশুকে উৎপাদনাত্মক কর্মে নিযুক্ত করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদনাত্মক এবং সৃজনাত্মক কর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে; সৃজনাত্মক কর্মের ভিতর দিয়া শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হইয়া থাকে, কিন্তু উৎপাদনাত্মক কর্ম সৃজনাত্মক না হইলে শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কোন কোন কাজ অনেকটা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়—নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সুযোগ না থাকিলে একঘেয়ে কাজ মনকে স্থবির করিয়া তোলে। শান্তি-নিকেতনের পাঠ ভবনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত শিল্প-শিক্ষা এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, গুরুদেব শিল্পের উৎপাদনাত্মক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব হইতেছে এই যে, উহা শিশুকে হাতে কলমে কাজ করিবার সুযোগ দিবে এবং তাহার সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে। তাই পাঠভবনে শিক্ষার জন্য নির্বাচিত শিল্পের মধ্যে চারুশিল্পের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য শিল্প-নির্বাচন কালে উৎপাদনাত্মক শিল্পের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩। ইহার ফলে অনেক সময় বুনিয়াদী শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলিয়া ভুল করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্প শিক্ষার কোন স্বকীয় গুরুত্ব নাই। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্পকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। শিল্পশিক্ষাদান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে,—শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। বুনিয়াদী শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা করিয়া তুলিলে ঐ উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা কেন্দ্রীকরণ করার নীতিও সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নহে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষাদানের নিমিত্তই আমরা কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকি। শিক্ষার সাহায্যে আমরা সমগ্র মানুষকে গড়িয়া তুলিতে চাই। শিশু বিদ্যালয়ে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া তাহাকে

এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী করিবে ইহাই আমাদের কামনা। কিন্তু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে একমাত্র শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই তাহা সম্ভব—শিশুর জীবনের চাহিদাই থাকিবে বিদ্যালয়ের সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের চেষ্টা কৃত্রিম। অভিজ্ঞতা হইতেও দেখা যাইতেছে যে, গ্রহণীয় সকল অভিজ্ঞতা কোন এক বিশেষ শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে প্রদান করা সম্ভব হইতেছে না। যেখানেই এই চেষ্টা বিধিবদ্ধভাবে করা হইতেছে সেখানেই শিক্ষা কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন (বর্তমানে শিল্প এবং পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে)।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হইতেছে যে, মহাত্মাজী যে সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আর বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে চলিয়াছে তাহাতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। মহাত্মাজীর স্বপ্ন ছিল যে, ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম-সমাজ স্থাপিত হইবে। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষকেই নিজের সমাজ-জীবনের প্রধান তিনটি চাহিদার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছুটা স্বাবলম্বী দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত বড় বড় কারখানা স্থাপন না করিয়া কুটিরশিল্পের উপর আমাদের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য নির্ভর করিব। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা বড় বড় কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছি—এই ব্যবস্থায় গ্রাম ত দূরের কথা, কোন রাষ্ট্রেরও (state) স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করা যায় না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের "নয়া সমাজে" অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। যে জীবন দর্শন (Plane living and high thinking) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হয়, যে স্বাবলম্বনের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয় পরিচালিত হয় বাস্তব জীবন হইতে ঐ জীবনদর্শন এবং ঐ নীতি দিন দিনই সরিয়া যাইতেছে। কুটির-শিল্পের স্থানও আর সমাজে বড় নাই। এখনও গ্রামগুলি শিল্পপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই বলিয়া গ্রামেই বিশেষ বিশেষ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু গ্রামের জন্য এক ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সহরের

জন্য অন্য ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি (Equality of Educational opportunities) ব্যাহত হইবে এবং ইহার ফলে গ্রাম এবং সহরের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণ এবং উহার ক্রটি উভয়দিক পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে চালু হইবার পূর্বে ইহার কিছুটা সংস্কার প্রয়োজন। সর্বপ্রথমই মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজসেবী এবং রাজনীতিকের প্রভাব শিক্ষার উপর থাকিবে বটে কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নাই তাঁহাদের হাতে শিক্ষা-সংস্কার ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। বুনিয়াদী শিক্ষার যেসব ক্রটির কথা আলোচনা করিয়াছি মহাত্মাজীর গোঁড়া শিষ্যেরা তাহা আরও বৃদ্ধি করিতেছেন। যে সব রাষ্ট্র বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গোঁড়ামি অল্প (পশ্চিমবঙ্গ তাহার অন্যতম) সেখানে শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে পড়িয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দোষ-ক্রটি স্বাভাবিক নিয়মেই সংশোধিত হইতেছে। মোটকথা, বুনিয়াদী শিক্ষা মোটামুটিভাবে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি ; কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সহিত উহা খাপ খাইতেছে না বলিয়া উহার সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। মহাত্মাজী জীবিত থাকিলে হয় তিনি দেশে শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বাধা দিতেন, আর না হয় বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কার করিতেন।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি—বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এক বিশেষ ধরণের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির নিম্নলিখিত নীতিগুলি বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতেও অনুসরণ করা হয়।

১। ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে হইবে ইহা নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

২। কোন একটি নির্দিষ্ট কর্মকে (Project) মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়।

৩। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষাদান প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম স্তর বলিয়া স্বীকার করা হয়।

৪। বিদ্যালয়ে সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা এবং ঐ সমাজে জীবন যাপন করার ভিতর দিয়া শিক্ষাগ্রহণ করাই যে শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না।

আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়—

১। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি একটিমাত্র নির্দিষ্ট শিল্পকে (কর্মকে) কেন্দ্র করিয়া সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতির মত অনেকগুলি কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় না।

২। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার কেন্দ্রস্থ কর্মটি (Project) উৎপাদনমূলক হইবে ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রজেক্ট মেথডের শিক্ষায় এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

৩। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—এই নীতি অনুসরণ করিয়া প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় বয়স্কদের জীবনের চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়) কথা বিবেচনা করিয়া প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়।

৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কায়িকশ্রমের উপর পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সংক্ষেপে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের একটি প্রয়াস মাত্র। দিন দিনই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কমিয়া আসিতেছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি—শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটির জন্যই যে আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা অনেক বেশী পরিশ্রম করিয়া অনেক কম শিক্ষা লাভ করে এবং তাহার কারণ হইতেছে বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন না করা। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন মনে করেন যে, শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার না হইলে পাঠ্যক্রমের সংস্কার কার্যকরী হইতে পারে না। বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

কার্যে পরিণত করিতে আমাদের শিক্ষকেরা অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেছেন ; গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করাই হইবে ইহার প্রধান কারণ। সকলেই "পড়াইয়া" পাঠ্যক্রমে শেষ করিতে চান। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের মতে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, উহা বাক্‌সর্বস্ব। শিক্ষকগণ মনে করেন যে, শ্রেণীতে পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিতে পারিলে এবং ছাত্রদিগকে পাঠ্যপুস্তক পড়াইতে পারিলেই বুঝি ছাত্রদের শিক্ষালাভ ঘটিল। কোন শিখণতত্ত্বই (Theory of Learning) কিন্তু এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করে না। শিক্ষক এবং পুস্তক জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ছাত্রের কর্ণ এবং চক্ষু এই দুই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া শিক্ষা তাহার অন্তরে প্রবেশ করে, ইহার পশ্চাতে গতানুগতিকতা ব্যতীত কোন মনস্তাত্ত্বিক সত্য নাই। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন না করিলে সকল শিক্ষা সংস্কারই যে ব্যর্থ হইবে একথা মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির সার কথা হইতেছে এই যে, যান্ত্রিকভাবে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা চলে না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলিয়াছেন যে, শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান গুণ এই হইবে যে, উহা পরিবর্তনশীল (Dynamic) ; শিক্ষার বিষয়বস্তু, ছাত্রদের মনের অবস্থা ইত্যাদির বিবেচনায় শিক্ষক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিবেন। এমন কি একই শ্রেণীতে একই বিষয়ে পাঠদানকালে তিনি কখনও ছাত্রদিগকে পড়িতে বা লিখিতে বলিবেন, কখনও বা তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পাঠ্য-বিষয়ক কোন সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে, কখনও বা পাঠের অনুকূল অন্য নানাবিধ কর্মে লিপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই যে শিক্ষালাভ করিতে পারে একথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞতা যত প্রত্যক্ষ এবং স্বতঃপ্রণোদিত কর্মের ভিত্তিতে হইবে শিক্ষা তত ভাল হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করার নিমিত্ত কতকগুলি যান্ত্রিক সহায়ক বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে (সিনেমা ইত্যাদি)। উহাদিগকে শিক্ষাকার্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ কর্মকেন্দ্রিক হইবে। ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সমস্যামূলক কর্মে ছাত্রদিগকে লিপ্ত করাই শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন শিক্ষকদিগকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রজেক্ট মেথড এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৃতীয়তঃ, মনে রাখিতে হইবে যে, এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংক্রমণ হয়। এই প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন লিখিয়াছেন যে, ছাত্র অল্প জ্ঞান লাভ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যতখানি জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহা দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শিক্ষায় সংক্রমণ হয় না। তারপর জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া না দিতে পারিলেও শিক্ষায় সংক্রমণ হয় না। উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন নিম্নলিখিত অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

১। কর্মে আগ্রহ এবং আপন কর্ম সম্বন্ধে গৌরববোধ। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কাজই আগ্রহহীনভাবে করিতে করিতে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যথোচিত কর্মপ্রেরণা লুপ্ত হইয়াছে—পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির ভয় ব্যতীত তাহারা কোন কাজ করিতে চায় না—সকল কাজই যেন তাহাদের নিকট অর্থহীন বোধ হয়। শুধু তাহাই নহে—নিজের কাজে তাহারা নিজেরাও গৌরববোধ করে না—কাজ করিতে হইবে বলিয়া যেন যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছে—কাজের ভালমন্দ যেন তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। যথাযথ শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে কর্ম সম্বন্ধে এই অবাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষা ছাত্রের আগ্রহভিত্তিক হইবে। শিক্ষার জন্য ছাত্র যেসব কর্মে লিপ্ত হইবে তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত তৃপ্তি এবং সার্থকতাবোধের সুযোগ থাকিবে। ২। শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। ভ্রান্ত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ইহাদের উভয়ই বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ছাত্রদিগকে সমস্যামূলক কার্যে লিপ্ত করিতে হইবে—তাহারা নিজেরা নিজেদের চেষ্টা দ্বারা শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান

করিবে—শিক্ষক এবং পুস্তকের নিকট হইতে তাহারা প্রয়োজনবোধে সাহায্য গ্রহণ করিবে। ৩। ছাত্রদের আগ্রহের ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির নিমিত্ত ছাত্রদের মন হইতে অনুসন্ধিৎসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাধ্যতামূলকভাবে জানাইয়া না দিলে, কেহ যেন কিছু জানিতেই চাহে না। এই অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্ত জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে হইবে—জ্ঞানলাভ পদ্ধতি তাহাদের নিকট তৃপ্তিকর করিয়া তুলিতে হইবে।

পরিশেষে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নহে। এই পদ্ধতি শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষণতত্ত্বের (Theory of Learning) উপর নির্ভরশীল। উহার মূলতত্ত্ব মাত্র দুইটি—(ক) ছাত্রেরা নিজের আগ্রহে নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা করিবে। (খ) তাহারা যে শিক্ষা লাভ করিবে তাহা সক্রিয় হইবে—একক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে তাহাদের শিক্ষার সংক্রমণ হইবে। এই দুইটি ঠিক নীতি রাখিয়া শিক্ষক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাঠ-পরিকল্পনা ও শিক্ষাদানের অপরাপর পদ্ধতি

আমাদের বিদ্যালয়ে, সাধারণতঃ ছাত্রদের শ্রেণীতে ভাগ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—শিক্ষায় সম মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যদিও শ্রেণী শিক্ষাদান পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত তবু ঐ ব্যবস্থার কতকগুলি দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে। শ্রেণী শিক্ষাকালে আমরা অনুমান করিয়া লই যে, এক শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স মোটামুটি এক এবং তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাশের মান প্রায় সম পর্যায়ের। ছাত্রদের শিক্ষাগত মান এক না হইলে, এক সঙ্গে, একই মানের বিষয়বস্তু, শিক্ষকের একই ধরণের বক্তৃতা বা বিশ্লেষণ হইতে তাহারা শিক্ষা করিতে পারে না। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের মান সম পর্যায়ের না হইলে, ছাত্রদের মধ্যে অব্যাহত পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না—শারীরিক এবং মানসিক মানের বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক মানের ছাত্রদের মধ্যে, আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, তাহা সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষার নিয়ামক হইবার আশঙ্কা থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে, একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য, সর্ববিষয়ে, অনেক বেশী থাকে। প্রথমেই বলিতে হয় যে, শিক্ষার সুযোগের পার্থক্যের জন্য একই শ্রেণীতে ছাত্রে ছাত্রে বয়সের পার্থক্য পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত দেখা যায়। অর্থাৎ একই শ্রেণীতে হয়ত ১০ বৎসর বয়স্ক এবং ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্র পাশাপাশি বসিয়া একই বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করিতেছে। মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের দিক হইতেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে। শিক্ষাগত মানের দিক হইতেও বলা যাইতে পারে যে, একই শ্রেণীতে হয়ত ছাত্রে ছাত্রে, চার শ্রেণীর পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ, ষষ্ঠ শ্রেণীতে হয়ত এমন

শ্রেণী শিক্ষার দোষ ত্রুটী—ছাত্রে ছাত্রে বৈষম্য

ছাত্র আছে যে যাহার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া উচিত ছিল, এবং ঐ শ্রেণীতেই হয়ত এমন ছাত্রও আছে যে সপ্তম শ্রেণীর যোগ্য। এই অবস্থায় শ্রেণী শিক্ষাদান ফলপ্রসূ করা খুবই কঠিন।

মানসিক অভীক্ষার সাহায্যে, ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হওয়ার পর হইতে এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে, শ্রেণী শিক্ষার উপর আমাদের আস্থা কমিয়া যায়, এবং শিক্ষাকে ব্যক্তিগত করার দিকে ঝোঁক পড়ে। তাই ডল্টন প্ল্যান (Dolton Plan) শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। দুইটি ছাত্রের মানসিক বিকাশ, শিক্ষাগত মান আগ্রহ, ইত্যাদি কখনও সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না; তাই দুইটি ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না!

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি শ্রেণী শিক্ষার বিরোধী

কিন্তু, বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে পারিপার্শ্বিককে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য অনেকখানি দূর করা সম্ভব। তারপর, ব্যক্তিগত বৈষম্য যেমন আছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাদৃশ্যও তেমনি অনেকখানি রহিয়াছে। সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কিছু কিছু ছাত্র এক শ্রেণীতে মিলিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি মানিয়া লইয়াও, শ্রেণীশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রেণীর ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা মনে রাখিয়া তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া প্রত্যেক দলকে পৃথক পৃথক কাজ নির্দিষ্ট (assignment) করিয়া দেওয়া চলে। প্রত্যেক দলের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রগণ নিজ নিজ চেষ্টায় এবং পারস্পরিক সাহায্যে, আপন আপন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবে; ফলে দলগত নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হইবে এবং ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রগণ নির্দিষ্ট শিক্ষা লাভ করিবে। একই শ্রেণীর বিভিন্ন দল, তারপর, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাজ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়া, একে অপরের কাজ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। প্রয়োজন মত শিক্ষক মহাশয়, সমগ্র শ্রেণীকে একসঙ্গে লইয়া আলাপ আলোচনা বা বক্তৃতা

নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে শ্রেণী শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব নহে

করিতে পারেন বটে, তবে ঐ আলোচনা সাধারণ ভাবের হইবে এবং বক্তৃতাতে কোন সূক্ষ্ম বিষয় বস্তুর অবতারণা করা হইবে না। ফলে ব্যক্তিগত বৈষম্য সত্ত্বেও, শ্রেণী হিসাবে, ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। সংক্ষেপে, যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, শ্রেণী শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব কিছু নহে।

আমাদের দেশের বিদ্যালয় ব্যবস্থা একটু উন্নততর করিলে, একই শ্রেণীতে ছাত্রে ছাত্রে বৈষম্য কমান যাইতে পারে। শ্রেণী উন্নয়ন (class promotion) কঠোরতর এবং শিক্ষাদান উন্নততর করিলেই, ছাত্রে ছাত্রে জ্ঞানগত বৈষম্য কম হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হইলে এবং শিক্ষার সুযোগ সমভাবে বণ্টিত হইলেই, একই শ্রেণীতে ছাত্রে ছাত্রে বয়সের তারতম্যও কমিয়া যাইবে। মোট কথা, শ্রেণী শিক্ষার এমন কতকগুলি গুণ আছে যে, কোন দেশেই শ্রেণী শিক্ষা তুলিয়া দেওয়ার কথা ভাবিতেছে না। বরং, শিক্ষাকে ব্যক্তিগত করার নিমিত্ত ডল্টন প্ল্যান প্রভৃতি যে সব শিক্ষাপদ্ধতি চালু হইয়াছিল, তাহাদের জনপ্রিয়তা দিন দিনই কমিতে চলিয়াছে। একই শ্রেণীতে, মোটামুটিভাবে সমান বয়সী ও সমান শিক্ষাগত মানের ৩০।৪০ জন ছাত্রকে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে পাঠ দান কঠিন বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হয় না।

শ্রেণীতে ছাত্রে ছাত্রে বৈষম্য কমান সম্ভব

বস্তুতপক্ষে শ্রেণী শিক্ষার অনেকগুলি সুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য। বর্তমানে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষান্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন করার নীতি গ্রহণ করিয়াছি। ফলে যে পরিমাণ ছাত্রকে আমাদের শিক্ষাদান করা প্রয়োজন ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে তাহা প্রদান করা সম্ভব নহে। আমাদের মত দরিদ্র দেশ শ্রেণী শিক্ষা তুলিয়া দিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার কথা ভাবিতেই পারে না।

শ্রেণী শিক্ষার গুণাগুণ

ব্যক্তিগত শিক্ষা যে শ্রেণী শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়, একথাও অনেকে স্বীকার করেন না। শিখন (Learning) সম্বন্ধে আধুনিকতম যে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি তাহাকে ভিত্তি করিয়া বলা চলে যে, ছাত্র অনেক সময়, শিক্ষক অপেক্ষা তাহার সহপাঠীর নিকট হইতে বেশী জ্ঞান লাভ করিতে পারে। চারিত্রিক বিকাশের দিক হইতে ত সহপাঠীর সাহচর্য

তাহার পক্ষে অপরিহার্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রেরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়া যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এক ছাত্র অপরের শিক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞান শ্রেণী শিক্ষার জন্য নানারূপ যন্ত্রপাতি (প্রজেক্টর ইত্যাদি) আবিষ্কার করিয়াছে এবং শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষায় সাহায্যকারী মডেল্, ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্যে শ্রেণী শিক্ষাদান, ব্যক্তিগত শিক্ষাদান অপেক্ষা কার্যকরী হইয়া উঠে।

বুদ্ধি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্য অল্প সময়ে নির্ভরযোগ্যভাবে জানার নিমিত্ত, নানা ধরণের অভীক্ষা বাহির হইয়াছে। উহাদের ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষক ছাত্রদের বৈষম্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকিতে পারেন এবং সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দলগত শিক্ষাপদ্ধতি (Group Methods) অনুসরণ কালে, দল গঠনের সময় শিক্ষক বুদ্ধিগত ও জ্ঞানগত বৈষম্যের কথা স্মরণ রাখিয়া চলিবেন এবং কোন ছাত্রের নিকট হইতে কতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, তাহাও বিবেচনা করিবেন।

বর্তমানে, সামাজিকতাবোধ, সুনাগরিকতা, সৌভ্রাত্র, সহযোগিতা প্রভৃতির শিক্ষার প্রতি বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ সব উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে।

প্রজেক্ট প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলি শ্রেণী শিক্ষার ক্ষেত্রেই সহজে প্রযোজ্য হয়। যাহাকে আমরা সহপাঠ্যক্রমিক কর্ম বলি, তাহার সংঘটনের নিমিত্তও শ্রেণী শিক্ষা বিশেষভাবে উপযোগী।

সংক্ষেপে, আজ পর্যন্ত সকল দেশেই শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত রহিয়াছে—উহার পরিবর্তনের কোন কারণও নাই, সম্ভাবনাও নাই।

পাঠ-পরিকল্পনা—শ্রেণী শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Notes) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিষয়-বস্তুতে শিক্ষকের জ্ঞান গভীর থাকিলেও, কি পড়াইব, কতটুকু পড়াইব, কি ভাবে পড়াইব, পড়াবার কালে কোন্ কোন্ জিনিসের সাহায্য প্রয়োজন হইবে ইত্যাদি, পূর্ব হইতে স্থির করিয়া

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন

না রাখিলে, পাঠদান সার্থক হইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। মনে রাখিতে হইবে, যে শিক্ষকের হাতে সময় খুবই অল্প (৪০ বা ৪৫ মিঃ) এবং সম্মুখে ৪০।৪৫টি ছাত্র। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ছাত্রের দ্বারা পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষা করাইয়া লইতে হইবে। কাজেই, পূর্ব পরিকল্পিত, শিখণ প্রক্রিয়া (Learning) সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ না করিলে পাঠদান সফল হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে- কোন বিষয়বস্তুর উপর কয়টি পাঠদান করিবেন সে বিষয়ে শিক্ষক কোন চিন্তাই করেন নাই। ফলে পাঠ্য তালিকার অনেক বিষয় সময়াভাবে হয়ত তাহার পক্ষে পড়ান সম্ভব হইল না। আবার এমনও দেখা যায় যে, একটি বিষয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়া, তাহা শেষ হইবার অনেক পূর্বেই ক্লাসের সময় চলিয়া গেল। পাঠদান কালে, ম্যাপ, ছবি, মডেল যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নানা ধরণের শিক্ষায় সাহায্যকারী (Teaching aids) বস্তুর প্রয়োজন হয়। পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া, ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে, পাঠদান কালে উহাদের ব্যবহার সম্ভব নহে। প্রজেক্ট পদ্ধতি, দলবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি, নাটকীয়করণ পদ্ধতি প্রভৃতি নানা ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে শ্রেণী শিক্ষায় প্রয়োগ করা হইতেছে। পূর্ব হইতে পরিকল্পনা করিয়া না রাখিলে ঐ সব শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ পাঠদানকালে সম্ভব নহে। আজকাল পরিকল্পনার যুগ। সফল হইতে হইলে, সর্ব ক্ষেত্রেই সুচারু পূর্ব পরিকল্পনা অপরিহার্য। এক কথায় পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত শিক্ষকের পাঠদান কার্যে অগ্রসর হওয়া অনুচিত।

পাঠ-পরিকল্পনা ও তাহার বিভিন্ন মত

কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, নির্দিষ্ট সময়ের (class period) মধ্যে, কিভাবে শিক্ষক, ছাত্রদের শিক্ষালাভে সাহায্য করিবেন তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে। শিক্ষাবিদ্ হার্বাটের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া, আমরা পাঠ পরিকল্পনাকে মনস্তত্ত্বনির্ভর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। হার্বাটের মতে মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা মনে সঞ্চিত থাকে (Apperceptive Mass)। নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত (Associate) করিয়া দিতে পারিলে শিক্ষা লাভ হয়। কাজেই হার্বাটের মতে শিক্ষাদানের প্রথম স্তরে, পূর্ব সঞ্চিত জ্ঞানকে নাড়া দিতে হইবে, যাহাতে নব পরিবেশিত জ্ঞান তাহার

সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। তাই পূর্ব জ্ঞানের সহিত পরিবেষোন্মুখ নূতন জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা, পাঠ পরিকল্পনার প্রথম স্তর।

ইহাকে সাধারণতঃ প্রস্তুতির স্তর (Preparation) আখ্যা দেওয়া হয়। শিখণপদ্ধতি সম্বন্ধে লব্ধ আধুনিকতম জ্ঞান, অবশ্য শিখণ সম্বন্ধে হার্বাটের তত্ত্বের সমর্থন করে না। ঐ জ্ঞান অনুসারে, শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রের জাগ্রত প্রয়োজনবোধ (felt need) শিক্ষার প্রথম সোপান—আগ্রহ এবং স্বকৃত চেষ্টা ব্যতীত কোন শিক্ষা লাভই ঘটিতে পারে না। কাজেই, হার্বাটের সহিত তত্ত্বগত পার্থক্য থাকিলেও, এই মত অনুসারেও প্রস্তুতি, শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম স্তর—এই স্তরে পরিবেষোন্মুখ জ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হয়। ঐ চেষ্টায় ছাত্রের পূর্ব জ্ঞানের শরণ হয়ত অনেকক্ষেত্রেই লইতে হয় কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পূর্ব জ্ঞানের শরণ লওয়া অপরিহার্য নহে।

প্রস্তুতি

সঞ্চিত জ্ঞানের (Apperceptive Mass) সহিত সংযুক্ত হইয়া কিভাবে পূর্ব জ্ঞানের বৃদ্ধি বা নূতন জ্ঞান লাভ হয় সে সম্বন্ধেও হার্বাট বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইলে প্রথমেই আমাদের তাহাতে মনসংযোগ (Concentration) হওয়া প্রয়োজন। যতই মনঃসংযোগ হইবে ততই অভিজ্ঞতাটি আমাদের মানসপটে স্পষ্টরূপে (clearness) প্রতিভাত হইবে। যতই সুস্পষ্ট হইবে, ততই উহার পূর্ব সঞ্চিত জ্ঞানের সহিত সংযোগ ঘটিবে (association)। ফলে উহা শিক্ষার্থীর চিন্তাবৃত্তের (circle of thought) মধ্যে পড়িয়া যাইবে। তখন মন নূতন অভিজ্ঞতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাহার পূর্বসঞ্চিত একই ধরণের অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সম শ্রেণীভুক্ত করে রাখবে (classification)। তাই প্রস্তুতির পর, উপস্থাপন (presentation) হয় পাঠ পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর। ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানকে সঞ্চালিত বা তাহাদের মনে নূতন জ্ঞানলাভের আগ্রহ সৃষ্টি করার পর নূতন অভিজ্ঞতাকে তাহার নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করিতে হয়, যাহাতে উহাতে সে মনসংযোগ করিতে পারে এবং অভিজ্ঞতাটি তাহার মানসপটে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া উহা তাহার চিন্তা বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। হার্বাটের মতানুসরণকারীরা উপস্থাপন স্তরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—উপস্থাপন—যখন নূতন জ্ঞান পরিবেশিত হয়,

উপস্থাপন

তুলনা (Comparison)—যখন পুরাতন জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির চেষ্টা হয়, সূত্রগঠন (Generalisation) —যখন নূতন জ্ঞানকে পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যে শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, হার্বাটের এই শিখণতত্ত্ব গ্রহণ না করিলেও, ছাত্রদের মনে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করার পর, পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা পরিবেষণ করিতে হয় তাহা স্বীকার করে। এই অভিজ্ঞতা ছাত্রেরা যত প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, শিক্ষা ততই স্থায়ী, দ্রুত ও আনন্দদায়ক হইবে। তাই, অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত নানা ধরণের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি (প্রজেক্ট ইত্যাদি) বর্তমানে চালু হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা তুলনা বা সূত্র গঠনকে শিক্ষাদান বা পাঠ পরিকল্পনার স্তর হিসাবে গ্রহণ করি না। শিক্ষার যথাযথ সঞ্চালন (Transfer in Learning) লাভের নিমিত্ত হয়ত আমরা তুলনা ও শ্রেণীভুক্ত করণপদ্ধতির শরণ লইয়া থাকি, কিন্তু ইহারা শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ নহে এবং শিক্ষাদানের স্তর হিসাবে গণ্য হইতে পারে না।

হার্বাটের মতে পাঠদানে পরিসমাপ্তি ঘটে নবলব্ধ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের প্রয়োগে বা অভিযোজনে (Application)। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানেও ইহা আমরা স্বীকার করি। নবলব্ধজ্ঞানকে যতক্ষণ পর্যন্ত নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা না জন্মায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। লব্ধ জ্ঞানকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগ, শিক্ষায় যথাযথ সঞ্চালন লাভের প্রধান উপায়। আর শিক্ষায় সঞ্চালন লাভ না করিলে, উহা জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না। আবার, প্রয়োগ ক্ষমতা জন্মাইয়াছে কিনা, ইহা শিক্ষালাভ হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করারও উপায়। পাঠ দান সফল হইলে, নবলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষমতা ছাত্রদের অবশ্যই জন্মাইবে। তাই পাঠদানের শেষ স্তর অভিযোজন।

অভিযোজন

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতিটি পাঠদান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ উহাকে প্রস্তুতি, উপস্থাপন এবং অভিযোজন এই তিনটি স্তরেরই ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কোন একটি স্তর বাদ দিলে বা সম্পূর্ণ না হইলে পাঠ দান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতের নিয়ম—পাঠ-পরিকল্পনার প্রথমেই কয়েকটি **মূলতথ্য** (Basic Information) সন্নিবেশিত করিতে হয়। ঐ তথ্যগুলো সম্মুখে না থাকিলে সুচারুরূপে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে। প্রথমেই আমাদের শ্রেণী মান সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। বিষয়বস্তু এক হইলেও (ধরুন, "গৌতমবুদ্ধ"), উচ্চ নিম্ন শ্রেণী হিসাবে পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠদান পদ্ধতির তারতম্য হইবে। তাই পাঠ-পরিকল্পনায় **কোন শ্রেণীতে** পাঠদান করা হইবে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীর **ছাত্র সংখ্যার** উল্লেখও হয়ত বা প্রয়োজন; কারণ ছাত্র সংখ্যা যত বেশী হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে সক্রিয় করিয়া পাঠ দান করিতে সময় ততই বেশী যাইবে। কাজেই ৪০-৪৫ মিঃ এর মধ্যে কি পরিমাণ বিষয়বস্তুর উপর পাঠ দান সম্ভব তাহা নির্ধারণ করিতে শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যার কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ সরকারী নিয়মেই শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা (৪০) নির্দ্দিষ্ট। তাহার চাইতে ৫।১০টি ছাত্র বেশী বা কম হইলে কিছু আসিয়া যায় না। তাই শ্রেণীতে বিশেষ কারণে ছাত্রের সংখ্যা ৪০ হইতে খুব বেশী কম বা বেশী হইলে, ছাত্র সংখ্যার উল্লেখের প্রয়োজন হয়; না হইলে ছাত্র সংখ্যার উল্লেখ করিয়া পাঠ পরিকল্পনাকে দীর্ঘ ও যান্ত্রিক করার প্রয়োজন নাই। পাঠদানের সময়ের পরিমাণ সম্বন্ধেও শিক্ষককে অবহিত হইতে হয়; পাঠের বিষয়বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণে ইহারও প্রয়োজন রহিয়াছে। কোন পাঠ অসম্পূর্ণ থাকা শিক্ষা লাভের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কাজেই পাঠদানের সময়ের পরিমাণ ৩৫ মিঃ, ৪০ মিঃ বা ৪৫ মিঃ হইলে সময় অনুসারে বিষয়বস্তুর কম বেশী করিতে হয়। পাঠ পরিকল্পনায় **পাঠদানের তারিখের** উল্লেখ থাকারও প্রয়োজন রহিয়াছে; ইহা পাঠের পুনরাবৃত্তি (Revision) পরিকল্পনা করিতে, পরীক্ষার বিষয়বস্তু স্থির করিতে এবং আরও নানা কারণে প্রয়োজন হয়। কেহ কেহ পাঠ পরিকল্পনায়, শ্রেণীতে ছাত্রদের গড়পড়তা বয়সেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। তত্ত্বের দিকে বিবেচনা করিলে ইহার প্রয়োজন হয়ত রহিয়াছে—কারণ পাঠ দানকালে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টির নিমিত্ত এবং অন্যান্য প্রয়োজনে শিক্ষককে সর্বদাই তাহাদের বয়সোচিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মনে রাখিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একই শ্রেণীতে ছাত্রদের বয়সের বিভিন্নতা

মূলতথ্য

অনেক সময় ৪।৫ বৎসরেরও অধিক থাকে ; এই পরিস্থিতিতে কোন শ্রেণীর ছাত্রদের গড়-পড়তা বয়স নির্ণয়ের কোন সার্থকতা থাকে না। অনেক সময় পাঠপরিকল্পনায় শিক্ষকের নামও থাকে। পাঠদানের জন্য ইহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। **কোন্ বিষয়ে** পাঠদান করা হইতেছে এবং মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠপরিকল্পনা যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভাল। **কোন ধরণের** (Type of Lesson) পাঠ দেওয়া হইবে তাহার উল্লেখেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পাঠদানের উদ্দেশ্য হিসাবে বিভিন্ন ধরণের পাঠ হইতে পারে। সাহিত্যে পাঠদানের বেলাই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যে সাধারণতঃ Reading Comprehension, Appreciation এবং Composition এই চারি ধরণের পাঠ হইতে পারে (ব্যাকরণ ও অনুবাদকে Composition-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়)। পাঠের ধরণ পাঠদানের পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া **পাঠের ধরণ** সম্বন্ধে পাঠ-পরিকল্পনার উল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক। সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও পাঠের ধরণ নির্ণয় করিতে পারিলে ভাল। তারপর, পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠক্রমের (Scheme of Lesson) উল্লেখ করিতে হয়। অনেক বিষয়বস্তুর (Topic) উপরই একদিন পাঠদান পর্যাপ্ত নহে, অথচ প্রত্যেক দিনের পাঠই স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete by itself) হইতে হইবে। পাঠের বিষয়বস্তু (Topic) নির্ণয় করাও সহজ নহে। পাঠ্যপুস্তকে যেভাবে বিষয়বস্তুর ভাগ থাকে পাঠের উদ্দেশ্যের সহিত অনেক সময়ই তাহার সঙ্গতি থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাস পুস্তকে হয়ত অধ্যায় বা বিষয়বস্তুর ভাগ করা হইয়াছে, "বাবর", "হুমায়ুন" এবং "আকবর" এই আখ্যা দিয়া। ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে এই তিনটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বা বিষয়বস্তু একটি বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইবে যথা—"মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ও দৃঢ়ীকরণ"। যখন বাবর প্রভৃতি সম্রাটের জীবনী পাঠ আমাদের উদ্দেশ্য নহে তখন তাহাদের নামানুসারে পাঠের বিভাগ করিলে পাঠের বিষয়বস্তুর উপর যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কাজেই বাবর, হুমায়ুন এবং আকবরের নামকে পাঠের আখ্যা হিসাবে

গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। আবার মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ও দৃঢ়ীকরণ এই বিষয়টি একদিনে ৪০।৪৫ মিনিটে ছাত্রদের পরিবেষণ করাও সম্ভব নহে। তাই প্রথমেই পাঠক্রমের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। কোন পাঠ পরিকল্পনা ক্রমে শুধু প্রথম পাঠে, ক্রমের উল্লেখ থাকিলেই চলে; উহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পাঠে উহার উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। পাঠক্রমের পরিকল্পনা ক্রমের আরও দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

(ক) জ্যামিতি: বিষয় (Topic): ত্রিভুজের বৈষম্য (Inequalities in a triangle)—কোণ এবং বাহু।

পাঠক্রম: ১। অষ্টম উপপাদ্য। ২। নবম উপপাদ্য। ৩। দশম উপপাদ্য।

(খ) ভূগোল: বিষয়: পশ্চিমবঙ্গ; পাঠক্রম: চতুঃসীমা, পরিধি, জলবায়ু এবং প্রকৃতিজ দ্রব্য; রাজনৈতিক বিভাগ ও প্রধান প্রধান স্থান; যাতায়াত ব্যবস্থা।

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য আমরা নিম্নলিখিতরূপে অগ্রসর হইতে পারি

মূল তথ্য

শ্রেণী······	পাঠের ধরণ······
সময়······	পাঠ পরিকল্পনার ক্রম···
তারিখ······	···············
	···············
	···············
	অদ্যকার পাঠ······

পাঠ পরিকল্পনার মূল তথ্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরই শিক্ষককে পাঠদানের উদ্দেশ্য (Aim) স্থির করিতে হয়। পাঠের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি, পাঠের উদ্দেশ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

পাঠদানের উদ্দেশ্য

সাধারণতঃ পাঠ পরিকল্পনায়, সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য এই দুই ধরণের উদ্দেশ্যের উল্লেখের রীতি আছে। যে বিষয়ে

পাঠদান করা হইতেছে, ঐ বিষয় পাঠ করার যে উদ্দেশ্য তাহাকেই সাধারণ উদ্দেশ্য (General Aim) আখ্যা দেওয়া হয়। একই বিষয়ের, ইতিহাস, গণিত, ইত্যাদি সকল পাঠে সাধারণ উদ্দেশ্য (General aim) একই থাকে ; অধিকন্তু পাঠ-পরিকল্পনায় এত সাধারণভাবে (General way) ইহার উল্লেখ হয় যে (যথা, ছাত্রদের ইতিহাসের জ্ঞান বৃদ্ধি করা, তাহাদের মনের বিশ্লেষণী শক্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি), পাঠদানের মত বাস্তব কাজে, ঐ ধরণের উল্লেখ হইতে কোন সাহায্যের আশা থাকে না, তাই সাধারণ উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া পাঠ-পরিকল্পনাকে ভারাক্রান্ত করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্য (Specific aim) পাঠে পাঠে আলাদা হয় এবং পাঠ-পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট (Specific) করিয়া উহার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হইতেছে (ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি), উহা পাঠের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসারে, নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি বুঝিয়া উহার বিশেষ উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক যে, সপ্তম শ্রেণীতে আকবরের 'হিন্দু নীতি'র উপর পাঠদান করিতে হইবে। এখন ইতিহাস পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ করা ; তাই এই পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে, আকবর কোন্ নীতি এবং কি পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার হিন্দু প্রজাদের মন জয় করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা। আবার, ইতিহাস পাঠের আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে, প্রাচীন ঘটনাবলীর সাহায্যে বর্তমান ঘটনাবলীকে বুঝিতে চেষ্টা করা ; তাই বর্তমান ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার নিমিত্ত আকবরের নীতি ও পন্থা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই সে সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি জাগাইতে সাহায্য করা। সপ্তম শ্রেণীতে ইতিহাস পাঠের আর একটি উদ্দেশ্য ইতিহাস পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা ; তাই আকবরের উদার চরিত্রের প্রতি ছাত্রদের মন আকৃষ্ট করিয়া এবং বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে আকবরের নীতি ও পন্থা কতখানি কার্যকরী এ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া ছাত্রদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি করাও এই পাঠদানের বিশেষ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পাঠদানের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করিয়া লিখার পর, আমাদের প্রয়োজন,

পাঠদানের উপকরণের একটি ফর্দ প্রস্তুত করা, কারণ ঐ উপকরণগুলি শিক্ষককে পূর্বাহ্ণে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। উপকরণের ফর্দ করিতে গিয়া, অনেকে শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ (অর্থাৎ, চক্, ডাষ্টার ইত্যাদি)-কেও ফর্দের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ইহার উল্লেখ করার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। কিন্তু বর্তমানে পাঠদানে, নানা রকমের বিশেষ উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পূর্ব হইতেই উহাদের প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিতে হয়। মডেল চিত্র, ম্যাপ, নক্সা ইত্যাদি উপকরণের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইহা ছাড়াও সমধর্মী পাঠ-এর পুস্তক (সাহিত্যের ক্ষেত্রে), প্রাচীন তথ্যবিষয়ক পুস্তক (ইতিহাসের ক্ষেত্রে) ইত্যাদিও উপকরণের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখিতে হইবে যে, এমন পাঠ খুব কমই আছে, যাহাতে কোন না কোন ধরণের বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন না হয়। পাঠদানের উপকরণগুলির উল্লেখও যত নির্দিষ্টভাবে করা যায় এবং পাঠদানের কোন স্তরে (আয়োজন, উপস্থাপন ও অভিযোজন) উহাদের ব্যবহার হইবে উহা যত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যায় ততই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চতুর্থ শ্রেণীতে "শিবাজীর গল্প" পড়াইতে গিয়া, উপকরণ হিসাবে, "শিবাজীর জীবনী সম্বন্ধে কয়েকখানি চিত্র", এই ধরণের সাধারণ উল্লেখ না করিয়া ঠিক কোন্ কোন্ চিত্র ব্যবহৃত হইবে, এবং বক্তৃনীর মধ্যে উহার কোন্‌টি পাঠদানের কোন্ স্তরে ব্যবহৃত হইবে, তাহার নির্দিষ্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পাঠদানের উপকরণ

পাঠদানের উপকরণের উল্লেখের পর আসে, পাঠগ্রহণের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুতি। কিভাবে তাহাদের মনকে পাঠগ্রহণে আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করা হইবে, সে সম্বন্ধে এখানে পদ্ধতি নির্দেশ করিতে হয়। পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। প্রস্তুতির প্রথমেই অনেকে "পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা" বলিয়া একটি শীর্ষ (head) করিয়া থাকেন অর্থাৎ বর্তমান পাঠের পূর্বে প্রদত্ত, পাঠের জ্ঞান ছাত্রদের উত্তমরূপে শিক্ষা হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। পূর্বজ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে শিক্ষা লাভ হইতে পারে না হার্বাটের এই নীতি হইতেই সম্ভবতঃ পাঠদানের প্রথমে পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইহার

পাঠগ্রহণের প্রস্তুতি

প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে হয়ত "বঙ্গভূমি" নামে একটি কবিতা পড়ান হইয়াছে এবং তাহার পর "বায়ু" সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ান হইবে; এইক্ষেত্রে, প্রস্তুতি স্তরে পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা, কেবলমাত্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে বর্তমান পাঠের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, পূর্বের পাঠ, ভাল করিয়া শিখিয়াছে কিনা ইহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পাঠেই, অভিযোজন স্তরে পাঠদান সার্থক হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করা হয়। অবশ্য বাড়ীতে পাঠের পর এই জ্ঞান দৃঢ়তর হয়। তাহা হইয়াছে কিনা, পরীক্ষা করিতে হইলে, সাপ্তাহিক পরীক্ষার (মৌখিক বা লিখিত) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; পাঠের বিষয়বস্তু কঠিন মনে হইলে পুনরাবৃত্তিকর পাঠদান (Revision Lesson) দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু নূতন পাঠের সহিত পূর্বের পাঠের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে, ঐ পাঠের জ্ঞানের পরীক্ষা প্রস্তুতির স্তরে করা উচিত নহে। কাজেই পাঠ পরিকল্পনায়, পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা বলিয়া কোন শীর্ষ (head) থাকা অনুচিত।

আধুনিকতম শিখণতত্ত্ব (Theory of Learning) অনুসারে, শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের আগ্রহ সৃষ্টিকে শিক্ষা কার্যে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হয়। শিক্ষার্থী একমাত্র নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে পারে—শিক্ষক হাজার চেষ্টা করিলেও শিক্ষাথীর আপন চেষ্টা ব্যতীত তাহাকে শিক্ষা দিতে পারেন না। শিক্ষার জন্য আগ্রহ জন্মাইলেই, শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের জন্য চেষ্টিত হইতে পারে। তাই, প্রস্তুতির স্তরে, পাঠের বিষয়বস্তু গ্রহণের জন্য ছাত্রদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করাই প্রধান কর্তব্য। এই চেষ্টা নানাভাবে করা যাইতে পারে—পাঠের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা এবং ছাত্রদের বয়স ও আগ্রহের বিভিন্নতা অনুসারে, প্রস্তুতির পদ্ধতিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। কোন কোন পাঠের "পূর্ব জ্ঞানের" সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই হয়ত বর্তমান পাঠ গ্রহণে আগ্রহ জন্মাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পর পর দুইটি দেশাত্মবোধক কবিতা পড়াইতে হইলে, দ্বিতীয়টি পড়ানোর সময় প্রথম কবিতার উপর প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের মনে ঐ কবিতাটি পাঠের আনন্দ জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিলে বর্তমান কবিতা পাঠে তাহাদের আগ্রহ

জন্মাইবে। আকবরের মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণ সম্বন্ধে পাঠদান কালে, হুমায়ুনের মৃত্যু এবং মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং উহার শত্রুদের ক্ষমতার কথা আলোচনা করিলে (পূর্ব পাঠের বিষয়) পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। কিন্তু অনেক পাঠেই তথাকথিত পূর্ব জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, পঞ্চম শ্রেণীতে বুদ্ধের উপর পাঠদান কালে, কোন ছেলেকে বুদ্ধরূপে টেবিলের উপর বসাইয়া আরও কয়েকটি ছেলেকে তাহার নিকট প্রণত করিয়া, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি আবৃত্তি করাইয়া (dramatisation), প্রস্তুতির কাজ শেষ করিতে পারেন—কে এই মহাপুরুষ—সকলে যাহার পূজা করিতেছে! ইহার সম্বন্ধে জানিতে ছেলেদের মনে স্বভাবতই আগ্রহের সৃষ্টি হইবে। কখনও কখন, বর্তমান পাঠের বিষয়বস্তুর আলোচনাও প্রস্তুতির স্তরে হইতে পারে। ধরা যাক "বর্ষা" সম্বন্ধে কবিতা পড়াইতে গিয়া, কবিতায় যে বর্ষায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য, ঐ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে, প্রস্তুতির স্তরে, তিন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে—
(ক) পূর্বজ্ঞানের সহিত বর্তমান পাঠের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আগ্রহ বৃদ্ধি।
(খ) পাঠের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নাটকীয় বা অন্যান্য পদ্ধতিতে আগ্রহ বৃদ্ধি।
(গ) বর্তমান পাঠের অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশন বা পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া আগ্রহ বৃদ্ধি এবং অনুধাবন সহজতর করণ।

পাঠগ্রহণের প্রস্তুতি যথাযথভাবে সমাধা করার পর, শিক্ষক ছাত্রদের নিকট পাঠ উপস্থাপন করিতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনায় উপস্থাপনের স্তরকে "বিষয়" এবং "পদ্ধতি" এই দুই ভাগে বিভক্ত করার রীতি আছে।

উপস্থাপন

উপস্থাপন স্তরে নূতন জ্ঞান পরিবেশন করিতে হয়; ঠিক কতটুকু জ্ঞান পরিবেশিত হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকা একান্ত আবশ্যক।

পাঠের বিষয়বস্তুর সহিত পাঠদানের উদ্দেশ্যের সঙ্গতি থাকা একান্ত আবশ্যক; ইহাতে উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কিছু থাকা যেমন উচিত নয়, তেমনি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কোন জ্ঞানও উহা হইতে বাদ পড়া অসঙ্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "আকবরের হিন্দুনীতি"

সম্বন্ধে পাঠদানকালে, যদি আমার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় বর্তমান ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধানের উপর আলোক সম্পাত করা, তবে "বর্তমান ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব," বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যদিও আকবরের সহিত উহার প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই।

পাঠ-পরিকল্পনায় "বিষয়বস্তুর" উল্লেখ করিতে গিয়া, অনেকে বহু বিস্তার করিয়া ফেলেন—পাঠ্যপুস্তকে যাহা লেখা থাকে, সম্পূর্ণভাবে তাহাই তুলিয়া দেন। বিষয়বস্তুর উল্লেখ, শীর্ষে (head) এবং উপশীর্ষে (sub-head) ভাগ করিয়া করিলেই ভাল। পাঠদানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত যুক্তিই (Logic) হইবে এই ধরণের বিভাগের নীতি (principle for division); প্রত্যেকটি শীর্ষ এবং উপশীর্ষের সহিত অপরাপর শীর্ষ ও উপশীর্ষের সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের শেষে যে কয়েকটি পাঠ পরিকল্পনার উদাহরণ দেওয়া হইবে, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবে আশা করা যায়। এমনও দেখা যায় যে, পদ্ধতির বস্তুর "ঘরে" (column) কয়েকটি প্রশ্ন থাকে এবং বিষয়বস্তুর "ঘরে" (column) উহাদের উত্তর লিখিত হয়। এই রীতি অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। পাঠদান কালে, নানা ধরণের প্রশ্ন করিতে হয়, তাহাদের সব কয়টির বিষয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনায় "বিষয়বস্তুর" উল্লেখ

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আকবরের হিন্দু নীতি পড়াইতে গিয়া, আমার উপস্থাপনের অন্যতম বিষয়বস্তু হইতেছে, জনগণের সদিচ্ছার উপর যদি রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে, রাষ্ট্রের নীতি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিতে আমি হয়ত প্রশ্ন করিলাম—১। বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুদের সঙ্গে কি ধরণের ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কোন দৃষ্টান্ত সহকারে তাহা বর্ণনা কর (ছাত্রদের মধ্যে কেহ হয়ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন গল্প বলিল)। ২। পাকিস্তান সরকারের প্রতি হিন্দু নাগরিকদের তাহা হইলে কি ধরণের মনোভাব হওয়া সম্ভব (উত্তর—বিরূপ মনোভাব)। সহজেই বুঝা যায় যে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ঘর (column) গড়িয়া উঠিতে পারে না।

পদ্ধতির ঘরে (column) সাধারণতঃ বিষয়বস্তুর উপর কতকগুলি পুনরাবৃত্তি মূলক (Recapitulatory) প্রশ্ন থাকে। ইহাও ভ্রান্তিপূর্ণ পদ্ধতি। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, উপস্থাপন স্তরে বিষয়বস্তুর উপর পুনরাবৃত্তি মূলক প্রশ্ন করা একেবারে নিষিদ্ধ। উপস্থাপনে নূতন জ্ঞান পরিবেশন করিতে হয়।

পাঠ পরিকল্পনার পদ্ধতির উল্লেখ

উপস্থাপিত জ্ঞান যদি সত্যই নূতন হয়,তাহা হইলে উহার উপর পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করিলে ছাত্রদের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে; আর উহা যদি পূর্বজ্ঞান হয়, তবে ছাত্রেরা উত্তর করিতে পারিবে বটে, কিন্তু উহা উপস্থাপন স্তরের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত নহে। ধরা যাক, অশোকের ধর্ম প্রচারের উপর পাঠদান করিতে গিয়া শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—"অশোক কি ভাবে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ?" এবং আশা করিলেন যে, ছাত্রেরা উত্তর করিবে, শিলা-লিপি, প্রচারক প্রেরণ ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু ছাত্রেরা যদি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতে পারে, তবে এই পাঠের বিষয়বস্তু তাহাদের পূর্বজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পাঠ প্রদানের কোন সার্থকতা থাকে না। আবার শিক্ষক মহাশয় প্রথম বর্ণনা করিয়া পরে তাহার উপর প্রশ্ন করাও সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা হইলে পাঠদানের পদ্ধতি "শিক্ষক কর্তৃক বর্ণনাই" রহিয়া গেল—প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হইল না। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে উপস্থাপন স্তরে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন সম্পূর্ণ অচল। কেবলমাত্র অভিযোজন স্তরে (Application) ঐ ধরণের প্রশ্ন করা যাইতে পারে। পাঠ খুব কঠিন হইলে উহার অংশে অংশে অভিযোজন (Sectional Application) করা যাইতে পারে বটে এবং ঐ সময় পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নও করা যাইতে পারে, কিন্তু পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন কখনও উপস্থাপনের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত বা উল্লিখিত হইতে পারে না।

আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া থাকি ; কখনও বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা করি, কখনও বা ছাত্রদের স্ফুরণমূলক প্রশ্ন (Developmental Question) করি, কখনও ম্যাপ, ছবি ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া উহাদের উপর প্রশ্ন করি এবং কখন কখনও শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে তাহাদের বিভিন্ন ধরণের কর্মে লিপ্ত করি। কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপনে যে সব পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহার সব

কয়টিরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, পদ্ধতির ঘরে (column) করিতে হয়। অধ্যায়ের শেষে পাঠ পরিকল্পনার উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলে, এই বিষয় স্পষ্টতর হইবে। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঠদানের পদ্ধতিকে বহু বিস্তৃত করাও সঙ্গত নহে। পদ্ধতির ঘরে (column) পাঠদানের ইঙ্গিত মাত্র থাকিবে।

উপস্থাপনেই পাঠদান শেষ হয় না, নূতন জ্ঞান সম্বন্ধে যতক্ষণ না ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টি (insight) জন্মিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা সার্থক হয় না।

অভিযোজন স্তর

অভিযোজন স্তরে লব্ধ জ্ঞানকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ করিয়া শিক্ষক ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টি লাভে সাহায্য করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কোন বাংলা গদ্য পাঠে অভিযোজন স্তরে, পাঠের নূতন শব্দগুলির উপর বাক্য রচনা করিতে বলা যাইতে পারে। অনেক সময় উপস্থাপন স্তরে প্রদত্ত জ্ঞান ছাত্রদের মনে আছে কিনা, পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়; পুনরাবৃত্তির ফলে অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করা হয়। কখনও কখনও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নও অভিযোজনে স্থাপন পায়। আবার পাঠকে নাটকীয় রূপদান করিয়াও ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করার চেষ্টা অভিযোজন স্তরে কখনও কখনও করা হইয়া থাকে। সংক্ষেপে, অভিযোজন স্তরের প্রধান উদ্দেশ্য (পাঠে ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করা) স্মরণ রাখিয়া, পাঠের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষক উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করিতে পারেন। মনে রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে অভিযোজন স্তর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

প্রস্তুতি, উপস্থাপন এবং অভিযোজন এই তিনটি স্তর ব্যতীত ব্ল্যাকবোর্ডে সারাংশ লিখনকেও পাঠ পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত।

ব্ল্যাকবোর্ডে সারাংশ

প্রদত্ত পাঠকে পরে স্মরণের এবং পরিবেশিত জ্ঞানকে দৃঢ়ীকরণ ও পরিবর্ধনের নিমিত্ত (পাঠের দ্বারা) ব্ল্যাকবোর্ডে বিষয়বস্তুর সারাংশ লিখিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র রসোপলব্ধিমূলক কবিতার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য না হইতে পারে। যে পাঠে ব্ল্যাকবোর্ডে সারাংশ লিখিয়া দেওয়া হয় না, সে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ব্ল্যাকবোর্ডে সারাংশ বেশী বিস্তারিত করিয়া লিখিতে নাই, তাহা হইলে পাঠদানের অনেক মূল্যবান সময় তাহাতে নষ্ট হয়—বিশেষ করিয়া ছাত্রেরা উহা লিখিয়া লইতে অনেক সময় ব্যয় করে। কাজেই ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে, ব্ল্যাকবোর্ডে পাঠের সারাংশ লিখিতে,বাক্যাংশের সাহায্য গ্রহণ করাই ভাল (পূর্ণ বাক্য লিখার প্রয়োজন নাই)।

সারাংশ লিখার পদ্ধতি

পাঠের বিষয়বস্তুকে শীর্ষে (Head) এবং শীর্ষদের উপশীর্ষে (Sub-head) ভাগ করিয়া সারাংশ লিখিলেই উহা সংক্ষিপ্ত এবং অর্থপূর্ণ হয়। ইহা অতি কঠিন কাজ। তাই পূর্ব হইতেই (পাঠ পরিকল্পনায়) সারাংশ লিখিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। অনেক সময় সারাংশ, ম্যাপ প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিতে পারে। যেমন "ভারতের নদনদী" এই পাঠে, প্রদত্ত বা অঙ্কিত ম্যাপে, ছাত্রেরা নদনদীগুলি বসাইয়া গেলেই সারাংশ গঠন করার কাজ হইয়া গেল। অনেকে সারাংশ পাঠ পরিকল্পনার শেষে লিখিয়া থাকেন। তবে পাঠ পরিকল্পনায় উপস্থাপন স্তরে, বিষয়বস্তুর ঘরে সারাংশ লিখাই আমাদের ভাল বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে স্বতন্ত্রভাবে বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপন খুব সুসংবদ্ধ হয়। প্রত্যেক শীর্ষ বা উপশীর্ষ অনুসারে পদ্ধতির উল্লেখ ও সুসংবদ্ধভাবে করা চলে।

সারাংশ লেখা, পাঠ পরিকল্পনার কোন পৃথক স্তর নহে। কেহ কেহ উহা অভিযোজন স্তরে, কেহ বা উপস্থাপন স্তরে করিয়া থাকেন। অভিযোজন স্তরে কখন পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করা হয়। তাহার উত্তরের ভিত্তিতে সারাংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হয়। কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করা অভিযোজন স্তরের লক্ষ্য নহে। যেখানে পুনরাবৃত্তি না করিয়া বিষয়বস্তুতে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সাহায্য করা সম্ভব, সেখানে অভিযোজনে পুনরাবৃত্তি একেবারে নাও হইতে পারে (যেমন রসোপলব্ধিমূলক কবিতা)। সমগ্র পাঠে পুনরাবৃত্তি কোন পাঠেই করা সম্ভব নহে। অভিযোজন স্তরে পুনরাবৃত্তি ব্যতীত, আরও অনেক কাজ করিতে হয়। তারপর অভিযোজন স্তরে সমগ্র পাঠের পুনরাবৃত্তি করিতে গেলে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। তাই, সারাংশ লিখা, উপস্থাপন স্তরে করিলেই ভাল হইবে। যেমন যেমন এক একটি বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হইবে, তেমন তেমনই উহা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত হইবে এবং ছাত্রেরা উহা

তাহাদের নিজস্ব খাতায় টুকিয়া লইবে (সারাংশ ছাত্রদের নিজেদের খাতায় লিখিয়া লইয়া একান্ত প্রয়োজন)।

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠ পরিকল্পনায় যদিও তিনটি স্তর আছে তথাপি প্রত্যেক স্তরে সমান সময় ব্যয় করা উচিত নহে। মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে, পাঠদানের জন্য যদি ৪০ মিনিট সময় পাওয়া যায় তবে ১৫ মিনিট উপস্থাপন এবং অভিযোজনের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট ২৫ মিনিটই উপস্থাপনের জন্য ব্যয় করা হয়ত সঙ্গত ; উপস্থাপনে ৫।৬ মিনিট এবং অভিযোজনে ৯।১০ মিনিট ব্যয় করা চলিতে পারে। তবে সব পাঠেই যে, ঐরূপ সময় বণ্টন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। পাঠের প্রকৃতি অনুসারে, পাঠদানের বিভিন্ন স্তরে সময় বণ্টনের তারতম্য হইয়া থাকে।

পাঠ পরিকল্পনায় সময় বণ্টন

কয়েকটি পাঠদান পরিকল্পনার নমুনা

ইতিহাস

শ্রেণী—সপ্তম
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—……

পাঠ সংখ্যা……
বিষয়—মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং উহার দৃঢ়ীকরণ।
ক্রম—১। প্রতিষ্ঠা এবং বিপদ
(বাবর ও হুমায়ুন)
২। অন্তর্বর্তী পাঠান শাসন
(শের শাহ্)
৩। সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণ
(আকবর)
(ক) সাম্রাজ্যের বিস্তার।
(খ) সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণ, হিন্দুনীতি।
(গ) শাসন সংস্কার, সাম্রাজ্যের উৎকর্ষ
(ঘ) সম্রাট হিসাবে আকবর।
* (ক) বর্তমান পাঠ

উদ্দেশ্য—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাত্রদের জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা—(ক) কোন্ কোন্ দেশ জয় করিয়া আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং দৃঢ় করেন। (খ) ভারতের রাষ্ট্রগত্য ঐক্য স্থাপন, ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের প্রথম স্তর।

উপকরণ—১। সময় রেখা—আকবরের রাজ্যারোহণ, তাঁহার মৃত্যু এবং বিভিন্ন রাজ্য জয় করার তারিখ ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের তারিখ দেখান থাকিবে।

২। ছাত্রেরাও বাড়ী হইতে একটি সময় রেখার outline করিয়া আনিবে তাহাতে শুধু আকবরের সিংহাসন আরোহণ ও মৃত্যুর তারিখ থাকিবে এবং সময় রেখাটিতে ১০ বৎসর অন্তর অন্তর দাগ কাটা থাকিবে।

৩। আকবরের রাজ্যারোহণকালে মুঘল সাম্রাজ্য প্রদর্শন করিয়া একখানা মানচিত্র (ব্ল্যাকবোর্ডে)।

৪। প্রত্যেক ছাত্র নিজের জন্য ঐ ধরণের একখানা মানচিত্র বাড়ী হইতে ইতিহাসের খাতায় আঁকিয়া আনিবে।

৫। আকবর যে যে দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া আর একখানি মানচিত্র।

৬। তাজমহল, জুম্মা মস্‌জিদ্, দেওয়ান-ই-আম, প্রভৃতি এবং কয়েকটি মুঘল যুগের অঙ্কিত চিত্র।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবদান যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রচুর, এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মাইয়া মুঘল ইতিহাস পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন করা যাইতে পারে—১। মুসলমান রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি স্মৃতি-সৌধ, প্রাসাদ, মস্‌জিদ্ ইত্যাদির নাম কর। (শিক্ষক উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব উহাদের ছবি ছাত্রদের দেখাইবেন)। ২। কয়েকজন কবি, ঐতিহাসিক, গায়ক ইত্যাদির নাম কর। (উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবেন)। তারপর শিক্ষক মুঘলযুগের কয়েকখানা উৎকৃষ্ট ছবি ছাত্রদের দেখাইবেন।

এই যে ভারতের মুসলমান রাজত্বকালের স্বর্ণ যুগ মুঘল সাম্রাজ্য, তাহার প্রতিষ্ঠাতার নাম তোমরা জান, তিনি কে বল? তাঁহার

উত্তরাধিকারী কে হন? তিনি কাহার দ্বারা গদিচ্যুত হন? সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কত দিন পারে তাহার মৃত্যু হয়।

শিক্ষক বর্ণনা করিবেন—কিন্তু তাহার শিশু-পুত্র আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই মুঘল সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগ আরম্ভ হয়। তিনি কি করিয়া ঐ কঠিন কাজে সফলকাম হন, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

উপস্থাপন

বিষয়

(ক) **বিপদমুক্তি**—হিমু কর্তৃক ভারত হইতে মুঘল বিতাড়নের চেষ্টা—দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ—আকবরের জয়—মুঘল সাম্রাজ্যের বিপদমুক্তি।

(খ) **আকবরের জাতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন**—সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(গ) **দেশজয় ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি**

১। রাজপুতানা বিজয়—চিতোর রণথম্বর, কালিঞ্জর ও যশোল্মীর।

২। গুজরাট বিজয় এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা পদানতকরণ।

৩। দাক্ষিণাত্য বিজয়—আহ-ম্মদনগর ও খান্দেশ।

৪। উত্তর-পশ্চিমে দেশজয়—কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।

৫। আকবরের সাম্রাজ্যের চতুঃ-সীমা—পশ্চিমে, কাবুল; উত্তরে, কাশ্মীর; পূর্বে, বঙ্গদেশ; দক্ষিণে, আহম্মদনগর।

পদ্ধতি

(ক) নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন ও বর্ণনার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে—

১। পিতা নাবালক পুত্র ও প্রবল শত্রু রাখিয়া মারা গেলে, শত্রু কি করিবে বলিয়া তোমরা অনুমান কর? (তাহার বিষয়সম্পত্তি গ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে) পাঠানগণ মুঘলদের শত্রু, তাই হুমায়ুনের মৃত্যুর পর পাঠান সেনাপতি হিমু ভারত হইতে মুঘল বিতাড়নের চেষ্টায় দিল্লী অধিকার করেন। (সময় রেখায় তারিখ দেখান হইবে এবং ছাত্রেরা তাহাদের নিজেদের খাতায় সময় রেখার তারিখ বসাইবে)।

২। নাবালক পুত্র যদি জেদী ও তেজী হয়, এবং তাহার যদি সাহায্য সহায়ও কিছু থাকে, তবে সে কি করিবে মনে কর? (সহজে নিজের দাবী ছাড়িবে না)।

বর্ণনা—আকবর তেজী ছিলেন এবং পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ তাঁহার সহায় ছিলেন। দিল্লীর নিকট পানিপথে তিনি হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী পুনরধিকার করিলেন।

ম্যাপে পানিপথ দেখান হইবে, ছাত্রেরা তাহাদের নিজস্ব ম্যাপে ঐ স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে।

(খ) আকবর সম্রাটের পুত্র খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী—তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি হইতে পারে অনুমান করিতে পার কি? (বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা)।

বর্ণনা—হ্যাঁ, তাহা ত ছিলই—অধিকন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাহার হিন্দু, মুসলমান সকল প্রজা রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান ব্যবহার পাইবে।

(গ) ম্যাপে কোন ছাত্রকে হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন দেখাইতে বলা হইবে। সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আকবরকে কি করিতে হইবে? (দেশ জয় বা নিজ সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে)।

বর্ণনা—রাজপুতরাই তখনকার ভারতে সবচাইতে স্বাধীনচেতা ও শক্তিশালী। আকবর প্রথমই রাজপুতানা বিজয়ের চেষ্টা করিলেন।

কোন ছাত্র, রেখা মানচিত্রে (পূর্ব হইতে চিহ্নিত) রাজপুতানার বিজিত দেশগুলি দেখাইয়া তাহাদের নাম করিবে এবং ছাত্রেরা তাহাদের নিজস্ব মানচিত্রে দেশগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করিবে।

বর্ণনা—রাজপুতানা জয়ের পর উহার সংলগ্ন গুজরাট ও আকবর জয় করিলেন (ম্যাপে প্রদর্শন; ছাত্রগণ কর্তৃক তাহাদের নিজস্ব মানচিত্রে চিহ্নিত করণ)। ইহার পর আকবর পূর্ব দিকে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিলেন।

প্রশ্ন—ম্যাপ দেখিয়া বল তাহাকে কোন কোন রাজ্য জয় করিতে হইবে (রেখা মানচিত্রে পূর্ব হইতেই রাজ্যগুলি চিহ্নিত থাকিবে এবং উহাদের নামও লিখা থাকিবে)।

প্রশ্ন—পশ্চিম এবং পূর্বে রাজ্য বিস্তারের পর আকবর কোন দিকে দৃষ্টি দিবেন বলে অনুমান কর? (দক্ষিণ ও উত্তর)

ম্যাপে এসে দেখাও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশ আকবর জয় করেন (ম্যাপে পূর্ব হইতেই চিহ্নিত ও নাম লিখিত থাকিবে) ছাত্রেরা নিজ নিজ ম্যাপ চিহ্নিত করিবে তাহারা সব দেশগুলি ঠিক্ ঠিক্ চিহ্নিত করিতে পারিয়াছে কিনা,

শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন। পাঠ্যপুস্তক হইতে চাঁদ সুলতানের সহিত আকবরের যুদ্ধবৃত্তান্ত একটু পড়িয়া শুনাইতে পারেন।

উত্তর-পশ্চিমে আকবর যে সব দেশ জয় করেন ম্যাপে এসে দেখাও।

শিক্ষক মানচিত্রে দেখাইবেন ছাত্রেরা নিজ নিজ মানচিত্রে দেশগুলির নামের নীচে দাগ দিবে।

অভিযোজন

১। কয়েকটি দেশের নাম দেওয়া হইল; ইহাদের মধ্যে আকবর যেগুলি জয় করিয়াছিলেন তাহাদের নীচে দাগ দাও—তুরস্ক, চুনার, খান্দেশ, বাংলাদেশ, তিরপুত, উড়িষ্যা, রণথম্বোর, কনৌজ, কালিঞ্জর, জয়শলমীর, চিতোর, বিজয়নগর, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, নেপাল, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা।

২। আকবর যে সব দেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত "heads" এর নীচে নীচে সাজাইয়া লেখ—(ক) রাজপুতানায় দেশজয়, (খ) উত্তর-পশ্চিমের দেশ জয়, (গ) পূর্বের দেশজয়, (ঘ) দক্ষিণের দেশ জয়।

৩। বর্তমান ভারতে কোন্ স্থান ভারতীয় রাষ্ট্র হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার দাবী করিতেছে?

৪। উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি?

ENGLISH

Class X
Time: 40 minutes

Lesson: "The Rains" by R. T. H. Griffith.
Type: Appreciation.
Lesson Scheme:
Unit (*a*) is the unit for the lesson.
(*b*) Who is this......... jewelled train.
(*c*) They will reval...... wings,

Aim: To help the pupils to (*a*) appreciate the beauty of the cloud, just before the rain starts, (*b*) appreciate the similies used in the poem, (*c*) read the poem alond with proper intonation etc. so as to enjoy it, (*d*) develop interest in reading poetry in general

and English poetry in particular. (*e*) To add the following word to the pupils English Vocabulary—Herald Glare. Pealing Marshalling.

Aids: 1. A few good pictures of rains. 2. Picture of an Indian emperor riding on an elephant in procession. 3. Books for parallel readings—Gitabitan etc,

Preparation. 1. Who love the rains, amongst you—Raise hands. 2. What appeals to you most, in a rainy day ? 3. Describe a rainy day as you liked it (Answer may be in English or Bengali). One or two pictures on rains may be presented and pupils may be asked to describe them. Pupils may be asked to recite any poem on rains (English or Bengali). The teacher may recite, one or two himself.

To day, we shall read a poem on rains and know how Griffith, an English poet enjoyed the beauty of the rains, when it was about to come.

PRESENTATION

Matter

A. Who is this......local classification of the following slmilies.

(1) The Emperor is riding on the elephant and the rains, like an emperor is riding on the cloud.

(2) The herald is marching with a red flag, announcing the emperor—the lightning is the herald for the rains and is carrying the red flag.

(3) Drummers are accompanying the emperor—thunder are the drummers for the rains.

4. Emperor's procession is being led on a spacious road—Air is the broadway for the rains.

B. Meaning of difficult words.

1. Herald : One who goes ahead of royality to announce his arrival.

2. Glare : Fierce look.

3. Pealing : Making a loud noise like cannon.

4. Marshalling : Setting in proper order as the Marshall sets the soldiers in order.

5. Fawn : Young deer.

6. Murky : Dark.

C. The whole lesson.

D. The lesson shall be divided into the following sub-units—

(1) Who......air.
(2) Pealing......train.
(3) Welcome......loud.
(4) Look upon......train.

E. Subject-matter as in D.

Method

1. The picture of the royal procession and a picture of cloud with lightning would be presented and the pupils would be asked the following types of questions—What is the emperor riding ? Which is the royal flag ? What do we call him who carries the royal flag (the teacher may supply the answer if required) ? etc. etc. At each stage, the pupils would be asked to compare the royal procession with that of the rains. They would take down in their note books, the clarification of the similies as done in the "matter" column and as developed in co-operation with the pupils.

1. The herald would be shown in the picture and the pupils would be asked to explain his functions and then to make a sentence with the word.

2. You must have seen a tiger in the zoo. "The tiger... looks"—Can you fill in the blank with a word (fierce). The word "glare" has the same meaning with fierce. Make a sentence with the word glare (The glare in a tigers' eye would surely frighten children).

4. A picture may be presented, where a Marshall in uniform may be seen arranging soldiers in order and the meaning of the word would be developed in reference to the picture.

The meaning of the other two words would be developed in similar fashion.

The meaning of every word along with an illustrative sentence would be written on the B. B. to be taken down by the pupils.

C. The teacher will give a pattern reading, the pupils following with their books shunt.

D. Pupils would read the units loudly with proper pronounciation etc. ; at every mistake committed pupils would raise hands and it would be corrected. The best readers in the class would be utilised for the readings.

The pupils would read silently the sub-units and at

the end of every sub-unit the following types of develop mental questions may be asked to improve the comprehension further.

(1) Who is coming ? (the rains). (2) Who is imagined as its herald ? (the clouds). (3) How is the cloud announcing the arrival of the rains ? (through the sounds of thunder) (4) Why is this sound, called the "sound of fear" ? (sound of thunder is frightening). (5) What is being imagined as the flag of the cloud, the herald of rains ? (Lightning) (6) Why is the lightning said to be glaring ? (can be compared to fierce look as it frightens people) (7) Why is the air said to be murky ? (Before the rains, the air is sombre). The other units would be dealt with in similar fashion.

Application : Every pupil will draw a penpicture of the landscape described in one of the sub units. The writings will then be discussed in reference to the text.

The pupils may recite (in Bengali or English) any poem on the rains or they may describe their own experience of the landscape before the rains come.

The Stanzas of the Poem on which the Lesson Note has been prepared

THE RAINS

Who is that driveth near,
Heralded by sounds of fear ?
Red his flag, the lightning's glare
Flashing through the murky air,
Pealing thunder for his drums,
Royally the monarch comes.
See, he rides amid the crowd,
On his elephant of cloud,
Marshalling his kingly train.

... ...

প্রশ্নকরার পদ্ধতি—উপরে যে দুইটি পাঠ পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কথোপকথন পদ্ধতি (Conversational Method) অনুসরণ করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে পরস্পর প্রশ্নকরণ এবং উত্তর দানের মাধ্যমে শিক্ষা অগ্রসর হইয়া থাকে। এই ধরণের পাঠদানের সফলতা, যথাযথ প্রশ্ন করণের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। শিখণতত্ত্ব (Learning theory) হইতে আমরা জানি যে, ছাত্রের মনে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন উপস্থিত না হইলে, শিখণ কখনও আরম্ভই হইতে পাবে না। শিক্ষার্থীর মনে সমস্যার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে শিক্ষালাভের জন্য চেষ্টিতই হইবে না। প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্রের মনে সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারেন; ইহার ফলে সে "জিজ্ঞাসু" হইবে বা নির্দিষ্ট শিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে। কিন্তু শ্রেণী শিক্ষা দান কালে শিক্ষক সাধারণতঃ বক্তৃতা করিয়া যান এবং ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় হইয়া শুনিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রশ্নোত্তর ছাত্রদের সক্রিয় করিবার অন্যতম উপায়। ইহার মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ছাত্রেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রশ্নকরণ, পাঠের ছাত্রদের মনযোগ আকর্ষণেরও পদ্ধতি। ছাত্রেরা পাঠ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে কিনা, পাঠের প্রতি তাহাদের মনযোগ আশানুরূপভাবে আকর্ষিত হইয়াছে কিনা, তাহাও প্রশ্নকরণের মাধ্যমে বুঝা যায়। পুরাতন জ্ঞান হইতে নূতন জ্ঞানে লইয়া যাওয়ার অন্যতম পদ্ধতিও প্রশ্নকরণ। পাঠ-দানের শেষ স্তরে, ছাত্রেরা আশানুরূপ জ্ঞানলাভে সক্ষম হইয়াছে কিনা জানিতে হইলেও প্রশ্নের সাহায্য লইতে হয়।

পাঠদানে প্রশ্নের গুরুত্ব

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। ছাত্রেরা অধ্যাপককে প্রশ্ন করিতেন এবং অধ্যাপকের উত্তরদানের মাধ্যমে শিক্ষা অগ্রসর হইত। বিতর্কও প্রাচীনকালে শিক্ষা-লাভের অন্যতম মাধ্যম ছিল—ইহাতে দুই পক্ষ পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেন এবং উত্তরদানের মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার হইত। গ্রীসদেশে সক্রেটীশ এবং পরে তাঁহার শিষ্যগণ (Sophists) শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেন এবং ইহাদের সাহায্যে তাঁহার মুখ হইতে অভিপ্রেত উত্তর (নূতন জ্ঞান) বাহির করিয়া লইতেন।

বর্তমানে পাঠদানকালে, আমরা কিছুটা অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকি।

বস্তুত পক্ষে শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ হইল, সুকৌশল প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রের মনে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহার চিন্তাধারা এবং কর্মকে যথাযথ পথে পরিচালিত করিয়া নূতন জ্ঞান আবিষ্কারের সাহায্য করা। কাজেই শিক্ষককে, কৌশল হিসাবে প্রশ্নকরণ পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হয়।

বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নকরণ পদ্ধতি—পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন

পাঠদানকালে শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের (Recapitulatory Questions) আলোচনা করা যাক। এই ধরণের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হইল, পুনরাবৃত্তি করিতে বলিয়া, ছাত্রের আয়ত্তীকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা করা।

দৃষ্টান্ত—(ক) "আরণ্যক" শব্দের অর্থ বল ?
(খ) "ভাজক" কাহাকে বলে ?
(গ) ভাকরা-নাংগাল বাঁধ কোন প্রদেশে (Stato) অবস্থিত ?
(ঘ) কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বনে জল বিশুদ্ধ করা যায় ?
(ঙ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? ইত্যাদি……

শিক্ষক মহাশয়গণ, পাঠদানকালে ঐ ধরণের প্রশ্নের বহুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র পূর্বার্জিত জ্ঞানের উপরই এই ধরণের প্রশ্ন করা চলে। যে জ্ঞান এখনও অর্জিত হয় নাই, উহার উপর পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ঐ ধরণের প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—

১। প্রস্তুতির স্তরে—পূর্ব জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐ ধরণের প্রশ্ন করা যাইতে পারে। যথা,—হুমায়ূনের উপর পাঠদানকালে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (বাবর)। তিনি কোন বংশের সম্রাটের নিকট হইতে ভারতসাম্রাজ্য জয় করেন ? (লোদী—পাঠান বংশ)। বাবরের মৃত্যুর পর কে সিংহাসন লাভ করেন ? (হুমায়ূন)। আজ আমরা হুমায়ূন কি করিয়া পাঠানদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন এবং তাহার ফলাফল কি হয় উহা পাঠ করিব।

ছাত্রেরা পূর্বে যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে সক্ষম হইবে।

২। অভিযোজন স্তরে—ছাত্রেরা পাঠ হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে কিনা, ইহা পরীক্ষার নিমিত্ত পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করা যাইতে পারে। যথা,—হুমায়ূনের উপর পাঠের উপস্থাপন শেষ করিয়া, অভিযোজন স্তরে পরীক্ষা নিমিত্ত, শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিতে পারেন, "হুমায়ুনের সহিত শেরশাহের কোথায় কোথায় যুদ্ধ হইয়াছিল ?"

কিন্তু উপস্থাপন স্তরে যে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করা চলে না একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। হুমায়ুন পড়াইতে গিয়া আমরা যদি প্রশ্ন করি, "শেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন ?" তাহা হইলে ছাত্রেরা উত্তর করিতে পারিবে না, কারণ ইহা ত তাহাদের পূর্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তাহারা ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে হুমায়ুন সম্বন্ধে তাহাদের পূর্বজ্ঞান আছে এবং ঐ বিষয়ে পাঠদানের সার্থকতা নাই। ২।১টি অগ্রসর ছাত্র যদি বাড়ীতে পড়িয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া উত্তরদানে সক্ষমও হয়, তথাপি শিক্ষকের তাহাদের সাহায্যে পাঠদানে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়; কারণ উপস্থাপন স্তরে পাঠদানের প্রধান নীতি হইল, ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের সাহায্যে নূতন জ্ঞানে উপস্থিত হইতে সাহায্য করা। পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে। সাবধান বাণী হিসাবেই, উচ্চারণ করা যাইতে পারে,—"উপস্থাপন স্তরে সাধারণতঃ পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করিবেন না"।

বিকাশমূলক প্রশ্ন

বিকাশমূলক (Developmental) প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ উপস্থাপন করিতে হয়। বিকাশমূলক প্রশ্ন এমন ধরণের প্রশ্ন যাহা ছাত্রকে পূর্বজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া নূতন জ্ঞানে উপস্থিত হইতে সাহায্য করে। ঐ ধরণের প্রশ্ন এমন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে যে, ছাত্রেরা তাহাদের বুদ্ধি এবং পূর্বজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের সমাধান করিয়া নূতন জ্ঞানে উপস্থিত হইতে পারে। যথা,—হুমায়ূন শেরশাহের নিকট যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন; ছত্রভঙ্গ সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আবার যুদ্ধ করিবেন, এ ভরসাও রহিল না; এই অবস্থায় তিনি কি করিবেন? যুদ্ধে না হউক, ঝগড়াঝাটি বা মারামারিতে এরূপ অবস্থায় পড়িলে লোকে কি

করে, সে জ্ঞান ছাত্রদের আছে। তাই পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, তাহারা হয়ত উত্তর করিতে পারিবে যে, "তিনি পলায়ন করিবেন।" আবার প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, "কেন তিনি পলায়ন করিবেন?" আবার পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রেরা উত্তর করিতে পারিবে, "প্রাণ রক্ষার জন্য বা শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্য লইয়া আবার যুদ্ধ করার জন্য। তখন শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিতে পারেন যে, তাহাদের অনুমান সত্য—শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্য লইয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় হুমায়ুন পারস্য দেশে পলায়ন করেন। বিকাশমূলক প্রশ্নে ছাত্রদের বুদ্ধির এবং সৃজনীশক্তির প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে বলিয়া, উহাদের উত্তর দিতে ছাত্রেরা বিশেষ আনন্দ পায়; পাঠে তাহাদের আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং মনযোগ আকর্ষিত হয়; নূতন জ্ঞান তাহাদের পূর্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হয়। বার বার আবৃত্তি (repetition) না করিলেও ইহা মনে থাকে।

কিন্তু যথাযথ বিকাশমূলক প্রশ্ন উদ্ভাবন সহজ কাজ নয়। বিকাশমূলক প্রশ্ন করার কৌশল না জানায় অনেক সময়ই শিক্ষক উপস্থাপন স্তরেও পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ধরুন, সাম্রাজ্যের প্রতি হিন্দুদের আন্তরিক আনুগত্য গড়িয়া তুলিবার জন্য, আকবর যে সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা উপস্থাপিত করিতে গিয়া শিক্ষক মহাশয় হয়ত প্রশ্ন করিবেন—আকবর হিন্দুদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? নূতন জ্ঞান হইলে, ছাত্রদের ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আবার অনেক সময় বিকাশমূলক প্রশ্ন ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। যথা,—পূর্বোক্ত বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিতে গিয়া যদি প্রশ্ন করা হয়, হিন্দুদের মুসলমানদের সঙ্গে যদি সমান অধিকার দিতে হয়, তবে আকবরের কি করা উচিত? (এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা নিজ অভিজ্ঞা হইতে দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না)। অথচ এক্ষেত্রেও ছাত্রদের বাস্তব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রশ্ন করা চলিত; তোমরা অনেকে পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিয়াছ; কেন চলিয়া আসিয়াছ তাহার ২।১টি কারণ বলিতে পার কি? (অত্যাচারের ভয়ে, জমির ফসল মুসলমানরা জোর করিয়া কাড়িয়া লয়, দুর্গা প্রভৃতি পূজায় বাজনা বাজাইতে দেয় না ইত্যাদি) ঐ উত্তরগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষক বলিতে পারেন—অর্থাৎ আইনের কাছে হিন্দুরা সুবিচার

পায় না, তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন এবং তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে অসুবিধা। আকবরের সময়ও হিন্দুদের ঐ সব অসুবিধা ছিল। এখন বল, আকবরের হিন্দুদের আনুগত্য লাভের জন্য কি করা উচিত ?

প্রশ্ন করার সময় অনুসৃত কয়েকটি প্রধান নীতি :

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপস্থাপন স্তরে, সাধারণতঃ পুনরাবৃত্তি-মূলক প্রশ্ন করিবেন না—প্রধানতঃ বিকাশমূলক প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিতে হইবে।

২। প্রস্তুতি এবং অভিযোজন স্তরে কিছুটা পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন করা চলে ; কিন্তু অধিকাংশ পাঠেই এই উভয় স্তরেই বিকাশমূলক প্রশ্ন করারও প্রয়োজন হয়।

৩। পাঠদানকালে প্রশ্ন করা প্রয়োজন, এই ধারণা হইতে অতিরিক্ত সহজ প্রশ্ন করা উচিত নয়। যথা,—রবীন্দ্রনাথ কে ছিলেন ? গরু দেখিয়াছ কি ? আমাদের বিদ্যালয়ে এমন ছাত্র নাই যে রবীন্দ্রনাথ কে ছিলেন জানে না, বা গরু দেখে নাই।

৪। প্রশ্নের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা (Vagueness) থাকা উচিত নয় ; অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন—উত্তর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকা অনুচিত। যথা,—প্রশ্ন করিলেন, আকবর কিরূপ সম্রাট ছিলেন ? (উত্তর—ভাল, সাহসী, রাজনৈতিক)। আপনার আকাঙ্ক্ষিত উত্তর হয়ত, "উত্তম রাজনৈতিক ছিলেন"। নির্দিষ্ট করিয়া প্রশ্ন করিলে, প্রশ্ন করা উচিত, ছিল—রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে, আকবর কিরূপ সম্রাট ছিলেন বল। প্রশ্ন করায় অস্পষ্টতা দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পূর্ব হইতেই আকাঙ্ক্ষিত উত্তর মনে স্থির করিয়া লইতে হয় এবং যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহাতে আকাঙ্ক্ষিত উত্তর আসিবে কি না, চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। তাই অনেক শিক্ষকই পাঠদান পরিকল্পনায় প্রশ্ন লিখিয়া, বন্ধনীর ভিতর আকাঙ্ক্ষিত উত্তরও লিখিয়া রাখেন।

৫। সাধারণতঃ এমন ধরণের প্রশ্ন করা উচিত নয়, যাহাতে প্রশ্ন হইতেই ছাত্রেরা তাহার উত্তর জানিতে পারে বা যাহার উত্তর কেবলমাত্র "হ্যাঁ" বা "না" দিয়া দেওয়া চলে। যথা,—রবীন্দ্রনাথ কি খুব বড় কবি ছিলেন? ঔরঙ্গজীব কি অতিরিক্ত গোঁড়া ছিলেন?

৬। অতিরিক্ত সহজ প্রশ্ন করা যেমন উচিত নয়; অতিরিক্ত কঠিন প্রশ্ন করাও তেমনি অনুচিত। যথা,—প্রশ্ন করা হইল, একজন উত্তম রাজনৈতিকের, তাহার সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কি করা উচিত (জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজার আনুগত্য লাভের চেষ্টা করা উচিত)। অষ্টম বা নবম শ্রেণীর ছাত্রেরা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষক যখনই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রশ্ন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তখনই উহাকে সহজ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। যথা,—সকল দেশবাসীর স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য এবং সৈন্যশক্তি এই উভয়ের মধ্যে কাহারও উপর রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত (প্রথমটিকে)? এখন পূর্বের প্রশ্নের উত্তর কর।

৭। আর একটি কথা মনে রাখিতে হয় যে, কখনও দুইটি পৃথক প্রশ্নকে একসঙ্গে যুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। যথা, আকবর কে ছিলেন এবং তিনি কখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন?

৮। প্রশ্নের উত্তর করার জন্য ছাত্রদিগকে হাত তুলিতে অভ্যস্ত করিতে হয়। অনেক সময় সঙ্কোচ, দ্বিধা প্রভৃতি নানা কারণে ছাত্রেরা উত্তর জানা সত্ত্বেও হাত তুলে না। ছাত্রদের হাত তোলা দেখিয়াই শিক্ষক বুঝিতে পারেন তাহার প্রশ্ন শ্রেণীর উপযুক্ত হইয়াছে কিনা, সাধারণভাবে ছাত্রেরা পাঠে আগ্রহশীল হইয়াছে কিনা। প্রশ্ন কঠিন হইলে তাহাকে সহজ করিয়া দিতে হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যাহাদের একটু বিশেষ সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, কে কে হাত তুলিল না তাহা দেখিয়াই শিক্ষক তাহাও বুঝিতে পারেন। একজন ছাত্র সঠিক উত্তর দেওয়ার পর যে সব ছাত্র হাত তোলে নাই, তাহাদের ২।১ জনকে আবার প্রশ্ন করিতে হয়। এইভাবে শিক্ষক অনগ্রসর ছাত্রদের শিক্ষালাভে বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন।

৯। ছাত্রেরা যে উত্তর করিবে, তাহা যথেষ্ট জোরে হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রই তাহা শুনিতে পারে। তাহা না হইলে, শিক্ষককে উত্তরটি পুনরাবৃত্তি করিয়া সকল ছাত্রকে তাহা শুনাইয়া দিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, যাহা কিছু শ্রেণীতে হইতেছে, প্রত্যেক ছাত্রই যাহাতে তাহা হইতে উপকৃত হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাত্র যদি মৃদুস্বরে বা অস্পষ্টভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে শিক্ষক তাহার নিকট গিয়া বা তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া উত্তর ভাল করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিবেন না—ছাত্রকে নিজ জায়গা হইতেই জোরে এবং স্পষ্ট করিয়া উত্তর দিতে বলিবেন। সে তাহা করিতে না পারিলে অপর ছাত্রকে উত্তর করিতে বলিবেন।

১০। অনেক সময় শিক্ষক এমন সব প্রশ্ন করেন যাহা শ্রেণীর ১।২ টি অগ্রসর ছাত্র ছাড়া আর কেহ উত্তর করিতে পারে না। তাই শিক্ষকও বার বার উহাদেরই উত্তর দিতে বলেন। ইহা অনুচিত। কারণ যদি কোন প্রশ্ন শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র উত্তর করিতে না পারে তাহা হইলে প্রশ্ন কঠিন হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাঠদানের উদ্দেশ্য ২।১টি অগ্রসর ছাত্রকে সাহায্য করা নহে—শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রই যাহাতে উপকৃত হয় শিক্ষককে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। তাই উত্তর দানের সুযোগ শ্রেণীর সকল ছাত্রকেই যথাসম্ভব দিতে হয়—শ্রেণীর প্রথমে, পিছনে, মাঝখানে সকল অংশেই ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ইহার ফলে শ্রেণীর সকল অংশের ছাত্রদের মনোযোগই পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি যে সব ছাত্র উত্তর দানের জন্য হাত তুলিতেছে না তাহাদেরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

১১। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সাধারণভাবে শ্রেণীর সকল ছাত্রকে করিতে হয়। কাহাকেও দাঁড়াইতে বলিয়া তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে কাহাকেও আঙ্গুল দিয়া নির্দেশ করিয়া উত্তর করিতে বলাও উচিত নয়। কারণ ইহার ফলে সমগ্র শ্রেণী উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সুযোগ পায় না। এই ধরণের প্রশ্নোত্তর শিক্ষক এবং একটি ছাত্রের ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

তাই প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের হাত তুলিতে বলিতে হয়; যাহারা হাত তোলে নাই তাহাদের হাত তুলিতে উৎসাহিত করিতে হয়; তারপর কাহাকে উত্তর করিতে বলিলে ভাল হয় বিবেচনা করিয়া উত্তর করার নির্দেশ দিতে হয়।

১২। প্রশ্নের উত্তর যাহাতে খুব বিস্তারিত না হয় সে দিকে প্রশ্ন করার সময়ই লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণতঃ কোন ছাত্রই এত ভাল উত্তর করিতে পারে না,' যাহাতে সকল ছাত্রই ২।৩ মিনিট তাহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিবে। আবার, এক ছাত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তর করিলে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে উত্তর দানের সুযোগ দেওয়া যাইবে না।

১৩। কোন ছাত্র ভুল করিলে শুদ্ধ উত্তর অপর কোন ছাত্রের নিকট হইতে আসার পর প্রথম ছাত্রকে আবার উত্তর দানের সুযোগ দিতে হয়।

১৪। ভুল উত্তরের জন্য ছাত্রকে তিরস্কার করা অনুচিত। কোন ছাত্রের ভুল উত্তর লইয়া অপর ছাত্রেরা যাহাতে হাসাহাসি না করে সেদিকেও শিক্ষক দৃষ্টি দিবেন।

ডল্টন পরিকল্পনা (Dalton)—উপরে বর্ণিত কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম মাত্র। শিক্ষা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি লইয়া নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে; ডল্টন পরিকল্পনা ইহারই অন্যতম ফল। ছাত্রে ছাত্রে বুদ্ধি, জ্ঞান, আগ্রহ-প্রবণতা, চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বহুল পরিমাণ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া এবং শ্রেণী শিক্ষার দোষক্রটির কথা বিবেচনা করিয়া ডল্টন পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে।

১৯১৯ খ্রীঃ আমেরিকার ম্যাসাচ্যুসেট্স্ প্রদেশের অন্তর্গত ডল্টন শহরে মিস্ হেলেন পার্কহার্ষ্ট এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করেন। এই পরিকল্পনার মূলনীতি পাঠদানকে ব্যক্তিগত করা (Individualise Instruction)। এই সময় বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা (Mental tests) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত বৈষম্যের পরিমাণ যে খুবই বেশী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ইহার বহু পূর্ব

হইতেই (রুশোর সময় হইতে) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষাবিদেরা-ও এই আন্দোলন সমর্থন করেন। ফলে কি করিয়া ছাত্রদের নিজ নিজ আগ্রহ, প্রবণতা, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি অনুসারে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া চলে, ইহা শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। মিস্ পার্কহার্ষ্ট, ডল্টন পরিকল্পনায় এই সমস্যার সমাধানের একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন।

ডল্টন পরিকল্পনার মূলনীতি

এই পরিকল্পনায় ছাত্রদের শ্রেণীতে বিভক্ত করার নীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। বাস্তবক্ষেত্রে নানা সুবিধার জন্য ইহা রক্ষিত হইয়াছে। ছাত্রেরা গতানুগতিক (Traditional) বিদ্যালয়ের মত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে ; প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র পাঠক্রম থাকিবে এবং বৎসর শেষে ছাত্র উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখা হইবে।

শ্রেণীবিভাগের স্বীকৃতি

শিক্ষাকালে কিন্তু শ্রেণীবিভাগ রক্ষিত হইবে না। এমনভাবে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে ইচ্ছামত পাঠ শিক্ষা করিতে পারে। প্রথমেই শ্রেণীর পাঠ্যসূচীকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ বা ইউনিট (unit)এ ভাগ করিয়া ফেলা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিট কিভাবে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন কোন বই পড়িতে হইবে, কোন কোন ধরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করিতে হইবে, তাহা শ্রেণীগতভাবে আলো-চনার ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠ্যসূচী ইউনিটে বিভাগ ও শ্রেণীগত আলোচনা

কিন্তু তারপরই প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে ইউনিটগুলির শিক্ষায় অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। প্রত্যেকটি ইউনিটকে কতকগুলি এস্যাইনমেণ্টে (Assignment) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই এস্যাইনমেণ্টের কাজগুলি সময়মত শেষ করিবার দায়িত্ব ছাত্রদের নিজস্ব। একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ছাত্রদের এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কোন এস্যাইনমেণ্ট কখন করিবে তাহা কিন্তু ছাত্র নিজ অভিরুচি অনুযায়ী স্থির করিবে। সে নিজ ইচ্ছানুযায়ী

ইউনিটকে এস্যাইমেণ্টে বিভাগ—
ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা

তাহার সময়-তালিকা (Time-table) প্রস্তুত করিয়া শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইবে! তবে শিক্ষকমহাশয় লক্ষ্য রাখিবেন যে, ছাত্র যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণতঃ একমাস) প্রত্যেকটি ইউনিট্ শেষ করিতে পারে। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধারণতঃ চারি সপ্তাহ পরপর, শিক্ষক, ছাত্রেরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহা বিচার করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রত্যেক ছাত্রের অগ্রগতির হিসাবস্বরূপ শিক্ষক পৃথক পৃথক গ্রাফ্ করিয়া বিষয় কক্ষের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখেন। তাহা হইতে প্রতি সপ্তাহে, কোন ছাত্র কতখানি অগ্রসর বা পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার হিসাব পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগতভাবে এস্যাইনমেণ্ট প্রস্তুত করার সময়ও ছাত্রেরা প্রয়োজনমত শিক্ষক এবং পুস্তকের সাহায্য পায়। প্রত্যেক বিষয়ের (Subject) জন্য এক-একটি কক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। ঐ কক্ষগুলি, প্রয়োজন-মত পুস্তক, যন্ত্রপাতি, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদিতে সজ্জিত থাকে। শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয় অনুসারে, বিষয় কক্ষে (Subject Room) উপস্থিত থাকেন, যাহাতে ছাত্রেরা প্রয়োজনমত তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে।

বিষয়কক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষক

বিষয়কক্ষে গিয়া শিক্ষক বা পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারে শ্রেণী-বিন্যাস ব্যবস্থা থাকে না—অর্থাৎ যে-কোন শ্রেণীর ছাত্র নিজ প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে যখন খুসী বিষয়কক্ষে গিয়া শিক্ষক ও পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষক, ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য দেন। ডল্টন শিক্ষা-প্রণালীতে তাই কোন সময়-তালিকা (Time-table) থাকে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর ঘণ্টাও বাজে না; কেবলমাত্র বিদ্যালয় বসিবার সময় এবং উহার কাজ শেষ হইবার সময় স্থির থাকে।

পাঠ প্রস্তুতের ব্যাপারে শ্রেণীবিন্যাস নাই

ডল্টন পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হওয়ার পরই, উহা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন স্থানে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নানাকারণে আমাদের দেশে ডল্টন পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। শিক্ষা বিজ্ঞানে, জ্ঞান অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইহার জনপ্রিয়তা কমিলেও উহার অনেকগুলি নীতি শিক্ষাদানে

গ্রহণ করা হইয়াছে। ডল্টন পরিকল্পনার যে অনেক গুণ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সর্বপ্রথমই বলিতে হয় যে, ডল্টন পরিকল্পনায় ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি স্বীকার করিয়া পাঠদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রে ছাত্রে বুদ্ধিগত, অপরাপর মানসিক শক্তিগত, আগ্রহগত, চারিত্রিক গুণাবলীগত এবং অর্জিত জ্ঞানগত ব্যবধান এত বেশী যে, দুইটি ছাত্রকেও এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। তাই, ডল্টন পরিকল্পনায় প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠ (assignment) গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। ফলে, মেধাবী ছাত্রকে অল্প মেধাবী ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না; অন্যদিকে অল্প মেধাবী ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে চলিবার নিমিত্ত কিছু না বুঝিয়াও পাঠ মুখস্ত করার চেষ্টা করিতে হয় না। কোন ছাত্র পাঠ গ্রহণ করিতে পারিল বা পারিল না তাহা নির্ণয় করাও শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হয় না। সংক্ষেপে শ্রেণী শিক্ষাদানের যেসব প্রধান ত্রুটি এই পরিকল্পনায় তাহা দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে। শিক্ষাগ্রহণ যে প্রধানতঃ ছাত্রদেরই কাজ, শিক্ষক এই কার্যে সহায়ক মাত্র, এই নীতিও ডল্টন পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শিক্ষকেরা বিষয়কক্ষে বসিয়া থাকেন, কেহ সাহায্য চাহিলে সাহায্য দিবেন এই প্রতীক্ষায়; ছাত্রেরা আপন আপন এস্যাইনমেণ্ট প্রস্তুত করার তাগিদে শিক্ষকের সাহায্য প্রার্থনা করে। ডল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলক (purposeful) এবং কর্মমূলক করার চেষ্টাও করা হইয়াছে। একটা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানকে ছাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে এবং এস্যাইমেণ্ট লিখন, ম্যাপ প্রস্তুতকরণ ও অন্যান্য কর্মের মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব পালন করে। ইহাতে ছাত্র আত্মনির্ভর হইবার সুযোগও পায়। তাহার নিজের সমস্যা তাহাকে নিজেকে সমাধান করিতে হইবে এই কথা ছাত্র প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে।

ডল্টন পরিকল্পনার গুণাগুণ

বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনাধীন থাকার জন্য ডল্টন পরিকল্পনায় ছাত্র, শিক্ষার রস অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে এবং উচ্চতর

শিক্ষার জন্য তাহার জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। শ্রেণীকক্ষের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের বই, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য শিক্ষাগ্রহণ করাও সহজ হয়।

ডল্টন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণে কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে; ইহার জন্যই ভারতবর্ষে ইহা রূপায়ণের চেষ্টা সফল হয় নাই।

ডল্টন পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটি

ডল্টন পরিকল্পনায় ছাত্রদের মনে যে সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, উহা তাহাদের চাহিদা (need) ভিত্তিক না হইয়া পাঠ্যক্রম ভিত্তিক থাকে, তাই উহা সমাধানের জন্য তাহাদের মনে স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায় না। শ্রেণী শিক্ষারই মত শাস্তি বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভয়েই ছাত্রেরা এস্যাইনমেণ্ট শেষ করিতে অগ্রসর হয়। ফলে, অল্পবয়সে ছাত্রেরা নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে দেশে পরিবারে বা বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা দায়িত্ব নিতে অভ্যস্ত নহে, সেদেশে এই পরিকল্পনা গ্রহণের ফল আশানুরূপ হইতে পারে না। ডল্টন পরিকল্পনায় উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী ছাত্রেরা লাভবান হয়, কিন্তু অনগ্রসর ও আলস্যপরায়ণ ছাত্রেরা এই পরিকল্পনায় ফাঁকি দেওয়ার অধিকতর সুযোগ পায়। এইজন্যই ভারতে ডল্টন পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করে নাই। আবার ছাত্রেরা যেমন এক হইতে অপরে স্বতন্ত্র তেমনি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। কোন কাজ সকলে মিলিয়া একসঙ্গে করার মধ্যে আনন্দও আছে—আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য উপভোগ করি এবং একে অপরের নিকট হইতে শিক্ষাও গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের সাহচর্য পাওয়ার নিমিত্ত আমাদের মনে নিরাপত্তার ভাব (security)-ও জন্মায়। অধিকন্তু শিক্ষার পদ্ধতির গুণে খুব বেশী পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বোধ জন্মাইলে সমাজ-জীবনের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। তাই শ্রেণীশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতিতে, সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত ছাত্রদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে স্থানাভাব এত বেশী যে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; বিষয়বস্তু-গুলিকে পুস্তকাদি ও অন্যান্য উপকরণে সজ্জিত করার মত আর্থিক সামর্থ্যও

আমাদের নাই। প্রয়োজনীয় উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে ছাত্রদের নিজের দায়িত্বে এসাইনমেণ্ট প্রস্তুত করা সম্ভব নহে।

প্রয়োজনানুরূপ বিষয়-শিক্ষক সংগ্রহ করাও আমাদের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকন্তু, আমাদের শিক্ষকগণ শ্রেণীশিক্ষায় অভ্যস্ত নহেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর কোথাও ডল্টন পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইতেছে না। অধুনা আমরা মিশ্র শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করাই ভাল মনে করি।

ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতি (Workshop Method)—বর্তমানে ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতি ডল্টন পরিকল্পনা হইতে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই পদ্ধতিও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রেই প্রথম প্রভাব বিস্তার করে।

তত্ত্বমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রজেক্ট শিক্ষা-পদ্ধতির নীতির প্রসারের ফলেই ওয়ার্কসপ্ শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রজেক্ট শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ কর্ম্মমূলক; কিন্তু ওয়ার্কসপ্ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ পাঠ, আলোচনা ও লিখনমূলক। প্রজেক্ট শিক্ষা-পদ্ধতির মত ওয়ার্কসপ্ শিক্ষা পদ্ধতিতেও ছাত্রেরা একটি শিখন সমস্যা নিয়া কার্যে অগ্রসর। এই সমস্যা সাধারণতঃ তাত্ত্বিক প্রকৃতির থাকে। সাধারণতঃ পাঠ্যতালিকা হইতেই সমস্যা গ্রহণ করা হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করা গেল—১। মুঘলদের শাসনকালে ভারতের সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে হইবে। ২। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবের কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনা করিয়া পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। ৩। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে এবং ঐ চরিত্র অঙ্কনে কতখানি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল তাহা স্থির করিতে হইবে।

ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতি প্রধানত তত্ত্বমূলক

বস্তুতপক্ষে পাঠের যে-কোন বিষয়কেই সমস্যারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; এমনকি পরীক্ষার জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ বা নির্দিষ্ট পাঠের কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ এবং ভাবের বিশ্লেষণকেও সমস্যারূপে গ্রহণ করা চলে। প্রজেক্ট পদ্ধতির অন্যতম প্রধান অসুবিধা এই যে, উহাতে পাঠ্যতালিকা যথাযথভাবে অনুসসণ করা যায় না এবং যথাযথ ক্রম

(Logical sequence) অনুসারে জ্ঞানলাভ ঘটে না। ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতিতে কিন্তু ঐ ত্রুটি নাই। সমগ্র পাঠ্যতালিকাকে, যথাযথ ক্রমঅনুসারে ওয়ার্কসপের কয়েকটি সমস্থার ভাগ করিয়া নেওয়া সম্ভব। •ওয়ার্কসপের সমস্যা ও ডল্টন পরিকল্পনার এস্যাইনমেণ্টের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। পার্থক্য এই যে, এস্যাইনমেণ্টের বেলা ছাত্র এককভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে, কিন্তু ওয়ার্কসপের বেলা ছাত্রেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া এক-একটি সমস্যা নিয়া যৌথভাবে কাজ করে।

এই পদ্ধতিতে যথাযথ ক্রমানুসারে পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ সম্ভব

ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতিতে সমস্যা নির্ণয়ের কালে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিতে হয়। ১। সমস্যাটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহার সমাধানের জন্য ছাত্রেরা সহজেই উদ্‌বুদ্ধ হয়। ২। তাত্ত্বিক সমস্যায় আমাদের ছাত্রদের আগ্রহান্বিত করিতে হইলে পরীক্ষার সহিত সমস্যাটিকে যুক্ত করিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই ; অর্থাৎ পরীক্ষায় আসিতে পারে, এমন প্রশ্নকে সমস্যারূপে গ্রহণ করিতে হয়। ৩। সমস্যাটির সমাধানকালে শুধু পড়া ও লেখা ছাড়া অন্যধরণের কাজের সুযোগ থাকিলে, (ম্যাপ বা নক্সা অঙ্কন, স্ক্রেপ্ বুকে নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করণ, বিশেষ যুগের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি), ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ৪। সমস্যাটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে, একসঙ্গে ৪।৫ জন ছাত্র ইহা সমাধানের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করিতে পারে অর্থাৎ সমস্যাটি ৪।৫টি সাব্ ইউনিটে (Sub-unit) বিভক্ত হওয়ার মত হওয়া প্রয়োজন। যথা, মুঘলযুগের সামাজিক অবস্থাকে সমস্যারূপে গ্রহণ করিলে উহাকে অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মাচরণের অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ওয়ার্কসপের জন্য সমস্যা নির্ণয়ের নীতি

প্রজেক্ট পদ্ধতির মত, ওয়ার্কসপ পদ্ধতিতেও প্রথম সমস্যা নিরূপণ করিতে হয়। একটি শ্রেণীর জন্য একসঙ্গে হয়ত ৩।৪টি সমস্যা স্থির করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ, ছাত্রদের এক-একটি দলে ৮ জনের বেশী থাকা উচিত নয়। প্রয়োজন হইলে দুই বা তিনটি দল, পৃথক পৃথক ভাবে একই সমস্যা নিয়া কাজ করিতে পারে। প্রজেক্ট পদ্ধতির মতই ছাত্রদের সহিত আলাপ-

সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত দলবিভাগ

আলোচনা করিয়া শিক্ষক সমস্যা উপস্থিত করেন এবং তাহার সমাধানের নিমিত্ত কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, কি কি বই পড়িতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। এই আলোচনায় শ্রেণীর সকল ছাত্রই অংশ গ্রহণ করে। তারপর ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলেই, বুদ্ধি ও বিদ্যার দিক হইতে, ভাল, মাঝারি ও মন্দ ছাত্র থাকে। কেবল ভাল, বা কেবল মন্দ ছাত্র নিয়া দল গঠিত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দলগুলি স্থায়িভাবে গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ২।৩টি সমস্যা সমাধানের পরই হয়ত নূতন দল গঠন করা ভাল।

প্রত্যেক দল, সমস্যাটিকে আবার ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করিয়া দলের প্রত্যেক ছাত্রকে এক-একটি অংশের সমাধানের ভার দেয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অল্পবয়স্ক থাকে বলিয়া সাধারণ আলোচনা কালেই শিক্ষক কিভাবে সমস্যাটিকে ভাগ করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত দিয়া দেন। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং কে কি করিল তাহার লিখিত প্রমাণ রাখিতে হইবে। দলের ছাত্রেরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া আবাব একত্র মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কাজের আলোচনা করিয়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবে। তারপর একজন বা দুইজন ছাত্রের উপর ভার পড়িবে সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে লিখিয়া, শ্রেণীর সকল ছাত্রের কাছে তাহা উপস্থিত করা। সকল ছাত্রই তখন এই সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিবে এবং শিক্ষকও তাহাদের পরামর্শ দিবেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে দলের ভারপ্রাপ্ত ছাত্র (প্রয়োজন হইলে) সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া লিখিবে। শিক্ষক তখন তাহা সংশোধন করিয়া শ্রেণীতে এমনভাবে রাখিবেন যাহাতে প্রত্যেক ছাত্র তাহা নকল করিয়া নিতে পারে এবং ঐ লেখা চুরি যাওয়ার সম্ভাবনাও না থাকে। সাধারণতঃ এক-একটি সমস্যার সমাধান শেষ হইতে অন্তত: চারটি পিরিয়ডের প্রয়োজন হয়। এক পিরিয়ডে শিক্ষক সমস্যা সম্বন্ধে শ্রেণীর সঙ্গে আলোচনা করিবেন। দ্বিতীয় পিরিয়ডে দলগুলি আলোচনা করিয়া সমস্যা বিভক্ত করিয়া নিবে। তৃতীয় পিরিয়ডে প্রত্যেক ছাত্র দলের নিকট পৃথকভাবে রিপোর্ট পেশ করিবে। চতুর্থ পিরিয়ডে শ্রেণীর সম্মুখে দল নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

করিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাত্ত্বিক বিষয়ের জন্য এই পদ্ধতি প্রজেক্ট পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই, বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য এই পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই পদ্ধতি অনুসারে, পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য লিখিত উত্তর প্রস্তুত করণকে সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা চলে। কাজেই পরীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায়, ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষক সকলের নিকটই এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যে কোন দ্বন্দ্ব নাই, ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতি তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম। এই পদ্ধতিতে মুখস্থ না করিয়া, স্বকীয় চিন্তা এবং সমবুদ্ধি ও বিদ্যাসম্পন্ন বন্ধুদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর অন্তর্দৃষ্টি (insight) জন্মিয়া থাকে। ইহা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিও বটে—কারণ, আলোচনা ও লেখার সাহায্যে শিক্ষা অগ্রসর হয়; কখনও কখনও ম্যাপ, নক্সা, মডেল প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে, অনেক ছাত্র নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ পায় এবং তাহাদের আত্মবিশ্বাস জন্মায়। দলের অগ্রসর ছাত্রদের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে করিতে বিষয়বস্তুর উপর অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়। দলের আলোচনার মান, দলের উপযুক্ত হয় বলিয়া অনগ্রসর ছাত্রও ইহাতে উপকৃত হয়; সেও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহার মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার জন্য লিখিত প্রস্তুতি হয় বলিয়া, ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ভাল হয়। দলবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা (যাহা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন)-ও এই পদ্ধতির অনুসরণে ছাত্রেরা পাইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের কাজ ও বাড়ীর কাজে কোন পার্থক্য থাকে না। সমস্যা সমাধানের জন্য বাড়ীতেও ছাত্রদের স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিতে হয়। সমস্যাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইলে, লাইব্রেরির সাহায্য গ্রহণ করাও ছাত্রদের অপরিহার্য হয়—লাইব্রেরি ব্যবহারে তাহাদের আগ্রহ জন্মায়। শিক্ষালাভের জন্য যে দুইটি কৌশল আয়ত্ত করা প্রধান প্রয়োজন (পঠন ও লিখন), তাহা ছাত্রদের আয়ত্তের মধ্যে আসে।

ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতির গুণাগুণ

কিন্তু, এই পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করিলেই যে শিক্ষক আশানুরূপ ফল

পাইবেন, এমন হয়ত নাও হইতে পারে। কারণ, আমাদের দেশের ছাত্রেরা দলগত কাজে অভ্যস্থ নহে। ফলে, দলের একজনই হয় ত সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য করিবে, কিন্তু অপর সকলে কিছু না করিয়া তাহার কাজের ফলভোগ করিবে। আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা এবং স্বাধীন চিন্তাও সাধারণতঃ জন্মায় না। তাই সমস্যাটির সমাধান নোট বইএ না পাইলে ছাত্রেরা হয়ত অথৈজলে পড়িবে এবং কাজে একেবারেই উৎসাহ দেখাইবে না। আমাদের শিক্ষকগণও বক্তৃতা দিতেই অভ্যস্ত—এই ধরণের শিক্ষা-পদ্ধতি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে উৎসাহ পাইবেন না। নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক এবং ভাল লাইব্রেরি ব্যবস্থা না থাকিলেও এই শিক্ষা-পদ্ধতি সাফল্যলাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই অসুবিধাগুলি দূর করা অসম্ভব নহে।

ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতির অসুবিধা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা এবং শিক্ষক

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। 'আচার্যের' উপরই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। তিনিই পাঠ্যক্রম রচনা করিতেন, তিনিই শিক্ষা দিতেন, তিনিই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন এবং শিক্ষা শেষে তিনিই 'অভিজ্ঞান পত্র' প্রদান করিতেন। প্রাচীন গ্রীসেও শিক্ষকের স্থান অনুরূপ ছিল। মধ্যযুগেও (ইউরোপে) শিক্ষক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু শিক্ষাকার্যে তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছিল। একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের গঠন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছিল; শিক্ষক এবং বিদ্যালয় তখন আর অভিন্ন ছিল না। চার্চ (Church) তখন বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে—বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেছে এবং তাহার পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছে; শিক্ষক কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতেছেন। কিন্তু কর্মচারী হইলেও তিনি ছিলেন শিক্ষাদাতা—তাঁহার আদর্শেই ছাত্রেরা অনুপ্রাণিত হইত। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, শিশু "পাপ" প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শিক্ষকের কার্য হইতেছে যে, অল্প বয়সেই তাহাদের "বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া"। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকের মুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ এবং পুস্তক পাঠ দ্বারা জ্ঞান অর্জন (বিশেষ করিয়া ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান) করার চেষ্টাই ছিল ছাত্রজীবনের বিশেষত্ব। ছাত্রের বিদ্যালয়-জীবন সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেন শিক্ষক।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে শিক্ষকের স্থান

শিক্ষা এবং শিক্ষকের কার্য সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা আমাদের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে "শিক্ষাদান" কথাটি সর্বত্র চালু হইয়া পড়ে। শিক্ষক জ্ঞানের ভাণ্ডার—শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে মূর্ত। অপরদিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্রেরা শূন্যকুম্ভ, তাহারা "পাপ"-প্রবণতায় পূর্ণ। শিক্ষককে ছাত্রের শূন্যকুম্ভ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার অন্তর হইতে পাপ-প্রবণতা দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম "শিক্ষাদান"। শিক্ষক "দান"

বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান

করিবেন এবং ছাত্র তাহা "গ্রহণ" করিবে। শিক্ষক বিদ্যালয় সমাজের কর্তা বা কার্যনায়ক ; ছাত্রেরা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিলেই শিক্ষালাভ হইবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উপরি-উক্ত ধারণা অনুসারেই শিক্ষাকার্য চলিতেছে। অধিকন্তু উহাদের কর্মক্ষেত্র মধ্যযুগের বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র হইতে সংকীর্ণতর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ছাত্রদের "পাপ"-প্রবণতা দমন বা তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছিত চরিত্রের সৃষ্টি করাকে আর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি না। ছাত্রদিগকে "জ্ঞানদানই" বিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ম বলিয়া গণ্য করি। আমাদের ধারণা এই যে, শিক্ষকরূপ পূর্ণকুম্ভ (জ্ঞানের) হইতে ছাত্রের মনরূপ শূন্যকুম্ভে জ্ঞান ঢালিয়া দিতে পারার নামই শিক্ষা। তারপর ধীরে ধীরে এমন দাঁড়াইল যে, শিক্ষক আর জ্ঞানের ভাণ্ডারও থাকিলেন না—তাঁহার নিজের জ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে সঞ্চিত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। ফলে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল ছাত্রদিগকে পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির ভয় দেখাইয়া পাঠ্যপুস্তক পড়িতে বাধ্য করা। শিক্ষা এবং "পড়ানো" একার্থবাচক হইয়া পড়িল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের প্রাধান্যও বেশী দিন থাকিল না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপরে বাহ্যিক পরীক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করার দরুণ পরীক্ষার পাশের প্রধান সহায়ক "অর্থপুস্তক" পাঠ্যপুস্তকের স্থান অধিকার করিল। আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ছাত্র কাহারও প্রাধান্য নাই ; উহাতে বাহ্যিক পরীক্ষা এবং অর্থপুস্তক সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ইউরোপে কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবর্তন প্রগতির পথ অবলম্বন করিল। সেখানে শিক্ষককেন্দ্রিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে পরিণত না হইয়া শিশুকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। আমরা দেখিয়াছি যে, রুশো শিশুকে "পাপ"-প্রবণতাপূর্ণ মনে না করিয়া "পুণ্য"-প্রবণতার আধার বলিয়া মনে করিতেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে, স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও ক্ষমতার বিকাশকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। রুশোর শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষক-কেন্দ্রিক ছিল না। আবার আমরা জানি যে, শিক্ষাবিদ্ ফ্রবেলের "কিণ্ডার গার্টেন" শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষককে বাগানের মালীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

শিক্ষক-কেন্দ্রিকতা হইতে শিশু-কেন্দ্রিকতায় বিদ্যালয়ের রূপান্তর

ফ্রবেলের মতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির (urges) প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। শিক্ষক ঐ বিকাশের সাহায্য করেন মাত্র। বিজ্ঞান হিসাবে মনস্তত্ত্বের অগ্রগতির ফলে শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের উপর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতে লাগিল। শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার দরুণ সকলে এক জিনিস একইভাবে শিক্ষালাভ করিবে এই আশা পরিত্যাগ করা হইল। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ হিসাবে শিক্ষালাভ করিবে। কাজেই শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক না থাকিয়া শিশুকেন্দ্রিক (child-centred) হইয়া পড়িল।

অধুনা সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের (Social Psychology) অগ্রগতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অপেক্ষা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হইয়া থাকে একথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। মানুষের জীবনে তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহের স্থান থাকিলেও সে যে অনেকখানিই পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি ইহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণের (manipulation) দ্বারা শিশুকে অনেকখানি ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তোলা সম্ভব বলিয়া আমরা বর্তমানে বিশ্বাস করি। শিশুকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই যে সে যথাযথ শিক্ষা পাইবে এই নীতিতে আমরা পূর্বের মত বিশ্বাস করি না। কাজেই শিক্ষার ক্ষমতা এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর আমাদের আস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিকতম শিক্ষণপদ্ধতি (Theory of Learning) আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে, কাহাকেও "শিক্ষা দান" বা "পড়ানো" সম্ভব নহে। শিশু একমাত্র নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ (শিক্ষাকার্যে ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা গ্রহণ) করিতে পারে। "শিক্ষা দান" এবং "পড়ানো" এই শব্দগুলি বর্তমানে অভিধান হইতে অপসারিত করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকার্যে দাতা-গ্রহীতা বলিয়া কোন সম্বন্ধ নাই। শিক্ষাকার্যে শিক্ষক এবং ছাত্র পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষাদান করিতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণও করিতেছেন—প্রথম অধ্যায়ে এইজন্যই

বিদ্যালয় সমাজের পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রয়িতা হিসাবে শিক্ষক

শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া উহাকে আমরা দ্বি-কেন্দ্রিক পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। তারপর ছাত্র যে একমাত্র শিক্ষকের সহিত সম্বন্ধের ফলেই অভিজ্ঞতা লাভ করে এমনও নহে। ছাত্রের অভিজ্ঞতালাভের জন্য অনেক নূতন নূতন মাধ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ লাইব্রেরি, মিউজিয়ম, সিনেমা, রেডিও, প্রদর্শনী ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে; শিক্ষকের মত ইহারাও আধুনিক বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যেই ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। আবার বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষকের একনায়কত্বের নীতিও বর্তমানে সমর্থিত হয় না। বিদ্যালয়কে বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক সমাজরূপে পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে এই সমাজের সভ্য হইবেন। ইহার কর্ম, আইনকানুন ইত্যাদি শিক্ষকের নির্দেশে পরিচালিত না হইয়া পারস্পরিক সম্মতিতে পরিচালিত হইলে এই সমাজে বাসের দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষালাভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তাই, বিদ্যালয় সমাজের পারিপার্শ্বিককে শিক্ষার প্রয়োজনে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করাই বর্তমানে শিক্ষকের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিকতম শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান—উপরি-উক্ত আলোচনার ফলে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিনা এ সন্দেহ মনে জাগিতে পারে। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষাকার্যে তাহার অবদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয় নাই। শিক্ষার চাবিকাঠি যে শিক্ষকের হাতে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন লিখিয়াছেন—"পরিকল্পিত শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষকের স্থানই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে" ("We are, however, convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher") আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিলে, শিক্ষাকার্যে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে।

১। আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রকে "শিক্ষাদান" করিতে চেষ্টা

করেন না বটে, কিন্তু শিক্ষালাভ কার্যে তিনি তাহার সহিত সহযোগিতা করেন। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সর্বপ্রথমেই শিক্ষককে ছাত্রদের মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হয়। বিদ্যালয়ে শিশু কেবলমাত্র নিজের "স্বাভাবিক" ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়া যাইবে—স্বেচ্ছাচারের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব—এই নীতি বর্তমানে স্বীকার করা হয় না। সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Social psychology) প্রমাণ করিয়াছে যে, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে বাঞ্ছিত শিক্ষাগ্রহণের জন্য ছাত্রের অন্তরে চাহিদা সৃষ্টি করা চলে। তাই শিক্ষকের প্রথম দায়িত্ব বিদ্যালয়ে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা যাহাতে বাঞ্ছিত শিক্ষালাভের ছাত্রদের মনে প্রেরণা জন্মায়।

শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের মনে আগ্রহের সৃষ্টিকরণ

২। বাঞ্ছিত শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের মনে আগ্রহ জন্মাইতে হইলে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার অনুকূল জীবনদর্শন জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, জীবনদর্শন এবং শিক্ষার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ছাত্রদের ভালমন্দের জ্ঞান যদি বিদ্যালয়ের ভালমন্দের জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে শিক্ষাকার্য কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। জীবনদর্শন হইতেই মানুষের ভালমন্দের জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সংক্ষেপে, আদর্শবাদ ব্যতীত শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণরূপে অচল। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বয়সের গুণেই যে ছাত্ররা আদর্শবাদী হইয়া থাকে একথাও আমরা জানি। কাজেই শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য সমাজ, তথা বিদ্যালয়, যে জীবনদর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে ছাত্রদের মনে সেই জীবনদর্শন জন্মাইতে সাহায্য করা। সমাজের জীবনদর্শন শিক্ষকদের মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে; তাই শিক্ষককে ছাত্রদের জীবনদর্শনের কর্ণধার (Philosopher) বলা হইয়া থাকে।

ছাত্রদের মনে যথাযথ জীবন-দর্শন গঠন

৩। জীবনদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য মাত্র স্থির করে। কোন্ কোন্ ধরণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব তাহা পৃথকভাবে স্থির করিতে হয়; এই কার্যকে সাধারণতঃ আমরা পাঠ্যক্রম রচনা করা বলিয়া অভিহিত

করিয়া থাকি। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ছাত্রেরা তাহাদের নিজের অন্তরের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নিজেরাই গ্রহণীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নির্বাচন করিবে বটে কিন্তু ঐ কার্যে শিক্ষকের পরামর্শ তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষ শিক্ষা শব্দের অর্থই সুপরিকল্পিত শিক্ষা—শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা মোটামুটিভাবে পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিতে হয়। এই কার্যে শিক্ষককে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়। কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঠ্যক্রমের কাঠামো রচনা করিয়া দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত প্রয়োগ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয় সমাজের নেতা হিসাবে শিক্ষক ছাত্রদিগকে এমনভাবে পরিচালিত করিবেন—তাহাদিগকে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন করাইবেন যাহাদের সমাধান করিতে গিয়া ছাত্রেরা পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলি লাভ করে।

শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পরিকল্পনা করিয়া পাঠ্যক্রমের বাস্তব রূপায়ণ

৪। বিদ্যালয়-সমাজকে লক্ষ্যপথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন (ছাত্র-সংসদ, লাইব্রেরী, সাহিত্যসভা, হবিক্লাব ইত্যাদি)। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার প্রাথমিক পরিকল্পনা শিক্ষককেই করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনে এবং পরিচালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এই কার্যেও শিক্ষককেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুকূলে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন

৫। বিদ্যালয়-সমাজের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন এবং উহারা যাহাতে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনেও শিক্ষক বিদ্যালয়-সমাজের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার নিয়ম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দানের নীতি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়-সমাজের আইন-কানুন প্রণয়নে নেতৃত্ব

৬। ছাত্রেরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞানলাভ করে; ঐ জ্ঞানকে সংহত এবং কার্যকরী করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব শিক্ষকের। এই উদ্দেশ্যে

শিক্ষককে অনেক সময় ছাত্রদের সহিত আলোচনা-সভায় মিলিত হইতে হয়; প্রয়োজনবোধে তাঁহার বক্তব্য ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়; তাহাদিগকে পুস্তকপাঠে সাহায্য করিতে হয় —সংক্ষেপে "পড়ানো" বলিতে আমরা যাহা কিছু বুঝি তাহার সব কিছুই করিতে হয়।

ছাত্রদের পাঠে সাহায্য দান

৭। শিক্ষকের আর একটি প্রধান কাজ হইল পরীক্ষা গ্রহণ করা। প্রদত্ত অভিজ্ঞতা কোন্ ছাত্রকে শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে কতখানি অগ্রসর করিয়া দিল তাহা শিক্ষককে সর্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হইতেছে তাহার উপযুক্ততাও শিক্ষককে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। ছাত্রদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ এবং তাহা বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে (কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা ইত্যাদি)।

পরীক্ষা গ্রহণ

৮। শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য দানের চেষ্টাও শিক্ষককে করিতে হয়। যেসব ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দিয়াছে তাহাদের মানসিক সমস্যা সমাধানের কার্যেও শিক্ষককে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। অপরদিকে অগ্রসর ছাত্রগণের প্রতিও শিক্ষককে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

৯। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাও শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনে তাঁহাকেই অগ্রণী হইতে হয়। ছাত্রের প্রগতিপত্র (Progress Report) শিক্ষকই প্রস্তুত করিয়া অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করেন। ছাত্রেরা সমাজসেবা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিলে শিক্ষককেই তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিদ্যালয়ে এমন কোন কর্ম নাই যাহাতে শিক্ষককে অংশ গ্রহণ করিতে না হয়। পূর্বে শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য ছিল পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ; বর্তমানে তাঁহার দায়িত্ব সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ দুইটি কাজ শিক্ষকের কর্মভারের সামান্যতম অংশমাত্র। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কোন কাজই শিক্ষক একা করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই ছাত্র-শিক্ষকের সম্মিলিত দায়িত্ব। তবু বিদ্যালয় জীবনের অধিকাংশ কাজেই শিক্ষককেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

বন্ধুর মত তিনি ছাত্রদের কর্মে সহযোগিতা করেন—তাহাদের আনন্দে-নিরানন্দে, সফলতায়-বিফলতায় অংশ গ্রহণ করেন। আবার নেতা হিসাবে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই উহার সমাধানের চেষ্টায় শিক্ষকের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাই এক শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন যে, শিক্ষক হইবেন ছাত্রদের বন্ধু, দার্শনিক এবং সচিব (Friend, Philosopher and Guide)। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের "পাঠদান" করিয়া শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয় না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কার্যে (পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত) শিক্ষক এবং ছাত্র সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন ইহাই আধুনিক শিক্ষানীতি। শিক্ষকের মধ্যেই ছাত্র তাহার জীবনের আদর্শকে খুঁজিয়া পাইবে। যে জ্ঞানদান এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষক হইবেন তাহার জীবন্ত প্রতীক। ইহা না হইলে ছাত্রদিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে ছাত্রেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নেতারূপে গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে তাঁহাকে যাহা কিছু করিতে হইত (পাঠদান এবং পরীক্ষাগ্রহণ) এখনও তাহার সবকিছুই তাঁহাকে করিতে হয়; কিন্তু ঐ কাজগুলি সুকৌশলে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে করিতে হয়। পূর্বে যে সব কাজ হইতে শিক্ষক দূরে থাকিতেন (খেলা ইত্যাদি) বর্তমানে সেই সব কাজেও তাঁহাকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। অধুনা অনেক নূতন ধরণের কাজের (কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা ইত্যাদি) দায়িত্বও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। মোটকথা, শিক্ষাকার্যের জটিলতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে শিক্ষকের দায়িত্বও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিক্ষক এবং ছাত্রে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব—প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও একজন শিক্ষক; কিন্তু বিদ্যালয় সমাজে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ব্রিটেনে প্রধান শিক্ষকের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে; প্রাচীন ভারতের আচার্যের মত বিদ্যালয়ে তিনি

প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন দায়িত্বের বিভাগ

প্রায় সর্বেসর্বা। আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষকদের কিন্তু ততটা স্বাধীনতা নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এবং শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয় তথা প্রধান শিক্ষককে অনেক অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তারপর প্রত্যেক বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালনের জন্য ম্যানেজিং কমিটি রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। শিক্ষকের সম্বন্ধ সাধারণতঃ ছাত্রের সঙ্গে; কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সম্বন্ধ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই সম্প্রসারিত। প্রত্যক্ষ হউক আর অপ্রত্যক্ষ হউক বিদ্যালয় জীবনের সকল সমস্যার নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। আলোচনায় সুবিধার জন্য প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—১। ছাত্রদের সম্বন্ধে দায়িত্ব, ২। সহকর্মীদেয় সম্বন্ধে দাযিত্ব, ৩। অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজ সম্বন্ধে কর্তব্য, ৪। বিদ্যালয়ের কর্মসচিবরূপে দায়িত্ব।

ছাত্রদের সম্বন্ধে দায়িত্ব—

১। প্রধান শিক্ষককে সর্বদা মনে করিতে হইবে যে তিনি, প্রধানতঃ শিক্ষক; শিক্ষক না হইলে বিদ্যালয়-সমাজে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব রক্ষা করা চলে না। বিদ্যালয়-সমাজে ছাত্রদের শিক্ষাকার্যে সাহায্য করাই সর্বপ্রধান কর্ম। সুশিক্ষক হইতে না পারিলে, সমাজের সভ্যেরা সহজে কাহাকেও অন্তর হইতে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। কাজেই অন্যান্য কর্মে প্রধান শিক্ষক যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, কিছু কিছু অধ্যাপনা তাঁহাকে করিতেই হইবে; যত বেশী সংখ্যক শ্রেণীতে তিনি অধ্যাপনা করিতে পারেন ততই ভাল। পাঠ্যক্রমের অনুসরণ করাই তাঁহার অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাপনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং সাধারণভাবে তাহাদিগকে শিক্ষালাভকার্যে উৎসাহিত করাই প্রধান শিক্ষকের অধ্যাপনার প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহার পাঠদানপদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিবেন ইহাও তাঁহার পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই প্রধান শিক্ষক কোন এক শ্রেণীতে বেশী অধ্যাপনা না করিয়া যত বেশী সংখ্যক শ্রেণীতে সম্ভব অধ্যাপনা করিবেন; নীতি হিসাবে ইহা গ্রহণ করা উচিত। তাঁহার

শিক্ষক হিসাবে প্রধান শিক্ষক

অধ্যাপনা কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রদের প্রধান শিক্ষকের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রয়োজন অল্প নহে।

২। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষকের বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার সঙ্গে যেন কোন ছাত্রের সম্বন্ধ নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে না থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনই হইবে তাঁহার প্রধান প্রচেষ্টা। প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের জীবন্ত প্রতীক; তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে ছাত্রেরা সহজেই উদ্বুদ্ধ হইবে; ফলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের সমস্যা পৃথকভাবে বোঝা সহজ হইবে। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, খেলা প্রভৃতি যে সব কার্যে অনেক ছাত্র একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে সেই সব কার্যে প্রধান শিক্ষকের (শুধু উপস্থিতি নহে) যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তারপর ছাত্রদের সহিত প্রধান শিক্ষকের এমন ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের ধারণা জন্মায় যে, তিনি তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট গিয়া তাহার সুখ-দুঃখের কথা জানাইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। ঐরূপ ধারণা জন্মাইতে পারিলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজতর হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যে প্রধান শিক্ষক তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহেন, তাঁহার পক্ষে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করা সম্ভব নহে।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন

সহকর্মীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব—

১। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের নেতা। শিক্ষক সমাজ যাহাতে তাঁহাকে অন্তরের সহিত নেতারূপে গ্রহণ করেন সে দিকে তাঁহার সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ঐরূপ নেতৃত্ব লাভ কারতে হইলে তাঁহাকে সব কাজে আদর্শানুরূপভাবে চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষকদের নিকট হইতে তিনি যে ধরণের কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি প্রত্যাশা করিবেন তাঁহার নিজেরও সেই ধরণের কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন।

২। প্রধান শিক্ষককে তাঁহার সহকর্মিগণের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পারস্পরিক ভালবাসার সম্বন্ধ ব্যতীত পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিদ্যালয় জীবনেই হউক, আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক যখনই কোন শিক্ষক কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবেন প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হইবে যে, নিজে অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের চেষ্টা করা।

৩। প্রধান শিক্ষকের মনে রাখা কর্তব্য যে, বিদ্যালয়ের সকল ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষকই সমান আগ্রহশীল। মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের সকল নীতি এবং কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল রাখা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। শুধু তাহাই নহে, বিদ্যালয় সমাজের আইন-কানুন প্রণয়ন এবং শিক্ষকের কাজ ও দায়িত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অন্ততঃ পাক্ষিক সম্মেলন প্রধান শিক্ষকের আহ্বান করা প্রয়োজন।

৪। শিক্ষকদের মধ্যে মেলামেশা এবং সহযোগিতা গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত শিক্ষক সমিতি স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষকের অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ সমিতি গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে। শিক্ষকদের পাক্ষিক সভা আহ্বানের দায়িত্ব ঐ সমিতি গ্রহণ করিতে পারে।

৫। প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হইতেছে যে, শিক্ষকদের তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা (শ্রেণী-পাঠ, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে)। যে শিক্ষকের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, মোটামুটি স্বাধীনভাবে তাঁহাকে ঐ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হয়। আমাদের অনেক প্রধান শিক্ষকই এই নীতির কথা বিস্মৃত হইয়া পড়েন।

৬। শিক্ষকদের কাজের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধীনভাবে কাজে অগ্রসর হইলে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে দেখা যায় যে, প্রধান শিক্ষক, অপরাপর শিক্ষকের কৃতিত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব কখনও নিজ স্কন্ধে বহন করেন না।

অধুনা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর শিক্ষকদের মধ্যে সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপ্রদ নহে। বিদ্যালয়ের কার্যের ত্রুটির জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করা যেন রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়া

গিয়াছে। প্রধান শিক্ষক অপরাপর শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকরা যতটুকু কাজ করেন যেন সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলকভাবেই করিয়া থাকেন। উপরি-উক্ত নীতিগুলি স্মরণ রাখিয়া প্রধান শিক্ষক কাজে অগ্রসর হইলে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজ সম্বন্ধে কর্তব্য—

১। বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসাবেও প্রধান শিক্ষককে কার্য করিতে হয়। শিশুর শিক্ষা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইলে তাহার বিদ্যালয় এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রধান শিক্ষককে অভিভাবকের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। অভিভাবকদের নিকট ছাত্রদের প্রগতি-পত্র পাঠাইবার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন গঠন ও তাহার পরিচালনে অগ্রণী হইতে হয়। ব্যক্তিগতভাবেও প্রধান শিক্ষককে অনেক সময় অভিভাবকদের সহিত দেখা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের মত প্রত্যেক অভিভাবকের সহিতও প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

২। অভিভাবকগণ ব্যতীত বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সমাজের সহিতও প্রধান শিক্ষককে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। বিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক সমাজের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ (functional relationship) রহিয়াছে। প্রধানতঃ আঞ্চলিক সমাজের প্রয়োজনে এবং উহার চেষ্টায়ই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়কে উন্নততর করিতে হইলেও ঐ সমাজের চেষ্টারও প্রয়োজন। ফলে প্রধান শিক্ষককে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হয় যাহাতে আঞ্চলিক সমাজ বিদ্যালয়কে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া উহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিদ্যালয় কর্ম-পরিষদের (School Managing Committee) মাধ্যমে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সমাজ বিদ্যালয় পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আঞ্চলিক সমাজের প্রতিনিধি লইয়া বিদ্যালয়-কর্ম-পরিষদ গঠিত হয় এবং কর্মসচিব হিসাবে প্রধান শিক্ষক ইহার সহিত যুক্ত থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-কর্ম-পরিষদ বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রদের শিক্ষালাভে সাহায্য করা বিশেষজ্ঞদের (শিক্ষকদের) হাতে অর্পণ না করিলে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিদ্যালয় আঞ্চলিক সমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পরে, কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনায় শিক্ষকদের স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পারে না। তাই কর্ম-পরিষদের সহিত কলহ সৃষ্টি না করিয়া বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাহাতে শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পারে প্রধান শিক্ষককে সেইরূপভাবে চলিতে হয়। সংক্ষেপে, আঞ্চলিক সমাজের উপর প্রধান শিক্ষকের অন্ততঃ কিছুটা প্রভাব থাকা আবশ্যক। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রধান শিক্ষক গ্রাম্য দলাদলি বা রাজনীতিতে লিপ্ত হইবেন। সমাজের উপর তাঁহার প্রভাবের উৎস হইবে তাঁহার চরিত্র, তাঁহার সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি এবং তাঁহার জ্ঞান।

আঞ্চলিক সমাজ যত শিক্ষাসচেতন হইবে বিদ্যালয়ের কাজও ততই ভালভাবে চলিবে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। আঞ্চলিক সমাজ, বিশেষ করিয়া অভিভাবকগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না থাকিলে বিদ্যালয়ের সংস্কার সহজ হয় না। তারপর, বিদ্যালয়ের কার্যে আঞ্চলিক সমাজের অবদান কতখানি সে সম্বন্ধে ঐ সমাজের অনেকের প্রকৃত ধারণা নাই। তাই প্রধান শিক্ষককে আঞ্চলিক সমাজকে শিক্ষাসচেতন এবং শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে উহাকে কিছুটা ওয়াকিবহাল করার দারিত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান বা সমাজসেবার কর্মে বিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই সব কর্মে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব (ধরা যাউক—গ্রাম্য মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ)। সংক্ষেপে, বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের কার্যে প্রধান শিক্ষককেই অগ্রণী হইতে হয়।

কর্মসচিবরূপে প্রধান শিক্ষক—

১। প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের কর্মসচিব। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার। বিদ্যালয়ের অফিস প্রধান শিক্ষকের

কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তাই অফিসের কর্মচারীদের সম্বন্ধেও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদিগের সহিতও তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত। শিক্ষকদের সহিত ব্যবহার করিতে তিনি যে সব নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন অফিসের কর্মচারীদের (পিওনসহ) সহিত ব্যবহারের কালেও তাঁহাকে সেই সব নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। শিক্ষকগণ এবং অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যাহাতে যথাযথ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে সেইদিকেও প্রধান শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হয়। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও অফিসের কর্মচারীরা শিক্ষকদের মত বিদ্যালয় সমাজের সভ্য এবং বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ একথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন হইতে ইঁহারা যাহাতে পৃথক না থাকেন সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে অবহিত হইতে হইবে।

২। বিদ্যালয়ের কর্মসচিব হিসাবে প্রধান শিক্ষককে নানারূপ "খাতাপত্র" রক্ষা করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষক এবং ছাত্রদের উপস্থিতির খাতা, বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির খাতা, লাইব্রেরীর খাতা, কর্মপরিষদের কার্যবিবরণীর খাতা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের খাতা ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সচিব হিসাবে শিক্ষাবিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রধান শিক্ষককে পত্র বিনিময়াদি করিতে হয়। সকলেই প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও প্রধান শিক্ষককেই অগ্রণী হইতে হয়।

৩। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে। ছাত্র ভর্তিকরণ, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়ন, দৈনন্দিন কর্মসূচীর প্রস্তুতি (Time-table), বিধিবদ্ধভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ, ছাত্রদের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণকরণ ইত্যাদি সকল কার্যের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়।

তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রধান শিক্ষকের কর্মসম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন ইহাই আশা করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার চাবিকাঠি তাঁহার নিকট। উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক লাভ করা

বিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র বিদ্যালয় সমাজের (শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারী) সহযোগিতা ব্যতীত তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না।

সুশিক্ষকের গুণাবলী—শিক্ষকের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিলেই সুশিক্ষক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা জন্মাইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ কি ধরণের শিক্ষক পাইলে সুখী হয় সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা কর্তব্য—বস্তুতঃ পক্ষে ছাত্রেরাই শিক্ষকের ভালমন্দ বিচারের প্রধান মাপকাঠি—তাহাদিগকে সাহায্যদানের যোগ্যতার উপরই শিক্ষকের যোগ্যতাবিচার প্রধানভাবে নির্ভর করে। ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছে যে, মোটামুটিভাবে শিক্ষকের মধ্যে তাহারা নিম্নলিখিত গুণাবলী দেখিতে চায়। (ক) বিষয়বস্তুতে গভীর জ্ঞান; (খ) পাঠদানে দক্ষতা; (গ) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী (ছাত্রদের সম্বন্ধে); (ঘ) ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিবার ক্ষমতা। শিক্ষকের কার্যাবলী এবং ছাত্রদের উপরি-উক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলির কথা স্মরণ রাখিয়া সুশিক্ষক হইতে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর আলোচনা করা যাইতেছে।

নিজ কর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা

সর্বপ্রথমেই শিক্ষকতা কার্যের প্রতি শিক্ষকের নিজের শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরিয়া অর্থহীন কাজ করিতে করিতে শিক্ষকদের নিজেদের কার্যের উপর নিজেদের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। —"পড়াইয়া" যে কোন লাভ হয় একথা সর্বাগ্রে শিক্ষকরাই বিশ্বাস করেন না। নিতান্ত পড়াইতে হইবে তাই পড়ান। পড়াইলে যাহা হইবে, না পড়াইলেও তাহাই হইবে এইরূপ একটি ধারণা লইয়াই যেন শিক্ষকেরা শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হন। যে কর্মী নিজের কার্যের ফলাফল সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহে, তাহার কার্য কখনও আশানুরূপ—হইতে পারে না। সে নিজের কার্য হইতে কখনও আনন্দ পাইতে পারে না—কার্য তাহার কাছে অপ্রীতিকর। শিক্ষকতা কার্যে শিক্ষকের আনন্দ পাওয়া একান্ত আবশ্যক; কেবলমাত্র অর্থের জন্য শিক্ষকতা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। জীবনের প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা জন্মাইলে শিক্ষকদের নিজেদের কার্যের উপর অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মাইবে আশা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরও শিক্ষকের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকতা এরূপ ধরণের কার্য যে, গতানুগতিকতা সম্পূর্ণরূপে ইহার পরিপন্থী। প্রগতিধর্মী না হইলে—কার্যকারণ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইলে শিক্ষকতাকার্যে সফলতা লাভ অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি শিক্ষাসমস্যা এক নূতন সমস্যা। কার্যকারণ বিবেচনা না করিয়া অন্ধভাবে গতানুগতিককে অনুসরণ করিলে, উহার সমাধান সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া বর্তমানে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিকতা এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে, শিক্ষকদের মধ্যে সর্ব প্রযত্নে প্রগতিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ

জাতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের উপর আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রধানতঃ জাতির আদর্শেই শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হইবে। শিক্ষক যদি জাতীয় আদর্শ বা ঐতিহ্যের পরিপন্থী শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন তবে নিতান্ত অবাঞ্ছিত কার্য হইবে (দৃষ্টান্ত—শিক্ষকের সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষাদানের চেষ্টা)।

জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা

শিক্ষকের নিজের জীবনে আদর্শবাদ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। আদর্শবাদ ব্যতীত শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পাবে না। জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে মনে একটি আদর্শ থাকিবে এবং ঐ আদর্শে পৌঁছানর চেষ্টার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ অগ্রসর হইবে ইহাই শিক্ষার নিয়ম। শিক্ষকের সাহচর্যে থাকিয়া ছাত্রেরা তাহার জীবনের আদর্শবাদ গ্রহণ করিবে ইহাই আশা করা হয়। তারপর ১৩।১৪ বৎসর হইতে ছাত্রেরা নিজেরা এত আদর্শবাদী হইয়া পড়ে যে, শিক্ষকের মধ্যে আদর্শবাদ না থাকিলে তাহার ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না।

আদর্শে বিশ্বাস

আচরণ ব্যতীত চরিত্র শিক্ষাদান যে সম্ভব নহে একথা আমরা বর্তমানে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তাই ছাত্রদের মধ্যে যে সব চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইবে বলিয়া আশা করা হয় (পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, মানসিক স্থৈর্য ইত্যাদি) শিক্ষকের মধ্যেও ঐসব চারিত্রিক গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক-জীবনে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে স্নেহপ্রবণতা,

যে সব চারিত্রিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন

পরার্থপরতা ইত্যাদি আরও কয়েকটি চারিত্রিক গুণ শিক্ষকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশুদের জীবনের চাহিদা এবং বয়স্ক জীবনের চাহিদার মধ্যে অনেক সময় এত পার্থক্য থাকে যে, উপরি-উক্ত গুণগুলি না থাকিলে শিশুর সাহচর্য হইতে আনন্দলাভ করা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার পারস্পরিক সম্বন্ধ আনন্দপূর্ণ না হইলে শিক্ষালাভও হইতে পারে না।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে শিক্ষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা আবশ্যক। তাহার বিচার এবং সিদ্ধান্তে শিক্ষক সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত প্রভাবের উর্ধ্বে থাকিবেন। পক্ষপাতিত্বহীন না হইলে শিক্ষক কিছুতেই ছাত্র-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিবেন না। শিশুসুলভ মনোভাব সুশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ। শিশুর সমস্তরে নিজেকে নামাইয়া আনিতে না পারিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারেন না। তারপর শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকা যে আবশ্যক ইহা বলা-বাহুল্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছাত্রসমাজের নেতা বলিয়া নিয়োগ করিলেই যথেষ্ট হইল না। ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে শিক্ষাকার্যে তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন না। নেতা হইতে হইলে একদিকে যেমন জ্ঞান, কর্মকুশলতা, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি স্বাধীনভাবে নূতন কাজে অগ্রসর হইবার সাহস পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ইত্যাদি নানা চারিত্রিক গুণ থাকা প্রয়োজন।

চারিত্রিক গুণাবলী ব্যতীত শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত: যে কোন একটিতে শিক্ষকের জ্ঞান বিশেষজ্ঞ স্তরের হওয়া আবশ্যক। নীচু ক্লাসগুলিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া তাহা ছাত্রদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারিলেই তাহারা শিক্ষালাভ করিবে ইহা আশা করা যায় না। পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ জ্ঞান শিক্ষকের নিজের উপলব্ধির মধ্যে না আসিলে, ছাত্রদিগকে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করিতে তিনি সাহায্য করিতে পারেন না। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে পৌঁছিতে না পারিলে জ্ঞান উপলব্ধিগত হওয়া সম্ভব নহে। তাই শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা দিবেন সে বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর শিক্ষককে যদি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি

বিষয়বস্তুতে জ্ঞান

অনুসরণ করিতে হয়, তবে কোন্ অভিজ্ঞতা হইতে কোন্ জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধজ্ঞান সংহত ও বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্তও "বিষয়বস্তু" সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের উচ্চতর স্তরের জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিকতরভাবে অনুভূত হইতেছে। কোন বিষয়ে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ঐবিষয় মাধ্যমিকস্তরে "পড়াইবার" যোগ্যতা জন্মায় না, এই এইকথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষককে কেবলমাত্র একটি বিষয় পড়াইলেই চলে না; অন্ততঃ আর একটি বিষয় তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে "পড়াইতে" হয়। নীতির দিক হইতেও ইহাতে আপত্তি করিবার খুব বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষকের জ্ঞান উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষক যে বিষয়ে "পাঠদান" করেন সে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয় (Correlated Subject) গুলিতেও তাঁহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসের শিক্ষকের ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞান না থাকিলে তিনি যথাযথভাবে ইতিহাস শিক্ষাও দিতে পারিবেন না। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজের বিষয় ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্ততঃ আরও একটি বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়।

জ্ঞান উদারভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন

শিক্ষকের "সাধারণ জ্ঞান" (General knowledge)-ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। উদার ভিত্তির উপর জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ জ্ঞানের যথোচিত সংক্রমণ (Transfer) হয় না। তারপর শিক্ষাকার্যকে যত বেশী করিয়া জীবনভিত্তিক (Life-centred) করা হইবে ততই শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর পরিমাণে অনুভূত হইবে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইলে শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইবে। আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন না হইলে আধুনিক পদ্ধতিতে তাঁহার পক্ষে শিক্ষাদান সম্ভব নহে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষকদের "সাধারণ জ্ঞান"

আশানুরূপভাবে থাকে না ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শিক্ষাদানে তাঁহাদের ব্যর্থতার ইহা অন্যতম কারণ।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমন অনেক বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহা শিক্ষা দিতে হইলে বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষকের যথেষ্ট পরিমাণ কর্মদক্ষতা থাকার প্রয়োজনও রহিয়াছে (শিল্প, গার্হস্থ্য-বিদ্যা ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োগধর্মী বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য বিষয়গুলির জ্ঞানও বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা শিক্ষকের না থাকিলে তিনি সুশিক্ষক হইতে পারেন না। বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা না জন্মান পর্যন্ত জ্ঞান সক্রিয় হয় না। শিক্ষকের নিজের জ্ঞান সক্রিয় না হইলে, ছাত্রদের জ্ঞান সক্রিয় করিতে তিনি সাহায্য করিতে পারেন না (দৃষ্টান্ত, সাহিত্যের শিক্ষক নিজে সুসাহিত্যিক হইলে, তাঁহার শিক্ষাদান ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়)। আধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ কৌশল উভয়কেই বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদিগকে "শিক্ষাদান" করিলেই যথেষ্ট হইল না; যথাযথ পদ্ধতিতে "শিক্ষাদান" করিতে না পারিলে সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার আধুনিকতম শিক্ষাদান-পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যথাযথ শিক্ষণ শিক্ষার উপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব সম্বন্ধবর্জিত নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশলকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। "শিক্ষাদান" কার্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে শিক্ষককে আরও কতগুলি বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা এবং তাহাতে নম্বর দান, ডায়গনিস্টিক (Diagonistic Test) প্রশ্নপত্র রচনা এবং উহার উত্তর-পত্রের বিশ্লেষণ, ভিসুয়েল এইড (Visual Aid) প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কৌশলের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

শিশু মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানে (Sociology) শিক্ষকের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। শিশু মনস্তত্ত্বে জ্ঞান না থাকিলে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়

শিক্ষকতা করা সম্ভব নহে। ডাক্তারের যেমন দেহতত্ত্বে (Physiology) জ্ঞান থাকা আবশ্যক শিক্ষকেরও তেমনি শিশু মনস্তত্ত্বে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঐ জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষাকার্যে একপাও অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তারপর বিদ্যালয় একটি সমাজ। এই সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই সমাজের সভ্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যথাযথ ভিত্তিতে স্থাপনের নিমিত্ত শিক্ষকের সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

ছাত্রদের বিভিন্ন আগ্রহের ক্ষেত্রে (Field of interest) শিক্ষকের আগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব করিতে হইলে তাহাদের আগ্রহ, অনাগ্রহ, ভাললাগা, মন্দলাগা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ না করিলে চলে না। ইংরেজিতে যাহাকে কো-কেরিকুলার এক্টিভিটি (Co-Curricular activity) বলে তাহাতে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে, তিনি অতি সহজেই ছাত্রসমাজের একজন বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। বর্তমানে কো-ক্যারিকুলার এক্টিভিটির মাধ্যমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা "শিক্ষাদান কার্যের" অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। তাই অন্ততঃ দুই একটি কো-ক্যারিকুলার এক্টিভিটিতে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা প্রত্যেক শিক্ষকের থাকা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষকের স্বাস্থ্য ভাল হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি সৌম্য ও প্রিয়দর্শন হইলে সহজেই ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারেন—দেহ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষক ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিলে তাঁহার কার্যে অনেক সুবিধা হয়।

তালিকা প্রস্তুত করিয়া সুশিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষেপে, চরিত্রে, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে শিক্ষকসমাজের আদর্শস্থানীয় না হইলে শিক্ষাকার্যে সাফল্য লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন।

শিক্ষণ-শিক্ষা এবং শিক্ষক—শিক্ষণ-শিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষক প্রস্তুত করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনেকে মনে করেন যে, সুশিক্ষকের যেসব লক্ষণের কথা উপরে আলোচিত হইল, তাহার অধিকাংশই জন্মগত—সুশিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন—শিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে প্রস্তুত করা যায় না। এই আলোচনায় মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু শিক্ষা কেন, যে কোন কার্যে দক্ষ হইতে হইলে (ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) কিছুটা জ্ঞান,

কিছুটা কর্মপদ্ধতিতে দক্ষতা এবং কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মানুষের জ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ-নিরপেক্ষ নহে একথাও স্বীকার্য। তবে মানুষ যে অনেকখানিই তাহার পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি—তাহার জ্ঞান, ক্ষমতা, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি সব কিছুই যে বিশেষভাবে শিক্ষালব্ধ একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত করা চলে, তবে শিক্ষকও শিক্ষা দ্বারা তৈয়ারী করা যায়। অনেকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, চারিত্রিক গুণাবলী বুঝি জন্মগত; কিন্তু ইহা সত্য নহে। বিশেষ পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করা চলে। আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলি যথাযথ কাজ করিতেছে না বলিয়া সুশিক্ষক শিক্ষাসাপেক্ষ নহে বলিয়া আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি—শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের নিমিত্ত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ছাত্রের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক না হইলে শিশু আশানুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র বিদ্যালয়ে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা তাহার অভিজ্ঞতাসমষ্টির অংশ মাত্র। ছাত্র বিদ্যালয়ে যতক্ষণ থাকে তাহার চাইতে বেশী সময় থাকে বাড়ীতে; তাহার উপর পারস্পরিক গভীর :ভালবাসার জন্য পিতামাতা, এবং ভাইবোনদের প্রভাব অনেক সময় শিক্ষকের প্রভাব অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ফলে "বাড়ী" এবং বিদ্যালয় এক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত না হইলে শিশুর শিক্ষাকার্য আশানুরূপ-ভাবে চলিতে পারে না। আবার সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিভাবকের মাধ্যমে বিদ্যালয় সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমাজকে যদি "বিদ্যালয়ে আনিতে হয়" তাহা হইলে অভিভাবকদের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। অভিভাবকদের সাহায্যে বিদ্যালয় সমাজের সুযোগসুবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে। কাজেই অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত।

আমাদের দেশে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হইতেছে না। অধিকাংশ বিদ্যালয় হইতেই শোনা যায় যে, সমিতির সভা আহ্বান করিলে, অভিভাবকগণ প্রায় কেহই উপস্থিত হন না। অভিভাবকেরা যদি কখনও বিদ্যালয়ে আসেন তাহা হইলেও তাঁহারা সহযোগিতার মনোবৃত্তি লইয়া আসেন না; সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্যের সমালোচনা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি কার্যকরী করিবার চেষ্টায় অভিভাবকদের উপর দোষারোপ করিয়া কোন লাভ নাই। বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সম্বন্ধ কি কারণে ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের অধঃপতনের ফলে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি সামাজিক সম্বন্ধেই পারস্পরিক দোষারোপ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে—অভিভাবক শিক্ষকের উপর, শিক্ষক অভিভাবকের উপর, শিক্ষক ছাত্রের উপর, ছাত্র শিক্ষকদের উপর, পিতা সন্তানের উপর, সন্তান পিতার উপর ক্রমাগত দোষারোপ করিয়া চলিয়াছেন। এই পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়া শিক্ষক যদি একটু সহিষ্ণু হন এবং অভিভাবকদের সম্বন্ধে নিজের মন হইতে বিরুদ্ধ-ভাব দূর করিতে পারেন, তবে অভিভাবক-শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শিক্ষক এবং অভিভাবকের সম্বন্ধ সত্য সত্যই পারস্পরিক দোষারোপের সম্বন্ধ নহে—ইহা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি কিভাবে সংঘটিত হইবে, ইহার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার কর্মপদ্ধতিই বা কি হইবে এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রকৃত ধারণা না থাকার দরুণ অভিভাবকেরা সমিতির সভায় মিলিত হইয়াও হয়ত দেখেন যে, তাঁহাদের সন্তানদের দোষের আলোচনা শুনা ব্যতীত তাহাদের আর কিছু করণীয় নাই। বিদ্যালয়কে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অভিভাবকেরা নানা কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের সময় বৃথা নষ্ট হইল। এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের মঙ্গল একান্তভাবে কামনা করেন; তাঁহারা যদি অন্তর দিয়া

বুঝিতে পারেন যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সন্তানদের মঙ্গল হইবে তাহা হইলে হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁহারা ঐ সভায় উপস্থিত হইবেন।

অবশ্য আমাদের দেশের অনেক অভিভাবকই এখনও অশিক্ষিত থাকার দরুণ বিদ্যালয়ের কার্যে আশানুরূপ সহযোগিতা করিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সার্থকতা বোঝানও কঠিন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হইতেছে যে, শিক্ষাকার্য সম্বন্ধে (চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে) অভিভাবকদের কিছুটা ধারণা দেওয়া এবং তাঁহারা যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন (যেমন সামান্য কারণে বিদ্যালয় হইতে ছাত্রকে অনুপস্থিত না রাখা) সেইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করা।

মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠিত এবং পরিচালিত হইলে তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী থাকিবে।

১। সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করিলে চলিবে না। ৪০০|৫০০ শত অভিভাবকের সভায় কোন কার্যকরী সূক্ষ্ম আলোচনা হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার ৪০০|৫০০ অভিভাবককে আমন্ত্রণ পাঠাইয়া ৫০ জনের বেশী উপস্থিত হইবেন না, ইহাও নিতান্ত অবাঞ্ছিত অবস্থা। সুতরাং বর্তমানে আমরা সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য যে একটি মাত্র অভিভাবক-সমিতি স্থাপন করিয়া থাকি এই রীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে মধ্যে মধ্যে সকল অভিভাবকদের একসঙ্গে বিদ্যালয়ে আহ্বান করা হইবে না এমন কথা নহে। সাধারণ সামাজিক মেলামেশার জন্য বৎসরে একবার বা দুইবার সকল অভিভাবককে বিদ্যালয়ে আহ্বান করা উচিত। এই সব মিলন সভায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হইতে পারেন এবং ছাত্র এবং শিক্ষকদের সহিত নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের কার্যে অভিভাবকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

২। প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক শাখার (section) জন্য পৃথক পৃথক অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ৩০।৪০ জন অভিভাবকদের বেশী একত্র সম্মিলিত হইলে সোজাসুজি আলোচনা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছান তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। তারপর সমশ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের মধ্যে সমস্যার দিক হইতেও অধিকতর সমতা (similarity) থাকিবার কথা। এইরূপ অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায়. সমস্যার সমতা হিসাবে অভিভাবকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, সপ্তম শ্রেণীর 'ক' শাখার অভিভাবকদের সভা আহ্বান করা হইয়াছে। ঐ শ্রেণীতে হয়ত ৬টি ছাত্র আছে যাহারা অঙ্কে বিশেষভাবে দুর্বল, আবার হয়ত আরও ৫টি ছাত্র আছে যাহারা ইংরেজীতে পিছাইয়া পড়িয়াছে। অঙ্কে দুর্বল ছাত্রদের অভিভাবকগণকে একদলে এবং ইংরেজিতে দুর্বল ছাত্রদের অভিভাবকদের আর এক দলে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ দলের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে। এই সব আলোচনা সভায় প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য (একাধিক পরীক্ষার ফল, ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণা ইত্যাদি) বিদ্যালয় অভিভাবকদের সরবরাহ করিবেন। আলোচনা বিশেষভাবে অভিভাবকেরাই করিবেন ; কিন্তু শিক্ষকগণ (বিশেষ করিয়া বিষয়-শিক্ষক) সব সময়ই তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। আলোচনা শেষে প্রত্যেক দলকেই কিন্তু সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ; ঐরূপ লিপিবদ্ধ কর্মপদ্ধতিতে আবার শিক্ষকের এবং অভিভাবকের অনুসরণীয় কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নির্দেশ থাকিবে। ঐ সব সভায় আমোদ-প্রমোদ এবং সামাজিক মেলামেশার সুযোগও থাকিতে পারে ; ঐ উপলক্ষ্যে শ্রেণীর ছাত্রদের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

৩। বৎসরে ৩।৪ বার ঐরূপ সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। প্রতিবার ছাত্রদের প্রগতি-পত্র প্রেরণ করার পরই একবার করিয়া এই সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। এইরূপ-ভাবে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন করিতে বিদ্যালয়ের দিক হইতে প্রধান সমস্যা সময়াভাব। এ সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথক পৃথক ঘরে একসঙ্গে ৫।৬টি সমিতির অধিবেশন

বসিতে পারে। প্রধান শিক্ষকের প্রতিটি সমিতির সভায় উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই; এমন কি প্রয়োজন অনুসারে এক শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইলেও কার্যে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর (শাখার) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং ঐ শ্রেণীর ছাত্রগণ সেই শ্রেণীর অভিভাবক-সমিতির আয়োজন করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই ধরণের শিক্ষক দেখা যায়। কেহ কেহ ছাত্রদের স্বাধীন কার্যে বাধা দিতে চান না ; আবার এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ছাত্রদের স্বাধীন ইচ্ছা স্বভাবতই মন্দপথগামী মনে করিয়া কঠোর হস্তে তাহা দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর থাকেন। জ্ঞাতসারে হউক আর না হউক, দুই ধরণের শিক্ষক পৃথক পৃথক শিক্ষাদর্শনের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন মতদ্বৈধের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে রহিয়াছে পৃথক পৃথক জীবনদর্শনে বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ে কঠোর শৃঙ্খলার নীতি—দীর্ঘদিন হইতে শিক্ষাকে আমরা শাসন এবং দমনের সহিত সমার্থবাচক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। বাইবেলের গল্প অনুসারে মানুষের আদিমতম পুরুষ আদম (Adam) এবং ইভ্ (Eve) তাঁহাদের অন্তর্নিহিত পাপপ্রবৃত্তির জন্য স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। আদিমতম পুরুষের পাপ-প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে তাহার অন্তর্নিহিত মন্দ প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকেই টানিয়া লইবে। তাই টমাস্ একুইনাস্ (Thomas Aquinas) প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ক্রীশ্চান শিক্ষাবিদ্‌গণ বাল্যকালেই কঠোর শাসন এবং নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা শিশুর "বিষদাঁত" ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই এখনও আমাদের দেশের মিশনারী বিদ্যালয়গুলি কঠোর শাসনের দ্বারা ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্তী রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। মানুষের মন স্বাভাবিক নিয়মেই যে অসৎ পথে ধাবিত হইতে চায় এ বিশ্বাস আমাদের দেশেও ছিল। আমাদের দেশের অনেক শাস্ত্রেই মানুষের মনের সৎ-অসতের দ্বন্দ্বকে দেবাসুরের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের মনে সৎ এবং অসৎ উভয় প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। দমন করিয়া রাখিতে না পারিলে সাধারণতঃ অসৎ প্রবৃত্তিই

মানুষের মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। সংযমের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সৎ প্রবৃত্তির প্রাধান্যের সুযোগ দেওয়ার নামই শিক্ষা বলিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাই প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত এবং ইন্দ্রিয় দমন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

উপরি-উক্ত জীবনদর্শনের প্রভাবের ফলে অভ্যাসের দ্বারা শিশুদের ব্যবহার বয়স্কদের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিন্‌ষ্টার কলেজের প্রবেশ দ্বারের উপর আজও খোদিত রহিয়াছে, "Train up a child in the way he should go ; when he is old he will not depart from it." অর্থাৎ শিশু যেভাবে চলিবে শিশুর মধ্যে সেই ধরণের অভ্যাস গঠন করাইয়া দাও, বয়স্ক হইলে ঐ অভ্যাস হইতে সে বিচ্যুত হইবে না। সংক্ষেপে শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালমন্দের বিচারের কথা চিন্তা না করিয়া বয়স্কদের ভালমন্দের বিচার অনুসারে তাহার অভ্যাস গঠন করিয়া তোল। বয়স্কদের যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করা উচিত শিশুকেও সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। শিশুর জীবনের চাহিদা স্বভাবতই বয়স্কদের জীবনের চাহিদা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া শিশুকে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী করিতে না পারিলে সে সাধারণতঃ বয়স্কদের অনুরূপ ব্যবহার করিবে বলিয়া আশা করা যায় না। শিশুর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলে না। পদে পদে তাহাকে বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। ফলে শিক্ষা হইয়া দাঁড়াইল নেতিবাচক—বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর হইতেই শিশু কি করা উচিত নয় এসম্বন্ধেই উপদেশ পাইতে লাগিল; তাহার স্বাধীন প্রচেষ্টাকে বিদ্যালয়ের আইন-কানুনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দেখিতে পাইল। শিশুর যাহা ভাল লাগে তাহা সে করিতে পাইবে না, যাহা ভাল লাগে না, তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। বিদ্যালয়ের কার্য সম্বন্ধে তাহার মনে এরূপ ধারণা জন্মিল। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই শিক্ষকদের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা যত বেশী সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাও তত ভাল হইতেছে ইহাই হইল সকলের ধারণা। বর্তমানে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরই মনে ঐরূপ ধারণা রহিয়াছে।

বিদ্যালয়ে অবাধ স্বাধীনতার নীতি—অপরদিকে সার্থক শিক্ষার নিমিত্ত শিশুকে স্বাধীনতা দানের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাও প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অ্যারিস্টটল্ (গ্রীস) এবং কুইন্টিলিয়ান (রোমান) উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দানের নীতি সমর্থন করিতেন। বর্তমান যুগে বিদ্যালয়ে শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হইলেন রুশো। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষ "পুণ্যের" প্রতীক—"পাপ" প্রবৃত্তি মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে এবিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমাজই বরং পাপের প্রতীক—বয়স্কগণ কর্তৃক শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার ফলে তাহার মনে পাপ প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তাই রুশো শিশুকে সম্পূর্ণরূপে "ছাড়িয়া দেওয়ার" নীতি (Laissez-faire) প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষাদর্শনও বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি সমর্থন করিয়া থাকে। এই শিক্ষাদর্শনের মতে শিশুর মধ্যেই লুপ্ত ও অপ্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে তাহার আত্মার পূর্ণপরিণতি। শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই তাহার আত্মার বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়। তাই ফ্রবেল্, মণ্টসরী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ বাধ্যতামূলকভাবে শিশুকে দিয়া কোন কাজ করান সমর্থন করিতেন না। আত্মসক্রিয়তার (self-activity) দ্বারা শিশু শিক্ষালাভ করিবে ইহাই ছিল তাঁহাদের শিক্ষানীতি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি সমর্থন করে। ইহার মতে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রহিয়াছে। নিজ নিজ জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে শিক্ষালাভের চেষ্টা করিলে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সহজেই সার্থক হওয়ার সম্ভবনা থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি জানিবার জন্য টেস্ট (test) আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে উপরি-উক্ত ধারণা আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ফ্রয়েড্ সাহেবের প্রবর্তিত মনোবিক্ষণে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মতেও শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছাকে সহজে দমন করা উচিত নহে; কারণ স্বাভাবিক ইচ্ছা অবদমিত (repressed) হইলে মানসিক বিকৃতি দেখা দেওয়া সম্ভব। শিশুর-স্বাভাবিক ইচ্ছার নিবৃত্তি যত সহজে হইবে তাহার মানসিক স্বাস্থ্যও তত ভাল থাকিবে।

আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাও শিশু-স্বাধীনতার নীতি সমর্থন করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজ শিশুর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকেও স্বীকার করে। তারপর গণতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে নিজেদের জীবন যথাসম্ভব নিজেরা পরিচালনা করার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের একনায়কত্বের প্রভাবে মানুষ হইলে, শিশু বড় হইয়া গণতান্ত্রিক সমাজে নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবে না।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী—বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাহাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলা নহে। ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ-জীবন উভয় ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক। শৃঙ্খলা মানুষের জীবনে ছন্দ ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম ব্যতীত মানুষ কোন কাজেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবোধ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে শিক্ষাকার্য গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মানো যায় এই বিষয়ে সর্বত্র আলোচনা চলিতেছে। সর্বস্বপণ পণ করিয়াও যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা নাই সেই বিদ্যালয় কোনরূপ শিক্ষা দানে সমর্থ নহে। যে ছাত্রের মনে শৃঙ্খলা বোধ নাই, সে কোন জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা নাই, তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত; কারণ সেখানে ছাত্রেরা সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা কি পরস্পর-বিরোধী নহে? শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিমিত্ত, তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য এবং নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে তাহাদের শিক্ষা সার্থক করিবার জন্য যে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, কি করিয়া আমরা শিশুকে স্বাধীনতাও দিব অথচ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনেও অভ্যস্ত করিব।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেই কিন্তু উপরি-উক্ত সমস্যার সামাধান আর কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নহে। কোন মানুষ স্বাধীন কি পরাধীন সে বিচার শুধু সে নিজেই করিতে পারে—স্বাধীনতা বা পরাধীনতা মানুষের নিজের উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। সহজ কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, আমাদের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির নিবৃত্তিতে কোন বাধা না পাইলেই আমরা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া মনে করি। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে নেতিবাচক (negative) সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয়—জীবনের চাহিদা পূরণে বাধা-নিষেধের আবিদ্যমানতাকেই আমরা স্বাধীনতা আখ্যা দিতে পারি।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা (বাধা-নিষেধ) পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষ যখন নিজের চেষ্টায় জীবনের চাহিদা নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হয় তখন তাহাকে স্বেচ্ছায় বাধা-নিষেধকে বরণ করিয়া লইতে হয়। সংসারে এমন কোন কাজ নাই যাহা নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা নহে। প্রকৃতি নিজেই নিয়মে বাঁধা। নিজেকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন না করিয়া কেহ কোন কাজে সফলতা অর্জন করিতে পারে না—নিজের জীবনের চাহিদা নিবৃত্তি করিতেও মানুষকে স্বেচ্ছায় নিয়ম-শৃঙ্খলা বরণ করিয়া লইতে হয়। সিনেমা দেখিতে গিয়া নিতান্ত দুরন্ত বালকও দুই ঘণ্টা স্বেচ্ছায় চুপ করিয়া থাকে, কারণ সে অনুভব করে যে, বিপরীত ব্যবহার করিলে তাহার নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পথেই বাধা সৃষ্টি হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পথে বাধা পাইলেই মানুষ নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া মনে করে। কাজেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষ যখন স্বেচ্ছায় নিজের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং অনুভূতিকে সংযত করিয়া নিয়মানুগভাবে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার মনে স্বাধীনতার উপলব্ধি হয়; এবং ঠিক এই কারণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় নিজেকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে না পারিলে মানুষ নিজেকে পরাধীন মনে করে। বাধা-নিষেধ না থাকিলেই মানুষ স্বাধীন হয় না। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বাধীনতা একার্থবাচক নহে। উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা মানুষের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা পরস্পরের পরিপূরক

হইতে পারে না ; বরং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে উচ্ছৃঙ্খলতা বাধা সৃষ্টি করে ; তাই উচ্ছৃঙ্খলতা পরাধীনতার নামান্তর। উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত শৃঙ্খলাকে বরণ করিয়া লইয়াই মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ফলে আত্মসংযম, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দ প্রায় একার্থবাচক—আত্মসংযম ব্যতীত মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব নহে। হুকুম (Order) এবং শৃঙ্খলা বা আত্মসংযম (Discipline) একার্থবাচক মনে করি বলিয়াই আমরা শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। হুকুম স্বাধীনতার পরিপন্থী ইহাতে সন্দেহ নাই। যে কাজে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই—হুকুমের দ্বারা আমাদিগকে সে কাজ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হয় ; যে কাজের সহিত আমাদের জীবনের চাহিদার কোন সংযোগ থাকে না, সেই কাজ করিতেই আমাদের প্রবৃত্তির অভাব ঘটে। কাজেই হুকুমের দ্বারা আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হয়। হুকুম মান্য করিতে হইলে স্বাধীনতা খর্ব হইল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু (স্বতঃপ্রবৃত্ত) হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিলে মনে বরং স্বাধীনতা উপভোগ করার অনুভূতি আসে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কেহ যদি কবিকে হুকুম করে যে, তাঁহাকে কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব হইল ; আর তিনি যখন কবিতা রচনা করিতে গিয়া কবিতা রচনা করার "আইন-কানুন" মানিয়া চলিতেছেন তখন তিনি স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন। ঐরূপ আইন-কানুন মানিয়া চলার ক্লেশের পরিবর্তে আনন্দের অনুভূতিই বেশী হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে এত কঠোরতা ছিল, ব্রহ্মচারীরা ইহাতে কিন্তু ক্লেশ বোধ করিতেন না। কারণ, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল মনে করিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় ঐ কঠোরতা বরণ করিয়া লইতেন ; অনেক সময় সংযম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর হইতে আসিত বলিয়া ইহাতে মনে কোন কঠোরতরে জ্ঞান আসিত না। ব্রহ্মচারীরা পরমানন্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেন।

এই ধরণের নিয়মের অনুবর্তনে মনে আনন্দ এবং ভঙ্গকরণে ক্লেশ জন্মায়। স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্ত সংযমের অপরিহার্য অঙ্গ। যখন স্বেচ্ছায় নিয়মের অনুবর্তন করা হয় তখন বাহির হইতে ঐ চেষ্টায় বাধা আসিলে স্বাধীনতা খর্ব হইল

বলিয়া মনে হয়। ধরা যাউক, কোন ছাত্র আগ্রহ সহকারে স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের পাঠ প্রস্তুত করিতেছে, তখন যদি তাহাকে অভিভাবকের আদেশে বাজারে যাইতে হয় তবে তাহার স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে বলিয়া সে মনে করিবে। বস্তুতঃপক্ষে সংসারে এমন কোন কাজ নাই যাহা করিতে হইলে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয় না। যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না সে কোন কার্যেও সফলতা লাভ করিতে পারে না। তাই "পাগলের" দ্বারা কোন কাজ সম্ভব হয় না। কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা এবং ঐ কাজে সফলতা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করাকে পরস্পর হইতে বিযুক্ত করা সম্ভব নহে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হইতেছে ঐ কাজের শৃঙ্খলাকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়—কাজেই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার মূল সমস্যা হইতেছে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জাগরিত করা; শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্যাকে কখনও পৃথকভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নহে। শৃঙ্খলা রক্ষা করা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র, বিদ্যালয়ে উহার স্বকীয় কোন স্থান নাই। অনেক সময়েই আমরা এই নীতি বিস্মৃত হইয়া, কেবলমাত্র শৃঙ্খলা রক্ষাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে, কখনও কখনও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতিকূলতাচরণও করিয়া থাকে অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেই। বিদ্যালয়ের কাজে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ না থাকিলে ঐ কাজের জন্য প্রবর্তিত শৃঙ্খলা রক্ষা করার কোন প্রবৃত্তিও তাহাদের থাকিতে পারে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে "হুকুমের" (order) দ্বারা শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিতে হয়, এবং শাসন এবং পুরস্কারের সাহায্যে ঐ শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ঐ ধরণের শৃঙ্খলাকে বহির্জাত শৃঙ্খলা এবং প্রথমোক্ত শৃঙ্খলাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বহির্জাত শৃঙ্খলা স্বাধীনতার পরিপন্থী। যে কাজে ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বহির্জাত শৃঙ্খলা তাহাদিগকে ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়া যে কাজে তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই উহাতে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করে। তাই উহা ছাত্রদের নিকট শৃঙ্খলস্বরূপ মনে হয়। জেলখানার কয়েদী বা যুদ্ধ-

বন্দীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা বহির্জাত শৃঙ্খলা—উহা স্বাধীনতার বিপরীত এবং দাসত্বের সমতুল্য ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ে আমরা ঐ ধরণের শৃঙ্খলা দেখিতে আশা করি না—বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হইবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। হাক্সলি (Aldous Huxley) বলিয়াছেন যে, স্বাধীন হইতে এবং নিজেকে নিজে শৃঙ্খলার অনুগামী করিবার কৌশল মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে ("teach people the arts of being free and governing themselves")। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা স্বাধীনতার পরিপূরক—নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলার অনুবর্তী হইতে কোন বহিঃস্থ শক্তি বাধা দিলে তাহাকেই বরং স্বাধীনতার হরণকারী বলিয়া মনে হয়। টি. এইচ. গ্রীন (T. H. Green) বলিয়াছেন, যে মানুষ নিজের কৃত আইন নিজে মান্য করিয়া চলিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করে সেই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ("That man is free who is conscious of himself as the author of the law which he obeys.")।

শিশুকে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে দেওয়া বা তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে শাসন বা পুরস্কারের সাহায্যে দমন করা কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বাধীনতা এক নহে। শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের চাহিদা প্রভৃতি এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের কাজ এবং তাহার ইচ্ছার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য এক হইলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার অনুবর্তন করিবে। প্রাচীন ভারতে গুরু এবং শিষ্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলিয়া গুরুর আদেশ অনুযায়ী অতি কঠোর শৃঙ্খলার অনুবর্তনও শিশুরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে করিত। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের জীবনের চাহিদা তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অনেক পরিমাণেই শিক্ষালব্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অঙ্ক, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাত্রের মনে সৃষ্টি করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের আদর্শকে ছাত্রদের অন্তরে প্রোথিত করিয়া দিতে পারিলে এবং তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া দিতে পারিলে ছাত্রেরা নিজের চেষ্টায়ই উচ্ছৃঙ্খলতার পথ পরিত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ের আইন-কানুন প্রণয়নে এবং উহাদের মানিয়া

চলার কার্যে ছাত্রেরা যতবেশী অংশ গ্রহণ করিবে ততই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বহির্জাত না হইয়া অন্তর্জাত হইবে। পাঠ-সংক্রান্ত বিষয়ই হউক বা অন্য কোন বিষয়ই হউক বিদ্যালয়ের সব নিয়মেই ছাত্রদের আন্তরিক সমর্থন লাভ করা আবশ্যক। নিয়ম মান্য করিয়া চলিবার দায়িত্বও ছাত্রদিগের উপর ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে ন্যস্ত থাকিবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভী বলিতে আমরা বুঝি :

১। অন্তর্জাত শৃঙ্খলাই প্রকৃত শৃঙ্খলা ; স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা একার্থবাচক। এই ধরণের শৃঙ্খলায় মানুষ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কাজে ব্রতী হয় এবং উহা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উহার অপরিহার্য বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলে।

২। প্রকৃত শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতাকে বিযুক্ত করা সম্ভব নহে—একটি ব্যতীত অপরটি সার্থক হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা বিরাজ করিবে। একের বদলে অপরকে লাভ করিতে চেষ্টা করিলে কাহাকেও প্রকৃতরূপে পাওয়া যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না ; আবার শাসন বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কাহাকেও নিয়ম মানিতে বাধ্য করাও উচিত নহে।

৩। বহির্জাত শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা নানাদিকে ক্ষতিকারক। ইহা শিক্ষার পরিপন্থী ; কাজেই বিদ্যালয়ে ঐ ধরণের চেষ্টা সর্বদা পরিহার্য।

৪। শিক্ষার সাহায্যে বহির্জাত শৃঙ্খলাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় পরিবর্তন করা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্যা প্রধানতঃ যথাযথ শিক্ষাদানেরই সমস্যা। যথাযথ শিক্ষার ফলে শৃঙ্খলা ছাত্রদের অন্তর্জাত হইবে ইহাই আশা করা হয়।

শাস্তি ও পুরস্কার—অতি প্রাচীনকাল হইতেই শাস্তি এবং পুরস্কার শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষকের হাতের দুইটি বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই ইহা বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, শিশুদের পক্ষে যে কার্য করা বাঞ্ছনীয় তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি নাই ; যাহা তাহাদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় তাহাদের দিকেই তাহারা (যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া) আকৃষ্ট। একমাত্র শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে

তাহাদিগকে বাঞ্ছিত কাজে প্রবৃত্ত করান কিছুটা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি অথবা শিশুদের জন্মগত স্বভাব—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখি না। শিশু যে আদিমতম মানুষের "পাপ" লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা তাহার জন্মগত সকল প্রবৃত্তিই (Instincts) যে মন্দ একথা আমরা বর্তমানে বিশ্বাস করি না। প্রধানত বিদ্যালয়ের ত্রুটির ফলে শিশুদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখিতে পাই। বিদ্যালয়ে ত্রুটি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যেও যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। ধরা যাউক, পাঠ্যবিষয়গুলি পাঠে (ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি) ছাত্রদের যে জন্মগত কোন বিতৃষ্ণা আছে এমন নহে, নানা কারণে বিদ্যালয় তাহাদিগকে ঐ সব বিষয় পাঠে আকৃষ্ট করিতে পারে না বলিয়াই ঐ ধরণের বিতৃষ্ণা তাহাদের মনে জন্মিয়া থাকে। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ছাত্রেরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে চায় না। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে যে এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায় তাহা কুশিক্ষার ফল ; সুশিক্ষার সাহায্যে তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের ব্যবহারের পরিবর্তন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই এই সমস্যা সমাধানের সহজতর পন্থা হিসাবে শাস্তি এবং পুরস্কারকে ব্যবহার করিতে বিদ্যালয় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই পন্থা অবলম্বনে অনেক ক্ষেত্রে আশু ফল লাভ হয় বলিয়া শিক্ষকেরা ইহা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। কিন্তু ঐ পন্থায় যে ফললাভ হয় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না ; অধিকন্তু শাসন ও পুরস্কার প্রয়োগ করিলে আরও অনেক দিকে যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয় ইহা শিক্ষকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন না।

শুধু বিদ্যালয়ে কেন, বৃহত্তর সমাজেও মানুষের অবাঞ্ছিত ব্যবহারকে বাঞ্ছিত ব্যবহারে পরিবর্তন করার সমস্যা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই নানারূপ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা প্রত্যেক সমাজেই রহিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে যে, দণ্ডের দ্বারা মানুষের ব্যবহারের স্থায়ী পরিবর্তন হয় না। একবার চুরি করিয়া যাহার জেল হয় সে মুক্ত হইয়া পুনরায় চুরি করিয়া থাকে। দণ্ডের ভয়ে অবাঞ্ছিত কাজ হইতে মানুষ নিবৃত্ত হয় না।

মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও "খুন" করা কোন সমাজেই বন্ধ হয় নাই। একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া, বর্তমানে জেলখানার কয়েদীদের সম্বন্ধেও ভিন্ন নীতি গ্রহণের আন্দোলন চলিতেছে।

আর বিদ্যালয়, যাহা শিক্ষার ক্ষেত্র, সেখানে কি এখনও আমরা জেলখানার নীতি চালাইব? শাস্তি এবং পুরস্কার বলিতে আমরা কি বুঝি এবং উহাদের প্রয়োগের ফলে শিশুর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ইহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

কৃত্রিম উপায়ে শাসিতকে ক্লেশ দানই শাস্তির উদ্দেশ্য। মানুষ স্বভাবতঃ ক্লেশ পরিহার করিতে চায়—এই বিশ্বাস হইতেই শাস্তিদানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ তিন প্রকারে আমরা ছাত্রদের ক্লেশদানের চেষ্টা করিয়া থাকি। ১। শারীরিক ক্লেশ, ২। মানসিক ক্লেশ, ৩। শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরণের ক্লেশের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ চড়চাপড়, কানমলা, বেত ইত্যাদির দ্বারা ছাত্রদের শারীরিক ক্লেশ প্রদানের চেষ্টা করা হয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, মানুষ সহজেই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; ফলে, শারীরিক শাস্তিতে ক্লেশের অনুভূতি বার বার প্রয়োগের ফলে কমিয়া যায়। তাই শিক্ষককে সব সময়েই কঠোর হইতে কঠোরতর শারীরিক ক্লেশদানের পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে হয়। ধরা যাউক, যখন দেখা গেল যে, কেবলমাত্র দাঁড় করাইয়া রাখায় ছাত্রের আর যথেষ্ট ক্লেশ বোধ হইতেছে না, তখন তাহাকে হয়ত নাড়ুগোপাল ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে বলা হইল; আরও কঠোরতর ক্লেশদানের জন্য ইহার পর তাহাকে হয়ত পা ফাঁক করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দুহাতে দুখানা থান ইট লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে নানারূপ শারীরিক ক্লেশদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল—উহাদের বর্ণনা পড়িতেও গা শিহরিয়া উঠে। বর্তমানে শিশুকে বিশেষ শারীরিক ক্লেশদানের অধিকার শিক্ষকের নাই। ফলে, প্রচলিত শারীরিক শাস্তিগুলি সহজেই ছাত্রদের অভ্যস্ত হইয়া পড়ে বলিয়া আর তেমন কার্যকরী থাকে না।

অনেক সময় মানসিক ক্লেশ শারীরিক ক্লেশ অপেক্ষা তীব্রতর হয় এবং

মানসিক ক্লেশদানের পদ্ধতিতে অধিকতর উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ থাকে। মানসিক ক্লেশদানের ক্ষেত্রে সমাজ এখনও শিক্ষকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় নাই। দৈহিক ক্লেশদানের ফলে শরীরের ক্ষতি হইলে তাহা চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু মানসিক ক্লেশদানের ফলে মনের ক্ষতি হইলে তাহা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। ফলে, মানসিক ক্লেশদানে কেহ খুব গুরুতর আপত্তি করে না। তাই বিদ্যালয়ে বর্তমানে মানসিক শাস্তিদানের প্রথাই অধিকতর প্রচলিত। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের মানসিক শাস্তি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হয়—

১। সকলের সমক্ষে ছাত্রকে অপদস্থ করা বা তাহার ব্যবহারকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করা। ২। ছাত্রের কামনার বস্তু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা (খেলা করিতে না দেওয়া)। ৩। শিক্ষকের সমর্থন হইতে ছাত্রকে বঞ্চিত করা—সে যে শিক্ষকের স্নেহ এবং সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে—তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। ৪। একঘরেকরণ—শিক্ষকের নির্দেশে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রেরা অপরাধী ছাত্রকে একঘরে করিয়া রাখিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ক্লেশের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক সময় দৈহিক এবং মানসিক শাস্তি একই সঙ্গে দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে একত্রিত করিয়া অপরাধী ছাত্রকে বেত্রাঘাত করা হইল বা শ্রেণীকক্ষের বাহিরে তাহাকে কান ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল।

শাস্তির প্রতিক্রিয়া—শাস্তি প্রদানকালে ছাত্রের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। শিক্ষক ছাত্রকে দিয়া যে কাজ করাইতে চাহেন তাহা তাহার নিকট অপ্রীতিকর (দৃষ্টান্ত—অঙ্ক কষা)। তাই তিনি শাস্তিদানের ভয় (বেত্রাঘাত) দেখাইয়া ছাত্রকে ঐ কাজ করিতে বাধ্য করিতে চান। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্র দুইটি বিপরীতগামী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া বিব্রত বোধ করে। নিম্নে প্রদত্ত নক্সাটি অনুধাবন করুন।
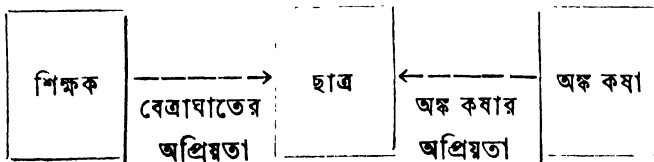
অঙ্ককষা ছাত্রের নিকট অপ্রীতিকর, তাই উহার অপ্রিয়শক্তি তাহাকে ঐ কাজ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে। অপরদিকে বেত্রাঘাতও তাহার নিকট ক্লেশদায়ক তাই উহার অপ্রিয়শক্তি তাহাকে কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

১। বলাবাহুল্য যে, ছাত্রকে লইয়া এই টানাটানিতে দুইটি অপ্রিয়শক্তির মধ্যে যেটি অধিকতর ক্লেশদায়ক তাহারই জয় হইবে। যেমন, অঙ্ককষা ছাত্রের নিকট খুব অপ্রিয় না হইলে বেত্রাঘাতের ক্লেশ এড়াইবার জন্য অঙ্ককষার ক্লেশ সে স্বীকার করিয়া লইবে। তাই অনেক সময় শিক্ষক শাস্তি প্রদান করিয়া সফলকাম হন এবং শাস্তির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নিজেকে ছাত্রের নিকট অধিকতর অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়া শিক্ষক আপাততঃ তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে অধিকতর অপ্রিয় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠার ফলে শিক্ষাদানকার্য তাঁহার পক্ষে সহস্রগুণে কঠিন হইয়া পড়িল। তারপর শাস্তির ভয়ে কাজ করিতে ছাত্রেরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, কোন কাজেই তাহাদের আর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থাকিবে না। শুধু বিদ্যালয়ে নহে, সারাজীবন ব্যাপিয়াই এই বদভ্যাস তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকিবে। বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজ করিয়া তাহাতে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা যায় না।

২। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ ছাত্রের নিকট এত অপ্রিয় যে, সে শাস্তির ক্লেশকে বরণ করিয়া লয়। ঐ সব ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান করিয়াও শিক্ষকেরা আশানুরূপ ফল পান না। লাভের মধ্যে ছাত্রেরা শাস্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের চরিত্রের অধোগতি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দিনের পর দিন শিক্ষক ছাত্রকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে দাঁড় করাইয়া রাখিতেছেন তবু সে বাড়ী হইতে পড়া তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষক শাস্তির পরিমাণ এবং নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করিয়া অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের অবনতি এবং শিক্ষকের চরিত্রেরও অধোগতি হয়।

৩। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র অপ্রীতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্লেশ এবং শাস্তি পাওয়ার ক্লেশ উভয়কেই এড়াইতে চেষ্টা করে; এই উদ্দেশ্যে সে নানা ধরণের প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন শিক্ষকের প্রধান

কাজ হয় ছাত্রের প্রতারণা ধরিয়া ফেলা এবং প্রতারণার জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা। এই অবস্থায় ছাত্র এবং শিক্ষক প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। যে কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা গৌণ হইয়া শিক্ষক-ছাত্র দ্বন্দ্ব প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাক, ছাত্র জানে যে, বাড়ীর অঙ্ক কষিয়া না আনিলে ক্লাশে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বাড়ীতে অঙ্ক কষা তাহার নিকট ক্লেশদায়ক। তাই কোন ছাত্রের খাতা হইতে অঙ্ক নকল করিয়া ক্লাসে সে দাঁড়াইয়া থাকিবার শাস্তি এড়াইতে চেষ্টা করে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সব ছাত্র নকল করিয়া অঙ্ক লইয়া আসিয়াছে তাহাদের প্রতারণা ধরিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে দুষ্ট হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, শাস্তি এড়াইবার চেষ্টায় ছাত্রদের মধ্যে অনেক ধরণের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয় (মিথ্যা কথা বলা, নকল করা, ক্লাশ হইতে পালানো ইত্যাদি)।

শাস্তিপ্রদানের নীতি—শাস্তিপ্রদান ছাত্রদের মধ্যে যে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সমাজ ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আদর্শানুগ হইলে শাস্তিদানের কোন প্রয়োজন থাকে না। ছাত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়ই বাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত হইবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শিশুর মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়কেও কোন প্রকারেই আদর্শ বলা চলে না—উহার দোষ-ত্রুটির জন্যও ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় হইতে শাস্তিপ্রদান সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়ত সম্ভব নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির দ্বারা যে আশু ফললাভ হয় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শাস্তিপ্রদানকে necessary evil হিসাবে কখনও কখনও ব্যবহার করিলেও শাস্তিপ্রদানের কুফল সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্তিপ্রদানকালে আমাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—

১। শাস্তিপ্রদানের দ্বারা সাময়িকভাবে মাত্র সমস্যার সমাধান করা চলিতে পারে। শাস্তিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের মূল কারণ বাহির করিয়া তাহা দূর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাস্তি প্রদানের দ্বারা ছাত্রকে একদিকে যেমন অঙ্ক কষিতে বাধ্য করা হইবে, অপর দিকে ঐ কাজে তাহাকে এরূপ সাহায্য দিতে হইবে যাহাতে অঙ্ক কষা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। অঙ্ক কষিতে যেন সে আনন্দ পায়।

২। "বাঞ্ছিত কাজ" ছাত্রের নিকট কি পরিমাণে অপ্রীতিকর এবং পরিকল্পিত শাস্তিই বা তাহার নিকট কতখানি ক্লেশদায়ক তাহা পূর্বেই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্তির দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের সম্ভাবনা না থাকিলে শাস্তিপ্রদান না করাই উচিত। কারণ শাস্তি গ্রহণের দ্বারা ছাত্রের চরিত্রের অধোগতি ঘটে।

৩। শারীরিক শাস্তি অধিকতর নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়; ইহা শিশুর মনের কোমল প্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে অনেকখানি পশুর স্তরে নামাইয়া লইয়া আসে। অনেক সময় ইহা অভিভাবক এবং শিক্ষকের মধ্যেও অপ্রীতিকর সম্বন্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তারপর ছাত্রেরা সহজে শারীরিক শাস্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু শারীরিক শাস্তি শিশুকে ভীরু ও দুর্বলচরিত্র করিয়া তোলে। তাই শারীরিক শাস্তিবিধান পরিহার করিয়া চলাই উচিত।

৪। মানসিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা নানাদিক দিয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহাও যে মানসিক বিকাশের গুরুতর ক্ষতি করিতে পারে একথা মনে রাখিতে হইবে। ঐ ধরণের শাস্তিবিধানের ফলে ছাত্রদের মানসিক নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৫। শাস্তিবিধানকালে শিক্ষককে সাধ্যমত নৈর্ব্যক্তিক (objective) থাকিতে হইবে। শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি শাস্তিবিধান করিতেছেন নিজের খেয়ালখুসী তৃপ্তির জন্য নহে। শাস্তিপ্রদানকালে তাঁহাকে নিজেকেও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে; একই অপরাধের জন্য কাহাকেও গুরুতর শাস্তি, কাহাকেও অল্প শাস্তি দেওয়া চলিবে না। কোন্ অপরাধের জন্য কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা পূর্ব হইতে সকলেরই জানা থাকিলে শাস্তির বাধ্যতামূলক শক্তি বৃদ্ধি পায়; শিক্ষক ছাত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত শাস্তিপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন

এইরূপ মনে করিলে শাস্তিপ্রদানের দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত কম তিক্ত হয়। শাস্তিপ্রদান শিক্ষকের "মর্জির" উপর নির্ভর করে এরূপ ধারণা ছাত্রদের মনে সৃষ্ট হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

৬। শাস্তিপ্রদানকালে শিক্ষক নিজে কখনও রাগান্বিত হইবেন না। ছাত্রের উপকারের নিমিত্ত তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি শাস্তি দিতেছেন না। শাস্তির দ্বারা তিনি ছাত্রকে যে ক্লেশ দিতেছেন তাহার জন্য তাঁহার মনেও কষ্ট হইতেছে—কিন্তু ছাত্রের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি তাহাকে এই সামান্য ক্লেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন—এইরূপ মনোভাব লইয়া শাস্তিপ্রদান করিলে শাস্তিপ্রদানের ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের তেমন ক্ষতি হয় না।

৭। কোন্ অপরাধের জন্য কোন্ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা পূর্বে নির্দিষ্ট থাকিলেও কখনও কখনও স্থান, কাল, পাত্রভেদে শাস্তিপ্রদান-ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে হইতে পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মনে যাহাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা না জন্মায় তাহার জন্য তাহাদের নিকট ঐ তারতম্যের কারণ ব্যক্ত করা আবশ্যক। শাস্তিদানে শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন ছাত্রদের মধ্যে ঐরূপ ধারণা জন্মানো অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিদ্যালয়ে পুরস্কারের স্থান—অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শাস্তির ন্যায় শিক্ষকেরা পুরস্কারের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। শাস্তির মত পুরস্কারও তিন রকমের হইতে পারে—দৈহিক, মানসিক এবং দৈহিক ও মানসিক পুরস্কারের সংমিশ্রণ। বিদ্যালয়ে শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে যেরূপ জনমতের সৃষ্টি হইয়াছে পুরস্কার প্রদানের বিরুদ্ধে এখনও কিন্তু তেমন হয় নাই। বরং পুরস্কার প্রদানকে শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্তিপ্রদানের প্রতিক্রিয়া এবং পুরস্কার প্রদানের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কাজে ছাত্রের স্বাভাবিক রুচি নাই—কাজের অপ্রিয়তা ছাত্রকে কাজ হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, আর শিক্ষক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। ছাত্র পরস্পর বিপরীতগামী যে দুইটি শক্তির মাঝখানে পড়ে তাহাদের একটি তাহার নিকট প্রীতিকর এবং অপরটি তাহার নিকট

অপ্রীতিকর (শাস্তির ক্ষেত্রে উভয় শক্তিই ছাত্রের নিকট অপ্রীতিকর)। ছাত্রকে হয় অপ্রীতিকর কাজে লিপ্ত হইতে হইবে আর না হয়ত প্রীতিকর কোন কিছুর লোভ ত্যাগ করার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে।
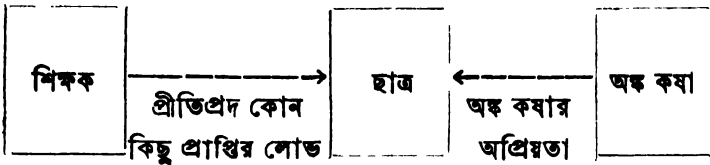
এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্লেশ, প্রদত্ত পুরস্কারের লোভ ত্যাগ করিবার ক্লেশ হইতে অল্প হইলে ছাত্র নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরস্কারের প্রলোভন ত্যাগ করার ক্লেশ খুব তীব্র হয় না বলিয়া পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া কার্যোদ্ধার হয় না। পুরস্কার অপেক্ষা শাস্তির কার্যকরী শক্তি বেশী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্তিপ্রদানের ফলে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ যেরূপ তিক্ত হইয়া পড়ে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না। শেষোক্ত, ক্ষেত্রে শিক্ষক ক্লেশদায়ক শক্তির পরিবর্তে প্রীতিপ্রদ শক্তির প্রতীক। কাজেই শাস্তি এবং পুরস্কারের মধ্যে পুরস্কারের প্রয়োগই যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরস্কার প্রদানের সর্বাপেক্ষা বড় গলদ হইতেছে এই যে, ইহার লোভে ছাত্রেরা প্রতারণা শিখা করে। শিক্ষক-নির্দিষ্ট কাজের অপ্রিয়তাকে বরণ করিয়া না লইয়া সে প্রতারণার সাহায্যে পুরস্কার লাভ করিতে চেষ্টা করে। আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ বিদ্যালয়ে শাস্তি বা পুরস্কার কোনটিরই স্থান নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরস্কার প্রদানকে necessary evil রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরস্কার প্রদানকালে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে—

১। মনে রাখিতে হইবে শাস্তির মত পুরস্কারও অভীষ্টলাভের অস্থায়ী পন্থা মাত্র। চেষ্টা করিতে হইবে যে, ধীরে ধীরে ছাত্র যেন পুরস্কারে লোভ ব্যতীতও কাজে লিপ্ত হয়—তাহার নিকট কাজ যেন অপ্রিয় না হইয়া প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।

২। অল্পস্বল্প পুরস্কার প্রদানে কার্যোদ্ধার হইতেছে না দেখিয়া পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রদের লোভী করিয়া তোলা সঙ্গত নহে।

৩। পুরস্কার প্রদানকালে শিক্ষক এমনভাবে চলিবেন যাহাতে ছাত্রেরা তাঁহাকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট মনে না করিতে পারে। এই বিষয়ে সাবধান হইলেই পুরস্কার প্রদানের ফলে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ তিক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পুরস্কার প্রদানের ফলে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধেরও যেন কোন ক্ষতি না হয়। তাই একজনকে পুরস্কার দেওয়ার ছলে অপরকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক সময় শিক্ষক কোন ছাত্রের প্রশংসার মূল্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্য কোন কোন ছাত্রের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া থাকেন। ফলে, যাহা একটি ছাত্রের নিকট পুরস্কার তাহা আর কয়েকটি ছাত্রের নিকট শাস্তি। ইহার ফলে ছাত্রদের মধ্যে ঈর্ষা এবং ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করাও ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ উৎসব—আমাদের দেশের সকল বিদ্যালয়ই এখনও পুরস্কার বিতরণ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রায় সকল বিদ্যালয়ই বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম তিনটি স্থান অধিকারকারী ছাত্রকে পুস্তক বা অনুরূপ কিছু পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করিয়া থকে। অনেক বিদ্যালয় আছে যাহারা শুধু পাঠের ক্ষেত্রেই নহে, বিদ্যালয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সব ছাত্র শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারে তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকে (খেলা, সমাজসেবা ইত্যাদি)। ছাত্র কোনও একটি বস্তু পুরস্কার হিসাবে (বই, কলম ইত্যাদি) লাভ করে, আবার সভায় দশজনের সামনে ঐ পুরস্কার বিতরণ করা হয় বলিয়া তাহার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে, পুরস্কার লাভের লোভ তীব্রতর হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, ঐরূপ পুরস্কার দানের দ্বারা ছাত্রদের পাঠে উৎসাহ দেওয়া হয়—পুরস্কারলাভের লোভে তাহারা পাঠের ক্লেশকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে, ইহাই প্রত্যাশা। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে (৪০, ৮০ বা ১২০ ছাত্রের মধ্যে) ৯।১০টি ব্যতীত অপরে উপরি-উক্ত ধরণে পুরস্কার বিতরণের দ্বারা পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে না। যে ছাত্র পরীক্ষায় সাধারণতঃ

নবম, দশম স্থানও অধিকার করিতে পারে না, সে কখনও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানের মধ্যে কোনটি অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতে পারে না। তাই পুরস্কার বিতরণের দ্বারা শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্র ব্যতীত অপরাপর ছাত্রেরা পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে না। তারপর পুরস্কার বিতরণ "ভাল" ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার সৃষ্টি করে। সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনে ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা অনুকূল নহে। ঐ ধরণের পুরস্কার বিতরণের পরিবর্তে ছাত্রদের যদি আত্মোন্নতির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা হইলে সকল ছাত্রই পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে—অর্থাৎ যে-কোন ছাত্র যদি পূর্ব বৎসরের পরীক্ষার ফল অপেক্ষা পরের বৎসরের পরীক্ষার ফল ভাল করিতে পারে (ঠিক কতখানি ভাল করিলে পুরস্কার পাইবে তাহা অবশ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে) তাহা হইলে সে পুরস্কার পাইবে, তা সে শ্রেণীতে প্রথমই হউক আর সকলের নীচেই হউক। এইরূপভাবে পুরস্কার বিতরণ করিলে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার সৃষ্টিও হয় না।

নবম পরিচ্ছেদ

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলী

(Co-curricular activities)

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলীর বিদ্যালয়ে স্থান—শিক্ষা সম্বন্ধে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে বিদ্যালয়কে আমরা শুধু জ্ঞান (knowledge) লাভের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়া থাকি। জ্ঞানদানই বিদ্যালয় তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে (যাহা দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়) ছাত্রেরা কোন্ কোন্ বিষয় পাঠ করিবে তাহার তালিকা ভিন্ন আর কিছু থাকে না। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের কার্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শিশুর বিকাশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে চলে না। তাই জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়কে অন্ততঃ কিছুটা শরীরচর্চা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। তারপর, গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে দেখা গেল যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিতে হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়েই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছুটা অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। ফলে বিদ্যালয়ে বিতর্কসভা ইত্যাদির আয়োজন হইতে আরম্ভ করিল, এবং শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বিদ্যালয় জীবন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কিছুটা ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এদিকে ধর্ম এবং পরিবারের প্রভাব আমাদের জীবনে যত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল, ততই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইতে আরম্ভ করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের বিখ্যাত "পাবলিক স্কুল"গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া দিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ছাত্রদের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে খেলাধূলা, নানাধরণের যুব আন্দোলন (বয়স্কাউট) ইত্যাদি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিল। তারপর দেখা গেল যে, সমাজজীবনে প্রবেশ করিয়া লোকে যদি যথাযথভাবে অবসর সময় না যাপন করে তবে তাহাদের জীবনের সকল

সুশিক্ষা নষ্ট হইয়া কুশিক্ষায় পরিণত হয় (তাহাদের মদ্যপান ইত্যাদি কদভ্যাস জন্মায়)। তাই আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, বিদ্যালয়কে "অবসর বিনোদনের জন্য শিক্ষা" (Education for Leisure) দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্র-দিগকে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনও অনুভূত হইল। তাই বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি স্থান পাইল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে নানাধরণের কর্মের স্থান হইলেও পঠন-পাঠনই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া রহিল। বিদ্যালয়ের কাজগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইতে লাগিল—পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্ম (Curricular activities) এবং পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম (Extra-Curricular activities)। পাঠ্যক্রমে পঠনীয় বিষয়ে নির্দেশ থাকে বলিয়া পঠন-পাঠনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়: এতদ্ব্যতীত অপরাপর সকল কর্মকেই পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত কর্মগুলি প্রথমোক্ত কর্মগুলির মত তত সুনির্দিষ্ট থাকে না; বিদ্যালয়ের 'টাইম-টেবল' (Time table)-এর মধ্যে ইহারা স্থানও পায় না; সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের "ছুটির" পর ঐসব কাজের জন্য সময় দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কাজগুলি সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয় না। পঠন-পাঠনই বিদ্যালয়ের প্রকৃত কর্ম। যথাযথভাবে পঠন-পাঠন করাইয়া সময় পাইলে তবেই ঐ অতিরিক্ত (Extra) কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে "পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম"গুলি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে পারিলে, তাহাদের চরিত্র গঠিত ক রতে পারিলে এবং যাহাকে আমরা পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম বলি তাহাতে উহাদিগকে লিপ্ত করিতে পারিলে পঠন-পাঠনেও সাহায্য হয়। তাই ঐ কাজগুলিকে পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কাজ না বলিয়া পাঠ্যক্রমের পরিপূরক (Co-curricular) কাজ আখ্যা দেওয়া বিদ্যালয়ের টাইম-টেবিলের অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। (যেমন, শরীর-চর্চা)।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পর হইতে শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির বিদ্যালয়ে স্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার

আরও প্রগতিশীল হইয়াছে। বর্তমানে আমরা 'সামগ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গী (Whole approach) লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকি। বিদ্যালয়ের সকল অভিজ্ঞতাই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত। বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা ছাত্রের নিকট শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র পঠন-পাঠনই শিক্ষালাভের উপায় নহে। শ্রেণীকক্ষের বাহিরে কাজের গুরুত্ব শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের গুরুত্ব অপেক্ষা কম নহে। পঠন-পাঠন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে (বিষয়কেন্দ্রিক নহে), পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিদ্যালয়ে ছাত্র যতরকম কর্মে লিপ্ত হইবে তাহার ইঙ্গিত থাকে। ছাত্রদিগকে যে সব অভিজ্ঞতা প্রদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে (তাহা পঠন-পাঠন-সংক্রান্ত হউক আর না হউক) বিদ্যালয়ের সময়ের ভিতরেই তাহাদের স্থান করিয়া দিতে হইবে—তাহারা টাইম-টেবলের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। যে কোন বিষয়েই ছাত্রকে অভিজ্ঞতা দেওয়া হউক না কেন, ঐ অভিজ্ঞতা হইতে সে আশানুরূপ ফল পাইল কিনা তাহাও পরিমাপ করিয়া দেখিতে হইবে। তাই বর্তমানে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে বিদ্যালয়ের সকল কাজেরই—(পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত) ফলাফল লিপিবদ্ধ (পরীক্ষা করিয়া) করার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রের শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই অর্থপূর্ণ (Significant) এবং তাহারা এমনভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে, একেকে অবহেলা করিয়া অপরের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মগুলির আবশ্যকতা—উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের জন্মাইয়াছে। এই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির সাহায্যে নিম্নলিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

১। এই কাজগুলি নানাভাবে শরীর-চর্চার সুবিধা করিয়া দিয়া ছাত্রদের শারীরিক বিকাশে সাহায্য করে। এমনকি ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কাজ আছে যাহারা বিশেষভাবে শারীরিক বিকাশের জন্যই প্রবর্তিত হইয়া থাকে (ব্যায়াম ইত্যাদি)।

২। নানাবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং নানা দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিয়া এই কাজগুলি ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে (নেতৃত্ব, সহযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা ইত্যাদি)। যখনই যে কাজ প্রবর্তন করা হয় তখনই ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলীর উপর উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

৩। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক বিভিন্ন ধরণের কাজে বিভিন্ন রূপ আত্ম-অভিব্যক্তির (Self-expression) সুযোগ থাকে বলিয়া এবং ইহাদের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা (need) নিবৃত্ত করিবার সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়া ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental health) রক্ষা করায় ইহারা বিশেষভাবে সাহায্য করে; এমন কি, অনেক সময় ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার পরিবর্তনে এই সব কাজ বিশেষ কার্যকরী হয়।

৪। ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিতেও ঐ সব কাজের অবদান প্রচুর। ঐ সব কাজ ব্যতীত বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি যথাযথভাবে স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।

৫। ঐ সব কাজ বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণবৃদ্ধি করে। জীবনে আনন্দ থাকিলে তাহা সকল কাজেই প্রতিফলিত হয়: ঐ সব কাজের আনন্দ পঠন-পাঠনে সংক্রামিত হইয়া উহার একঘেয়েমি হ্রাস করে।

৬। ঐ সব কাজ (বিশেষ করিয়া যুব আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা) ছাত্রদের মধ্যে আদর্শবাদ এবং জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

৭। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশে ঐ সব কাজ সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা জানি যে, চর্চার সুযোগের অভাবে, ক্ষমতা বা আগ্রহ জন্মগত হইলেও তাহা অবদমিত হইয়া থাকিতে পারে এবং বিধিবদ্ধ চর্চার সুযোগ পাইলে তাহারা শুধু বিকশিত নহে বৃদ্ধিও পাইতে পারে। "পাঠ্যক্রমের পরিপূরক" কাজগুলির দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের একান্ত চেষ্টা করা হয়।

৮। ঐ সব কাজের সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের একাত্মবোধ জাগ্রত হয় (প্রার্থনা সভা, বিদ্যালয়-সঙ্গীত ইত্যাদি)।

৯। ঐ সব কাজ ছাত্রদের জ্ঞানলাভের সাহায্যও করে।

১০। বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা (Desirable Experience) এবং শিক্ষা যদি সমার্থব্যাচক হয় তাহ হইলে পাঠ্যক্রমের বহিভূত কর্মের মাধ্যমেও ছাত্রদের

প্রচুর শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের মাধ্যমে জ্ঞানলাভও কম হয় না।

সংক্ষেপে শিক্ষাক্ষেত্রে "পাঠ্যক্রমের পরিপূরক" কাজগুলির গুরুত্ব "পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্মের" গুরুত্ব অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মের প্রকারভেদ—পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির কোন নির্দেশ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে; কারণ ঐগুলি অসংখ্য ধরণের হইতে পারে। তথাপি উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়ার নিমিত্ত উহাদিগকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইল। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতাই এই বিভাগগুলির ভিত্তি।

১। বিদ্যালয়ের প্রতি একাত্মবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত এবং ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকে মেলামেশা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কাজ। প্রার্থনা সভা, বিদ্যালয়-সঙ্গীত গান করা, ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ ধরণের খেলাধূলা (mixing up games), ঐ উদ্দেশ্যে বনভোজন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

২। ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাজ। শরীর-চর্চা (Physical training); কুস্তি, বক্সিং এবং বিভিন্ন ধরণের স্পোর্টস্ (sports) ঐ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

৩। চরিত্র বিকাশ, কিছুটা শরীরচর্চা এবং নির্মল আনন্দলাভের নিমিত্ত কাজ। ফুটবল, হাডু-ডু-ডু, ক্রিকেট ইত্যাদি দলবদ্ধ খেলাধূলাকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায়।

৪। সাংস্কৃতিক জীবনের এবং চরিত্রের বিকাশের জন্য: রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন ইত্যাদি।

৫। জীবনে আদর্শবাদ সৃষ্টি এবং চরিত্রগঠনের নিমিত্ত কাজ; যথা হিন্দুস্থান স্কাউট, এন. সি. সি. ইত্যাদি।

৬। জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশের নিমিত্ত কাজ: বিভিন্ন ধরণের হবিক্লাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৭। ভবিষ্যৎ শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করিবার জন্য কাজ, যথা, 'কেরিয়ার টক' (Career Talk), প্রদর্শনী ইত্যাদি।

৮। পাঠলব্ধ জ্ঞানকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে কাজ; যথা, এক্সকার্সন (Excursion), প্রদর্শনী ইত্যাদি।

৯। গণতান্ত্রিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দানের নিমিত্ত কাজ; যথা, বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংঘের কাজ, বিতর্কসভা ইত্যাদি।

১০। সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কাজ; যথা, জনসেবা, জনশিক্ষা ইত্যাদি।

১১। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও কল্পনার বিকাশের জন্য, বিতর্ক ও আলোচনা সভা, প্রাচীর পত্রিকা ইত্যাদি রচনা।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির যথাযথভাবে পরিচালনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—

১। ঐ সব কাজে লিপ্ত হইবার সুযোগ যাহাতে সকল ছাত্র পায় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সব কাজের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ৩০।৪০ জনের এক একটি দলে বিভক্ত করিতে হইবে।

২। ঐ সব কাজের পরিচালনার দায়িত্ব যথাসম্ভব ছাত্রদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা—পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলী শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যদানের মত, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ। ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যে যোগদানের সুযোগ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐভাবের কাজ অসংখ্য রকমের হইতে পারে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয় তাহার পারিপার্শ্বিক, ছাত্রদের রুচি এবং অভিভাবকদের মতামতের কথা বিবেচনা করিয়া কোন্ কোন্ পাঠ্যক্রমের পূরক কার্যের সুযোগ ছাত্রদের দিবে তাহা স্থির করিবে। কিন্তু তথাপি, উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিয়া যে এগার ধরণের কার্যের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ধরণের কিছু কিছু কার্যের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই করা প্রয়োজন। (এখানে উদাহরণসহ প্রত্যেক ধরণের কার্যের উল্লেখ বই-এ যেভাবে দেওয়া আছে সেইরূপ করিবেন)।

এই সব কার্যের প্রত্যেকটিতেই যে সকল ছাত্র লিপ্ত হইবে এমন নহে। ছাত্রদের ক্ষমতা এবং রুচির বিভিন্নতার কথা বিবেচনা করিয়া, তাহারা বিভিন্ন ধরণের কাজে লিপ্ত হইতে পারে। যথা, কোন ছাত্র হয়ত বিতর্ক সভায় বসিবে, আবার কোন ছাত্র হয়ত কবিতা পাঠের আসরে গিয়া বসিবে। কাজেই মোটামুটি একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিভিন্ন কাজ, একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং ছাত্রেরা তাহাদের রুচি ও ক্ষমতামত বিভিন্ন কাজে যোগ দিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন কাজে যোগ দিতে হইবে।

আবার কতকগুলি কাজ এমন আছে যে, রুচি ও ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে, সকল ছাত্রকেই ইহাতে যোগ দিতে হয়। যথা, পাঠলব্ধ জ্ঞানকে সংহত করার জন্য এক্সকার্সন, ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করিবার জন্য কেরিয়ারটক্ ইত্যাদি।

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে কার্যগুলিতে যোগ দিতে হইবে—নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিলে চলিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা করিলে, প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন-না-কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে ; প্রাচীর পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে, প্রত্যেক ছাত্রই ইহাতে লিখিবার সুযোগ যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব ছাত্রের বিভিন্ন কাজে রুচি রহিয়াছে, তাহা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, প্রত্যেক ছাত্রেরই কোন-না-কোন কাজে রুচি গড়িয়া তোলা বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যগুলি যদি শিক্ষামূলক হয়, তাহা হইলে সকল ছাত্রেরই ঐ সব কার্যে যোগদানের সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। এই সুযোগ দিতে হইলে প্রত্যেকটি কার্য্য শ্রেণী ভিত্তিতে পরিকল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাচীর পত্র প্রকাশিত হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীর পত্র থাকিতে হইবে ; প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা খেলার ব্যবস্থা, আলাদা আলাদা বিতর্ক সভা, সাহিত্য সভা ইত্যাদি থাকিবে। এক একটি কার্যের জন্য যে দল গঠিত হইবে তাহাতে ৪০ জনের বেশী ছাত্র না থাকাই ভাল। অবশ্য শ্রেণী ভিত্তিক কার্যগুলি বিদ্যালয় ভিত্তিক ভাবেও হওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে: অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক

প্রাচীর পত্র থাকিলেও, সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্যও একটি প্রাচীর পত্র থাকিতে পারে।

প্রত্যেকটি কার্যের জন্য বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সব কার্য সময় তালিকার বহির্ভূত কার্য নয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন শেষ হওয়ার পর ঐ সব কার্যের আয়োজনের যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় নহে। প্রতিটি কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ পাঠদানের বেলায় যেমন শিক্ষক নেতৃত্ব করেন, ঐ সব কার্যের বেলাও তেমনি তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

তবে ছাত্রেরাও, ঐসব কার্যের ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে। ঐসব কার্যের পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছাত্রেরা নিজেদের তাগিদে, নিজেদের দায়িত্বে ঐ সব কার্যের ব্যবস্থা করিবে, শিক্ষক কেবলমাত্র প্রয়োজনে পরামর্শ এবং সাহায্য দিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরণের ব্যবস্থাপনা কেবল যে পাঠ্য তালিকায় পরিপূরক কার্যাবলীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী সম্বন্ধেও একই নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

হবিক্লাব (Hobby Club)—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ উভয়েই বিদ্যালয়ে হবিক্লাব স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। প্রত্যেক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে হবিক্লাব স্থাপনের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। তাই পাঠ্যক্রমের পরিপূরক অন্যান্য কার্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা না হইলেও এ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

অবসর বিনোদনের জন্য আমরা যেসব কার্যে লিপ্ত হই তাহাকে সাধারণতঃ 'হবি' আখ্যা দেওয়া হয়। খেলাধুলা, নৃত্যগীত, অভিনয়, পুস্তকপাঠ, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ (hiking), ডাকটিকিট সংগ্রহ, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি কত রকমের হবি যে লোকের থাকিতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। অবশ্য অনেকে অবসর বিনোদনের জন্য জুয়াখেলা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কর্মেও লিপ্ত হইতে পারে; কিন্তু 'হবি' শব্দটি কোন অবাঞ্ছিত কর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। অবসর বিনোদনের জন্য আমরা যে সব

বাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত হই তাহারাই শুধু 'হবি' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। 'হবি' এমন ধরণের কাজ যাহাতে আমরা নিছক আনন্দের জন্য লিপ্ত হই। সাধারণতঃ জন্মগত ক্ষমতা, আগ্রহ এবং চারিত্রিক গুণাবলী অনুসারেই লোকের 'হবি' গঠিত হইয়া থাকে। কাহারও যে একাধিক হবি থাকে না, এমন নহে। একই লোক ফটোগ্রাফি, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ এবং ডাক টিকিট সংগ্রহ হবি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। তবে জন্মগত ক্ষমতা, আগ্রহ এবং চারিত্রিক গুণাবলীর সহিত সম্বন্ধ থাকে বলিয়া সাধারণতঃ লোকের এক ধরণের 'হবি' থাকে। অর্থাৎ একই লোকের নৃত্যগীত এবং বক্সিং হবি হিসাবে থাকিবার সম্ভাবনা অল্প। পারিপার্শ্বিক সুযোগের উপর মানুষের 'হবি' গ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করে। সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের অনেক ছাত্রের কোন 'হবি'ই নাই। পারিপার্শ্বিকের সুযোগের পার্থক্যের নিমিত্ত জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ এক হইলেও দুইটি ছাত্র বিভিন্ন হবি গ্রহণ করিতে পারে ; একজন চিত্রাঙ্কন অপরে ফটোগ্রাফি।

প্রত্যেক ছাত্রেরাই যাহাতে এক বা একাধিক হবি থাকে তাহার জন্য আধুনিক বিদ্যালয় বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কার্যের উপর বর্তমানে এত অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে যে, বিদ্যালয়ে হবিক্লাব পরিচালনার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই বিশেষ অর্থের বরাদ্দ করিতেছেন। ছাত্রদিগকে বাঞ্ছনীয় কাজের দ্বারা অবসর বিনোদনের শিক্ষা দেওয়া হবিক্লাব স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য। অবসর সময়ে ছাত্রেরা যে সব কর্মে লিপ্ত হয় তাহা তাহাদের শিক্ষার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সমাজে অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ যত বৃদ্ধি পাইতেছে, বাঞ্ছনীয় কাজের দ্বারা অবসর বিনোদনের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা ততই অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। ছাত্রেরা দিন দিনই অবাঞ্ছিত কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বিদ্যালয়ের কার্যে তাহাদের মনোযোগ কমিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঞ্ছনীয় 'হবি' বাড়িয়া উঠিলে উহা আমাদের মানসিক স্থৈর্য (Mental balance) রক্ষা করার সাহায্য করে। হবি জীবনের আনন্দ বৃদ্ধি করে এবং ঐ আনন্দ জীবনের অপেক্ষাকৃত নিরানন্দময় কার্যে লিপ্ত হইতে আমাদিগকে মানসিক শক্তি যোগায়।

বিদ্যালয়ের হবিক্লাবগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল ছাত্রদের জন্মগত ক্ষমতা

এবং আগ্রহের বিকাশ সাধন করা। চর্চার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশ হয় এবং চর্চার অভাবে উহারা সুপ্ত থাকে। হবিক্লাবে নিজের ইচ্ছামত কার্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ পাইয়া ছাত্রদের নিজ নিজ জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশ পাইবে ইহাই আশা করা যায়। আমাদের দেশে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে ছাত্ররা নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে 'বিশেষ বিষয়' পাঠের সুযোগ পায়। কিন্তু ইহার পূর্বে তাহাদের জন্মগত ক্ষমতা এবং স্বাভাবিক আগ্রহের বিকাশ না ঘটিলে পাঠের 'বিশেষ বিষয়' নির্বাচন করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে। কাজেই সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বিদ্যালয়ে হবিক্লাবের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হবিক্লাবের সংঘটন—নিজ বিদ্যালয়ে এবং প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে যেসব 'বিশেষ-বিষয়' পাঠের সুযোগ আছে তাহা বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ে হবিক্লাব গঠন করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলিতে যে সাতটি বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ আছে (সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি) তাহাদের নাম অনুসারে হবিক্লাবের নাম রাখিলে ভাল হয়। অবশ্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে সাতটি হবিক্লাব স্থাপন করিয়া সাতটি বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশের সুযোগ দেওয়া বাস্তব কারণে সম্ভব নহে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া তিনটি বা চারিটি হবিক্লাব স্থাপন করিলেই হয়ত চলিতে পারে। পাঠ্যবিষয়ে নামানুসারে হবিক্লাবের নামকরণ করিতে হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন বিষয় 'পাঠ্য' হইলেই উহা 'হবি' হইতে পারে না ঐ ধারণা ভ্রান্ত। বরং বিদ্যালয়ে 'হবি' এবং 'পাঠ্যের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ভবিষ্যতে থাকিবে না বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 'হবি' এবং 'পাঠ্য' উভয়ই ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং স্বাভাবিক আগ্রহ অনুসারে স্থির হইবে এবং উভয় কার্যে লিপ্ত হইয়াই ছাত্র সমান আনন্দ পাইবে, ইহাই আশা করা যাইতেছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র যদি কোন একটি বিশেষ কার্যে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সুযোগ পাইলে ঐ ধরণের অপরাপর কার্যেও হয়ত আকৃষ্ট হইবে ইহা আশা করা অন্যায় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন ছাত্র যদি বিতর্কের প্রতি

আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সে সুযোগ এবং উৎসাহ পাইলে সাহিত্য রচনায়ও আকৃষ্ট হইতে পারে। তাই প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য (যেমন, বিতর্ক) পৃথক পৃথক হবিক্লাব স্থাপন না করিয়া এক ধরণের সকল কাজের জন্য একটি হবিক্লাব স্থাপন করা সঙ্গত (বিতর্কের জন্য বিতর্ক-হবিক্লাব স্থাপন না করিয়া সাহিত্য-হবিক্লাবের অন্যতম কর্ম হিসাবে বিতর্ককে গ্রহণ করাই ভাল)।

কোন হবিক্লাবের সভ্যসংখ্যা ৪০ জনের বেশী হওয়া উচিত নহে। সভ্য সংখ্যা বেশী হইয়া পড়িলে একই হবিক্লাবের বিভিন্ন শাখা স্থাপন করা উচিত। ধরা যাউক, বিজ্ঞানের হবিক্লাবের সভ্যসংখ্যা যদি হয় ৮০ জন তাহা হইলে উহা দুইটি শাখায় বিভক্ত করিতে হইবে। ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে হবিক্লাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক 'ইউনিট' (unit) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নবম শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীগুলির ছাত্রদিগকে আর একটি ইউনিট্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পৃথক্ ভাবে লইয়াও হবিক্লাব গঠন করা যাইতে পারে। প্রত্যেক হবিক্লাবের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকিবেন, এবং অন্ততঃ প্রতি দুই সপ্তাহে হবিক্লাবের ১½ ঘণ্টা করিয়া (একসঙ্গে) অধিবেশন বসিবে। শিক্ষকের নেতৃত্বে হবিক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব যথাসম্ভব ছাত্রেরাই গ্রহণ করিবে।

বাস্তবক্ষেত্রে এক ছাত্রকে একাধিক হবিক্লাবের সভ্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব হইবে না, কারণ সকল হবিক্লাবের অধিবেশনে হয়ত একই সময়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম কিছুদিন নিজেদের ইচ্ছানুসারে ছাত্র-দিগকে বিভিন্ন হবিক্লাবে যোগদানের অনুমতি দিতে হইবে। ৩।৪ মাস ঐ ধরণের সুযোগ ভোগ করার পর প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন হবিক্লাবের সভ্য হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু ইহার পরও সে যদি মধ্যে মধ্যে অপর কোন হবিক্লাবে যোগ দিতে চায় তবে তাহাকে সে অনুমতি দিতে হইবে।

হবিক্লাবের কার্য—উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া হবিক্লাবের সভ্যেরাই উহার কার্য স্থির করিবে। তথাপি হবিক্লাবে করা যাইতে পারে এমন কয়েকটি কাজ সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাইতেছে—

স্ক্রেপ বুক (Scrap Book) রক্ষা করা—হবিক্লাবের প্রত্যেক সভ্যই একখানি করিয়া 'স্ক্রেপ বুক' রাখিবে। অবসর সময় উহাতে নিজ নিজ আগ্রহ

এবং রুচি অনুসারে নিজের হবিক্লাবের বিষয় সম্বন্ধীয় ছবি, লেখা ইত্যাদি— ছাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

প্রশ্নের থলি (Question Box)—প্রত্যেক হবিক্লাবেই একটি করিয়া বাক্স রাখা হইবে। সভ্যেরা নিজেদের ইচ্ছামত প্রশ্ন লিখিয়া ঐ বাক্সে ফেলিবে। হবিক্লাবের সভায় ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে (ভারপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বাক্স খুলিয়া পূর্ব হইতেই প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিবে)। প্রশ্ন অবশ্য নিজ নিজ হবিক্লাব বিষয়ক হইবে।

পাঠ—হবিক্লাবের সভায় ছাত্রেরা নিজেদের স্ক্রেপ বুক হইতে পাঠ করিয়া অপরাপর সভ্যকে শুনাইতে পারে। কোন ভাল বই বাড়ীতে পড়িয়া থাকিলে তাহার অংশ বিশেষও পাঠ করিয়া শুনান যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ হবিক্লাবের নিজস্ব কতকগুলি পুস্তক থাকিবে। নিজেদের রুচি অনুসারে সভ্যেরা ঐসব পুস্তক লইয়া পাঠ করিবে। প্রশ্নের থলির প্রশ্নগুলির উত্তরও হবিক্লাবের অধিবেশন কালে দেওয়া হইবে।

প্রাচীরপত্র—প্রত্যেক হবিক্লাবেই একখানা করিয়া প্রাচীরপত্র থাকিবে।

অন্যান্য কাজ—প্রত্যেক হবিক্লাবই নিজ নিজ বিষয়ে অভিনয়, বিতর্ক, এক্সকার্সন প্রভৃতি আরও নানারূপ কার্যে ব্রতী হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, হবিক্লাবের কার্যের মধ্যে কিছুটা হইবে ব্যক্তিগত এবং কিছুটা হইবে দলবদ্ধ।

দশম পরিচ্ছেদ

চরিত্রগঠন বা নীতি শিক্ষা

চরিত্রের সংজ্ঞা—চরিত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। চরিত্র বলিতে আমরা এক একজন এক একরূপ ধারণা করিয়া থাকি। আমাদের অনেকের ধারণা, সমাজের অনুমোদিত ব্যবহারগুলি কাহারও ব্যবহারে প্রকাশ পাইলেই সে চরিত্রবান। অর্থাৎ সমাজের ভাল-মন্দের বিচার যে নিজ মনে গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছে তাহারই চরিত্র গঠিত হইয়াছে—চরিত্র ও নীতিজ্ঞান প্রায় সমার্থ-বাচক। কিন্তু ব্যাপক অর্থে, চরিত্র ব্যক্তিত্বের (personality) সমার্থ-বাচক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণও সহজ নহে। ব্যবহারের মধ্য দিয়াই মানুষের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে—মানুষেব ব্যক্তিত্ব (personality) বা চরিত্র আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবহারের মধ্য দিয়া। মানুষ কতকগুলি প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; পারিপার্শ্বিক সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা ব্যবহারে রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে, প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারের মধ্যেই আমরা কতকগুলি বিশেষ প্রতিকৃতি (pattern) দেখিতে পাই। যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষ নিজ নিজ গঠিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি (Behaviour pattern) অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। তাই কোন মানুষ বা সত্যবাদী আর কেহবা মিথ্যাবাদী, কোন মানুষ অলস আবার কেহ পরিশ্রমী ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই ব্যবহার-প্রতিকৃতিকে মানুষের চারিত্রিক "গুণ" বলা হইয়া থাকে। ঐ প্রতিকৃতিগুলিই মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality) সৃষ্টি করে। চরিত্রগঠন বলিতে আমরা বাঞ্ছনীয় ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তোলা মনে করিয়া থাকি।

চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা—প্রাচীন ভারতে চরিত্র গঠন ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা শব্দের আধুনিকতম সংজ্ঞা হইতেছে—অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাঞ্ছিত পথে শিক্ষার্থীর ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করা। তাই এক হিসাবে শিক্ষা এবং চরিত্রগঠনকে সমার্থ-বাচক বলা যাইতে পারে।

শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিলেও (বিদ্যালয়কে যদি শুধু জ্ঞানদানের স্থান বলিয়া মনে করি) দেখা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত করিতে না পারিলে তাহাদিগকে জ্ঞানদানও সম্ভবপর হয় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে দিন দিনই যে অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে—যে কোন পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা যে, এত অধিক হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ছাত্রদের চরিত্র যথাযথভাবে গঠিত হইতেছে না। ছাত্রদিগের মধ্যে একাগ্রতা, সততা, দায়িত্ববোধ শ্রমসহিষ্ণুতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করিতে না পারিলে তাহাদের পড়াশুনার অগ্রগতি সম্ভব নহে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পর হইতে আমাদের বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেয় নাই; সমাজ, পরিবার এবং ধর্মের মধ্য দিয়াই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের প্রভাব আমাদের জীবনে খুবই সামান্য; নানা কারণে সামাজিক অভিজ্ঞতা বর্তমানে আমাদের চরিত্রকে বিকশিত না করিয়া বরং নষ্টই করিতেছে; পরিবার সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় বিদ্যালয়কে চরিত্রবিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে চলিতে পারে না। চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ার বিষময় ফল আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবার পূর্বে বিদ্যালয়কে ছাত্রদের চরিত্রবিকাশের চেষ্টা বিধিবদ্ধভাবে করিতে হইবে।

চরিত্র জন্মগত নহে—চরিত্র জন্মগত বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেকের ধারণা যে, আমরা সৎ বা অসৎ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণ বিকশিত হয় মাত্র। এমন কি চরিত্র বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অপরাধীদের বংশানুক্রম পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিও অপরাধপ্রবণ হয় বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাদের মতে অনেকে 'পীড়িত-ব্যক্তিত্ব' (psychopathic personality) বা 'নৈতিক শিশুত্ব' (moral imbecility) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ঐরূপ লোক যদিও বা থাকে তথাপি তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। আধুনিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, চারিত্রিক গুণাবলী বিশেষ করিয়া অভিজ্ঞতালব্ধ।

তাই অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন সমাজের লোকের মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী দৃষ্ট হয়। ধরা যাউক, আমাদের দাম্পত্য জীবনে যৌননিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক অপেক্ষা অধিক, অথচ উহাদের কর্মনিষ্ঠা আমাদের চেয়ে বেশী। পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য দেশের লোকের মধ্যে চারিত্রিক গুণের এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা। ফলতঃ বুদ্ধি (Intelligence) এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার (Aptitudes) সহিত সহিত তুলনা করিলে চরিত্রের উপর অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব অনেক বেশী বলিয়া প্রতীত হইবে—চরিত্র যে প্রধানতঃ শিক্ষালব্ধ এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানের প্রতিকূল পরিস্থিতি—সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই চরিত্রগঠনের কাজ চলিয়া থাকে। অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং তীব্রতার ফলে যে কোন বয়সে মানুষের ব্যবহার-প্রতিকৃতি পরিবর্তিত হইয়া নূতন ব্যবহার-প্রতিকৃতির সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু শিশুকালই যে চরিত্র-গঠনের প্রশস্ত সময় ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তখনও জন্মগত প্রবণতা ব্যবহার-প্রতিকৃতিতে রূপ গ্রহণ করে নাই। পারিপার্শ্বিককে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তখনই শিশুদের মধ্যে বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করার প্রকৃষ্ট সময়; বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ছাত্রদের চরিত্র গঠিত করিতে গেলে আমাদের তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়—(ক) ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান ছাত্রদের মনে জন্মাইয়া দেওয়া। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ নীতিজ্ঞান বলিয়া থাকি। নীতিজ্ঞান জন্মিলে চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (খ) বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলীর অনুকূল অভ্যাস গঠিত করিয়া দেওয়া। সৎ-অসতের জ্ঞান এবং গঠিত অভ্যাসের ভিত্তিতে মানুষের ব্যবহার-প্রতিকৃতি (Behaviour pattern) গড়িয়া উঠে। (গ) অবাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি গঠিত হইলে তাহার স্থলে বাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তোলা।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকি—

(ক) ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সর্বদা উপদেশ দেওয়া। (খ) শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে ছাত্রদিগকে বাঞ্ছিত ব্যবহার করিতে

বাধ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করা। (গ) উপদেশ এবং শাস্তির দ্বারা অবাঞ্ছিত ব্যবহার দূর করা।

এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়া কাহারো নীতিবোধ জন্মানো যায় না। কোন কিছু শোনা অর্থই তাহা শিক্ষা করা নহে। যে কোন সত্য নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ না হইলে উহাতে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মায় না। সত্য কথা বলিয়া যে তৃপ্তি পাইয়াছে এবং মিথ্যা কথা বলিয়া তিক্তস্বাদ অনুভব করিয়াছে—তাহার মনে সত্যবাদিতা যে ভাল এবং মিথ্যা কথা বলা যে মন্দ সে জ্ঞান কোন উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই জন্মাইবে। যে সব স্থলে উপদেশদাতা সম্বন্ধে মনে প্রচুর শ্রদ্ধা থাকে সে সব স্থলে উপদেশ মনের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। উপদেশদাতার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইতে হইলে তাহাকে নিজ উপদেশ অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। উপদেশদাতার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে উপদেশ বিপরীত ফল প্রসব করে। অর্থাৎ শিক্ষক সত্যকথা বলার উপদেশ দিলে ছাত্রদের মনে মিথ্যাকথা বলার প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষাদানের চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ প্রচারিত নীতি অনুসারে বিদ্যালয়ের নিজের জীবনই গঠিত হয় না। ছাত্রদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা উপদিষ্ট নীতির প্রতি ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা না জন্মাইয়া অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছাত্র যদি দেখিতে পায় যে, নকল করিয়া অনেক ছাত্র ভাল নম্বর পাইতেছে এবং নকল না করার দরুণ তাহার নম্বর ঐ সব ছাত্রের নম্বর অপেক্ষা কম হইতেছে, তবে নীতি হিসাবে সত্যাচারের প্রতি তাহার আস্থা নষ্ট হইবে। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের নিজেদের ব্যবহার আদর্শানুরূপ থাকে না। যে শিক্ষক সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই হয়ত নিজে ক্লাসে যাইতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু বিলম্ব করিতেছেন। নানা কারণেই শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকে না। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের উপদেশ বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে।

শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে সু-অভ্যাস গঠন করা যায় না। কারণ যখনই শাস্তি বা পুরস্কারের প্রলোভন থাকে না তখন গঠিত অভ্যাসও নষ্ট

হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিপ্ত কর্মের ফলে যে অভ্যাস গঠিত হয় তাহা সহজে পরিবর্তিত হয় না। অধিকন্তু শাস্তি এবং পুরস্কার ছাত্রদের মধ্যে প্রতারণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করে। এক কথায় বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে চরিত্র শিক্ষা-দানের প্রতিকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।

বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানের আধুনিকতম পদ্ধতি—চরিত্র শিক্ষাদান সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে—"Character is not taught but caught"। এই কথাটি আমাদের চরিত্র শিক্ষাদানের সর্বপ্রধান নীতি অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের আবহাওয়া হইতে স্বাভাবিক নিয়মে ছাত্রেরা চারিত্রিক গুণাবলী আহরণ করিবে। শুধু ক্লাসে লেখাপড়া করাইয়া এবং উপদেশ দিয়া ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া তোলা সম্ভব নহে। ছাত্রদের মধ্যে কি কি গুণ বিকশিত দেখিতে চাই সে সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে আমাদিগকে মনস্থির করিতে হইবে। বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণের তালিকা প্রস্তুত করার কালে আমাদের দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী। (খ) সমাজজীবনে সাফল্য লাভের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী। সর্বজন সমর্থিত চারিত্রিক গুণাবলীর কোন তালিকা প্রদান করা সম্ভব না হইলেও নিম্নলিখিত চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে কোন বিদ্যালয়ই হয়ত আপত্তি করিবে না—

১। সত্যাচার, ২। মানসিক স্থৈর্য, ৩। দায়িত্ব বোধ, ৪। অধ্যবসায় এবং শ্রমসহিষ্ণুতা, ৫। সহযোগিতা, ৬। সমস্যা সমাধানে অগ্রগামিতা, ৭। আত্মবিশ্বাস, ৮। যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস, ৯। সৌন্দর্য-বোধ, ১০। নিয়মানুবর্তিতা।

সমগ্র বিদ্যালয়জীবনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, উহার প্রতিটি অভিজ্ঞতা যেন উপরি-উক্ত চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের অনুকূল হয়: অন্ততঃ কোন অভিজ্ঞতাই যেন উহাদের প্রতিকূল না হয়। বিদ্যালয়-জীবনকে প্রধানতঃ শ্রেণীকক্ষের ভিতরের জীবন এবং শ্রেণী কক্ষের বাহিরের জীবন—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চরিত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত উভয় জীবনকেই কর্মকেন্দ্রিক করিতে হইবে; সকল প্রকার কর্মে ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে।

ছাত্রদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্র হিসাবে যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, চরিত্র গঠনের নিমিত্ত শ্রেণীকক্ষের ভিতরের জীবন অপেক্ষা শ্রেণীকক্ষের বাহিরের জীবনের গুরুত্ব বেশী। শ্রেণীকক্ষের বাহিরের জীবনে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিয়া তাহাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে অনেকটা আপনা হইতেই ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইবে।

প্রার্থনা সভা—ভগবান কিংবা কোন মহান শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ (Security) জন্মায় এবং স্বাভাবিক নিয়মে প্রশান্তি আসে। সমবেতভাবে গান বা আবৃত্তির মাধ্যমে ঐরূপ আত্মসমর্পণ সহজতর হয়। গান বা আবৃত্তির বিষয়বস্তু ভগবানকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিবে এবং ভগবানের সঙ্গে একাত্ম-বোধের ফলে (আত্মসমর্পণের দ্বারা) ঐ গুণাবলীর প্রতিও একাত্মবোধ জন্মিবে। প্রার্থনা সভায় মহাপুরুষের জীবনী এবং বাণী পর্যালোচনা ইহাতেও (ছাত্রেরা নিজেরাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে) নীতিশিক্ষার সাহায্য হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কার্য প্রার্থনা-সভা দ্বারা আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

আত্ম-বিশ্লেষণ সভা—এই সভার উদ্দেশ্য হইবে নিজ নিজ দোষ-গুণের আলোচনা করিয়া আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক সভা থাকিবে। ঐ সভায় ছাত্রেরা নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আইন-কানুনও প্রণয়ন করিবে। নিজেদের ব্যবহার উন্নততর করার দায়িত্ব যথাসম্ভব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাসে দুইবার করিয়া ঐ সভার অধিবেশন বসিলেই চলিবে।

যুব-আন্দোলন—বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রেরই কোন না কোন যুব-আন্দোলনের সভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের যুব-আন্দোলনের প্রবর্তন করা উচিত (এন. সি. সি., মনিমেলা, শক্তিসংঘ ইত্যাদি), যাহাতে ছাত্রেরা নিজ নিজ রুচি এবং প্রকৃতি অনুসারে কোনও-না-কোন আন্দোলনের সভ্য হইতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে যে-কোন ধরণের আদর্শবাদ জন্মাইয়া তুলিতে পারিলে এবং ঐ আদর্শ অনুসরণ করিবার কিছুটা সুযোগ তাহাদিগকে দিতে পারিলে তাহাদের চরিত্র বিকশিত হইবে।

হবিক্লাব—হবিক্লাবের মাধ্যমে বাঞ্ছনীয় কর্মে ছাত্রদের আগ্রহ জন্মাইতে পারিলে অবাঞ্ছনীয় কর্মে তাহাদের রুচি জন্মাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে। আপন আগ্রহ অনুযায়ী কর্মে লিপ্ত হইবার ফলে ছাত্রদের মনে যে আনন্দ জন্মে উহা তাহাদের চারিত্রিক বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমাজে ছাত্রদের অবাঞ্ছনীয় কর্মে আগ্রহ জন্মাইবার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে সেই সমাজে বাঞ্ছনীয় কর্মের প্রতি তাহাদের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারিলে উহা তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছনীয় চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করিবে।

দলবদ্ধ খেলাধূলা—দলবদ্ধ খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের ফলেও নানারূপ চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের 'পাবলিক স্কুল'গুলি বিশেষ করিয়া খেলাধূলার সাহায্যেই ছাত্রদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে।

ছাত্রসংঘ—(School Union)—বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ই শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ছাত্রদের জীবন নিয়ন্ত্রণে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। ছাত্রসংঘ ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহার ভিতর দিয়া ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য আরও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করা চলিতে পারে; শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেই চলিবে না; ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপভাবে পরিচালিত হইবে যে, উহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের প্রতিকূলে কাজ না করিয়া অনুকূলে কাজ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক ছাত্রসংঘ এমনভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে যে, তাহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা বাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতির পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

শ্রেণীকক্ষের ভিতরে জ্ঞানদান আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ইহার ভিতরে চরিত্র শিক্ষাদানের চেষ্টা করাও চলে। পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে (মুখস্থ করা জ্ঞান নহে) উহার ছাপ অবশ্যই চরিত্রের উপর

পড়িবে। তাই সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠ মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে এইরূপ বিশ্বাস করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' কবিতা পাঠ করিয়া ছাত্র যদি দুর্গাধিপতি দুমরাজের কর্তব্যনিষ্ঠার মাহাত্ম্য অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে তবে কর্তব্যনিষ্ঠা তাহার নিজের চারিত্রিক গুণ হিসাবে বিকশিত হওয়া সহজতর হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, নিজের অন্তরের প্রেরণায় যখন ছাত্র পাঠে রত হয় এবং পাঠ হইতে আনন্দ লাভ করে তখনই পাঠের বিষয়বস্তু তাহার চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করিয়া থাকে। বিপরীত অবস্থায় তাহার মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তারপর আধুনিকতম শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট সমস্যায় বিভক্ত করা হয় এবং ছাত্রদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের উপর একটি সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করা হয়। এইরূপ পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করিলে স্বতঃই ছাত্রদের মধ্যে নানাবিধ চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনে শিক্ষক সর্বাবস্থায় বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনিই ছাত্রদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ। স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রেরা তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুসরণ করিয়া থাকে, তাই শিক্ষক যদি আদর্শ চরিত্রের হন তাহা হইলে তাহার চারিত্রিক গুণাবলী সহজেই ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে; উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া পড়িলে ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না; তাহার উপদেশ বরং ছাত্রদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ছাত্রদের পরস্পরের মেলামেশার ভিতর দিয়া যে চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত হয় না, এমনও নহে। অনেক সময় ছাত্রেরা পরস্পরের নিকট হইতে যতখানি শিক্ষা করে—শিক্ষকদের নিকট হইতে ততখানি করে না। তাই বিদ্যালয়কে ছাত্রসমাজের ব্যবহারের মানকেও উঁচু সুরে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুনিয়ন্ত্রিত হইলেই ইহা সম্ভব। তারপর যে সব ছাত্রের মধ্যে কিছুটা অবাঞ্ছিত ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে কৌশলে "ভাল" ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া দিতে চেষ্টা

করিতে হয় ; মন্দ ছাত্রেরা "মন্দ" ছাত্রের সঙ্গে মেলামেশা করিলে পরস্পরের প্রভাবে মন্দ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্ষেপে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই ছাত্রের চরিত্র গঠিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র শব্দের অর্থ—বর্তমান যুগকে আমরা বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রের যুগ বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষও নিজেকে গণতান্ত্রিক দেশরূপে গড়িয়া তুলিতে চায়—দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে ইহাই ভারতের কামনা।

যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি ইহার নীতি, প্রকৃতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে অনেকের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। গণতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ফলে আমরা অনেকে গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়া থাকি।

গণতন্ত্রের রাজনৈতিক সংজ্ঞা

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Democrcy is the rulo of the people, by the people and for the people" (ইহাকেও রাজনৈতিক সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে।) যাহা হউক, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত গত দুইশত বৎসরের সাধনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান (Institution) গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন, বয়স্কদের ভোটাধিকার (Adult Suffrage), প্রতিনিধিমূলক আইনসভা (Representative Parliament), দায়িত্বসম্পন্ন সরকার (Responsible Government) এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা (Independent Judiciary)। জনসাধারণের দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে হইলে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অপরিহার্য—পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশই উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গণতন্ত্র বুঝি সমার্থ-বাচক।

বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া

বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তারপর কোন দেশে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিলেই সেই দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাও বলা যাইতে পারে না। দেশের জনসাধারণ যদি প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একথা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হইলে এবং তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত না হইলে আইনের দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান করিলেও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসিতে পারে না।

গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপ

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র একটি সমাজ দর্শন (Social philosophy)—একটি আদর্শবাদ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণে কতকগুলি বিশিষ্ট নীতিতে বিশ্বাস করার নামকেই গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গণতন্ত্রের আসন প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে। কাজেই গণতন্ত্র কাহাকে বলে জানিতে হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সমাজ দর্শনরূপে গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল দেশ এখনও সম্পূর্ণ একমত নহে। আমাদের শাসনতন্ত্রে যে সব আদর্শকে গণতান্ত্রিক আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে নীচে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা হইল।

১। আমাদের শাসনতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে (Individual liberty) সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে, প্রত্যেকরই নিজ রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে জীবন যাপনের স্বাধীনতা থাকিবে। কোন ব্যক্তিকেই সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র মাত্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না। আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বাধীনতা রক্ষার যেমন চেষ্টা করিব অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইতেও তেমনি বিরত থাকিব।

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় গুণাগুণ

২। প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব পথ এবং মত অনুসারে চলিবার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদিগকে পরমতসহিষ্ণুতাকে (Tolerance) নীতি হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং পরভাষা এবং সংস্কৃতি-সহিষ্ণুতার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রেও আমাদিগকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পারস্পরিক আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি ব্যতীত সমাজ-জীবন সার্থক হইতে পারে না। আর সমাজ-জীবন সার্থক না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশও সম্ভব নহে। তাই পরস্পর সহযোগিতাকে গণতন্ত্র অন্যতম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪। পারস্পরিক সম্বন্ধ ন্যায় (Justice) এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাও গণতান্ত্রিক জীবনের আর একটি আদর্শ। বাস্তববাদের প্রভাবের ফলে অনেকক্ষেত্রে বর্তমানে গণতন্ত্রই জীবন দর্শনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গণতান্ত্রিক জীবনযাপনই অনেকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিক্ষা ও গণতন্ত্র—শিক্ষা ও গণতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে-কোন দেশের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে শিক্ষারও বিস্তার ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা না করিয়া পারেন না। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে জনসাধারণই দেশের কর্তা; কর্তাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে (Educate thy master) গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সাফল্যের সহিত দেশ শাসন করা সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কালে ১০ বৎসরের মধ্যে দেশের সকলকে লেখাপড়া শেখানো হইবে বলিয়া আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলাম। সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশশাসনে সাফল্য অর্জন করা যে সম্ভব হইবে না তাহা প্রথম হইতেই আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

তারপর পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, গণতন্ত্র একটি সমাজদর্শন। শিক্ষার সাহায্যে এই সমাজদর্শনের প্রতি দেশের জন-

সাধারণের বিশ্বাস জাগাইয়া তোলা আবশ্যক। গণতন্ত্রের যে পাঁচটি মূলনীতির কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে ঐ নীতিগুলির সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইতে না পারিলে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (প্রাপ্তবয়স্করদের ভোটাধিকার ইত্যাদি) গড়িয়া তুলিলেই গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করিবে না। গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে, গণতন্ত্রের আদর্শানুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলী নাগরিকদের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য বিধিবদ্ধভাবে করিতে হইলে বিদ্যালয়ের শরণ লওয়া অপরিহার্য।

অধিকন্তু গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা খুব জটিল হইয়া থাকে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলেও বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্ত জ্ঞান, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা সবকিছু অর্জন করাই প্রয়োজন। তাই শিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব কল্পনা করাও চলে না।

অপরদিকে গণতান্ত্রিক আদর্শ এত ব্যাপক যে, ইহাকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ; ইহা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও অন্যতম উদ্দেশ্য। আবার গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিলে স্বভাবতই তাহাদের শিক্ষা সমাজ-জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তাই গণতন্ত্রকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে দুইটি প্রধান মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা চলে।

শিক্ষার সাহায্যে গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টি—আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টি করার প্রয়োজন বর্তমানে খুবই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। আমরা নিজেদের রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়াছি, এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনের যে সব স্বীকৃত নীতি আছে তাহা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ব্যবহার গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের ব্যবহারের উপযুক্ত এখনও হয় নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন (যথা, পার্লামেন্ট ইত্যাদি) তাহার অনেকগুলিই গড়িয়া তুলিয়াছি, কিন্তু গণতান্ত্রিক

গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

নাগরিকোচিত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি না হওয়ার দরুণ, ঐসব প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে না এবং দিন দিনই আমাদের রাষ্ট্রের অবনতি ঘটিতেছে। তাই বিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টির কাজে অগ্রণী হইতে হইবে। মুদালিয়ার কমিশনও, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গ'ড়িয়া তোলা, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

গণতান্ত্রিক চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

এই দায়িত্ব প্রতিপালন ক'রতে হইলে, বিদ্যালয়কে প্রথমেই ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নাগরিকোচিত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করিতে হইবে; অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আন্তরিক বিশ্বাস, ব্যবহারে পরমতসহিষ্ণুতার প্রকাশ, সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করায় আগ্রহ, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই দুরূহ কর্তব্য বিদ্যালয়কে সম্পাদন করিতে হইলে, প্রথমেই বিদ্যালয়ের নিজস্ব জীবনে উপরি-উক্ত ব্যবহার ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। সকল শিক্ষকেরই গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাদের ব্যবহারে সর্বদা ঐ আদর্শগুলি প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের প্রতিটি নিয়ম উপরি-উক্ত আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা প্রয়োজন. এইভাবে বিদ্যালয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিলে, ছাত্রদের মধ্যে নিজেরই অজ্ঞান্তে গণতান্ত্রিক নাগরিকোচিত চরিত্র গড়িয়া উঠিবে।

গণতান্ত্রিক সমাজদর্শন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজদর্শন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানও ছাত্রদের দেওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং পরিচালন-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ছাত্রদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। "সমাজ-বিদ্যা (Social Studies), বিষয় হিসাবে পাঠের কালে ঐ জ্ঞান ছাত্রদের দেওয়া চলিতে পারে। তবে জ্ঞানকে সক্রিয় করিবার নিমিত্ত সমাজবিদ্যা পাঠ, যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত—শিক্ষকের বক্তৃতা বা পুস্তক মুখস্থকরণ, জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে যত কম ব্যবহৃত হয়, ততই ভাল। ছাত্রেরা বিভিন্ন ধরণের বিতর্ক, আলোচনা সভা এবং

রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে।

স্বায়ত্তশাসনের (Self-Government) শিক্ষা—গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকের সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় স্বায়ত্ত-শাসনের শিক্ষা লাভ করা। কি রাজনৈতিক, কি কৃষ্টিগত, কি অর্থনৈতিক—গণতান্ত্রিক সমাজের সকল ধারার জীবনযাত্রা, সর্বস্তরে, স্বায়ত্তশাসনের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংশ্লিষ্ট নাগরিকেরা একত্রিত হইয়া, নেতা নির্বাচিত করিয়া তাহাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কৃষ্টিগত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত করে। স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতি সার্থক হইতে হইলে, নির্বাচকদের মধ্যে তাহাদের কার্য সম্বন্ধে পূর্ণ দায়িত্ববোধ, আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর আদর্শবাদ এবং অপরাপর নাগরিকদের আপন আদর্শবাদের স্বমতে আনার চেষ্টার জন্য আলাপ, আলোচনা প্রভৃতি গণতন্ত্র-সম্মত পদ্ধতি গ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত আবশ্যক। অপরদিকে নির্বাচিত নেতাদের মধ্যেও ঐসব গুণ থাকা আবশ্যক। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনে যে সব বিশেষ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহা সমাধানের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা তাহাদের থাকা প্রয়োজন।

স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা বলিতে কি বুঝি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেই এই শিক্ষার দায়িত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে যে সব ছাত্র সমাজে প্রবেশ করিবে, তাহারাই হয়ত বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব করিবে। ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, সমগ্র বিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়াগত, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের জন্য বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয়। সমাজ-জীবনে যত ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ থাকে, সম্ভব হইলে তাহাদের সব কয়টিকেই বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক জীবনে বর্তমানে সমবায় সমিতি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাই বিদ্যালয়েও সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া, তাহাদের পরিচালন সম্বন্ধে যথাযথ

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের স্বায়ত্তশাসন সমিতি

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেওয়া প্রয়োজন—ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সব চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তাহা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করাও আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত জীবনের জন্য নিম্নলিখিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—১। শিক্ষা পরামর্শদান সমিতি। ইহা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি এবং নবম শ্রেণী হইতে আর একটি—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ইহাতে প্রতিনিধি থাকিবে। প্রত্যেক শাখাতে একজন শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে দুইজন করিয়া উপমন্ত্রী থাকিতে পারেন। ইহারা, বিদ্যালয়ের টাইম টেবিল, পাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের লিখিত কাজ, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত সহযোগিতা করিবে। শ্রেণীকক্ষের জন্য, অন্ততঃ প্রতিমাসে একজন করিয়া মনিটর নিয়োগ করা, শিক্ষক ছাড়াই, কখনও কখনও শ্রেণীকক্ষের কাজ পরিচালনা করা ছাত্রদের লিখিত কাজ পরস্পরের দ্বারা সংশোধন করা প্রভৃতি নানারকম শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। যে সব ছাত্র পড়ায় অনগ্রসর ইহাদের সাহায্য করার দায়িত্বও এই সমিতি গ্রহণ করিবেন। কোন শ্রেণীতে কোন শিক্ষক কোনদিন অনুপস্থিত হইলে, তাঁহার অনুপস্থিত কালে ছাত্রদের লেখার জন্য এস্যাইনমেণ্ট যোগানোর দায়িত্বও এই সমিতির উপর থাকিবে। ২। লাইব্রেরী সমিতি। পূর্বলিখিত সমিতির অনুকরণে, এই সমিতিও স্থাপিত হইবে। লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের সহিত এই সমিতি সহযোগিতা করিবে। কি কি বই পড়িতে হইবে, তাহা ছাত্রদের (শ্রেণী অনুসারে) জানানোর দায়িত্ব এই সমিতি গ্রহণ করিবে। লাইব্রেরী পিরিয়ডে শ্রেণীর সকল ছাত্র যাহাতে বই পায় এবং সকলেই যাহাতে পড়াশুনা করে সে দিকেও ইহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। লাইব্রেরীর জন্য বই কেনার ব্যাপারে এই সমিতি পরামর্শ দিবেন। ৩। নিয়ম ও শৃঙ্খলা সমিতি। এই সমিতির গঠনও পূর্ব পূর্ব সমিতির অনুরূপ হইবে। বিদ্যালয়ের যত আইন (যথা, অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে) এবং তাহাদের যথাযথ প্রতিপালন এই সমিতির দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই সমিতির বিচার সভারূপে কাজ করিয়া দণ্ডদানের ক্ষমতাও থাকিতে পারে।

শিক্ষাগত জীবনের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালনের নিমিত্ত, প্রাচীরপত্র

সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান

পরিচালক সমিতি, সাহিত্যসভা সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমিতি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালনার নিমিত্তও অনুরূপ ধরনের কয়েকটি সমিতি থাকা প্রয়োজন।

সমবায় সমিতি, কেন্‌টিন (Canteen) সমিতি, প্রভৃতি বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনের দায়িত্বগ্রহণ করিতে পারে।

স্বায়ত্তশাসন সমিতিগুলি পরিচালনের নীতি

প্রত্যেকটি সমিতির সহিতই, একজন করিয়া শিক্ষক সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে তিনি ছাত্রদের সাহায্য করিবেন এবং পরিচালিত করিবেন। প্রত্যেক সমিতির সহিত প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা প্রয়োজন—এমনকি প্রতি সপ্তাহেই সমিতিগুলির কার্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন। এই সমিতিগুলির অধিবেশনের জন্যও সপ্তাহে অন্ততঃ একটি পিরিয়ড থাকা প্রয়োজন।

সমিতিগুলির সভ্যগণ ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন—কিন্তু নির্বাচনে প্রতিযোগিতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমিতির অধিকাংশ সভ্যই শ্রেণী ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন। কাজেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে আসা কঠিন নহে। ভোটদ্বারা নির্বাচনের সম্ভাবনা পরিহার করার জন্য বারবার আলোচনায় সময় কিছু বেশী গেলেও তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রেণীর, প্রায় ⅔ অংশ ছাত্রই যদি, কোন-না-কোন সমিতির সভ্য হওয়ার সুযোগ পায়, এবং সমিতির সভ্য যদি বৎসরে একবার পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে, খুব তীব্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকে না। মনে রাখিতে হইবে যে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য শিক্ষাদানই যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য সেখানে যত বেশী সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন সমিতির কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়, ততই ভাল। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সুযোগ পাইলে, প্রায় সকল ছাত্রই কোন-না-কোন বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কাজেই প্রত্যেক সমিতির সভ্যদেরই বৎসরে একবার বা দুইবার পরিবর্তন আবশ্যক।

মনে রাখিতে হইবে যে, স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা প্রধানতঃ চরিত্রগঠনের শিক্ষা। ছাত্রেরা যদি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অন্তরে অন্তরে গ্রহণ না করে, গণতান্ত্রিক সমাজে বাসোপযোগী চারিত্রিক গুণাবলী যদি তাহাদের মধ্যে গঠিত না হয় তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও তাহারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা পায় নাই বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। গণতন্ত্রের উপযুক্ত চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের সমাজে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কালে এত গলদ দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক চরিত্র গঠিত করিয়া দিতে না পারার দরুণ আমাদের বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা অনেক সময় বিফল হয়। কাজেই প্রতিটি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কালে গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতে হইবে; ঐ সমিতির কার্যের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা যাহাতে গণতান্ত্রিক চরিত্র গঠনের পরিপূরক না হইয়া পরিপন্থী না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সম্বন্ধ—ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষকী, গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী গঠিত হওয়া আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠনের জন্য যে সব প্রাতষ্ঠানের কথা নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে (প্রার্থনা সভা, হবিক্লাব, খেলাধুলা, যুব-সংঘ ইত্যাদি) তাহাদের মধ্য দিয়াও গণতান্ত্রিক গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। যদি গণতন্ত্রই আমাদের জীবনদর্শন হয় তবে গণতান্ত্রিক চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ করিতে পারিলেই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। বিদ্যালয় যদি আধুনিকতম নীতি হিসাবে পরিচালিত হয় তাহা হইলে পৃথকভাবে উহাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে না; গণতান্ত্রিক-শিক্ষা এবং "প্রকৃত শিক্ষার" মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; একের ব্যবস্থা করিতে গেলে অপরের ব্যবস্থা আপন হইতেই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষা

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ—ছোট মানবশিশু কত অসহায়! কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হইয়া উঠে। সে লম্বা হয় এবং তাহার ওজনও বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌পিণ্ড, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরে যে সব যন্ত্র আছে তাহাদের সব কয়টিই ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং তাহাদের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বুদ্ধি এবং অপরাপর মানসিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেক কাজ (যেমন হাঁটা), অনেক রকম মনের ভাব প্রকাশ করা (যেমন রাগ) সে আপনা হইতেই শিক্ষা করে। এই যে 'বড় হওয়া' উহা অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ।—প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু বড় হইয়া থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্যে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, মুক্ত করার কয়েক দিনের মধ্যেই সে হাঁটিতে শিখিয়াছে; এই কাজের জন্য অপরাপর শিশুদের মত তাহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, কোনরূপ অভ্যাস করার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশুর মাংসপেশীগুলি এত দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাদের উপর তাহার কর্তৃত্ব এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, হাঁটিবার ক্ষমতা তাহার মধ্যে আপনা হইতেই জন্মাইয়াছে।

জন্ম হইতে 'বড় হওয়া' পর্যন্ত মানুষের শরীর এবং মনের এই যে স্বাভাবিক বিকাশ হইতে থাকে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন—

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাধারণ নিয়ম

১। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর এবং মন উভয়ের বিকাশ হইতে থাকিলেও উহাদের বিকাশ যে পরস্পরের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবে এমন কোন কথা নাই ; অনেক সময় শরীরের বিকাশ না হইলেও মনের বিকাশ এবং মনের বিকাশ না হইলেও শরীরের বিকাশ হইতে পারে। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ পৃথক পৃথক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিকাশ হইতে থাকিলেও ঐ বিকাশ যে সকল ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে তাল রাখিয়া চলে এমন নহে। অনেক সময় হয়ত দেখা যাইবে যে, ছয় মাস বা এক বৎসরের মধ্যে শিশুর তেমন কোন শারীরিক বা মানসিক উন্নতি হইল না ; কিন্তু তার পরের দুই-তিন মাসের মধ্যে তাহার এত দ্রুত উন্নতি হইল যে, পূর্বের ত্রুটি পূর্ণ করিয়া সে আরও অগ্রসর হইয়া গেল। মোটকথা শিশুর বিকাশ ব্যাঙের মত অনেকটা লাফাইয়া লাফাইয়া অগ্রসর হয়। ঠিক কোন্ বয়সে কোন্ শিশু যে 'লাফ' দিবে—ঠিক কখন যে কাহার শারীরিক বা মানসিক বিকাশ দ্রুততর হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না।

৩। দুই-তিন বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে অধিকাংশ শিশুর মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ আশা করা যাইতে পারে। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া জন্ম হইতে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর বিকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্তরে কি পরিমাণ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ আশা করা যায় তাহার একটা মানও মনোবিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ তাহার বয়সের জন্য নির্দিষ্ট মানের সঙ্গে মিলিয়া না গেলেও খুব বেশী আশঙ্কার কারণ নাই।

৪। ছেলে এবং মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সাধারণতঃ এক রীতিতে হয় না—তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বিকাশ ছেলেদের বিকাশ হইতে অনেক দ্রুততর হয় ; কিন্তু সতেরো-আঠারো বৎসর

বয়সে গিয়া সাধারণতঃ মেয়েদের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ছেলেদের বিকাশ কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বৎসর হইতে দ্রুততর হইতে থাকে এবং প্রায় একুশ-বাইশ বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে, ফলে, শেষ পর্যন্ত ছেলেদের বিকাশ হয়ত, মেয়েদের চাইতে বেশীই হইয়া পড়ে।

৫। শিশুর বিকাশ যদিও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহাতে পারিপার্শ্বিকের যে কোন অবদান নাই ইহাও সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ যে ব্যাহত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; আবার গবেষণার দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ মানসিক-শক্তি-বিকাশকারী অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে। তাই শিশুর মানসিক বিকাশে পরিপার্শ্বিকের অবদান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা চলে না।

শিক্ষা এবং শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ—প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন দুই কারণে হইতে পারে—১। অন্তর্নিহিত শারীরিক এবং মানসিক শক্তির বিকাশের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন ২। অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের পরিবর্তন। শেষোক্ত উপায়ে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই আমরা শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ ব্যবহারই শিক্ষালব্ধ ; কিন্তু শিক্ষাদান শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যে-কোন বয়সের শিশুকে যে-কোন ধরনের অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে তাহা ফলপ্রসূ হয় না। শিশু তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বলেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়—অভিজ্ঞতা গ্রহণের যোগ্যতা আসে শরীর ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহিত শিক্ষাকে তাল রাখিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ফলে বিভিন্ন বয়সের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান কালে ঐ সব চাহিদার কথা শিক্ষককে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। ঐ সব চাহিদার অনুকূলে শিক্ষাদান হইলে শিশুর মধ্যে নানারকমের অবস্থিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইতে পারে।

স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর—জন্ম হইতে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে ভাগ করা যাইতে পারে—

১। শৈশব (Infancy)—এক বৎসর বয়স হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত।

২। বাল্যকাল (Childhood)—চার বৎসর হইতে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত।

৩। বয়ঃসন্ধি (Adolescence)—এগারো বৎসর বয়স হইতে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত।

উপরি-উক্ত প্রত্যেক স্তরকে আরও স্বল্পস্থায়ী স্তরে ভাগ করা চলে। শৈশবকে অতি শৈশব (১—২ বৎসর) এবং শৈশব (২—৪ বৎসর), বাল্যকাল (৪—৭ বৎসর) এবং পরবর্তী বাল্যকাল (৭—১১ বৎসর), এবং বয়ঃসন্ধিকে কৈশোর (১১—১৪ বৎসর) এবং নবযৌবন (১৪—১৮ বৎসর) এইরূপ স্বল্পস্থায়ী স্তরেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে, শিশুর ক্রমবিকাশকে যে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছিল উহারা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের (নার্সারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) সহিত সম্বন্ধযুক্ত। শৈশব সাধারণতঃ 'নার্সারি' শিক্ষার, বাল্যকাল, প্রাথমিক শিক্ষার এবং বয়ঃসন্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাহাকে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন করে এবং ওই বয়সের শিক্ষাকে কিভাবে শিশুজীবনের সমস্যা-কেন্দ্রিক করা চলিতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধি কালের প্রকৃতি—সাধারণতঃ শিশুকাল (১১ বৎসর বয়সের পর) হইতে বয়স্ক পদলাভের অন্তর্বর্তী কালকে বয়ঃসন্ধি আখ্যা দেওয়া হয়। প্রাণী বিজ্ঞানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরের আরম্ভ এবং ঐ ক্ষমতার পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের মধ্যে শুক্র কণিকা দেখা দিলেই সন্তান জন্মদানের ক্ষমতার সুরু হয়। তবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা কখন পূর্ণতা লাভ করে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না—তাই, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে যতদিন পর্যন্ত শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চলিতে থাকে, ততদিন পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকাল বলা যাইতে পারে। এগারো হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে কোন্ শিশু কখন যে বয়ঃসন্ধি স্তরে প্রবেশ করে এবং ঐ স্তরের ক্রমবিকাশ পূর্ণ করে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। অন্তর্নিহিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা সমান হইলেও দুই শিশুর মধ্যে এই স্তরের ক্রমবিকাশে দুই-তিন বৎসরের পার্থক্য থাকাও কিছু আশ্চর্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন মেয়ে হয়ত বারো বৎসর বয়সেই ঋতুমতী হইতে পারে আবার কাহারও ক্ষেত্রে উহা হয়ত চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিশুরই ক্রমবিকাশের একটি স্বকীয় ধরন আছে। বয়ঃসন্ধিকালে ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ফলে একটা নির্দিষ্ট বয়সের সকল শিশুর একই রূপ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হইয়াছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইলে ভুল করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত হইতে থাকে; অন্ততঃ ঐ স্তরের পরিবর্তন বেশী করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। আর এই স্তরের পরিবর্তন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়—হঠাৎ একদিন আমাদের চোখে ধরা পড়ে—এ যেন আর আগের সে শিশু নাই। বয়ঃসন্ধিকালের আবির্ভাব হঠাৎ চোখে ধরা পড়ার দরুণ, উহা শিশু এবং তাহার আশেপাশের সকলকে বিস্মিত এবং বিমূঢ় করে। বয়ঃসন্ধি-স্তরে প্রবেশ করিলে শিশু যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া পড়ে। শৈশব এবং কৈশোরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তুলনা করিলে মনে হয় যে, ইহা যেন সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পরিবর্তন। শিশুর জীবনে যেন এক বিপ্লব-সৃষ্টিকারী জোয়ার আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়—ঐ জোয়ারের বন্যা কোথায় যে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহার সঙ্কেত শিশু নিজেও পায় না। বন্যার স্রোতে ভাসমান লোকের মত শিশুর (তীরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। জোয়ার শেষে সে যেন নূতন দেশে পৌঁছায় —তাহার নবজন্ম লাভ হয়। বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী স্ট্যান্‌লী হল্ (Stanley Hall) বয়ঃসন্ধিকালকে 'নবজন্ম' (a new birth) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি শিশুকে সমাজ-

জীবনের মুখোমুখী লইয়া আসে বলিয়া উহারা নানাভাবে শিশুর মনে নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই স্ট্যান্‌লী হল বয়ঃসন্ধিকে শিশুর পক্ষে ঝঞ্ঝা এবং ক্লেশের কাল (period of storm and stress) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৈশোরের সমস্যাগুলি শিশুর নিকট এত জটিল যে, তাহার সমগ্র জীবনের শুভাশুভ ইহাদের সমাধানের উপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধিকালে শিশু যেন এক আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া থাকে—পতন হইলে আগ্নেয়গিরির অন্ধকার গহ্বরে চিরদিনের জন্য সে বিলীন হইয়া যাইবে।

বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের উপরি-উক্ত ধারণা কিন্তু আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে খুব দ্রুত এবং যুগান্তকারী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিবর্তন শিশুর ক্রমবিকাশের অন্যান্য স্তরের পরিবর্তন অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নহে। বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎ শিশুর জীবনে "জোয়ার" আসে একথাও সত্য নহে। শিশু দিনে দিনে, পলে পলে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ ক্রমবিকাশ যখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যায়—তখন উহা শিশুর আশেপাশের সকলের চোখে ধরা পড়ে। শিশুর নিজের কাছে ঐ পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; সে ঐ পরিবর্তন লইয়া বিব্রত বোধ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাহার মনে অন্যরূপ ধারণা জন্মাইয়া না দেই। বিখ্যাত বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী বার্ট সাহেব (C. Burt) লিখিয়াছেন—"The mental changes are so gradual that it is imposible to say whether 11, 12, 13 or even later is the age at which the characteristics of adolescence first "emerge". There is no sudden "Crisis" no Rubican to be crossed"—The crisis, if there is one, lies rather in the mind of the administrator than in the life of the child". (শিশুর মানসিক পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে সাধিত হয় যে, ১১, ১২, ১৩ বৎসর বা ইহার পরে ঠিক কোন্ বয়সে বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতিগুলি তাহার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। হঠাৎ সে কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় না—তাহার জীবনের কোন আমূল বা বিপ্লবকারী পরিবর্তন ঘটে না। যাহাকে ঐ বয়সের গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে তাহা

শিক্ষকের মনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করে শিশুর মনে কিন্তু ততখানি করে না।) বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর পক্ষে ভীষণ মানসিক অশান্তির সময়; এই বয়সে সামান্য মাত্র পথভ্রষ্ট হইলেই তাহার সমগ্র জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই সমস্ত ধারণাও অনেকখানি ভ্রান্তিপ্রসূত। অপেক্ষাকৃত আদিম সমাজে বয়ঃসন্ধিকাল শিশু বা সমাজ কাহারও নিকট বিশেষ সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ স্বীকার করিয়া লয় এবং ঐ পরিবর্তনগুলির নিমিত্ত শিশুর মনে যে সব চাহিদার সৃষ্টি হয় তাহাদের নিবৃত্তির পথ সমাজ সুগম করিয়া দেয়। বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ মার্গারেট মিড (Margart Mead)-এর মতে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি বিশেষ করিয়া আধুনিক সমাজের সৃষ্টি।

১। বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করিলে প্রাচীন সমাজগুলি শিশুকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ বয়স্কের অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু বর্তমান সমাজে অর্থনৈতিক কারণে পূর্ণবয়স্কদের অনুরূপ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও নবযুবককে পূর্ণবয়স্কের অধিকার লাভ করার নিমিত্ত অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হয়। "নবযুবকের" (বয়ঃসন্ধিকাল) জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা (needs) সমাজ নানাভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহার মনে সমস্যার সৃষ্টি করে।

২। ঐ স্তরের যৌনক্ষমতার বিকাশ লইয়া অনেক সমাজেই "ঢাক ঢাক নীতি" (hush hush) প্রচলিত আছে। ইহার ফলেও শিশুর মনে বয়ঃসন্ধিকালে নানারূপ সমস্যা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

৩। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুকে তাহার মানসিক চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীনতা না দিলে অভিভাবকদের সম্বন্ধে তাহার মনে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া অশান্তি জন্মায়।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্বন্ধে আমাদের উপরি-উক্ত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে—

১। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় তাহা তাহার পূর্ব পূর্ব স্তরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হইতে ভিন্ন প্রকৃতির নহে।

২। ঐসব পরিবর্তন জোয়ারের মত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না এবং তাহাদিগকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া চলে না। ঐসব পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিলে বয়ঃসন্ধিকালকে শিশুজীবনের বিশেষ সঙ্কটের কাল বলিয়া গণ্য করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের সমাজব্যবস্থার ত্রুটির জন্য বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর কাছে নানা সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন—১। বয়ঃসন্ধিকালে সর্বশরীরই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া বয়স্কদের অনুরূপ হইয়া পড়ে—ঐ সময় গ্ল্যাণ্ড, মাংসপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক প্রত্যেক অঙ্গই বিকাশ লাভ করে। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা (puberty) জন্মানোর অনতিপূর্বে এই বৃদ্ধির গতি খুব দ্রুত হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা জন্মানোর প্রধান লক্ষণ হইতেছে ঋতুমতী হওয়া ; আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা জন্মানোর নিশ্চিত লক্ষণ হইতেছে প্রস্রাবে শুক্রকীটের উপস্থিতি। Pubertyর পূর্বে শিশুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তাহার হাত এবং পায়ের হাড়গুলি এত দ্রুত লম্বা হয় যে, অনেকের ক্ষেত্রে এক বৎসরের ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। শরীরের ওজন কিন্তু দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। তাই এই বয়সে অনেক শিশুকে লম্বা টিঙ্‌টিঙে মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, শিশুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব সময় একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। ধরা যাউক, শিশুর হাত বা পায়ের হাড় হয়ত অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ; ফলে তাহার দেহের গঠন বেমানান হইয়া পড়িল। কিন্তু এই বেমানান ভাবটা ধীরে ধীরে দূর হইয়া যায়—ধীরে ধীরে লম্বার অনুপাতে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায় ; তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মধ্যেও সামঞ্জস্য আসে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি বেমানান থাকে ততদিন পর্যন্ত তাহার মনে ভীষণ অশান্তি হয়। কাহারও সঙ্গে সে সহজে মিশিতে পারে না।

সকল শিশুর দৈহিক বিকাশ একই হারে হয় এমন নহে। প্রথম দিকে মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশী লম্বা হয় ; কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েকে ছাড়াইয়া যায়। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এমন অনেক আছে যাহারা অল্পবয়সে লম্বা হইয়া যায়। আবার অনেকে এমন আছে যাহারা অপেক্ষাকৃত পরে লম্বা হয়। যাহারা অল্প বয়সে হঠাৎ লম্বা হইয়া পড়ে—তাহারা অনেক সময়

নিজেদের এত দিনের খেলার সাথী হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া নিজেদের নিঃসঙ্গ বোধ করে।

২। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর মুখমণ্ডল বিকশিত হয়। কিন্তু হাত এবং পায়ের বৃদ্ধির মত মুখমণ্ডলের সকল অংশও সমান হারে বৃদ্ধি পায় না। বয়ঃসন্ধিকালে ইহাও অনেক শিশুর মনোকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত মেয়েদের মুখ কোমল এবং লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া উঠে এবং ছেলেদের মুখ পুরুষোচিত রূপ ধারণ করে (কাঠিন্যের ছাপ পড়ে এবং চোয়ালের হাঁড় উঁচু হইয়া বাহির হইয়া পড়ে)।

৩। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরে মাংসপেশীগুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হয়। মানসিক স্থৈর্য নষ্ট না হইলে তাহার কর্মক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

৪। এই বয়সে ছেলেদের স্বরনালী লম্বায় অনেকখানি বাড়িয়া যায়; তাহাদের লেরিঙ্ক্স (Larynx) বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে ছেলেদের এবং মেয়েদের গলার স্বর সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া যায়। ছেলেদের গলার স্বর পূর্বের মত মিহি থাকে না; উহা অনেকটা ভাঙাভাঙা হইয়া পড়ে।

৫। যৌন অঙ্গ (Sex organ) ব্যতীত অপর যে সব শারীরিক লক্ষণের দ্বারা (Secondary sex characteristics) ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, বয়ঃসন্ধিকালে তাহাদের বিকাশ হয়—ছেলেদের গলার স্বর ভাঙাভাঙা হওয়া ব্যতীতও তাহাদের গোঁফদাড়ি দেখা দেয় এবং মেয়েদের স্তনযুগল স্ফীত হয়।

৬। নবযুবক এবং যুবতীর এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড Endocrine gland)-সমূহ হইতে সেক্স হরমোন (Sex hormons) নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার যৌন অঙ্গের বিকাশ সাধন করে এবং তাহার যৌনচেতনা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে শিশুর মানসিক চাঞ্চল্য জন্মায়।

৭। এই সব পরিবর্তন ব্যতীত ও বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পরিপাক ক্রিয়া দ্রুততর হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সাময়িক-ভাবে কোন কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা (বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে।

বয়:সন্ধিকালে শিশুর শারীরিক বিকাশ সম্বন্ধে দুইটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—

১। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ একসঙ্গে চলিতে নাও পারে। কোন শিশু হয়ত শারীরিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মানসিক বিকাশ হয়ত তখনও "বাল্যকালের" স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। আবার ইহার বিপরীতও হইতে পারে অর্থাৎ কোন শিশুর মানসিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও শারীরিক বিকাশ বিলম্বিত হইতে পারে।

২। শিশুর উপর সমাজের প্রতিক্রিয়ার দরুণ বয়:সন্ধিকালে শিশুর প্রায় প্রতিটি শারীরিক পরিবর্তনই তাহার মনে কোন-না-কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশ—বয়:সন্ধিকালে মানসিক বিকাশ যে খুব দ্রুত হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে বয়:-সন্ধি কালের পরিসমাপ্তির পর শিশুর বুদ্ধির আর বিকাশ হয় না। ঠিক কত বৎসর বয়সে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ চরমস্তরে পৌঁছায় তাহা এখনও আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। এক সময় ধারণা ছিল যে, ১৪ বৎসর বয়সেই আমাদের বুদ্ধির বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমানে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে যে, কাহারও কাহারও একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে পারে। ঠিক কোন্ বয়সে কাহার বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হইবে তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে ঠিক পিউবার্টির (puberty) পূর্বে বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হয় এবং তারপর উহার বিকাশ ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কে কোন্ বয়সে পিউবার্টিতে পৌঁছিবে তাহা নির্দিষ্ট না থাকার দরুণ কাহার বুদ্ধির বিকাশ কখন দ্রুততর হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কেবল বুদ্ধি কেন, বয়:সন্ধিকালে শিশুর অন্যান্য মানসিক ক্ষমতারও (special abilities) বিকাশ হইতে আরম্ভ করে।

বয়:সন্ধিকালে ছেলে এবং মেয়ের ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশে কোন উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ সব সময় পরস্পরের সহিত তাল রাখিয়া চলে না। অর্থাৎ বয়:সন্ধিকালে উপযুক্ত শারীরিক বিকাশ কোন শিশুর হইয়া গেলেও

তখন পর্যন্ত তাহার অনুরূপ মানসিক বিকাশ নাও হইতে পারে ; ইহার বিপরীতও সত্য হইতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে অনুভূতির (Emotion) বিকাশ—বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি শিশুকে তাহার পূর্বের ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হইতে এত দূরে সরাইয়া লইয়া যায় যে, এই বয়সে সময় অনেক শিশুর মধ্যেই একটা মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মনে কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাবের সৃষ্টি হয়। সে ঠিক কি চায় তাহা সে নিজেই ঠিক করিতে পারে না। কোন কিছুতেই সে যেন মনস্থির করিয়া পূর্ণভাবে একাগ্র হইতে পারে না।

যৌন চেতনার বিকাশের ফলে স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে প্রবল হইয়া উঠে। এই বয়সে শিশু বিশেষভাবে বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়। তাহার এই বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা চলে—১। প্রথম স্তরে ছেলেরা ছেলে বন্ধু এবং মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পছন্দ করে। এই স্তরে কোন একটি শিশুর সহিত অপর একটি শিশুর খুব ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না বন্ধুত্ব সাধারণতঃ দলগত থাকে। কয়েকটি শিশু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একটি বন্ধুগোষ্ঠীর বা দলের সৃষ্টি করে। ২। দ্বিতীয় স্তরে কিন্তু একটি শিশুর অপর আর একটি শিশুর (সমলিঙ্গ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। পরস্পরের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানে এবং সমস্যার আলোচনায় তাহারা তন্ময় থাকে। অনেকক্ষেত্রে এই বয়সের বন্ধুত্ব সাংসারিক জীবনেও স্থায়ী হইতে দেখা যায়। ৩। তৃতীয় স্তরে ছেলে, মেয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে। উহারা পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ভালবাসে এবং একে অপরের শ্রদ্ধা লাভ করিতে কামনা করে।

বয়ঃসন্ধিকালে শিশুজীবনের সমস্যা—বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের শিশুদের মধ্যে যে সব বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এই সময় শিশুরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করে। তাহারা আর শিশু নহে—পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে তাহারা নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান পাইতে চায়। বয়স্কদের সহিত তাহাদের যে পার্থক্য রহিয়াছে ইহার জন্য তাহাদের অবচেতন মনে একটা হীনতাবোধও (Inferiority Complex) থাকে। ইহার

ফলে বিশেষ করিয়া পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বাধীনতা পাইতে চায়। বড়দের সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা বিদ্রোহীভাব প্রকাশ পায়। কথায় কথায় বড়দের সঙ্গে তাহাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। সুযোগ পাইলেই বড়দের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাহারা মুখর হইয়া উঠে।

কিন্তু একদিকে বড়দের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইলেও ঐ বয়সে শিশুরা বিশেষ কোন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত একাত্মবোধও স্থাপন করিতে চায়। এই সময় সে এমন কোন লোকের অনুসন্ধান করে যাহার সহিত একাত্মবোধ স্থাপন করিয়া সে নিজের হীনতাবোধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। শিশুর কাছে সে হইবে অনেকটা আদর্শ মানব; সে শিশুকে ভালবাসিবে এবং সর্বান্তঃকরণে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবে। এমন লোকের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শিশু বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকে। স্বাধীনতালাভ এবং বশ্যতা স্বীকার পরস্পর বিপরীত ভাব হইলেও বয়ঃসন্ধিকালে এই উভয় প্রকার মনোভাবই নবযুবকের মনে পাশাপাশিভাবে বিরাজ করে।

পিতা, মাতা এবং শিক্ষক ইঁহাদিগকে সে একই সঙ্গে ভালোবাসিতে চায়, শ্রদ্ধা করিতে চায় এবং সমালোচনাও করিতে চায়। দুঃখের বিষয় আমাদের পরিবার এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থায় নবযুবকের মনের এই চাহিদা পূর্ণ হইবার সুযোগ না থাকায় তাহার মনে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, আমাদের পরিবার এবং বিদ্যালয়গুলি একনায়কত্বের নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে; পিতামাতা বা শিক্ষক কেহই নবযুবকের মনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বিদ্রোহ মনে করিয়া কঠিন হস্তে দমন করিতে চান। নবযুবকের সহিত যে অনেকটা বয়স্কদের অনুরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত—তাহাদিগকে দায়িত্ব দিলে, বিশ্বাস করিলে তাহারা যে উহার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে একথা বিস্মৃত হইয়া পিতা-মাতা এবং শিক্ষক তাহার সহিত "বালকের" মত ব্যবহার করেন। তাঁহারা নবযুবক কর্তৃক তাহাদের সমালোচনাও সহ্য করিতে পারেন না। ইহার প্রধান কারণ তাঁহাদের নিজেদের মনে অপরাধবোধ (Guilt feeling) প্রবল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের ঐতিহ্যে বয়স্কদের ঐরূপ সমালোচনা অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয়। অপরদিকে পিতা-মাতা এবং শিক্ষক কেহই কিন্তু নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা নবযুবকের মনের আদর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন

না—সে তাঁহাদের কাহাকেও নিজের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ফলে, আমাদের দেশে পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে নবযুবকের সহিত পিতা-মাতা এবং শিক্ষকের সম্বন্ধ দিন দিনই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। পিতা-মাতা এবং শিক্ষককে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহারা 'রাজনৈতিক নেতা', 'ফিল্‌ম ষ্টার' (Film star), দুর্দান্ত ছাত্র প্রভৃতির সহিত নিজের মনের একাত্মবোধ সৃষ্টি করিয়া অনেক ক্ষেত্রে জীবনকে অবনতির পথে লইয়া যাইতেছে।

নবযুবকের মনের আদর্শবাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বয়সে সে নিজের জন্য জীবনদর্শন খুঁজিয়া বেড়ায়। সংসার এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাল্যকালের শিশু-সুলভ ধারণা তাহাকে আর তৃপ্ত রাখিতে পারে না। পিতামাতার ভালবাসা পাওয়া এবং তাহার প্রতিদান দেওয়াই আর তাহার নিকট জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হয় না। মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ হওয়ার দরুণ সে অনেক সময় মানুষ কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, এই সব গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায়ও রত হয়। নবযুবক বাস্তবরাজ্য অপেক্ষা ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেই অধিক পছন্দ করে। যৌনবোধ হইতে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা এবং উহা হইতে আত্মবিসর্জনের স্পৃহা নবযুবকের মনে দেখা দেয়। আদর্শবাদী কোন কাজ করিয়া আত্মবিসর্জন করার কোন সুযোগ পাইলে সে বিশেষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

আত্মসচেতনতা নবযুবকের আর একটি লক্ষণ। নবযুবক অনেক সময়েই মনে মনে নিজের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া থাকে; অধিকাংশ সময় সে নিজের কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকে। তার অন্তরের অপূর্ণতাবোধকে পূর্ণ করিবার জন্য সে শিল্পকলা, ধর্ম, সমাজসেবা, রাজনীতি, দেশভ্রমণ এবং বিভিন্ন ধরনের বীরত্বপূর্ণ কর্মের (Gallant actions) প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উপরি-উক্ত ধরনের কাজে লিপ্ত হইবার সুযোগ ছাত্রেরা অল্পই পাইয়া থাকে। ছাত্রদের মধ্যে বাঞ্ছিত জীবনদর্শন সৃষ্টি করিয়া দিবার নিমিত্ত-বিদ্যালয় কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা করে না। আমাদের সমাজেও দিন দিনই আদর্শবাদী কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ কমিয়া আসিতেছে। ফলে,

রাজনৈতিক নেতারা নবযুবকের মনের আদর্শবাদ এবং আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছেন।

যৌন পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং বিপরীত লিঙ্গ (opposite sex) লোক সম্বন্ধে সুস্থ মনোভাব পোষণ করা নবযুবকের জীবনের আরও দুইটি প্রধান সমস্যা। যৌন প্রসঙ্গ মাত্রেই আমাদের সমাজ "ঢাক ঢাক" নীতি (hush hush) অনুসরণ করিয়া থাকে। ফলে, এই বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানও আমাদের সমাজের নবযুবকদের থাকে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে আমাদের দেশের নবযুবকেরা অনেক সময় অনর্থক মানসিক উদ্বেগ ভোগ করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রথম ঋতুমতী হইলে অনেক মেয়ে মনে করে যে, তাহাদের গুরুতর কোন রোগ হইয়াছে বা তাহারা বিশেষ কোন অন্যায় করিয়াছে—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং অপরাধবোধের ফলে তাহারা আধমরা হইয়া থাকে। কোন নবযুবকের "স্বপ্নদোষ" দেখা দিলে তাহার মনেও অনুরূপ ধারণা জন্মে। স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষাকেও নবযুবকেরা বিশেষ পাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিপরীত লিঙ্গ লোকের সহিত মেলামেশা করা এবং তাহাদের শ্রদ্ধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক নিয়মেই নবযুবকের মধ্যে জাগরিত হয়। কিন্তু সমাজের বিধিনিষেধের নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে তাহারা এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারে না—বিপরীত লিঙ্গ লোকের সহিত সুস্থ এবং স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধেও নবযুবকের মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। নবযুবক বুঝিতে পারে যে, পরিবারের এবং বিপরীত লিঙ্গ লোকের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা অনেকটা তাহার অর্থোপার্জন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আমাদের সমাজ বেকার সমস্যায় পরিপূর্ণ। ইহার ফলে নবযুবকের মনে ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশের নবযুবকদের মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ নবযুবকের জীবনের উপরি-উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের নিমিত্ত আমরা বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করি না।

বয়ঃসন্ধিকাল ও শিক্ষা—বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ যত্ন করিয়া যে শিশুকে শিক্ষা দিতে হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুণ অনেকে ঐ বয়সের শিক্ষা সম্বন্ধেও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর মনে মন্দ প্রবৃত্তির জোয়ার আসে। ঐ জোয়ার হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত সর্বদা তাহাকে বাঞ্ছিত কর্মে নিযুক্ত করিতে হয়, যাহাতে মন্দ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইবার মত অবসর সে না পায়। তারপর চারুকলা, ক্রীড়া ইত্যাদি কর্মে নবযুবকে ব্যাপৃত করিয়া তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে সাব্‌লিমেশন (Sublimation)-এর সুযোগ দানের চেষ্টাও করিতে হয়।

কিন্তু নবযুবকের প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিয়াছি যে, তাহার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের অপরাপর স্তর হইতে এই স্তরের প্রকৃতি কোন হিসাবে ভিন্ন নহে। ঐ বয়সের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার দরুণ বয়ঃসন্ধি কালকে আমরা বিশেষ বিপদের কাল বলিয়া মনে করি। বাড়ীতে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক নবযুবককে যথাযথভাবে সাহায্য করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই সে বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করিয়া জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

শিক্ষককেই সর্বপ্রথমে নবযুবকের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে হইবে। এই বয়সে তাহার এমন একজন লোকের প্রয়োজন যাহাকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। যাহার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিয়া সে পরামর্শ চাহিতে পারে। তাহার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সব সময়েই তাহাকে নূতন নূতন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে—পদে পদে সে নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা সে নিজের বুদ্ধি দিয়া ধরিতে পারিতেছে না। বন্ধুর সহিত সে পরামর্শ করিতে পারে। কিন্তু তাহাও ত অনেকটা এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখানোর মত। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে তিনি ছাত্রকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন অপর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ধরা যাউক, কোন ছাত্র হয়ত বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎ বেমানান লম্বা হইয়া পড়িয়াছে; এই লইয়া তাহার মনে অশান্তির শেষ নাই। শিক্ষক দৃষ্টান্ত দিয়া, পুস্তক হইতে ছবি দেখাইয়া, তাহাকে সহজেই বুঝাইয়া দিতে

পারেন যে, উহা কিছু অস্বাভাবিক নহে; অনেকের এই বয়সে এইরূপই হইয়া থাকে; বেশীদিন তাহার দেহের বেমানান ভাব থাকিবে না। শিক্ষককে নবযুবকের মনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে হইলে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানের মত ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব থাকিলে চলিবে না। বন্ধুর মত ছাত্র তাহার মনের গোপনতম সমস্যাও শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে এবং তাহার পরামর্শ লইবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রকে শিক্ষকের সহিত একা দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

যৌন বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য নবযুবকের মনে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। যৌন বিষয়ে নিম্নতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে সমাজ-জীবনে শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। সমাজজীবনে দাম্পত্য জীবন যাপন করার নিমিত্তও যৌন বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেকের বিবাহিত জীবন এই জ্ঞানের অভাবে বিষময় হইয়া পড়ে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতে বিদ্যালয়ে যৌন বিষয়ে জ্ঞান দানের চেষ্টা করা আবশ্যক। ছাত্রেরা নবযৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই ঐ জ্ঞানদান আরম্ভ করিতে হয়। তাহারা যাহাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যৌন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে সেইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয়। বয়ঃসন্ধিকালেও বিধিবদ্ধভাবে যৌন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হয়।

নবযুবকের মনের আদর্শবাদের তৃপ্তির নিমিত্ত তাহাকে কোনও-না-কোন যুব আন্দোলনে (Youth Movement) যোগদানের সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বিভিন্ন ধরনের যুব আন্দোলন গড়িয়া তোলা আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অল্প নহে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ও আলোচনার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। নিজের আচরণের দ্বারা শিক্ষক ছাত্রদের মনে আদর্শনিষ্ঠা জাগরিত করিয়া তুলিবেন। ছাত্র এবং শিক্ষক পরস্পর মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মধ্যে মধ্যে পরস্পরের ব্যবহারের ভাল-মন্দের আলোচনা করিলে ভাল হয়। ইহার ফলে মনের হীনতাবোধের জন্য ছাত্রের মধ্যে বয়স্কদের সমালোচনা করিবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মায় তাহা

পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ ঐরূপ আলোচনা হইতে পরস্পরের সম্বন্ধ তিক্ত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে। ঐরূপ আলোচনা আত্মোন্নতিরও কারণ হয়। ছাত্রদের মনের স্বাধীনতা ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির নিমিত্ত বিদ্যালয় জীবন গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবন সংগঠনের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর যত অধিক পরিমাণে পড়িবে ততই তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে ঐ দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। ঐরূপ অভিজ্ঞতার ফলে নবযুবকের আত্মবিশ্বাস জন্মায় এবং তাহার মনের হীনতাবোধ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়।

নবযুবকের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। নবোন্মেষিত চিন্তা এবং কল্পনা শক্তির উপযুক্ত খোরাক না যোগাইতে পারিলে তাহার মনে তৃপ্তি থাকিতে পারে না। বিদ্যালযের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তা এবং কল্পনা শক্তি প্রয়োগের প্রচুর সুযোগ থাকিবে। ছাত্রদেব মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশ হিসাবে তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ দিতে হয়।

আমরা জানি যে, ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে এই বয়সে ছাত্রদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা থাকে। কাজেই সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে নবযুবককে কিছুটা জ্ঞান দিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর দিক হইতে বিচার করিলে সে কোন্ বৃত্তির বিশেষভাবে উপযুক্ত সে সম্বন্ধেও তাহার ধারণা জন্মাইলে ভাল হয়। নবযুবক মোটামুটিভাবে যে বৃত্তির উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে সে যে বৃত্তি গ্রহণ করিতে চায়, তাহার জন্য তাহাকে তাহার পাঠের ভিতর দিয়া সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন এবং এডুকেশন্যাল ও ভোকেশন্যাল (Educational & Vocational Guidance) প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে কোন যৌন কদভ্যাস না জন্মায় এবং বিপরীত লিঙ্গ লোকের প্রতি যাহাতে তাহাদের সুস্থ মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহার অন্য শিক্ষকের বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হয়। যৌন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদান এই উদ্দেশ্য সাধনে কিছুটা সাহায্য করে বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যৌন আকাঙ্ক্ষার মূলে রহিয়াছে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা,

ইত্যাদি ভাবের আদান-প্রদান করার বাসনা। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সমাজে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ (personal relationship) স্থাপনের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সুযোগ থাকিলে, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একত্রে আদর্শমূলক বা সংস্কৃতিমূলক কার্যে লিপ্ত হইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে ভাল। মনে রাখিতে হইবে যে নবযুবকের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা (যেমন বিপরীত লিঙ্গ লোকের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা) স্বাভাবিক নিয়মে যত বেশী পরিতৃপ্ত হইবে ততই তাহার মানসিক স্বাস্থ্য দৃঢ় হইবে। ছাত্রদের সাধারণ জীবন যত তিক্ততাপূর্ণ হইবে, তাহাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যত অধিক পরিমাণে অপরিতৃপ্ত থাকিবে, যৌন বিষয় লইয়া তত অধিক পরিমাণে তাহাদের মন ব্যাপৃত থাকিবে—হয়ত অনেক যৌন কদভ্যাস তাহাদের মনে গড়িয়া উঠিবে।

উপরি-উক্ত আলোচনার সারমর্ম হিসাবে আবার বলিতে হয় যে, বয়ঃসন্ধি কালকে বিশেষ সঙ্কটের কাল বলিয়া গণ্য করার কোন কারণ নাই। সমাজ বিশেষ করিয়া পরিবারের ক্রটির জন্য নবযুবকের মনে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় যদি বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ সমস্যাগুলির বিধিবদ্ধ সমাধানের চেষ্টা করে তাহা হইলে নবযুবকের জীবন সার্থকতা এবং তৃপ্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে যে খুব একটা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এমনও নহে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করিলে আপনা হইতেই বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাসমূহের সমাধান হইয়া যাইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা ও অবসর বিনোদনের শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দী হইতে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং সকল দেশেই তাহাকে অভিনন্দন জানান হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ শেষ হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল যে, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং ফলে অর্থক্ষতি, জীবনহানি এবং মানুষের ক্লেশের শেষ রহিল না। আরও দেখা গেল যে, এই বিশ্বযুদ্ধগুলির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে রহিয়াছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। শুধু তাহাই নহে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, League of Nations নাম দিয়া, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণের জন্য যে বিশ্বসংস্থা গঠন করা হইয়াছিল, তাহাও প্রধানতঃ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বেশীদিন টিকিল না এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে U. N. O.-কে সংগঠিত করা হইয়াছে। U. N. O. নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যুদ্ধ নিবারণের কাজে অগ্রসর হইয়াছে। U. N. O. বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধ মানুষের মনে প্রথম বাসা বাধে (War exists in the minds of men) এবং মানুষের মন হইতে ইহাকে দূর করিতে না পারিলে, কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। মানুষের মনের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোভ, পরমত অসহিষ্ণুতা, প্রতিযোগিতা বোধ, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা প্রভৃতি আছে, উহারাই মানুষে মানুষে, জাতীতে জাতীতে সৌহার্দ্য স্থাপনের অন্তরায়, এবং উহারাই শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সৃষ্টি করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মন হইতে ইহাদের দূর করিতে না পারিলে বিশ্বশান্তি অসম্ভব। তাই ঐসব বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই U. N. O.-র একটি শাখা হিসাবে UNESCO. স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশে, বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত আন্দোলন চলিতেছে।

আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীতা

বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং মানুষকে আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন যে বর্তমানে, পূর্ব হইতে অনেক গুণ বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানের প্রসাদে, এরোপ্লেন প্রভৃতি যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ায় পৃথিবীর দূরত্ব অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে—পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তের লোক, অতি সহজে অপর যে-কোন প্রান্তের লোকের সহিত অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে এবং পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান করিতে পারে। রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রের মারফতে, প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন না করিয়াও দূর-দূরান্তরে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং ভাবের-আদান প্রদান হইতে পারে। ফলে, সমগ্র পৃথিবীই যেন একটি দেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে, আন্তর্জাতিকতা বোধ মানুষের মনে জাগাইতে না পারিলে, বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং ফলে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া অনিবার্য। আবার, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ পরস্পরের এত কাছে চলিয়া আসিয়াছে যে, কোন যুদ্ধ বাধিলেই তাহা বিশ্বযুদ্ধে রূপায়িত হইতেছে। আরও সাংঘাতিক কথা, মানুষের হাতে আণবিক অস্ত্র চলিয়া আসার ফলে, ভবিষ্যতে কোন বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে, তাহাতে সমগ্র মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। মানবতাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের বিদ্যালয়কে আগাইয়া আসিতে হইবে—আমরা, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শিক্ষক, যদি আমাদের ছাত্রদের মনে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগাইয়া তুলিতে পারি, তবে হয়ত পৃথিবী এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

অন্তর্জাতিকা শিক্ষা-দানের ভিত্তি—আন্তর্জাতিক জীবন দর্শন

আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা প্রদান করা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তাহা কঠিনও বটে। ছাত্রদের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তিত করিতে না পারিলে এই শিক্ষা সার্থক হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ আমাদের মত অনগ্রসর দেশে, যেখানে অন্তরে নিরাপত্তা বোধের (Feeling of security) এত অভাব এবং যেখানে হীনমন্যতাবোধ এত প্রবল, সেখানে সর্বমানবতাবোধ জাগান খুবই কঠিন কাজ। আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি হইল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা—ছাত্রদের মনে, এমন একটা জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা উচ্চনীচ প্রভৃতি ভেদাভেদ

ভুলিয়া সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—কাহাকেও নীচ মনে করা বা ঘৃণা করা যে পাপ, এ বিষয়ে ছাত্রদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাইতে হইবে। তারপর ছাত্রদের মনে এই ধারণা জন্মাইতে হইবে যে, কেবলমাত্র নিজ স্বার্থের জন্য জীবনধারণ প্রায় পশুর জীবনের সমতুল্য—আত্মত্যাগের মধ্যেই রহিয়াছে জীবনের স্বার্থকতার পথ। পরমতসহিষ্ণুতা, পরদুঃখ-কাতরতা এবং অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সমীকরণের মধ্যে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠতর মানবত্বের লক্ষণ। এক হিসাবে এই ধরণের জীবন-দর্শনের শিক্ষা গণতান্ত্রিক জীবনের শিক্ষার ভিত্তিও বটে। কেবলমাত্র জাতীয় পরিপ্রেক্ষির বাহিরে গিয়া আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনকে বিস্তারিত করিলেই তাহা আন্তর্জাতিক জীবনদর্শনে পরিণত হইতে পারে। মোটকথা প্রকৃত শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে একই স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়—সকল প্রকৃত শিক্ষাই পরস্পরের পরিপূরক। এমনকি উচ্চস্তরে জাতীয়তাবাদের শিক্ষাকেও (Enlightened nationalism) আন্তর্জাতিকতাবাদের শিক্ষার পরিপূরক বলা যাইতে পারে—কারণ উহার জন্যও উপরে উল্লিখিত ধরণের জীবনদর্শন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

অজ্ঞান ও কুসংস্কার আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টির শত্রু

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জ্ঞানের অভাব এবং কুসংস্কার আন্তর্জাতিকতাবাদ শিক্ষার প্রধান শত্রু। অশিক্ষিতদের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিতদের মধ্যে ও অপরদেশ ও জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সামান্য; সামান্য যে জ্ঞান আছে তাহাও ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ ২০০ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। তবু এখনও অনেক ইংরেজেরই ধারণা যে ভারতবর্ষ এক ভয়ঙ্কর স্থান—উহা হাতী এবং সাপে পরিপূর্ণ। আবার এই ধরণের ধারণার জন্য ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তক কতকাংশে দায়ী। আমাদেরও ইংরেজদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। অজ্ঞানের ফলেই কুসংস্কারের সৃষ্টি হয় এবং কুসংস্কারের ফলে পারস্পরিক সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হইয়া পড়ে। পরস্পরের সম্বন্ধে আমরা যতবেশী জানিব ততই পরস্পরের মনে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সহযোগিতা প্রভৃতির সৃষ্টি হইবে এবং

কুসংস্কার ও ঘৃণা দূর হইবে। তাই অজ্ঞান ও কুসংস্কার দূরীকরণ আন্তর্জাতিকতাবাদ শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের নিমিত্ত, বিদ্যালয়ে আমরা কি কি বাস্তব পন্থা অবলম্বন করিতে পারি, তাহাই এখন আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। বিশ্বমানবতার আদর্শ গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত, বিদ্যালয়ে কিছু পাঠ এবং কিছু আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের যত ধর্ম আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছে; আবার আমাদের বরেণ্য এবং প্রণম্য মানুষদের অনেকেরই লেখায় এবং জীবনে বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখা যায়। তাই, দৈনন্দিন প্রার্থনা সভার পাঠ এবং আলোচনায় বিশ্বমানবতার আদর্শের কিছুটা স্থান থাকিতে পারে। প্রতিদিন তাহা সম্ভব না হইলেও কোন কোন দিন, বিশ্বমানবতার আদর্শই পাঠ এবং আলোচনার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হইতে পারে। দৈনন্দিন যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়, তাহার মধ্যে স্বজাতির প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে বিশ্বমানবতার প্রতি আনুগত্য জানানোর জন্যও একটি বাক্য থাকিতে পারে।

প্রার্থনা সভায় বিশ্ব-মানবতার শিক্ষা

প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবতা ক্লাব নামে একটি ক্লাব গড়িয়া তুলা উচিত। এই ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করিবে—ইহা বিশেষ আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিতর্কের অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারে। U. N. O. বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যে সব সংস্থা স্থাপন করিয়াছে এবং যে সব কার্য করিয়াছে এবং করিতেছে সে সম্বন্ধে তথ্য ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করাও এই ক্লাবের বিশেষ দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে এই ক্লাব U. N. O. কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ দিবসে, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী নকল U. N. O. সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই ক্লাবই আন্তর্জাতিক সংবাদ নামে কিছুটা সংবাদ ব্ল্যাক বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিদিন ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থাও করিতে পারে।

বিদ্যালয়ে বিশ্বমানবতা ক্লাব

পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে ও আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাপ্রদানের সুযোগ রহিয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক দেশেরই পাঠ্য-পুস্তকে (বিশেষ

করিয়া ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ বিদ্যা ইত্যাদি) অপরাপর দেশ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত বা একদেশদর্শী (Partial) সংবাদ থাকে। ইহা ছাত্রদের মনে কুসংস্কারের সৃষ্টি করে ; এমন কি, তাহাদের মনে বিরুদ্ধ ভাবেরও সৃষ্টি করে। পাঠ্য-পুস্তক হইতে ঐ সব ভ্রান্ত এবং একদেশদর্শী তথ্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। UNESCO তাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তকের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে, অর্থাৎ, যে সব দেশের মধ্যে বিশেষ পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে (যথা গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ) তাহাদের মধ্যে পাঠ্য-পুস্তকের (ধরুন, ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তক) আদান-প্রদান হইবে—পাঠ্য-পুস্তকের যে সব অংশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রেট ব্রিটেনের ছাত্রদের মনে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার দিকে ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, অনুরূপভাবে গ্রেট ব্রিটেনও ভারতের পাঠ্য-পুস্তক সংস্কারের দিকে (বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া) তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আন্তর্জাতিক মনোভাবের ক্ষতি না করিয়া, কিভাবে ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়, ইহার জন্য UNESCO বিশেষ বইও প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় ব্যতীত, সাহিত্যের মাধ্যমেও বিশ্বমানবতার আদর্শ ছাত্রদের মনে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়—যে সব কবিতা বা আদর্শ ঐ আদর্শকে পুষ্ট করে, তাহাদের স্থান পাঠ্য-পুস্তকে করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিকতার শিক্ষার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের সংস্কার

সর্বশেষে বলিতে হয় যে, সেবার মাধ্যমে ও বিশ্বমানবতার আদর্শকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যায়। যে পরদুঃখকাতর—যে নিজের স্বার্থে বলি দিয়া অপরকে সাহায্য করে, তাহার মনে বিশ্বমানবতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। কাজেই বিদ্যালয় এবং সমাজকে সেবা করার জন্য যদি একটি ক্লাব বিদ্যালয়ে গড়িয়া তোলা যায়, তবে তাহাও অপ্রত্যক্ষভাবে, আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাদানে সাহায্য করিবে।

আন্তর্জাতিকতা শিক্ষায় সেবার অবদান

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়া, বিদ্যালয়ের

সাধারণ জীবনের অংশ হইয়া পড়িবে। ইহা এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা, এবং ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যেমন পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, এই শিক্ষাও তেমনিভাবে দিতে হইবে, এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি যেন না হয়।

অবসর বিনোদনের শিক্ষা—বর্তমানে আর একটি দাবী উঠিয়াছে যে, ভবিষ্যৎ জীবনে ছাত্রেরা যাহাতে বাঞ্ছিত রীতিতে অবসর বিনোদন করিতে পারে, তাহার শিক্ষাও বিদ্যালয়কে দিতে হইবে। এই দাবী উঠার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভবিষ্যৎ জীবনে অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা হইলে, বিদ্যালয়ে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা স্থায়ী হইতে পারে না। মানুষের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে,—পূর্বের শিক্ষাকে নষ্ট করিতেছে বা তাহাকে আরও শক্তিশালী করিতেছে। তাই আজ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দিলাম, তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী হইতে হইলে, সারা জীবনই মানুষকে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার ভিতরে রাখিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে এবং কলেজে ছাত্রদের পঠন-পাঠন শিক্ষা দেওয়া হইল, কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে অবসর পাইলেও ইহারা পঠন-পাঠনের কাছেও যায় না; তাস খেলিয়া বা দলাদলি করিয়া সময় কাটায়। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল। যন্ত্র সভ্যতার প্রসারের ফলে, মানুষের অবসর কাল, এক গুরুতর শিক্ষা-সমস্যা রূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। কলকারখানায় কাজ করিয়া মানুষ কাজের আনন্দ ও তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে—যন্ত্রের সঙ্গে সে যন্ত্রেরই মত কাজ করিয়া চলিয়াছে—কাজের প্রতি মুহূর্তে সে তাহার মনুষ্যত্বের দাবী অস্বীকার করিতেছে। কাজ এখন মহা ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, কেবলমাত্র মাহিনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্মীরা কাজ করিয়া চলিয়াছে কাজের নিজস্ব কোন আনন্দ তাহাদিগের নিকট নাই। ফলে অবসরের জন্য চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে, কাজের সপ্তাহ ৫ দিনে পরিণত হইয়াছে—শনি ও রবিবার সাধারণতঃ ছুটি থাকে। আমাদের দেশেও কাজের সময় সীমিত হইয়াছে এবং আমাদের অবসরের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ, তাহাদের অবসর সময় অত্যন্ত অবাঞ্ছিতভাবে যাপন করিতেছে। মদ্যপান, কুরুচিপূর্ণ ছায়াচিত্র

অবসর বিনোদনের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

দর্শন প্রভৃতি কলকারখানার কর্মীরা অবসর বিনোদনের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাই দাবী উঠিয়াছে যে, বিদ্যালয়েই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে যথাযথভাবে অবসর কাল যাপনের শিক্ষা দিতে হইবে।

বিদ্যালয় এই সমস্যা সমাধানে যে কিছুটা সাহায্য করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতই কাজের মধ্যে যে আনন্দ আছে এই অনুভূতি ছাত্রদের দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ লেখাপড়া। লেখাপড়ায় ছাত্রদের নিজস্ব আনন্দ বোধ জন্মাইতে হইবে। ছাত্রেরা পরীক্ষার বা শাস্তি লাভের ভয়ে পড়াশুনা করিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। পড়ায় আনন্দের অনুভূতি একবার হইলে, ভবিষ্যৎ জীবনেও ছাত্রেরা পড়ার অভ্যাস ছাড়িতে পারিবে না। পুস্তক পাঠ যে অবসর বিনোদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ছেলেই অবসর কালের কিছুটা সময় লেখা পডায় কাটাইবে এই অভ্যাস বিদ্যালয় হইতে গঠন করিয়া দিতে পারিলেই ভাল। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে লাইব্রেরী গঠন করিতে হইবে এবং ছাত্রদের মধ্যে লাইব্রেরী পাঠের অভ্যাস জন্মাইতে হইবে। শ্রেণী কক্ষের লেখাপডা ও ছাত্রদের নিকট যাহাতে প্রীতিপ্রদ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া, প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে, তাহার আগ্রহ, ক্ষমতা, রুচি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল অন্ততঃ একটি "হবি"-গড়িয়া দিতে হইবে। "হবি" এমন একটি কাজ যাহা কেবলমাত্র আনন্দ লাভের জন্য অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াও আমরা করিয়া থাকি—যেমন কাহারও গান গাওয়ার, কাহারও খেলার, কাহারও সমাজ সেবার, আবার কাহারও বা পুস্তক পাঠের "হবি" থাকিতে পারে। অবসর সময়েই আমরা "হবি" সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হইয়া থাকি। একবার হবি গড়িয়া উঠিলে, সহজে ইহা পরিত্যাগ করা যায় না। ভবিষ্যৎ জীবনেও উহা আমরা অবসর বিনোদনের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। কাজেই ছাত্র জীবনে, বাঞ্ছিত "হবি" গড়িয়া দিতে পারিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে অবসর কালে অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আমাদের দেশে খুব অল্পসংখ্যক লোকের ঐ হবি আছে। কারণ বিদ্যালয় জীবনে তাহাদের হবি গঠনের সুযোগ হয় নাই। ইহার ফল নানা দিক দিয়াই বিষময় হইতেছে। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয়েই নানা ধরণের হবি ক্লাব গঠন করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য যে সব হবি নির্বাচিত হইবে,

তাহার কিছুটা সামাজিক মূল্য থাকা বাঞ্ছনীয়; চরিত্র গঠনেও তাহাদের উপযোগিতা থাকা আবশ্যক; তাহাদের মাধ্যমে জ্ঞান সংগ্রহের ও শরীর গঠনের সুযোগ থাকিলে আরও ভাল। এই হবি ক্লাবগুলি পরিচালনে, প্রয়োজনবোধে শিক্ষক মহাশয়গণ নেতৃত্ব করিবেন এবং বিদ্যালয় ইহাদের জন্য যথাসাধ্য সুযোগসুবিধা করিয়া দিবে। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি কুটির শিল্পকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কোন কোন ছাত্রের জন্য এই কুটির শিল্পও হবির কাজ করিতে পারে।

হবি গঠন ব্যতীত, ছাত্রদের মধ্যে সুরুচিবোধ জাগাইযা তুলিতে হইবে। সাংস্কৃতিক জীবনে তাহারা যাহাতে কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান আপনা হইতেই পরিহার করে—কুরুচিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হইতে যাহাতে স্বভাবতই তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহ করে, এইরূপ শিক্ষা তাহাদের দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবন যথাসাধ্য উন্নত করা প্রয়োজন—ছাত্রেরা যাহাতে উচ্চতর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখিবার সুযোগ পায়, বিদ্যালয়ের তরফ্ হইতে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকে লইয়া, শিক্ষকের নেতৃত্বে আলাপ-আলোচনা করার মাধ্যমেও সুরুচি গঠিত হইতে পারে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা-ব্যবস্থা

পরীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা—আমাদের সমাজ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা যেরকম গুরুত্বপূর্ণস্থান অধিকার করিয়া আছে এমন আর কোন দেশে নাই। এই সেদিনও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নপত্র সর্বপ্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও অসাধু, অর্থলোলুপ লোকের চেষ্টায় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের লৌহদ্বার কক্ষের ভিতর হইতে প্রায় 'যাদুবলে' বাহির হইয়া কল্পনাতীত মূল্যে পরীক্ষার্থীদের নিকট বিক্রীত হইল। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উত্তর করিলেন যে, বি.এ. এবং বি. এস্-সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গোপন রাখার জন্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত সব রকম সতর্কতাই অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু প্রশ্নপত্র যে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকিবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র জানা-জানি হইয়া যাওয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন কিছু নহে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি এই অবস্থা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা পরীক্ষার উপর এত গুরুত্ব দেয় না। 'এত কাণ্ড' করিয়া প্রশ্নপত্র জানা-জানি করা তাহাদের কাছে মূল্যহীন। পরীক্ষায় পাশ না হইলে শিক্ষাই হয় না এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে নাই। একবার ফেল করিলে, অল্পদিন পর পরীক্ষা দিয়া পাশ করিবার সুযোগ তাহারা পায়। কেহ কোন পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিলে তাহার জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে বা মানুষ হিসাবে পরিবার এবং সমাজের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে না এমনও নহে। আমাদের দেশে পরীক্ষার উপর একদিকে যেমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হয় অপর দিকে আবার পরীক্ষা-ব্যবস্থা তেমনি ত্রুটিপূর্ণ হইয়া আছে। প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া বা জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াও পরীক্ষায় আশানুরূপ সফলতা লাভ করা সম্বন্ধে কেহ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। পরীক্ষা 'ভাগ্যের ব্যাপার' ইহা আমাদের প্রচলিত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—পরিশ্রম বা জ্ঞানলাভের সহিত তাহার নিশ্চিত সম্বন্ধ নাই। উহা অনেকখানি প্রশ্নপত্র রচনাকারী এবং উত্তরপত্র পরীক্ষকের খামখেয়ালির

উপর নির্ভর করে। তাই পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এত উদ্বেগ, এত উৎকণ্ঠা, এত ভয় ; আর পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য সাধু, অসাধু সর্বপ্রকার চেষ্টা গ্রহণের জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা। নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ সম্ভব হইলে, পরীক্ষাকে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে উঠাইয়া দিতে চাই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা বা কোন সমাজই পরীক্ষা করার কাজ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। এক হিসাবে আমরা সমস্ত জীবনব্যাপীই পরীক্ষা দিয়া চলিয়াছি। যখনই আমরা পরস্পর মিলিত হই তখনই জ্ঞাতে হউক বা অজ্ঞাতে হউক আমরা পরস্পরের সম্বন্ধ জানিতে চেষ্টা করি ; ঐ জ্ঞানই আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তি। বর্তমানে আমরা যেরূপ নৈর্ব্যক্তিক সমাজে বাস করিতেছি তাহাতে যে-কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিবার পূর্বে (যেমন চাকুরি) পরস্পরকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে গ্রামের ব্যক্তিগত সমাজে আমরা পরস্পরকে এরূপ অন্তরঙ্গভাবে জানিতাম যে, পরীক্ষা-ব্যতীতও পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গেও অনেক সময় আমাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। ফলে সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে পরীক্ষার দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়া না লইলে ঐ সব সম্বন্ধ সার্থক এবং সুন্দর হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ক্লাবে নূতন সভ্য বা বিদ্যালয়ে নূতন ছাত্র লওয়া, কোন প্রতিষ্ঠানে লোকনিয়োগ করা, বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করা প্রভৃতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরীক্ষার প্রচলন অতি প্রাচীন ; সম্ভবতঃ চীনদেশেই ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। সকল দেশে সকল সময়ে বিদ্যালয়ে এবং সমাজে নানা ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ; যেমন গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা ও শক্তির পরীক্ষা, তর্কবিদ্যার পরীক্ষা ইত্যাদি। বর্তমানে দেশ, কাল ও সমাজ ভেদে পরীক্ষাব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সংক্ষেপে আমাদের সমাজ-জীবনে পরীক্ষা করার প্রয়োজন না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের সমস্যা, পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার নহে, পরীক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। মনে রাখিতে হইবে যে, পারস্পরিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ছাত্র এবং শিক্ষকের প্রথম মিলনে, শিক্ষকের প্রধান কাজ ছাত্রসম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা করা। ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ ও অর্জিত জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকিলে শিক্ষা-দানকার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, এক শ্রেণীতে একসঙ্গে ৪০টি ছাত্রকে পড়াইবার চেষ্টা করিলেও তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক পৃথক সত্তা এবং তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদাভাবে স্পষ্ট ধারণা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসা করার ন্যায় শিক্ষাদান-কার্যেও একটা ধারাবাহিকতা আছে। কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া যেমন পরের ঔষধ নির্বাচন করিতে হয় তেমনি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর তাহাদের কার্যকারিতা বুঝিয়া তবে পরের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এমন হইতে পারে যে, প্রথম চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া গিয়াছে; এরূপ অবস্থায় পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হয়। এমনও হইতে পারে যে, প্রথম চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিপরীত ফললাভ হইয়াছে; তাহা হইলে ঐরূপ হওয়ার কারণ ভালভাবে বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আবার এমনও হইতে পারে যে, শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় আংশিক ফল লাভ হইয়াছে; তাহা হইলে হয়ত ঐ ধরণের চেষ্টা আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে। মোট কথা জ্ঞানদানই হউক, আর চরিত্রগঠনই হউক অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলাফল বার বার বিবেচনা না করিয়া শিক্ষক নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। যে সব ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষাদান চেষ্টার ফলাফল বিধিবদ্ধভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ব্যক্তিগত (নানারূপ) পার্থক্য থাকার দরুণ একই শ্রেণীর সকল ছাত্র একই শিক্ষকের শিক্ষাদনের চেষ্টা হইতে সমান ফল লাভ করে না। তাই শ্রেণীতে শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা সাধারণভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে কিনা এবং কোন্ ছাত্রের ক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টা কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে ইহা প্রতি প্রচেষ্টার পরই শিক্ষকের পরীক্ষা করা

প্রয়োজন। যদি সমগ্র শ্রেণীর কাছে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে তবে নূতনভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি সাধারণভাবে চেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে তবে 'পিছনে পড়া' ছাত্রদের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতি শিক্ষাদান-প্রচেষ্টার পরই মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক ইহার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পরই শিক্ষাদানপ্রচেষ্টার ফলাফল কিরূপ হইতেছে তাহা লিখিতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন—ঐ ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই নিজ নিজ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলে শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান কার্য আশানুরূপভাবে চলিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রের পরীক্ষা, অপর দিকে তেমনি শিক্ষকের পরীক্ষাও বটে। ইহার উদ্দেশ্য কে ভাল, কে মন্দ নির্ধারণ করা নহে ; ইহার উদ্দেশ্য নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার উন্নতি সাধন করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরীক্ষাকার্যে অগ্রসর হইলে ছাত্রদের মনে পরীক্ষা সম্বন্ধে ভীতির সঞ্চার হইবে না এবং শিক্ষকগণও ইহাকে অপ্রীতিকর কর্মভার বলিয়া মনে করিবেন না—নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক বলিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উভয়পক্ষই পরীক্ষাগ্রহণ এবং পরীক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইবে। আরও একটু বিশেষভাবে বলিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হইবে তিনটি—

(ক) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রচেষ্টা হইতে কোন্ ছাত্র কতখানি ফললাভ করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা।

(খ) যে ছাত্র আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারে নাই সে কি কারণে বিফল হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা করা। ইংরাজিতে ঐ ধরণের পরীক্ষাকে ডায়গনষ্টিক (Diagnostic) পরীক্ষা বলা হয়। ডাক্তারের পক্ষে কোন রোগীর জ্বর হইয়াছে ইহা নির্ধারণ করাই চিকিৎসা করার পক্ষে যথেষ্ট নহে ; রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যতক্ষণ তিনি জ্বর হওয়ার কারণ নির্ধারণ কবিতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসাকার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। ঠিক একইভাবে কোন ছাত্র আশানুরূপভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই—পরীক্ষার দ্বারা ইহা নির্ণয় করাই শিক্ষাদানের

পক্ষে যথেষ্ট নহে ; যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক অনুধরণের পরীক্ষা (Diagnostic Test) না করিয়া কোন্ ছাত্রের ঠিক কোথায় আটকাইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহার উন্নতির চেষ্টায় অগ্রসর হইতে পারেন না। ধরা যাউক, কোন ছাত্র অঙ্ক পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর পায় নাই। ইহা নানাকারণে হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে—১। ভাল নামতা না জানার জন্য সে অঙ্ক কষিতে ভুল করিতে পারে। ২। অঙ্কের মূল পদ্ধতিগুলি (যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি) ঠিকভাবে বুঝিতে না পারার দরুণ অঙ্ক ভুল হইতে পারে। ৩। ভাজ্য, ভাজক প্রভৃতি গণিতের বিশেষ বিশেষ শব্দগুলির অর্থ না জানার জন্যও তাহার অঙ্কে ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। ৪। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপ্রসূত মানসিক চাঞ্চল্যের নিমিত্ত সে ছোট ছোট যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি করিতে ভুল করিয়া সমগ্র অঙ্কটিই ভুল করিয়া দিতে পারে। এই ছাত্রের অঙ্কের জ্ঞান উন্নত করিতে হইলে ঠিক কোথায় কি কারণে তাহার অসুবিধা হইতেছে তাহা প্রথমেই স্থির করিতে হইবে। সুতরাং কারণ-নির্ণয়ণ-পরীক্ষা (Diagonstic Test) না করিয়া শিক্ষক পিছাইয়া-পড়া ছাত্রদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।

(গ) শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে কোথায় কোন্ দোষ-ত্রুটি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা ; কারণ নির্ণয়ণ-পরীক্ষা হইতে ইহা কিছু ধরা পড়িলেও আলাদাভাবে ইহার পরীক্ষা করারও প্রয়োজন রহিয়াছে। ঐ ধরণের পরীক্ষাগ্রহণ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় শেষোক্ত দুই ধরণের পরীক্ষার সহিত আমরা এখনও তেমনভাবে পরিচিত নহি। হয়ত অধিকাংশ শিক্ষকই উহাদের নামও শুনেন নাই।

বাহ্যিক পরীক্ষা—শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) আভ্যন্তরীণ ও (২) বাহ্যিক। ইতিপূর্বে যে সব ধরণের পরীক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বলা যাইতে পারে—শিক্ষাদানের প্রয়োজনে বিদ্যালয় ঐ ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমাজের প্রয়োজনেই বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক সমাজে অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে

অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে যে পরীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ের প্রথমেই করা হইয়াছে। ঐ সব পরীক্ষার ফলাফল সামাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অভিজ্ঞান-পত্র। ঐসব অভিজ্ঞানপত্র দানের ক্ষমতা কোন বিদ্যালয় বা কলেজকে দেওয়া হয় না। ইহার কারণ অভিজ্ঞানের মূল্য সাধারণতঃ অভিজ্ঞানদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। তারপর একরূপ অভিজ্ঞানদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মর্যাদাও সমান হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাউক, কলিকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সামাজিক মূল্য সমান না হইলে সমাজ-জীবনে নানা ধরণের জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। তাই শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এবং সামাজিক অভিজ্ঞানদানের প্রয়োজনে পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ এক হয় না। এই কারণেই বাহ্যিক পরীক্ষার সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতে উপাধ্যায়গণই সামাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে ছাত্রদের উপাধি প্রদান করিতেন। এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের সামাজিক মর্যাদা এত বেশী যে, তাহারা নিজেরাই সমাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে উপাধিপত্র দিয়া থাকেন। বাহ্যিক পরীক্ষা নানাকারণে অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই; এইজন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ ইহা উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। প্রথমতঃ, বাহ্যিক পরীক্ষা ছাত্রের প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপ করিতে পারে না। দুই বা তিন বৎসর ধরিয়া যাহা অধ্যয়ন করা হইল তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেল—এই পরীক্ষা যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টার সহিত পরীক্ষা জড়িত থাকিলেই জ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য পরীক্ষায় যাঁহারা প্রশ্নপত্র-রচনাকারী থাকেন তাঁহারা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐ শিক্ষা-স্তরের শিক্ষাদানের সহিত জড়িত থাকেন না। ফলে, অনেক সময় প্রশ্নপত্রের মান এবং শিক্ষাদানের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। ছাত্রদের অধীত জ্ঞানের পরীক্ষার প্রকৃত মান শুধু তাহাদের শিক্ষকই নির্ণয় করিতে পারেন। পাঠ্যতালিকা যত বিশদভাবেই রচিত হউক না কেন তাহা দেখিয়া 'বাহিরের

লোক' প্রশ্নপত্র রচনা করিলে পরীক্ষার্থীরা যাহা শিক্ষা করিয়াছে এবং যাহা পরীক্ষা করার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষক যে ছাত্রকে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন তিনিই শুধু তাহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন। তারপর আমাদের অজ্ঞতার জন্য প্রশ্নপত্ররচনা ও নম্বরদানের ব্যাপারে আমরা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছি না। ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ভ্রমপ্রমাদ, দোষ-ত্রুটি অধিকতর হইতেছে। বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিয়া বা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া খুব কম লোকই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন। একদিকে পরীক্ষার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, অপরদিকে পরীক্ষাগ্রহণ-ব্যবস্থা ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ; ফলে, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। সর্বশেষে ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণ সমাজকে জানানোই যদি বাহ্যিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে ঐ পরীক্ষাদ্বারা পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে আমরা যতখানি জানিতে চাই তাহা জানিতে পারিতেছি কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। বর্তমানে আমরা শুধু অধীত জ্ঞানেরই পরীক্ষা করিয়া থাকি। বাহ্যিক পরীক্ষা আমাদের যে সামাজিক অভিজ্ঞান দেয়, তাহা শুধু অধীত জ্ঞানেরই অভিজ্ঞান। চারিত্রিক গুণাবলী, বিশেষ ক্ষমতা, আগ্রহের ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ে ঐ অভিজ্ঞানপত্র হইতে কিছুই জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা ঐসব নির্ণয় করাও যায় না। ফলে, বাহ্যিক পরীক্ষা আংশিকভাবে এবং অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতেছে; অথচ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষ অধিক। ছাত্রেরা 'শিক্ষাগ্রহণের' উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া, 'সামাজিক অভিজ্ঞান-সংগ্রহের' উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। সমাজের ও পিতামাতার নিকট ছাত্রের মূল্য তাহার সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারও হইয়া থাকে উহার ছাত্রদিগকে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করাইয়া দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তিতে। শিক্ষাপদ্ধতির ভালমন্দ, শিক্ষকের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারও একই ভিত্তিতে হইতেছে। এই অবস্থায় বাহ্যিক পরীক্ষা বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা অপেক্ষা

পরীক্ষা পাশের গুরুত্ব অধিকতর হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষা, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (পূর্বে আলোচিত) বিস্মৃত হইয়া বাহ্যিক পরীক্ষার অনুকরণ করিতেছে; পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাপদ্ধতি শুধু বাহ্যিক পরীক্ষার চাহিদা মিটাইতেই ব্যস্ত। এই অবস্থায় বাহ্যিক পরীক্ষাকে সংস্কার বা একেবারে উঠাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষার কোন সংস্কারই সম্ভব হইবে না। বাহ্যিক শিক্ষার 'চাহিদা মিটাইতে গিয়া শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্র কুশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে (না বুঝিয়া মুখস্থ করার অভ্যাস, অর্থপুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি প্রভৃতি)। শিক্ষাপদ্ধতির কোন সংস্কারের চেষ্টা করিতে গেলে শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই শঙ্কিত হইয়া পড়েন, পাছে বাহ্যিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির কোন ব্যাঘাত ঘটে।

তবু শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বাহ্যিক পরীক্ষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কোন দেশই এখনও তাহা করে নাই। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে, যেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর আস্থা রাখিতে পারি না সেখানে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র দানের প্রয়োজনে বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় চিন্তা করা যায় না। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশনও এই মতই পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যিক পরীক্ষার সংখ্যা সম্ভবমত কমাইয়া দিতে হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দিয়া কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হইতে ছাত্রদের অব্যাহতি দিলেন বলিয়া মনে করেন। প্রি-ইউনিভারসিটি এবং প্রিপেরেটরি কোর্সের শেষে একটা করিয়া পরীক্ষা থাকিবে বটে, কিন্তু ঐগুলি বাহ্যিক পরীক্ষা না হইয়া আভ্যন্তরিক পরীক্ষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তারপর, প্রশ্নপত্ররচনা এবং নম্বরদান উভয়ই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের প্রশ্নপত্র-রচনাকারী বা পরীক্ষক কেহই নবলব্ধ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতেছেন না। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে বাহ্যিক পরীক্ষার গলদ কিছু কমিবে বলিয়া কমিশন আশা করেন। সর্বশেষে কমিশনের মতে কোন পরীক্ষাই সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক থাকা উচিত নহে। ছাত্রের জ্ঞানের মান নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া আভ্যন্তরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরও গুরুত্ব দিতে হইবে।

কিভাবে পরীক্ষাপদ্ধতিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক করা চলে এবং কিভাবে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্রদানে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া চলে তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে।

এই আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আমাদের সমাজে যে এক নূতন ধরণের বাহ্যিক পরীক্ষার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার সহিত ঐ সব পরীক্ষার এখনও তেমন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র-দানের জন্য গৃহীত বাহ্যিক পরীক্ষার মত ইহারাও হয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ I.A.S., B.C.S. পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃত্তিতে নিয়োগকারীর প্রয়োজনেই ঐ ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; উপযুক্ত লোককে বাছাই করিয়া কর্মে নিয়োগ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে সরকার সমাজের সর্বপ্রধান নিয়োগকারী হইয়া পড়িতেছেন এবং সরকারী নিয়োগ যাহাতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে হয় তাহার জন্য পরীক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন। বর্তমানে কেরানী নিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম পদে নিযোগের জন্য নানা ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট যখন অধিকাংশ সরকারী কার্যের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে তখন প্রায় প্রত্যেক সরকারী চাকুরিতেই সম্ভতঃ পরীক্ষার ভিত্তিতে লোক-নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। কাজেই সমাজ-জীবনে তথা শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ সব পরীক্ষা প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সরকার ছাড়াও "টাটা" প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও হয়ত লোকনিয়োগের জন্য পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে পারে। ইহা ছাড়াও এমন অনেক বৃত্তিশিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের প্রবেশ পরীক্ষা (Admission Test) যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। সংক্ষেপে, বাহ্যিক পরীক্ষার অপকারিতা হইতে শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে হইল অমোদের যতগুলি সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক পরীক্ষা আছে তাহাদের সবগুলিকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সহিত একটি করিয়া পরীক্ষাগ্রহণ বিশেষজ্ঞ সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনের কথা অনেকে এখনই আলোচনা করিতেছেন।

আভ্যন্তরিক পরীক্ষা—আভ্যন্তরিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যভেদে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা যে বিভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়গুলি শুধু অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা ব্যতীত অন্য দুই ধরণের পরীক্ষার সহিত মোটেই পরিচিত নহে। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার ব্যাপারেও নিজের উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া বিদ্যালয় বাহ্যিক পরীক্ষার (স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার) অনুকরণ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষাগুলিও স্কুল ফাইন্যালের মত ৩ ঘণ্টা ধরিয়া হয় (প্রতিটি পেপার); উহাদের প্রশ্নপত্রের ধরণ এবং নম্বরদানের পদ্ধতিও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মত। ফলে, বাহ্যিক পরীক্ষার অধিকাংশ দোষ-ত্রুটিই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষায়ও বর্তাইয়াছে। এমনকি আভ্যন্তরিক পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তাহাও আমরা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষা শিক্ষার কোন প্রয়োজনেই লাগিতেছে না। কি উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষকগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা আশা করেন যে, পরীক্ষা ছাত্রদিগকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করিবে। প্রকৃতপক্ষে কোন ছাত্রই পরীক্ষা দিতে উৎসাহ বোধ করে না। পরীক্ষার 'ভয়ে' পড়াশুনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন বিদ্যালয়কে এই ভয় আরও কার্যকরী করিবার জন্য বছরে ৩।৪ বার মার্ক রিডিং (mark-reading) করিতে দেখিয়াছি—স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষকগণের সামনে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রেরা পরীক্ষায় নিজ নিজ নম্বর অনুসারে দাঁড়ায় এবং ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে নিজ ক্লাসে গিয়া বসে। অর্থাৎ পরীক্ষা, ছাত্রদিগকে পড়াশুনা করিতে বাধ্য করার নিমিত্ত এক ধরণের পুরস্কার বা শাস্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'মার্ক রিডিং প্যারেডে' যাহাদের প্রথম দিকে স্থান হইল তাহারা প্রশংসা এবং বিদ্যালয়ে সামাজিক মর্যাদা পুরস্কার হিসাবে পাইল এবং যাহারা নিচের দিকে পড়িল তাহারা তিরস্কার এবং সামাজিক হীনতা শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্রথম ৫।৬টি ছাত্রের নিকট পরীক্ষা পুরস্কারের প্রলোভন এবং অবশিষ্ট সকলের নিকট শাস্তির আশঙ্কা লইয়া উপস্থিত হয়। আমাদের মনে থাকে না যে,

সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির আশঙ্কায় কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে উপযুক্তভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশই যে শুধু ব্যাহত হইবে তাহা নহে, ইহার ফলে চরিত্রের বিকৃতিও অনিবার্য। তারপর একরকমের পুরস্কার বা শাসন দীর্ঘদিন কার্যকরী থাকে না। তাই পরীক্ষার প্রলোভন বা আশঙ্কা ছাত্রদের সম্মুখে সমানভাবে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পড়াশুনার প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতেছে। অপর দিকে তাহাদের মধ্যে নকল করা, মুখস্থ করা প্রভৃতি নানারকমের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাদের চরিত্রের বিকৃতি ঘটিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবকদের জানানো উচিত বলিয়া, মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, ইহা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কারণ-নির্ণয়কারী (Diognostic) না হওয়ার দরুণ অভিভাবকগণ পরীক্ষার ফলাফল হইতে ছাত্র পড়াশুনায় ভাল কি মন্দ এই সংবাদ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই জানিতে পারেন না—কিভাবে তাহাদিগকে পড়াশুনায় উন্নততর করা যায় তাহার কোন ইঙ্গিতই ঐ ধরণের পরীক্ষার ফলাফল হইতে পাওয়া যায় না। ফলে, অভিভাবকগণ ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাহাকে তিরস্কার করিতে পারেন বা তাহার জন্য গৃহশিক্ষক রাখিতে পারেন, কিন্তু পড়াশুনায় উন্নতি করিতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না (শুধু গৃহশিক্ষক রাখিলেই পড়াশুনায় উন্নতি হয় না, এসত্য এখন হয়ত অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন)।

তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করিবার পূর্বে তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া সকল বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই মনে করেন। এই প্রয়োজনের কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু ছাত্রদের এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করার ব্যাপারে বৎসরের শেষে একটি পরীক্ষাগ্রহণই যথেষ্ট, না সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক পরীক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন, একথা কেহই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অনুকরণে শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে

ছাত্রদিগকে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়া থাকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-রচনার ধরণ এবং উত্তর-পত্র পরীক্ষার পদ্ধতিও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মত হওয়ায় ঐসব পরীক্ষার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাহাতে গুরুতর গলদ থাকে (ঐসব গলদের কথা পরে আলোচিত হইবে)। সংক্ষেপে বর্তমানে আমরা যেভাবে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছি তাহাতে শিক্ষার কোন প্রয়োজন সাধিত না হইয়া বরং অপকারই হইতেছে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা-সংস্কারের চেষ্টা—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক পরীক্ষা উভয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ের সকল কার্যে উহাদের অবাঞ্ছিত প্রভাব শিক্ষাদানকার্যকে প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর পরীক্ষার কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন লিখিয়াছেন, "... the dead weight of the examination has tended to curb the teacher's intiative, to stereotype the curriculum, to promote the mechanical and lifeless methods of teaching, to discard all spirit of experimentation and to place the stress on wrong or unimportant things in education." পরীক্ষার বোঝা শিক্ষাব্যবস্থার ঘাড়ের উপর চাপিয়া থাকায় শিক্ষকদের শিক্ষাদানের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গতানুগতিক পাঠ্যসূচী, যান্ত্রিক এবং প্রাণহীন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার জন্যও এই ধরণের পরীক্ষা অনেকখানি দায়ী। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করিয়া ভ্রান্ত বা অপেক্ষাকৃত গৌণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর জোর দিতে বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা আমাদিগকে প্ররোচিত করিতেছে। ভারত সরকারের পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ে আমেরিকান পরামর্শদাতা ডাঃ ব্লুম আমাদের শিক্ষাসংস্কার-সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত পোষণ করেন—"The (present education) System consisting of examinations, syllabi, teaching methods and instructional materials —has formed a grand conspiracy to persuade every one involed in it to be lieve that learning is to be equated with rote memorization." বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা, পাঠ্যসূচী,

শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক সকলে যেন এক মহা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আমাদের সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, শিক্ষা এবং তোতাবৃত্তি একই কথা। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা এক 'পাপচক্রের' (vicious circle) মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই পাপচক্রের অবসান ঘটাইতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হার্টস তাঁহার 'An Examination of Examinations' পুস্তকে আমাদের নম্বরদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া (পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে) উহার সংস্কারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এই সংস্থা পরীক্ষাসংস্কারের জন্য বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিলেব উদ্যোগে ভারতের শিক্ষাবিদ্ এবং স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া ভূপালে এক 'আলোচনা সভা' (Seminar) আহ্বান করা হয়। এই সভা পরীক্ষা-সংস্কার-সমস্যা সকল দিক হইতে আলোচনা করিয়া ইহার সমাধানের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। এই পরামর্শগুলি মোটামুটিভাবে সর্বত্রই সমর্থিত হইয়াছে। তারপর পরীক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডাঃ ব্লুমকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনানো হয়। ডাঃ ব্লুম্ যেমন একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত পরীক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা চালান অপরদিকে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের সহিত এই সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে আলোচনাসভায় যোগ দেন। অধুনা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন দিল্লীতে পরীক্ষাসংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসংস্কার সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন স্থায়িভাবে একটি পরীক্ষাবিষয়ক সাব-কমিটিও (Evaluation Sub-Committee) গঠন করিয়াছেন। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার জন্য এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত প্রতি রাষ্ট্রে একটি করিয়া ষ্টেট ইভেলিউশান ইউনিট্ (State Evaluation unit) স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিম বাংলায়ও একটি ষ্টেট্ ইভেলিউশান ইউনিট স্থাপিত হইয়াছে। ব্যুরো অব্

এডুকেশন্যাল ও সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ নিজের দায়িত্বের অংশ হিসাবে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ চালু করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই সংস্থা ষ্টেট্ ইভেলিউশান ইউনিট্ যে ধরণের কাজ করিবে বলিয়া আশা করা যায় সে ধরণের কাজে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। তারপর প্রতি বৎসরই অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের উদ্যোগে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি) একত্র মিলিত হইয়া পরীক্ষাসংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিম বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরীক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটি এই ব্যাপারে কিছুটা কাজও করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষাসংস্কারের কাজে যে দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কাজে বাধা এত বেশী যে, বিশেষ কোন সফলতা এখনও লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

পরীক্ষাগ্রহণের বৈজ্ঞানিক নীতি—পরীক্ষাসংস্কারের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা আমাদের এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। গতানুগতিকতার দাসত্ব না করিয়া সমগ্র পরীক্ষাগ্রহণ কার্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সংগৃহীত জ্ঞানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি একটি পরিমাপ যন্ত্রমাত্র। যেমন, কাপড পরিমাপের জন্য গজের প্রচলন হইয়াছে, চাউলের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য দাড়িপাল্লা তৈরী করা হইয়াছে, রাসায়নিক দ্রব্যের ওজন ঠিক করিবার জন্য মেজার গ্লাস (Measure glass) উদ্ভাবন করা হইয়াছে, তেমনি শিক্ষার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এই কার্যে সর্বপ্রথমই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পরিমাপের বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে পরিমাপ"যন্ত্রের পার্থক্য হইয়া থাকে। কাপড়ের এবং চাউলের পরিমাপ যেমন এক মানযন্ত্র দ্বারা করা যায় না, অর্জিত জ্ঞান এবং চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের পরীক্ষাও তেমনি একই পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষায় উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে পরীক্ষা-পদ্ধতির পার্থক্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিমাপ-যন্ত্র নির্ভরযোগ্য না হইলে পরিমাপ নির্ভুল হইতে পারে না। অর্থাৎ কাপড় মাপিবার 'গজ' যদি এমন হয় যে একই কাপড় দুই বার মাপিলে দুই মাপ হয় তবে ঐ গজের উপর নির্ভর করা চলে না। একই

কাপড় অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার পরিমাপ করিলে কম-বেশী হইতে পারে না ; হয়ত বা গজটি ইলাষ্টিক দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া বারবার টানাটানিতে লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, তাই ঐ 'গজ' দিয়া একই কাপড় দ্বিতীয় বার মাপিলে প্রথম-বারের চেয়ে মাপ কম হইয়া পড়িয়াছে ; পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। প্রথমতঃ, আমাদের পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বা রিলায়েবিলিটির (Reliability) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে ; অর্থাৎ অল্প সময়ের ব্যবধানে কোন ছাত্রকে একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্য লইয়া বার বার পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি একই হওয়া উচিত। ইহা না হইলে পরীক্ষাপদ্ধতি নির্ভরযোগ্য (Reliable) নয় বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ঐ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা অনুচিত মনে করিতে হইবে।

তারপর, মনে রাখিতে হইবে যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া নহে ; সমান বয়সের বা এক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে কাহারও স্থান নির্ণয় করাই পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধরা যাউক, আমরা কোন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্রের ইংরেজীর জ্ঞান পরীক্ষা করিতে চাই। আমরা জানিতে চাই যে, ঐ শ্রেণীর ৪০টি ছাত্রের মধ্যে কাহার ইংরেজীর জ্ঞান কাহার অপেক্ষা কতখানি কম বা বেশী। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া নম্বর দেওয়া হয়। অর্থাৎ দুইটি ছাত্রের মধ্যে ইংরাজীর পরীক্ষায় যদি একটি ৩০ এবং অপরটি ৪০ পায় তাহা হইলে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাত্রটির ইংরেজীর জ্ঞান ১০ নম্বরের পরিমাণ বেশী এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি। কিন্তু নম্বর না দিয়া আমরা যদি বলিতে পারি যে, ইংরেজী জ্ঞানে প্রথম ছাত্রটি শ্রেণীর মধ্যে মাঝামাঝি এবং দ্বিতীয় ছাত্রটি তাহার এক "পয়েন্ট" উপরে তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। শ্রেণীর সকল ছাত্রকে জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে পাঁচটি বিভাগে বা পয়েন্টে ভাগ করিলে উহা মোটামুটি এই ধরণের হইতে পারে।

আবার কোন পরীক্ষায় ছাত্রটির স্থানের সহিত অপর পরীক্ষায়

তাহার স্থানের তুলনা করিতে হইলে (সে উন্নতি বা অবনতির পথে চলিতেছে ইহা বিচারের উদ্দেশ্যে) নম্বর দেওয়া অপেক্ষা উপরি-উক্ত ধরণের বিচার বেশী কার্যকরী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দুই পরীক্ষার মানের তারতম্যের জন্য, এক পরীক্ষায় ৩০ নম্বর পাওয়ায় ছাত্রটির স্থান 'মাঝারি' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে অথচ অপর পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থান মাঝারির নীচে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কাজেই, কেবল মাত্র নম্বরের দ্বারা শ্রেণীতে কোন ছাত্রের 'স্থান' নির্ধারণ করা যায় না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু নিজ বিদ্যালয়ে নিজ শ্রেণীতে ছাত্রের স্থান নির্ধারণের সার্থকতা অপেক্ষা সমগ্র রাষ্ট্রের (যেমন, পশ্চিমবঙ্গ) ছাত্রদের (নিজ শ্রেণীর) মধ্যে তাহার স্থান নির্ধারণ করার সার্থকতা অধিক। পরীক্ষায় নম্বরদান কালে নম্বরদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা আমাদের অনেকেরই মনে থাকে না।

সর্বশেষে, যে বস্তু পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, পরীক্ষার দ্বারা উহা ঠিক ঠিক পরিমাপ হইতেছে কিনা ইহাও যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। কোন পার্থিব (material) বস্তু পরিমাপের বেলা ঐ ধরণের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ, বস্তুটি আমাদের চোখের সামনে থাকে ; কাপড় মাপিতেছে কি চাল মাপিতেছে, পাগল না হইলে এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবে না। কিন্তু জ্ঞান, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, আগ্রহ, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি দৃশ্যবস্তু নহে। উহাদের একটি পরিমাপ করিতে গিয়া অপরটি পরিমাপ করা অসম্ভব নহে ; অনেক সময়ই আমরা ঐরূপ ভুল করিয়া থাকি। ধরা যাউক, রচনামূলক প্রশ্নের সাহায্যে ইতিহাসের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা হয়ত ছাত্রের ভাষাজ্ঞান ও রচনার ক্ষমতাই বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি। তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতিতে নানারূপ পদ্ধতি ও কৌশলের সাহায্যে, যাহা পরিমাপের চেষ্টা করা হইতেছে, ঠিক তাহাই পরিমাপ করা হইতেছে কিনা উহা বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। এই যাচাই করাকে ইংরেজীতে ভ্যালিডিটি (validity) ঠিক করা বলে।

আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা—উপরি-উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশের প্রচলিত বাহ্যিক পরীক্ষাগুলির সংস্কারের

বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া আমরা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার কথাই আলোচনা করিব। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য অপরাপর সকল বাহ্যিক পরীক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই মোটামুটি প্রযোজ্য।

শিক্ষা পরিমাপ যন্ত্রের রিলায়েবিলিটি ও ভ্যালিডিটি—অধুনা, স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় থিওরিটিক্যাল (Theoretical) ও প্র্যাকৃটিক্যাল (Practical) উভয়বিধ পরীক্ষাই গ্রহণ করা হইতেছে। বর্তমান আলোচনা মোটামুটি থিওরিটিক্যাল (Theoretical) পরীক্ষার বিষয়েই সীমাবদ্ধ করা হইল।

এই আলোচনার প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র (উহার নম্বরদান-পদ্ধতিসহ) এক একটি পরিমাপ যন্ত্র। এই মানযন্ত্র প্রতিবৎসর নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাপড় পরিমাপের মানযন্ত্র 'গজের' সহিত তুলনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন নহে যে একটি গজ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল এবং তাহার সাহায্যে কাপড়, ধুতি, শাড়ি, জামার ছিট ইত্যাদি সব কিছু বৎসরের পর বৎসর পরিমাপ করা যাইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে প্রতি বৎসর প্রতিটি প্রশ্নপত্রের রিলায়েবিলিটি (Reliability) এবং ভ্যালিডিটি (Validity) নূতন ভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে তাহা সম্ভব না হইলে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 'মানসিক পরীক্ষার' (Mental Test), 'রিলাইয়েবিলিটি' ও 'ভ্যালিডিটি' বৃদ্ধি পায় বলিয়া আমরা জানি বিধিবদ্ধভাবে সেই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রশ্নপত্র রূপ পরিমাপ যন্ত্র—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের শিক্ষা-পরিমাপের উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। ডাঃ ব্লুম তাঁহার বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়া আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দোষ-ত্রুটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন—'The questions I found in these examinations required little more than rote memorization of some details presumably learned in the class-room. Inspection and comparison of examinations in different years revealed something of the pattern of these

questions : favourite questions are repeated ; slight changes are made in the wording of questions in successive years. Most of the questions appeared to be of a sort that might be thought about on the last day or a short time before the examination-material was due. Rarely did I encounter questions which suggested that the paper-setter had given careful thought to the matter over an extended period of time. In short, the questions were routine and stereotyped—as though every one was quite weary with the system and was mainly going through the formalities required by it.' সংক্ষেপে ডাঃ ব্লুমের মন্তব্য এরূপ দাঁড়ায়—স্কুল ফাইন্যালের প্রশ্নপত্রগুলি (সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ে শিখাইয়া দেওয়া) শুধু তোতাবৃত্তিরই পরীক্ষা করে। তারপর বিভিন্ন বৎসরের পরীক্ষাপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় এক ধরণের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। প্রশ্নপত্র রচনাকারীর হয়ত কয়েকটি প্রিয় প্রশ্ন আছে ; সামান্য ভাষার পরিবর্তন করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহাই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। প্রশ্নগুলির ধরন এমন যে দেখিয়া মনে হয়, প্রশ্নপত্র, কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আগের দিন বসিয়া উহা রচনা করা হইয়াছে—প্রশ্নপত্রগুলিকে যথোচিত যত্ন এবং দীর্ঘদিনের চিন্তা এবং পরিশ্রমের ফল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলি একেবারেই যান্ত্রিক এবং গতানুগতিক। মনে হয় সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন এই ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কোন রকমে বাহ্যিক আইনকানুনগুলি বাঁচাইয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

যে সব কারণ উপরি-উক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার প্রথমেই মনে রাখিতে হয় যে ঠিক কি পরিমাপ করার চেষ্টা করা হইতেছে, এ বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনাকারীর কোন সঠিক ধারণা থাকে না। প্রশ্নপত্র রচনার জন্য পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠ্যসূচী থাকে বটে কিন্তু উহা হইতে কোন বিষয় পাঠ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় না। ডাঃ ব্লুম আমাদের মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন ইহা প্রাসঙ্গিক হইবে মনে করি।

ডাঃ ব্লুমের মতে ঐ পাঠ্যসূচীগুলি কতকগুলি বিষয়ের (topics) তালিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করা সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষকদের চেষ্টা থাকে যে কোন রকমে বিষয়গুলি, (পাঠ্য পুস্তকে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ছাত্রদের মুখস্থ করাইয়া দেওয়া এবং পরীক্ষকের উদ্দেশ্য থাকে ঐগুলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি ছাত্রেরা মুখস্থ করিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা। ঐ ধরণের পাঠ্যসূচী সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষকের পক্ষে ঠিক কি পরিমাপ করিতে হইবে সে বিষয়ে মন স্থির করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এক জিনিষের পরিবর্তে অপর জিনিষ পরিমাপিত হইলে ছাত্রসম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আমাদের সত্যের পরিবর্তে ভ্রান্তির পথে লইয়া যাইবে এবং পরীক্ষার ভ্যালিডিটি (validity) নষ্ট হইবে। ধরা যাউক, বিজ্ঞানের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা যদি এমন ধরণের প্রশ্ন করি যে, তাহার উত্তর হইতে বিশেষভাবে মুখস্থ করার ক্ষমতাই পরীক্ষিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা এক জিনিষের বদলে অপর জিনিষ পরিমাপ করিতেছি। কাজেই যে বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচনা করিতেছি সেই বিষয় পড়ানোর তথা পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য প্রথমেই সঠিকভাবে নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক, আমি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর প্রশ্নপত্র রচনা করিতে বসিয়াছি। প্রথমেই আমি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কি পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিব সে বিষয় স্থির করিয়া লইব—

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য—

১। ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা।

২। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্যের জ্ঞান।

৩। ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলির সম্বন্ধের জ্ঞান।

৪। ভারত ইতিহাসের উপর বিশেষ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারকারী ঘটনাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫। ভারত ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তির অবদান সম্বন্ধে ধারণা।

৬। ভারতের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করার ক্ষমতা।

৭। ইতিহাসপাঠে আগ্রহের পরিমাণ।

শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। প্রশ্নপত্র রচনাকালে ঐ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে কতখানি গুরুত্ব দিতে হইবে তাহাও স্থির করিয়া লইতে হইবে। ধরা যাউক, ইতিহাস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যদি আমি ১০০ নম্বরের উপর রচনা করিতে চাই, তাহা হইলে ইতিহাস পরীক্ষার যে সাতটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টি পরীক্ষার জন্য কত নম্বরের উপর প্রশ্ন করিব তাহা প্রথমেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। উপরি-উক্তভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলে পরীক্ষার ভ্যালিডিটি (validity) যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর আসে পরীক্ষা গ্রহণের পন্থা নির্ণয়ন-সমস্যা। নানা ধরণের পরীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে পরীক্ষা করা চলে। পরীক্ষার্থীদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া (group) নির্দিষ্ট কাজ করিতে দিয়া, তাহার ভিত্তিতেও তাহাদের জ্ঞানের পরিমাপ করা চলে। আবার লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও আমরা পরীক্ষা করিয়া থাকি। স্কুল ফাইন্যালে বিভিন্ন বিষয়ে (subjects) আমরা যে পরীক্ষা করিতে চাই তাহা লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন ভাবে করা সম্ভব নহে ; যদিও এই মাধ্যম কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অসন্তোষজনক মনে হইতে পারে (দৃষ্টান্ত, ইতিহাসপাঠে আগ্রহের পরিমাণ নির্ণয় করা)। লক্ষাধিক ছাত্রকে এক বিষয়ে একই ভাবে অল্প সময়ের মধ্য পরীক্ষা করার আর কোন পন্থাই আমাদের এখনও জানা নাই।

লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা আবার নানা ধরণের হইতে পারে—১। প্রচলিত, রচনামূলক (Essay-type) ; ২। ছোট উত্তরমূলক (Short answer-type) ; ৩। নৈর্ব্যক্তিক (Objective-type). নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা আবার দুই রকমের হইতে পারে—(ক) যাহা প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (standardised), (খ) যাহা প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত নহে।

উপরি-উক্ত এক একটি পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এক একটি পরিমাপ-যন্ত্র। পরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে স্থির করিয়া লইবার পর চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন ধরণের পরিমাপ-যন্ত্রের সাহায্যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কিনা

তাহার পরীক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় রচনাক্ষমতা পরীক্ষা করিতে হইলে হয়ত রচনামূলক পরীক্ষাপদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শব্দ-সম্ভারের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হয়ত অধিকতর উপযুক্ত। কোন এক বিশেষ ধরণের পদ্ধতির সাহায্যে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির সব কয়টিকে কিছুতেই যথাযথভাবে পরীক্ষা করা চলিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাহ্যিক পরীক্ষাগুলি নির্বিচারে রচনামূলক পরীক্ষাকেই একমাত্র পরিমাপ-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। রচনামূলক পরীক্ষায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের রচনা লিখিতে বলা হয় এবং লিখিত রচনা হইতে যে কোন বিষয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ স্থির করিতে চেষ্টা করা হয়। একমাত্র অঙ্কের পরীক্ষায় ইহার ব্যতিক্রম হয়। অঙ্কের মাধ্যম ভাষা না হইয়া সংখ্যা হওয়ার দরুণই হয়ত ইহা রচনামূলক পরীক্ষার আওতা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। পরিমাপ-যন্ত্র হিসাবে রচনামূলক পরীক্ষার দোষ-ত্রুটি লইয়া আলোচনা করা হইতেছে। ইহাকে বাহ্যিক-পরীক্ষা বা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনাও বলা যাইতে পারে।

১। তিন ঘণ্টা পরীক্ষা গ্রহণকালের মধ্যে (পরীক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তির জন্যই একসঙ্গে ইহার অধিক সময় পরীক্ষা গ্রহণ করা চলে না) পরীক্ষার্থীকে স্বভাবতঃ ৫।৬টির বেশী রচনা লিখিতে বলা চলে না। কিন্তু যে-কোন বিষয়ে শিক্ষা-পরিমাপের উদ্দেশ্য স্থির করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে, তাহাদেরই সংখ্যা ৬।৭টির কম নহে। ফলে প্রত্যেকটি 'উদ্দেশ্যের' জন্য একটি করিয়া প্রশ্ন করাও রচনামূলক পরীক্ষায় সম্ভবপর নহে। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রশ্নের সংখ্যার উপর পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (reliability) অনেকখানি নির্ভর করে। নানা কারণেই এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, দীর্ঘ দিন ধরিয়া (এক, দুই বা তিন বৎসর) যে শিক্ষা দেওয়া হইল ৫টি বা ৬টি রচনার মাধ্যমে তার সুষ্ঠু পরিমাপ কিছুতেই সম্ভব নহে। বেশী জিনিষ অল্প সময়ের মধ্যে পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের নমুনার (sample) উপর নির্ভর করিতে হয়। ধরা যাউক আমাকে যদি অল্প সময়ের মধ্যে একশত বস্তা চালের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, তবে প্রথমেই আমাকে চালের বস্তাগুলিকে তাহাদের প্রকারভেদে (বাঁকতুলসী, চামরমণি ইত্যাদি)

ভাগ করিয়া লইতে হইবে এবং প্রত্যেক ভাগ হইতে ২।৩টি বস্তার কিছু কিছু চাল লইয়া পরীক্ষা করিয়া ঐ একশত বস্তা চালের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সমস্যাও অনেকটা একই ধরণের। অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর ২ বা ৩ বৎসরের শিক্ষার পরিমাপ করিতে হইবে। প্রশ্নপত্র রচনার প্রারম্ভেই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার ক্ষেত্রকে যে ভাগ করিয়া লইতে হয় এ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। তারপর প্রত্যেক বিভাগে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া প্রশ্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, রচনামূলক পরীক্ষায় শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়াও প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। ফলে ঐ ধরণের পরীক্ষায়, পরীক্ষক শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্র হইতে ৫।৬টি প্রশ্ন, নিজের খেয়াল-খুশীমত বাছিয়া লন। শিক্ষার পরিমাণের তুলনায় প্রশ্নের সংখ্যা কম থাকায় তিনি বিধিবদ্ধভাবে প্রশ্ন বাছাই করতে পারেন না। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রতি বিষয়েই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন স্থির হইয়া গিয়াছে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার ঐ প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞাসিত হয়। তাই 'প্রশ্নোত্তরিকা', 'বোধিনী' প্রভৃতি ধরণের পুস্তকের প্রচলন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐসব পুস্তকের সাহায্যে "বাছাই করা প্রশ্ন" মুখস্থ করিয়া ছাত্রেরা পরীক্ষা দিতে আসিতেছে। "বাছাই করা প্রশ্নের" বাহিরে প্রশ্ন করিলে দলবদ্ধভাবে ছাত্রগণ পরীক্ষা না দিয়া নানারূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতেছে। আবার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার ধৈর্য পর্যন্ত অনেক পরীক্ষার্থীর থাকে না। তাহারা 'অনুমানের' উপর নির্ভর করিয়া উহাদের মধ্যে আবার বাছাই করিয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে। অনুমান অনুযায়ী প্রশ্ন আসিলে তাহারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় আর তাহা না হইলে একেবারে 'ফেইল' হইয়া যায়। পরীক্ষা দেওয়া যেন অনেকটা জুয়াখেলার মত হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষায় ফলাফল লটারিতে টাকা পাওয়ার মত যে 'ভাগ্যের কথা' ইহা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হইল। কোন স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিয়া নম্বর পাইল শূন্য। কারণ সে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটিরও উত্তর না করিয়া তাহার মুখস্থ করা অপর প্রশ্নের

উত্তর করিয়াছে। তাহার মুখস্থের মধ্যে প্রশ্ন না আসায় সে দমিয়া না গিয়া যে কয়টি প্রশ্ন মুখস্থ করিয়াছিল তাহার মধ্য হইতে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করিয়া গিয়াছে। তাহার 'ভাগ্যে' নিজ বাছাই করা প্রশ্নগুলি যদি পরীক্ষায় আসিয়া যাইত তবে সে প্রায় ৬০ নম্বর পাইত; দুর্ভাগ্যের ফলে উহাদের মধ্যে একটিও না আসায় সে শূন্য পাইল। এই অবস্থায় পরীক্ষার ফলের অনিশ্চয়তা থাকার দরুণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকালীন উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বশেষে এই ধরণের পরিমাপ-যন্ত্রের (প্রশ্নপত্রের) সাহায্যে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা হইতে কি যে পরিমাপ হইতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। পরীক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই যেন পরীক্ষা করা হইতেছে। স্বভাবতই ঐ ধরণের পরীক্ষার 'রিলায়েবিলিটি' ও 'ভ্যালিডিটি' দুইই খুব কম।

২। রচনামূলক পরীক্ষায় ভাষার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া বিষয়বস্তু নির্বিশেষে, ভাষার মাধ্যমে লিখিতভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব পড়িয়া যায়। স্কুল-ফাইন্যালের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্ন-পত্রের উপরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হয় যে, বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাইবে (বানান ভুল করা বাঞ্ছনীয় নয় নিশ্চয়, কিন্তু ইহা ভূগোল বা ইতিহাসের পরীক্ষার পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম নহে ইহাও সত্য)। পরীক্ষকদের নিকট নির্দেশ যায় যে, উত্তর পরীক্ষাকালে তাহারা যেন চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু নির্দেশ-দানকারীরা হয়ত ভুলিয়া যান যে, পরীক্ষার্থীকে ঐসব গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ কেবলমাত্র লিখিত ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া যাইতেছে—অনেক ছাত্রের ঐসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র লিখিত ভাষায় আত্মপ্রকাশে দক্ষতা নাই বলিয়া পরীক্ষক তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তবিচার করিতেছেন। সংক্ষেপে, অঙ্ক ব্যতীত অপর প্রায় সকল বিষয়েই প্রচলিত পরীক্ষা প্রধানতঃ রচনাশক্তির পরীক্ষাই করিয়া আসিতেছে।

৩। সাহিত্য-পরীক্ষায় রচনা শক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ধরণের প্রশ্ন করা হয়, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও প্রশ্ন করিতে মোটামুটি তাহারই অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ধরা যাক্, ইতিহাস পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকিল, 'আকবরের জীবনী পর্যালোচনা কর'। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে

(সাহিত্যে 'দেশ পর্যটন' সম্বন্ধে রচনা লেখার মত) চিন্তাশক্তি, কল্পনাপ্রবণতা, ভাষার সাবলীলতা প্রভৃতি প্রকাশের প্রচুর সুযোগ থাকে। কিন্তু ইতিহাস পরীক্ষায় ইহাদের একটিকেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করিতে চাহি না। তারপর ঐ ধরণের যে কোন প্রশ্নের বিভিন্ন প্রকারের উত্তর সম্ভব বলিয়া এবং প্রশ্নের মাধ্যমে ঠিক কি পরীক্ষা করা হইতেছে সেবিষয়ে পরীক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকে না বলিয়া পরীক্ষকে পরীক্ষকে নম্বরদানে গুরুতর পার্থক্য হয়। হার্টস্ সাহেব তাহার 'পরীক্ষার পরীক্ষা' (Examination of Examinations 1935) নামক পুস্তকে এই পার্থক্য যে কত গুরুতর হইতে পারে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। একই পরীক্ষার খাতায় বিভিন্ন পরীক্ষক স্বাধীনভাবে নম্বর দিলে পরস্পরের মধ্যে ২৫।৩০ নম্বরের পার্থক্য থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। পরীক্ষার্থীদের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময়েই কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় উত্তর জানা সত্ত্বেও পরীক্ষক ঠিক কি চান তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মনোমত উত্তর করিতে পারে না। প্রশ্নের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুণ পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং পরীক্ষাথী উত্তর করিয়াছে 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য'। কিন্তু পরীক্ষক চান যে, এই প্রশ্নের উত্তরে সে চন্দ্রগুপ্তের বংশধারা এবং সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত তাঁহার জীবনীর পর্যালোচনা করিবে। কিন্তু প্রশ্নের ভাষায় পরীক্ষকের মনোভাব প্রকাশ না হওয়ার দরুণ জানা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থী তাঁহার মনোমত উত্তর করিতে পারিল না। এই পরিস্থিতির ফলে পরীক্ষার্থীরা নিজ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া উত্তর করিতে সাহস পায় না। 'নোট' বই-এর উত্তর না বুঝিয়া পরীক্ষার্থী মুখস্থ করে ; আর নোট বই-এর লেখক যদি পরীক্ষক হন তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই কারণে নোট লেখকদের অধুনা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে না। কিন্তু ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে এই ধরণের আইন-কানুনের সাহায্যে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব নহে।

৪। রচনামূলক প্রশ্নপত্রের সবকয়টি প্রশ্নই মোটামুটিভাবে এক ধরণের সহজ বা কঠিন থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষাথার মধ্যে পার্থক্য ধরিতে হইলে

প্রশ্নপত্রে সহজ ও কঠিন দুই ধরণের প্রশ্নই থাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন খুব কঠিন হইয়া পড়িলে, খুব ভাল ছেলে ব্যতীত অপর কেহ তাহার উত্তর করিতে পারে না। ফলে মাঝারি ও খারাপ ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে না। প্রশ্ন সহজ হইলে সকল ছাত্রই তাহার উত্তর করিতে পারে এবং ফলে মাঝারি এবং ভাল ছাত্রদের মধ্যে প্রভেদ ধরা পড়ে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা করিলে কিছু প্রশ্ন সহজ, কিছু প্রশ্ন কঠিন এবং বেশীর ভাগ প্রশ্নই মাঝারি-ধরণের-কঠিন করিয়া রচনা করিতে হয়। যেখানে মাত্র ৫।৬টি প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে সেখানে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে প্রশ্ন রচনা করা সম্ভব নহে। রচনামূলক প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহাও ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র বিষয় না পড়িয়া অনুমানের ভিত্তিতে বাছাই করা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিতে পরীক্ষার্থীদিগকে ইহা আরও উৎসাহিত করে। তারপর বিকল্প প্রশ্নগুলি অনেক সময়েই সমান সহজ বা কঠিন হয় না। সুতরাং 'উপযুক্ত' প্রশ্ন বাছাই করার উপরও পরীক্ষার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে।

৫। উত্তরপত্রে নম্বরদান-পদ্ধতির গলদ রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটি আরও বাড়াইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রতি প্রশ্নপত্রে ১০০ শত নম্বর থাকে। প্রশ্নপত্রকে পরিমাপ-যন্ত্র মনে করিলে বলিতে হয় যে, প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ আছে। পরীক্ষার্থীরা শূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া একশত পর্যন্ত যে-কোন নম্বর পাইতে পারে। জড়বস্তু পরিমাপ করার কোন যন্ত্রেও এত অধিক পরিমাণ বিভাগ থাকে না (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাপড় পরিমাপের জন্য প্রস্তুত গজে এক ইঞ্চি করিয়া ৩৬টি বিভাগ থাকে মাত্র)। মানসিক বস্তু পরিমাপের জন্য প্রস্তুত পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ থাকিলে এই যন্ত্র যে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের মান নির্ণয়ের জন্য অবশ্য সাধারণতঃ ১০ হইতে ২০ পর্যন্ত নম্বর বা বিভাগ থাকে। কিন্তু প্রশ্নের বিভাগ ১০ই হউক বা ২০ই হউক, কোন বিভাগই সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত নহে। অর্থাৎ ঠিক কি ধরণের উত্তর লিখিলে পরীক্ষার্থীকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে বা ঠিক কত নম্বর দিতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সঙ্কেত পরীক্ষকের নিকট থাকে না। (তুলনীয় 'গজের' ৩৬টি বিভাগের মধ্যে প্রত্যেকটি বিভাগ নির্দিষ্ট করা থাকে

কাপড়খানি কতখানি লম্বা হইলে ১০ ইঞ্চি বা ১২ ইঞ্চি হইবে গজের মধ্যে ফেলিয়া তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে)। সমগ্র উত্তরটি পড়িয়া উহা মোটামুটি কত নম্বর পাইবে বা পরিমাপ-যন্ত্রের কোন্ বিভাগে পড়িবে সে সম্বন্ধে পরীক্ষককে স্বকীয় মত গঠন করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে ইংরাজিতে 'রেটিং' (Rating) বলে। এই পদ্ধতির সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ করা সম্ভব নহে। এই পদ্ধতির পরিমাপের দ্বারা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সূক্ষ্মতম তারতম্য ধরিতে চেষ্টা করিলে স্বভাবতই ভ্রান্ত হইতে হইবে। কয়লা পরিমাপের দাঁড়ি দিয়া যেমন কোন জিনিসের ওজন আধ ছটাক কম বা বেশী ধরা সম্ভব নয়, 'রেটিং' পদ্ধতির সাহায্যে তেমনি কোন উত্তরপত্রে এক নম্বর বা দুই নম্বর কম বা বেশী দিতে হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা সম্ভব নহে। 'রেটিং' পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্রে সাতটির অতিরিক্ত বিভাগ থাকিলে পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকিবে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ থাকার দরুণ 'রেটিং' পদ্ধতির স্বাভাবিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, কার্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই বাস্তবক্ষেত্রে,স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কোন ছাত্র কোন প্রশ্নের উত্তর করিয়া কত নম্বর পাইবে তাহা অনেকখানি পরীক্ষকের নিজের ধারণা এবং মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভর করে।

পরিচালনা-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির গলদ আরও বৃদ্ধি পায়। বাহিরের লোককে প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া আমাদের রীতিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের মান ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ ধারণা থাকে না। পাঠ্যসূচী যে প্রশ্নপত্রের রচনাকারীকে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার পরিধি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় "বাহিরের" পরীক্ষক তাঁহার পূর্ববর্তী প্রশ্নপত্র রচনাকারীর পদাঙ্কনুসরণ করেন (কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে প্রশ্নপত্র রচনার সময় পূর্ব বৎসরের একখানা প্রশ্নপত্র সর্বদাই পাঠাইয়া থাকেন)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপূর্ব বৎসরের প্রশ্নপত্র হইতে প্রশ্ন বাছাই করিয়া তিনি নিজের প্রশ্নপত্র রচনা করেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া একই ব্যক্তি একই বিষয়ে

প্রশ্নপত্র রচনা করিলে এই কাজে আরও সুবিধা হয়। বস্তুত পক্ষে পাঠ্যসূচী হইতে যে সব প্রশ্ন বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া (Stock questions) পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়, সেইগুলিই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এবং ঐ প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে কোন পরীক্ষায় প্রশ্ন না পড়িলে পরীক্ষাথাদের মধ্যে অসন্তোষ এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখা দেয়। ঐ ধরণের প্রশ্নপত্রের জন্য কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে "নোট" বইএর প্রচলন এবং ছাত্রদের মধ্যে না বুঝিয়া মুখস্থ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

৭। কি ধরণের যোগ্যতা থাকিলে পরীক্ষকের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়, পরীক্ষক নিয়োগ করার সময় কর্তৃপক্ষ তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখেন না। প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও উপর এই কার্যের দায়িত্ব ছাড়িযা দেওয়া উচিত নয়—পরীক্ষকগণের প্রশ্নপত্র রচনায় এবং উত্তরপত্র পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র রচনাকারীরা শুধু 'বাহিরের লোকই' নহেন, প্রশ্নপত্র রচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই নাই। ফলে, রচনামূলক প্রশ্নপত্রের রচনা এবং তাহার উত্তরপত্র পরীক্ষাকে যতদূর উন্নত করা চলে ততদূরও করার কোন চেষ্টা হয় না। অধিকন্তু পরীক্ষকের অজ্ঞতার জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি আরও বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রশ্নপত্রের ভাষায় ত্রুটির জন্য অনেক সময় পরীক্ষার্থী এবং উত্তর-পত্র পরীক্ষাকারী উভয়ই বিভ্রান্ত হন। কখনও কখনও প্রশ্নের ভাষা হইতে ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। ধরা যাক প্রশ্ন থাকিল "লর্ড ক্লাইভ সম্বন্ধে টীকা লিখ"। এই টীকায় লর্ড ক্লাইভের জীবনী আলোচনা করিতে হইবে, না ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদানের আলোচনা করিতে হইবে, না তাঁহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলির উপর জোর দিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। ঐ ধরণের সাধারণ ভাবের (general) প্রশ্ন পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপন্থী।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা উন্নত করার উপায়—স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কারের জন্য যে সব পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে, আলোচনার

সুবিধার জন্য তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্বপ্রথমেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থপনার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯১৭ খৃঃ) পরামর্শ দেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পত্র বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ সংস্থা (Central Advisory Board of Education) ও এই পরামর্শের সমর্থন করেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র করিলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করণই হইবে মাধ্যমিক শিক্ষাদানের এক মাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গলদ থাকিলে পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদ দূর করা যাইবে না। ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্নপত্রের প্রবর্তন অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনেই করা হইয়াছে। বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নাম পরিবর্তিত করিয়া স্কুল-ফাইন্যাল রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র হিসাবেই তাহার যত মর্যাদা। ফলে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা পদ্ধতির সংস্কার করা সম্ভব হইতেছে না। বর্তমানে অনেকে দুই ধরণের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র চাহিবে তাহাদের জন্য এক ধরণের পরীক্ষা এবং যাহারা মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তাহাদের জন্য অন্য ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরামর্শ কার্যকরী করিতে পারিলে পরীক্ষা-গ্রহণ, পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে অধিকতর সুষ্ঠু এবং উদ্দেশ্যমূলক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার গ্রহণের দায়িত্ব সরাইয়া লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের হাতে ঐ পরীক্ষার ভার ন্যস্ত করা কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশনের আর একটি প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব ভারতের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই (পশ্চিমবঙ্গেও) কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐরূপ পরিবর্তনের ফলে পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, শুধুমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ-সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। ঐ সংস্থার সঙ্গে একটি গবেষণা বিভাগও সংযুক্ত থাকিবে। বর্তমানে প্রতি রাষ্ট্রে যে

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ সংস্থা (State Evaluation Unit) স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা পরীক্ষাগ্রহণের জন্য স্থাপিত বিশেষজ্ঞ সংস্থার গবেষণা বিভাগরূপে কাজ করিতে পারে। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব ঐরূপ বিশেষজ্ঞ সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে এবং তাহাতে ফলও ভাল হইতেছে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন এক একটি রাষ্ট্রের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে একাধিক পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা স্থাপনের জন্যও প্রস্তাব করেন। কমিশনের মতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হইলে পরীক্ষাগ্রহণ কার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাইবে। কিন্তু উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি তেমন কিছু বৃদ্ধি করিতেছে না। অধিকন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইলে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের পরীক্ষার মান ভিন্ন ভিন্ন হইলে উহা আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে পারিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য খুব গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না।

বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে। এই নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ না করিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র রচনা করা সম্ভব হইবে না। উত্তরপত্র-পরীক্ষকদেরও ঐ কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ট্রেনিং থাকা উচিত। আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তর-পত্র পরীক্ষার বিশেষ স্থান থাকিলে উপরি-উক্ত ধরণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানযুক্ত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাব হইবে না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতৃ সংস্থা (Central Advisory Board of Education) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন উভয়েই দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বাহ্যিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিমাপ হইতে পারে না। আজকাল সকলেই একমত যে, বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের (Cumulative Record Card) ভিত্তিতে রক্ষিত ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিমাপ বাহ্যিক-পরীক্ষার পরিমাপের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারিলে ছাত্রের শিক্ষার সঠিক পরিমাপ কিছুতেই হইতে

পারে না। আশা করা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সহিত কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখিতে পারিলে স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেটের জন্য একদিন হয়ত কোন বাহ্যিক পরীক্ষার প্রয়োজনই হইবে না। একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে রক্ষিত পরিমাপগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত সংস্কার (refinement) করিয়া তাহার ভিত্তিতে স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য মাধ্যামিক শিক্ষাপর্ষদকে পরামর্শ দিতে পারেন। ঐ সার্টিফিকেট কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ধরণেরই হইবে। ইহাতে একদিকে ছাত্র সম্বন্ধে যেমন অনেক অধিক সংবাদ পাওয়া যাইবে অপর দিকে প্রতিটি সংবাদ বা পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতাও হইবে অনেক বেশী। বাহ্যিক পরীক্ষাগ্রহণের কুফল হইতেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মুক্ত হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে এখনও কিছুটা বিলম্ব হইবে, কারণ প্রথমে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড সুষ্ঠুভাবে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, সমগ্র স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া পৃথক পৃথক সময়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনই হিন্দী, সামাজিক-জ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা বিদ্যালয় কর্তৃক নবম বা দশম শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইতেছে। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ভিত্তিতে প্রতি বিষয়ে কিছুটা নম্বর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত যোগ হওয়ার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও একসঙ্গে সমগ্র পরীক্ষা গ্রহণের দোষ-ত্রুটির কিছুটা প্রতিকার হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে সকল বিষয়ে এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; প্রতি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানার্জন হইয়াছে কিনা ইহা পরিমাপের জন্যই পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রতিবিষয়ে সাপ্লিমেণ্টারী (Supplementary) পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পরীক্ষাথার নিকট পরীক্ষার বিভীষিকা হয়ত কিছুটা কমিয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। মাধ্যমিক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাপনা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপর্ষদ শিক্ষক

এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তাহা প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে পাঠাইবেন। প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে যে পরীক্ষাগ্রহণকার্যে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন বিষয়ে পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার পর প্রত্যেকটি "উদ্দেশ্যের" উপরই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন থাকে সে বিষয়ে প্রশ্নপত্র-রচনাকারীকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রশ্নপত্রে তিন ধরণের প্রশ্ন যথা, রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক (কোন কোন বিষয়ে হয়ত রচনামূলক প্রশ্ন করার প্রয়োজন একেবারে না হইতে পারে) থাকিবে; প্রত্যেক ভাগের প্রশ্নের উত্তরের জন্য আলাদা আলাদা সময় দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র প্রশ্নপত্রের উত্তরের জন্য সম্ভবতঃ তিন ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরণের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানতঃ সেই ধরণের প্রশ্নই করিতে হইবে। ধরা যাউক, লিখিত ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য রচনামূলক প্রশ্নই যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরীক্ষার পদ্ধতি হিসাবে রচনামূলক প্রশ্ন নানাদিক হইতে এত ত্রুটিপূর্ণ যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন করিলেও ঐ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক ধরণের প্রশ্ন করাও হয়ত প্রয়োজন। রচনামূলক প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে; তাই সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার কৌশল সম্বন্ধে নীচে কিছুটা আলোচনা করা হইল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন—প্রশ্ন-রচনার কৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধরণের প্রশ্নের দোষ-ত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা করে। রচনামূলক প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন উহারা যেন একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত; সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের স্থান ঐ দুই ধরণের প্রশ্নের মাঝখানে বলা যাইতে পারে। রচনামূলক প্রশ্নে ঠিক কি উত্তর দিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট থাকে না। উত্তরদানকালে পরীক্ষার্থিগণ নিজ নিজ কল্পনা চিন্তাশক্তি প্রভৃতি অনুসারে একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে করিতে পারে; আবার বিভিন্ন ধরণের উত্তর করিয়াও দুই পরীক্ষার্থী সমান নম্বর পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে

যে, কোন পরীক্ষার্থী "দেশভ্রমণ" সম্বন্ধে রচনা লিখিতে গিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার উপর জোর দিল, আবার অপর কয়েকজন দেশভ্রমণের উপকারিতার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিল। ফলে, রচনামূলক প্রশ্নের সাহায্যে কতকগুলি পরীক্ষণীয় বিষয়ের একসঙ্গে সাধারণভাবে পরীক্ষার চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র। কোন বিশেষ পরীক্ষণীয় বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করা ঐ ধরণের প্রশ্নের সাহায্যে সম্ভব নহে। পরিমাপের বিষয় সুনির্দিষ্ট না থাকার দরুণ রচনামূলক প্রশ্নে নম্বর দেওয়াও সহজ নহে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় কিন্তু পরিমাপের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট থাকে। এমন কি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উত্তরও দিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের ঐ উত্তরগুলি হইতে একটি বাছাই করিয়া লইতে হয় মাত্র। ফলে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা কিছুটা যান্ত্রিক হইয়া পড়ে। যে সব বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে সুনির্দিষ্ট করা চলে না (ধরা যাউক, কবিতার রসাস্বাদন ক্ষমতা) সে সব ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ততটা কার্যকরী হয় না। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নে পরিমাপের বিষয়বস্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মত অতটা সুনির্দিষ্ট অথবা রচনামূলক প্রশ্নের মত একেবারে অনির্দিষ্টও থাকে না। ঐ ধরণের প্রশ্ন উত্তর করার সময়ে নিজের মনের ভাব সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইতে হয় (প্রদত্ত উত্তর হইতে একটি বাছিয়া লইলে চলে না)। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইল যে "দশ লাইনের মধ্যে দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা বিষয়ক যুক্তিগুলি লিখ।" পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই প্রশ্নে রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্নের মত অনিশ্চয়তা নাই; প্রশ্ন-রচনাকারী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির পরীক্ষা করিতে চান; পরীক্ষার্থী সংক্ষেপে শুদ্ধভাষায় তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে কিনা ইহাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশ্নের উত্তরটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের মত এত যান্ত্রিক নহে; অধিকন্তু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুইটি বিষয়ের পরীক্ষা একই প্রশ্নের সাহায্যে হইতেছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু একসঙ্গে মাত্র একটি বিষয়ের পরীক্ষা চলিতে পারে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অপেক্ষা ভালভাবে কাজ করিলেও আমাদের শিক্ষক এবং প্রশ্নপত্র রচনাকারীরা ঐ ধরণের প্রশ্ন করায় এখনও অভ্যস্ত হন নাই। প্রশ্নপত্রে সাধারণতঃ "টীকা লেখার" যে প্রশ্ন থাকে তাহাতে ঠিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের পর্যায়ে ফেলা

চলে না। পরীক্ষা বিষয়ে যিনিই কিছুটা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারিবেন যে, ঐ ধরণের টীকা লেখার মাধ্যমে ঠিক কি পরিমাপের চেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধে ধারণা রচনামূলক প্রশ্ন অপেক্ষাও অধিকতর অনিশ্চিত থাকে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন রচনাকালে তিনটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়—(১) প্রশ্নটি একাধিক বস্তু পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিলেও উহা ঠিক কি কি পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। (২) প্রশ্নটি এমন হইবে যে, তাহার উত্তরের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট বস্তুগুলি পরিমাপ করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে। (৩) প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষিপ্ত হইবে এবং উত্তর দান সম্বন্ধে নির্দেশ এত স্পষ্ট হইবে যে, কতকটা নৈর্ব্যক্তিক নম্বর দান সম্ভব হইবে। পূর্বে দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মোটামুটিভাবে উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ভূপাল সেমিনারীতে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন অনেক সময় প্রায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধরণেরও হইতে পারে—এই দুই ধরণের প্রশ্নের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করা কঠিন নয়।

দৃষ্টান্ত (১) ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পাঁচটি কর্তব্য কি? নিম্নে শূন্য স্থানে কর্তব্যগুলির নাম লিখ (কোথাও ৪টির বেশী অধিক শব্দ ব্যবহার করিও না)

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(২) আবশ্যকমত সংখ্যা বা সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ বসাইয়া নিম্নের শূন্যস্থান পূর্ণ কর (বাক্যাংশে তিনটির অধিক কথা থাকিবে না)

"মেগাস্থিনিস বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থা"—

পাটলিপুত্রের পৌরসভা

মোট সভ্য……

উপসমিতি ১	উপসমিতি ২	উপসমিতি ৩	উপসমিতি ৪	উপসমিতি ৫	উপসমিতি ৬
সভ্য সংখ্যা… কার্য…বিদেশী আগন্তুকগণের তত্ত্বাবধান	সভ্য সংখ্যা… কার্য…	সভ্য সংখ্যা… কার্য…	সভ্য সংখ্যা… কার্য…	সভ্য সংখ্যা… কার্য…	সভ্য সংখ্যা… কার্য…

আমরা আশা করিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরীক্ষাগুলিতে দিন দিনই অধিকতর চালু হইবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন—এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Intelligence, Aptitudes) প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য ঐ ধরণের প্রশ্নই ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা রচিত প্রশ্নপত্রের (পরিমাপ-যন্ত্র) রিলাইয়েবিলিটি (Reliability) এবং ভ্যালিডিটির পরিমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্থির করা যায়। সাধারণতঃ প্রশ্নগুলি রচনা করার পর যে শ্রেণীর জন্য উহাদিগকে রচনা করা হইয়াছে, ঐ শ্রেণীর ২০০।৩০০ ছাত্রকে নমুনা (sample) হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঐ প্রশ্নগুলি উহাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। তারপর ঐ ছাত্রদের উত্তর বিশ্লেষণ করা হয়। সমগ্র প্রশ্নপত্রে যে সব ছাত্র ভাল নম্বর পাইয়াছে তাহারা যদি বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর না করিতে পারে; আবার সমগ্র প্রশ্নপত্রে যাহারা খারাপ নম্বর পাইয়াছে তাহারা যদি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে পারে, তবে প্রশ্নগুলিরই ত্রুটি আছে

মনে করিয়া প্রশ্নপত্র হইতে উহাদের বাদ দেওয়া হয়। আবার কোন প্রশ্ন শতকরা কয়টি ছাত্র উত্তর করিতে পারিয়াছে তাহার ভিত্তিতে প্রশ্নের 'কাঠিন্যিক-মূল্য' (Difficulty value) স্থির করা হয়। ধরা যাউক, কোন প্রশ্ন যদি শতকরা ৮০টি পরীক্ষার্থীই উত্তর করিয়া থাকে তবে উহার 'কাঠিন্যিক মূল্য' হইবে ২০। তারপর, প্রশ্নগুলির কাঠিন্যিক মূল্য হিসাবে প্রশ্নপত্রকে পুনর্বার সাজাইতে হয়। প্রশ্নপত্রটিতে যাহাতে সব রকম কাঠিন্যিক-মূল্যের প্রশ্নই থাকে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে সোজা হইতে ক্রমান্বয়ে কঠিনের দিকে সাজান হয়। খুব সহজ ও খুব কঠিন প্রশ্নের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়—মাঝামাঝি কাঠিন্যিক-মূল্যের প্রশ্নের সংখ্যাই প্রশ্নপত্রে বেশী থাকে। এইভাবে প্রশ্নপত্রটি পুনর্বার রচনা করিয়া যে শ্রেণীর জন্য উহা রচিত হইয়াছে তাহার হাজার দুই ছাত্রের উপর পুনরায় উহাকে প্রয়োগ করা হয়। তারপর ঐ প্রয়োগের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া আরও একটু জটিলতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রটি নির্ভরযোগ্য (Reliable) কিনা এবং উহা যাহা পরিমাপ করিতে চাহিতেছে তাহা পরিমাপ করিতে পারিতেছে কিনা (valid) তাহা স্থির করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নপত্রে কত নম্বর পাইলে ছাত্রকে "মাঝারি" (average), কত নম্বর পাইলে "ভাল" (Above average), কত নম্বর পাইলে "খারাপ" (Below average), কত নম্বর পাইলে "খুব ভাল" (Very much above average), কত নম্বর পাইলে "খুব খারাপ" (Very much below average) ইত্যাদি স্থির করা হয়। উপরি-উক্ত সবগুলি কাজই বৈজ্ঞানিকভাবে করিবার জন্য নানা ধরণের গণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইভাবে যেসব নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচিত হয় তাহাদিগকে "প্রয়োগ সিদ্ধ" (Standardised) প্রশ্নপত্র বলা হয়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হইলেই যে তাহা "প্রয়োগসিদ্ধ" হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন প্রশ্নপত্রকে "প্রয়োগসিদ্ধ" করিতে হইলে প্রচুর সময় এবং পরিশ্রমের প্রযোজন। তাই আশু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রয়োগসিদ্ধিকরণ পদ্ধতির ভিতর দিয়া না গিয়াও আমরা এডহক্ (Ad hoc) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করিতে পারি। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার মূলনীতি এই যে, উহা পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়েরই ব্যক্তিত্ব

নিরপেক্ষ হইবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর নম্বর দানকালে পরীক্ষক-এ পরীক্ষক-এ পার্থক্য হইবে না। তাই সাধারতঃ কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাত্র একটি শুদ্ধ উত্তর থাকে; শুধু ঐ উত্তরটি লিখিলেই পরীক্ষাথা পূর্ণ নম্বর পাইবে, অপর কোন উত্তর দিলে শূন্য পাইবে। স্বভাবতই প্রশ্নের ভাষা দ্ব্যর্থবোধহীন (unambiguous) না হইলে চলে না। ফলে, প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্নচরনাকারীর মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নদ্বারা একাধিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। একটি প্রশ্নের দ্বারা একটি মাত্র নির্দিষ্ট বস্তুই পরিমাপের চেষ্টা করা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থীরা যাহাতে প্রশ্নের অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল ধারণা করিতে না পারে এবং যাহাতে তাহাদের উত্তরদানের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য না থাকে (তাহা হইলে নম্বর দানকালে পরীক্ষকের নৈর্ব্যক্তিকতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে) তাহার জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঙ্গে সাধারণতঃ কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া হয়; পরীক্ষার্থীদিগের তাহাদের মধ্য হইতে শুদ্ধ উত্তরটি বাছিয়া লইতে বলা হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রকে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ করার জন্যও বিধিমত চেষ্টা করা হয়। অঙ্ক ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে ভাষাই পরীক্ষার্থীদের উত্তরদানের মাধ্যম। ফলে সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়েও ভাষা-জ্ঞানের তারতম্যের জন্য প্রশ্নের উত্তরদান ক্ষমতার তারতম্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দূর করিবার নিমিত্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরদানে সাধারণত প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্য হইতে একটির নীচে দাগ দিয়া নিজের উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে হয়; তাহা হইলে ভাষা-জ্ঞানের তারতম্যের জন্য প্রশ্নের উত্তরের মানের তারতম্য হইতে পারে না। তারপর, শুদ্ধ উত্তরটি "সম্ভাব্য উত্তরগুলির" মধ্যে দিয়া দেওয়ার ফলে, ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিভিন্নতার জন্য কাহারও মনে যদি পরীক্ষাদানকালে উৎকণ্ঠা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতির সৃষ্টি হয় তবুও উত্তরদানে কোন তারতম্য হয় না। সর্বশেষে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভাষা এমন থাকে যে, ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে সে সম্বন্ধে পরীক্ষার্থী মনে কোন দ্বিধা থাকে না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার কতকগুলি বিশেষ রীতি প্রচলিত হইয়াছে—সত্য-মিথ্যা ঠিক করা (True-false), শুদ্ধ উত্তর বাছাই করা (Multiple choice), শূন্যস্থান পূর্ণ করা (Fill in the blanks), জোড় মিলাইয়া দেওয়া

(Matching) প্রভৃতি ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, উপরি-উক্ত কোন একটি পদ্ধতির সাহায্যে প্রশ্ন-রচনা না করিলে তাহা নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে না। উপরে উল্লিখিত পদ্ধতির ভিত্তিতে রচিত না হইলেও অনেক প্রশ্ন আছে যাহাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইল "চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত মৌর্য সাম্রাজ্যের যে সম্বন্ধ মোগল সাম্রাজ্যের সহিত কাহার সেইরূপ সম্বন্ধ?" এই প্রশ্নটি উপরি-উক্ত কোন ধরণের মধ্যেই পড়ে না। তথাপি পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ হওয়ার দরুণ উহা নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা পাইতে পারে। আশা করা যাইতেছে যে, শিক্ষকগণ তাঁহাদের সৃজনীশক্তির সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার নূতন নূতন পদ্ধতি বাহির করিবেন; ইতিমধ্যেই অনেক নূতন পদ্ধতি বাহির হইয়াছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করার বিভিন্ন ধাপ—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করিতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হয়।

১। যে বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে সে বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার তথা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সর্বপ্রথমেই সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। ধরা যাউক, বাংলা সাহিত্যে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে। প্রথমেই নিম্নলিখিত-রূপে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া হইবে—(ক) শব্দসম্ভারের জ্ঞান, (খ) লিখিত ভাষা পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা, (গ) নিজের চিন্তাধারা, কল্পনা ও উপলব্ধি লিখিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা, (ঘ) পঠিত বিষয়ের চিন্তাধারা, ভাব প্রভৃতি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা, (capacity to appreciate materials read).

২। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রশ্নরচনা কালে কোন্‌টির উপর কতখানি গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া লইতে হয়। ধরা যাউক, আপনি ১০০ নম্বরের উপর প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন। প্রশ্নপত্র রচনা আরম্ভ করিবার পূর্বেই আপনি হয়ত স্থির করিয়া লইবেন যে, উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথমটি সার্থক করিবার জন্য ২০ নম্বর, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির প্রত্যেকের জন্য ২৫ নম্বর এবং চতুর্থটির জন্য ২০ নম্বরের উপর প্রশ্ন রচনা করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীভেদে ঐ ধরণের গুরুত্ব আরোপ করায় তারতম্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয়

মানে (Class II) শব্দসম্ভারের জ্ঞান পরীক্ষা করার গুরুত্ব যতখানি হইবে পড়িয়া-বোঝার (Reading-Comprehension) পরীক্ষা করার গুরুত্ব তাহার চাইতে অনেক কম হইবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়নে ৪।৫ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বাধীন মতামত গ্রহণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

৩। তারপর পরীক্ষার ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে পাঠ্যসূচীই পরীক্ষার ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পঠন-পাঠনের পদ্ধতির সহিত পাঠ্যসূচীকে সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে ছাত্রদের (কোন বিষয়ে) শিক্ষার পরিধি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মাইতে পারে না। ধরা যাউক, সমাজবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল যে, ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশসাধন করা অথবা বাংলা সাহিত্য পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, ছাত্রদের মধ্যে ঐ ভাষায় সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি করা ; কিন্তু বর্তমানে ঐ দুই বিষয়ের পঠন-পাঠন যেভাবে হইতেছে তাহাতে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সার্থক হইতেছে কি না তাহা পরিমাপ করার জন্য প্রশ্ন করিলে কোন লাভ হইবে না। তাই পাঠ্যসূচীর সহিত পঠন-পাঠন পদ্ধতির কথা চিন্তা করিয়া প্রশ্নপত্রের রচনার পরিধি স্থির করিতে হয়।

৪। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার সবকিছুর উপর প্রশ্ন করা যে সম্ভব নয় তাহা বলাই বাহুল্য। তাই চতুর্থ ধাপে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্র হইতে নমুনাস্বরূপ কিছু কিছু করিয়া প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তু বাছিয়া লইতে হয়। এই বাছাইকার্যে নিম্নলিখিত নীতিগুলি মনে রাখা ভাল।

(ক) সমগ্র ক্ষেত্রটি পরিমাপ করার জন্য কতখানি সময় পাওয়া যাইতেছে তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষাথাকে একঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের জন্য উত্তর করিতে বলা হইলে মানসিক ক্লান্তির জন্য পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল হয়ত নির্ভরযোগ্য নাও হইতে পারে।

(খ) পরিমাপের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের (পাঠ্যসূচীর) যথাসম্ভব সকল বিভাগ হইতেই বিষয়বস্তু বাছাই করিতে হইবে। অবশ্য

পরিমাপের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বের তারতম্যের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সংখ্যার কম-বেশী হইবে।

(গ) সামগ্রিক-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আকবরের আহ্মদনগর অভিযান একটা সমগ্র বিষয়বস্তু নহে; দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারকেই শুধু একটা সমগ্র বিষয়বস্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সংক্ষেপে, রচনামূলক প্রশ্নের বিষয়বস্তু যে ধরণের হয়, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বিষয়বস্তু তাহার চাইতে পৃথক হওয়ার কোন কারণ নাই।

প্রশ্নপত্রের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

দৃষ্টান্ত: ইতিহাস পরীক্ষা; অষ্টম শ্রেণী; পরীক্ষার ক্ষেত্র—মোগল সাম্রাজ্য।

আমাদিগকে পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য "রাজনৈতিক ঘটনার জ্ঞান" পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে। সমগ্র পরীক্ষাটির জন্য ৪৫ মিঃ সময় আছে; কাজেই উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্য আমরা মাত্র ১২ মিনিট সময়ের মধ্যে উত্তর করা যায় এরূপ প্রশ্ন করিতে পারিব। প্রশ্নপত্রের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন করা যাইতে পারে—১। পানিপথের তিনটি যুদ্ধ, ২। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য শের শাহের চেষ্টা, ৩। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার, ৪। মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার।

এতখানি প্রস্তুতির পর প্রশ্নপত্র রচনার কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক হউক, রচনামুলক হউক বা সংক্ষিপ্ত-উত্তর হউক সব ধরণের প্রশ্নপত্র রচনায়ই উপরি-উক্ত চারিটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঠিক কিভাবে রচনা করিতে হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য রচনার যে সমস্ত রীতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়, দৃষ্টান্তসহ তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে। কোন প্রশ্নপত্রে যে সব রীতির প্রশ্ন থাকিবে এমন কথা নহে। প্রশ্ন রচনার 'রীতি' অনেকটা নির্ভর করে প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উপর।

'সত্য-মিথ্যা' রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে কতকগুলি সত্য এবং মিথ্যা বিবৃতি একত্র করিয়া দিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত ঃ নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কয়েকটি সত্য এবং কয়েকটি মিথ্যা। যেগুলি সত্য তাহাদের প্রত্যেকটির ডান পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'টিক' চিহ্ন (√) দাও; আর যেগুলি মিথ্যা তাহাদের প্রত্যেকটির ডান পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'ক্রশ' চিহ্ন (×) দাও।

১। সিন্ধুনদ রাজস্থানের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ( )
২। ইরাবতী ব্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা বড় নদী ( )
৩। ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতীয় অংশের নাম "সানপে" ( )
৪। গৌহাটি আসামের রাজধানী ( )

এই রীতির প্রশ্ন রচনা করা সহজ বটে, কিন্তু এই রীতিতে প্রশ্ন রচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। এই রীতিতে প্রশ্ন-রচনা করিলে সময় এবং কাগজ উভয়েরই অপব্যয় হয়। একটি সামান্য বিষয়ে জ্ঞান পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুইটি (একটি সত্য এবং একটি মিথ্যা) সম্পূর্ণ বাক্য লিখিতে হইবে এবং পরীক্ষার্থীকে বাক্য দুইটি পড়িয়া উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে উহার অর্থ এই যে, এক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্ন করিয়া এবং পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১৫ মিনিট ব্যয় করিয়া গোটাদশেক সামান্য সামান্য পঠিত বিষয় পরীক্ষার্থীর মনে আছে কিনা তাহা জানা যাইতে পারে। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরদানকালে ফাঁকি দেওয়ারও সুযোগ থাকে। কোন পরীক্ষার্থী যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কোনটিতেই জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সবগুলি বিবৃতির ডান পাশেই টিক্ চিহ্ন দিয়া চলে তবে কিছু না জানা সত্ত্বেও প্রশ্নটির জন্য নির্দিষ্ট নম্বরের হয়ত অর্ধেক পাইয়া যাইবে। তাই ঐ রীতির প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দানকালে যতগুলি বিবৃতির পাশে ঠিক দাগ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যা হইতে যতগুলি বিবৃতির পাশে ভুল দাগ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যাকে বিয়োগ করিতে হয়। এই রীতিতে করা প্রশ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সহজ হয় এবং মুখস্থ বিদ্যার পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়। তাই এই রীতিতে প্রশ্ন-রচনা না করাই বাঞ্ছনীয়।

"শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে প্রদত্ত কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর হইতে পরীক্ষাথাকে সঠিক উত্তর বাছিয়া লইতে হয়।

দৃষ্টান্ত—বন্ধনীর ভিতর হইতে যথাযথ উত্তরটি রেখাঙ্কিত করিয়া পাশের উক্তিটি সম্পূর্ণ কর।

(ক) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগকে বলা হয় ইউরোপের ইতিহাসের "অন্ধকার যুগ" কারণ (বৈদ্যুতিক আলো ছিল না; রাস্তায় রাস্তায় সব সময় যুদ্ধ চলিত; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা লোপ পাইয়াছিল; ঐ যুগ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।)

"শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির প্রশ্ন অনেকটা সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্নের অনুরূপ। কিন্তু উহাতে সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্নের যে সব দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা হইযাছে তাহা ততটা নাই। একটা সামগ্রিক বিষয়বস্তুতে "সত্য-মিথ্যা" রীতিতে প্রশ্ন করিলে তাহা "শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির অনুরূপ হইয়া পড়ে। সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্ন করিতে হইলে ঐ ধরণে করাই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্ত—নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কয়টি রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য উহাদের পূর্বে বন্ধনীর ভিতর √ চিহ্ন দাও, যেগুলি প্রয়োজ্য নহে, তাহাদের পূর্বে বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

(১) গথিক শিক্ষা-রীতির অনুকরণ
(২) গ্রীক-রোমান শিক্ষা-রীতির অনুকরণ
(৩) ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন
(৪) ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাহুল্যের নিদর্শন
(৫) প্রকৃতির সৌন্দর্যের রূপায়ণ
(৬) ভাবের গভীরতা সম্পাদন
(৭) মানবের দৈহিক সৌন্দর্যের সম্যক প্রকাশ
(৮) রঙ-এর যথেচ্ছ ব্যবহার
(৯) রঙ-এর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার

শূন্যস্থান পূর্ণকরণ রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়া পরীক্ষার্থীকে তাহা পূর্ণ করিতে বলা হয়। প্রয়োজনমত বাক্যের একাধিক স্থান অসম্পূর্ণ রাখা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত—শূন্যস্থান পূর্ণ কর: বাবর মোগল সাম্রাজ্যের—করিয়াছিলেন; আকবর উহা—করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজীব উহার—পথ প্রশস্ত করেন।

যাহাতে ভাষাজ্ঞানের উপর অতিরিক্ত জোর না পড়ে এবং যাহাতে একটি শূন্যস্থান ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা "শুদ্ধ" ভাবে পূর্ণ করা না যায় তাহার জন্য এই

রীতির প্রশ্নে সাধারণতঃ শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য সম্ভাব্য শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া হয়। ফলে, ঐ রীতির প্রশ্ন অনেকটা শুদ্ধ উত্তর বাছাই করা রীতির অনুরূপ হইয়া পড়ে।

দৃষ্টান্ত—নিম্নে বামপার্শ্বে কয়েকটি অসম্পূর্ণ উক্তি ও ডানপার্শ্বে প্রতিটি বন্ধনীর মধ্যে চারিটি করিয়া সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি বামপার্শ্বের উক্তিটিকে সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারে, মাত্র সেইটির নীচে দাগ দাও :

(ক) রেনেসাঁস আন্দোলনে ভাব-গঙ্গার ভগীরথ ছিলেন—(পেট্রার্ক, বোকাচিও, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি)

(খ) ফ্লোরেন্সের চাণক্য হইলেন—(গ্যালিলিও, নেপোলিয়ন, মেকিয়াভেলি, বোকাচিও)

(গ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিল্পী ছিলেন—(র‍্যাফায়েল, বেকন, সেক্সপীয়র, নিউটন)

বাক্য ব্যতীত নক্সার (diagram) মাধ্যমেও শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার রীতির প্রশ্ন করা যায়।

দৃষ্টান্ত—মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের একটি ধারাবাহিক নক্সা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ স্তরগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া উহাদের মধ্যস্থিত 'নাম' এবং 'কর্তব্য ও দায়িত্ব' অথবা 'কর্তব্য ও অধিকার' ঐ দুইটি অসম্পূর্ণ স্থান অতি সংক্ষিপ্ত অথচ উপযুক্ত বাক্যাংশ দ্বারা পূর্ণ কর। কোথাও ৪টির বেশী শব্দ ব্যবহার করিও না। উদাহরণস্বরূপ ১নং নক্সার অসম্পূর্ণ স্থানগুলি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

নাম—রাজা প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব—ভূমিবণ্টন ও রাজ্যশাসন।

নাম..............................
প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..............
....

|

নাম..............................
প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..............
....

|

নাম..............................
প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব
....

|

নাম..............................
প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..............
....

জোড় মিলাইয়া দেওয়া রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে সাধারণতঃ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুইটি শব্দ বা বাক্যাংশের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এক তালিকার শব্দ বা বাক্যাংশের সহিত অপর তালিকার শব্দ বা বাক্যাংশকে জোড় মিলাইয়া দিতে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত—নীচে বামপার্শ্বে মুঘল শাসনবিভাগের কতিপয় কর্মচারীর নাম লিখিত আছে ; ডানপার্শ্বে লিখিত আছে তাহাদের কর্তব্য ; কাহার কর্তব্য

কি তাহা বুঝাইবার জন্য বামপার্শ্বের নামের নম্বরটি ডানপার্শ্বের সঠিক 'কর্তব্যের' পূর্বে বন্ধনীর ভিতর বসাও। যে কর্তব্যের সহিত কোন নামেরই সম্বন্ধ নাই তাহার বামপার্শ্বের বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

কর্মচারীর নাম		কর্তব্য
১। শিপাহসালার	( )	বড় বড় সহরের বিচারকার্য সম্পাদন
২। ফৌজদার	( )	দুর্নীতি নিবারণ
৩। বকিয়ানবিস্	( )	সৈন্যদের বেতন দেওয়া ও হিসাব রাখা
৪। কোতোয়াল	( )	সরকারী কারখানার তত্ত্বাবধান
৫। কাজী	( )	রাজস্ব আদায় ও তৎসংক্রান্ত বিচারকার্য সম্পাদন
৬। মীরবক্সী	( )	দাতব্যবিভাগ পরিচালন
৭। দেওয়ান	( )	সহরের শান্তিরক্ষা
৮। কারকুন	( )	সংবাদ সংগ্রহ
	( )	রাজস্ব সংগ্রহ
	( )	শান্তিশৃঙ্খলা বিধান ও বিদ্রোহ দমন

দুইটি পৃথক তালিকা না করিয়াও উপরি-উক্ত রীতিতে প্রশ্ন করা চলে।

দৃষ্টান্ত—নীচের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিগুলির মধ্যে যে কয়টি বিশেষভাবে জাতি-সংঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদিগের বামদিগের বন্ধনীতে (১), যে কয়টি রাষ্ট্রসংঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের বামদিকে (২) এবং যেগুলি দুই সংঘের কোনটির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে তাহাদের বামদিকে বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

( ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় উৎপত্তি।
( ) সংগঠনে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের অবদান
( ) সংঘের সাফল্যে জওহরলাল নেহরুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান
( ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় উৎপত্তি
( ) ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের উদ্ভব
( ) ভার্সাই সন্ধি
( ) সংঘের উৎপত্তির মূলে রুজভেল্ট ও চার্চিলের চেষ্টা
( ) ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণরোধে অক্ষমতা
( ) কোরিয়া বিভাগ

( ) ইসরাইল ও মিশনের মধ্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা

( ) টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা লাভ

উপরি-উক্ত রীতিগুলি ছাড়া আরও নানাভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রচনা করা চলে। প্রশ্নপত্র রচনাকারীর সৃজনীশক্তি অনুসারে নানাধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতেছে।

নিম্নে প্রত্যেক পংক্তিতে কতকগুলি নাম লেখা আছে, উহাদের মধ্যে এমন একটি নাম আছে যেটি অপরাপর নামগুলির সহিত এক জাতীয় নহে। উহাকে বাছিয়া লইয়া তাহার নীচে দাগ দাও।

(ক) বুদ্ধ, মহাবীর, খ্রীষ্ট, ভবভূতি

(খ) বাণভট্ট. শশাঙ্ক, ধর্মপাল, জয়পাল

(গ) চেঙ্গিস্ খাঁ, হাফেজ, এ্যাটিলা, তাইমুর লঙ্গ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের গুণাগুণ—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন যে শুধু পরিমাপের মাধ্যম এমন নহে, ইহা শিক্ষাদানেরও একটি বিশিষ্ট কৌশল। ছাত্রেরা শিক্ষকের বক্তৃতা অপেক্ষা নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিলে তাহার মূল্য অধিক একথা সকল আধুনিক শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করেন। ছাত্রেরা যদি পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা নিজ চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে পারে। পরিমাপ-যন্ত্রহিসাবে উহা অন্য যে কোন ধরণের প্রশ্ন অপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের 'রিলায়েবিলিটি' এবং 'ভ্যালিডিটি' পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। আদর্শ প্রশ্নপত্র রচনায় যে সব নীতি অনুসরণ করার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা কালেই তাহা হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব। আধুনিক কালে, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য সে সব প্রশ্নপত্র রচনা করা হইতেছে তাহাতে নৈর্ব্যক্তিক ধরণের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয়। আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রচলন হইলে ঐ পরীক্ষা যে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দোষ-ত্রুটি : নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন একেবারে দোষ-ত্রুটিশূন্য নহে। পরীক্ষণীয় সকল বিষয় সমান দক্ষতার সহিত নৈর্ব্যক্তিক

প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় না। রচনা-ক্ষমতা, মানসিক-উপলব্ধি প্রভৃতি বিষয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা উপযুক্তভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাই, রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার না করিলে "আদর্শ প্রশ্ন-পত্র" (পরিমাপ-যন্ত্র) রচনা করা সম্ভব হয় না। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রচনাক্ষমতা এবং মানসিক উপলব্ধি প্রভৃতিও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা একেবারে পরিমাপ করা যায় না, ইহা সত্য নহে। আমরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের রচনায় যতই অভ্যস্ত হইব ততই যে কোন বিষয়বস্তু উহার সাহায্যে অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিমাপ করিতে পারিব। আমাদের দেশের অনেকের অভিজ্ঞতা এই যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু রচনার ক্রটির জন্যই এইরূপ হয়। প্রয়োজন মত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে সহজ বা কঠিন করা চলে। আবার, অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন একটু যান্ত্রিক ধরণের হইয়া পড়ে; ইহাতে শুধু মুখস্থ বিদ্যারই পরিচয় দেওয়া চলে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের এই ক্রটিও প্রশ্নরচনাকারীর অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই হইয়া থাকে।

প্রশ্নপত্রে নম্বরদান পদ্ধতি—পরীক্ষাকে উন্নততর করিতে হইলে, একদিকে যেমন প্রশ্নপত্র রচনা পদ্ধতিব সংস্কার করিতে, অপরদিকে তেমনি নম্বরদান পদ্ধতিকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এযাবৎ শুধু প্রশ্নপত্র সংস্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। রচনামূলক প্রশ্নপত্রে যে আমাদের ১০০ পর্যন্ত নম্বর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে তাহা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। রচনামূলক প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর নাই। তাই পরীক্ষক উত্তর সম্বন্ধে নিজ ধারণা অনুসারে উত্তরপত্রে নম্বর দিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত-ধারণার ভিত্তিতে যেখানে পরিমাপ করিতে হইতেছে সেখানে দুই উত্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরিতে চেষ্টা করিলে আমাদের ভুল করিবার সম্ভাবনাই যে বেশী এ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ধরা যাউক, ইতিহাসের পরীক্ষায় একটি পরীক্ষার্থী ৪৫ নম্বর পাইয়াছে এবং অপর একটি পরীক্ষার্থী ৪৭ নম্বর পাইয়াছে; দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী অপেক্ষা প্রথম পরীক্ষাথার ইতিহাসে জ্ঞান কম, একথা কোন পরীক্ষকই স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারিবেন না। তাই রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদিগকে ১০১ ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা না করিয়া ৫ বা ৭ ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা

করিলে উহা অধিকতর বৈজ্ঞানিক হইবে। রচনামূলক প্রশ্নরূপ পরিমাপ-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য আমাদের সর্বাগ্রে কমাইতে হইবে। সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন উত্তরপত্রগুলিতে নির্দিষ্ট নম্বর না দিয়া উহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

অনেক নীচে | নীচে | মাঝারি | উপরে | অনেক উপরে

আমরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

প্রথমতঃ, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত পাঁচভাগের কোন্ ভাগে পড়িবে তাহা স্থির করিতে হইবে; তারপর প্রতিটি উত্তরের জন্য নির্ণীত বিভাগের ভিত্তিতে সমগ্র উত্তরপত্র কোন্ বিভাগে পড়িবে তাহা স্থির করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরীক্ষাথাকে কোন নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া নহে, তাহার "সমশ্রেণীর" ছাত্রদের মধ্যে কোন্ বিষয়ের শিক্ষায় তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করাই বাহ্যিক-পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই উপরি-উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে কোন উত্তরপত্রের স্থান ঠিক্ কোথায় ইহা নির্দেশ করিতে পারিলে পরীক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। নম্বর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলে প্রতিটি বিভাগের জন্য নম্বর নির্দিষ্ট করিয়া দিতেও কোন ক্ষতি নাই। উপরি-উক্ত প্রস্তাব অনুসারে পরিমাপ-যন্ত্রের (প্রশ্নপত্রের) পাঁচটি কি সাতটি বিভাগ থাকিলে, ঠিক কি ধরণের উত্তর করিলে, উত্তরপত্রকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে তাহাও অনেকখানি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় বর্তমানে ঐ ধরণের চেষ্টা কিছুটা করা হয়। পরীক্ষার শেষে প্রধান পরীক্ষকগণ (Head Examiners) একত্র হইয়া প্রতিটি প্রশ্নের 'আদর্শ উত্তর' ঠিক করিয়া দেন এবং পরীক্ষকদিগকে ঐ উত্তরের ভিত্তিতে নম্বর দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রধান পরীক্ষকগণ প্রশ্নপত্র রচনা এবং তাহাতে নম্বরদান কার্যে বিশেষজ্ঞ না হওয়ার দরুণ, ঐ কাজটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা হয় না। 'আদর্শ' উত্তরগুলি কয়েকটি পয়েণ্টের (points) তালিকা মাত্র। ঐ পয়েণ্টগুলির অধিকাংশ উল্লেখ করিলে পরীক্ষার্থীকে 'পূর্ণ নম্বর' দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই পূর্ণ নম্বরটি যে কত তাহা নির্দিষ্টভাবে বলিয়া না দেওয়ার জন্য একই ধরণের উত্তরে কেহ দেন

৬০, কেহ ৭০, কেহ ৮০ ইত্যাদি। তারপর, প্রধান পরীক্ষকদের নির্দেশে এক দিকে যেমন পয়েণ্টের তালিকা করিয়া প্রশ্নের উত্তরকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করা হয়, অপর দিকে আবার প্রকাশভঙ্গী. চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে বলিয়া নম্বরদানকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কার্যতঃ প্রধান-পরীক্ষকদের নির্দেশ নম্বর-দান কার্য উন্নততর করিতে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। ইহার পরিবর্তে যদি নির্দেশ দেওয়া হইত যে, প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরকে মাত্র পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইবে (পাঁচ ধরণের নম্বর দেওয়া যাইবে) এবং ঐ পাঁচ ধরণের উত্তরের নমুনা যদি পরীক্ষকদের দেওয়া যাইত, তাহা হইলে নম্বরদানের অনিশ্চয়তা অনেকখানি দূর হইতে পারিত। নীচে নম্বরের ভিত্তিতে বিভাগগুলি কিরূপ হইতে পারে দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝান হইতেছে—

প্রতিটি প্রশ্ন বা পরিমাপ-যন্ত্র (Scale for Measurement)

অনেক নীচে নম্বর	নীচে নম্বর	মাঝারি নম্বর	উপরে নম্বর	অনেক উপরে নম্বর
২৯ বা তাহার চাইতে কম	৩০ হইতে ৪৫	৪৬ হইতে ৫৯	৬০ হইতে ৭৯	৮০ হইতে ১০০

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রশ্ন রচনার সঙ্গে সঙ্গে উহার উত্তর কিভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে (নম্বর দিতে হইবে) তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নেও একই নীতি অনুসরণ করিয়া নম্বর দেওয়া উচিত। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তরে নম্বরদানের জন্য উপরি-উক্ত পাঁচ ধরণের উত্তরের নমুনা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নে নম্বর দান (মান নির্ণয়ন) অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক করা সম্ভব।

নৈর্বক্তিক প্রশ্নের একটি মাত্র শুদ্ধ উত্তর থাকে বলিয়া উহার উত্তরে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নম্বর দেওয়া চলে; উত্তর শুদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়া হইবে, না হইলে কোন নম্বরই দেওয়া হইবে না; শুদ্ধ উত্তরটি কি

তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের "সমশ্রেণীর" ছাত্রদের মধ্যে স্থান নির্ণয়ন কালে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের নম্বরও উপরি উক্ত পাঁচভাগে ভাগ করিয়া প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কার

এই অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া নীচে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হইল। প্রথমেই ব্যবস্থাপনার দিক হইতে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার কিছুটা সংস্কারের প্রয়োজন। ১। পরীক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার হাতে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হইবে। ২। দুই ধরণের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা প্রবর্তন করিলে (যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না এবং যাহারা প্রবেশ করিবে) পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টতর হওয়ার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। ৩। পরীক্ষা-গ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহিত পরীক্ষা-সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্য পরিচালনা করার নিমিত্ত একটি গবেষণা বিভাগ সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরীক্ষাকে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া পরের পরীক্ষা উন্নততর করিবার জন্য পরামর্শ দিবেন। ৪। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কাহারও উপর প্রশ্নপত্র রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত নহে। ৫। উত্তরপত্র পরীক্ষকগণেরও ঐ কার্যে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষণশিক্ষা বিদ্যালয়-গুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা করা এবং তাহাতে নম্বর দান, হাতে কলমে শিখাইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ৬। সমগ্র স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা যে একই সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ হইয়া গেলে তাহার পরীক্ষাকার্য (তাহা নবম, দশম, একাদশ শ্রেণীর মধ্যে যে-কোন শ্রেণীতেই হউক না কেন) শেষ করিয়া ফেলিতে কোন আপত্তি নাই; বরং তাহাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি বিষয়ে সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রথম পরিমাপের সময় কোন বিষয়ে ছাত্রের শিক্ষা আশানুরূপ না হইলে পুনরায় চেষ্টা দ্বারা তাহাকে ঐ বিষয়ে তাহার শিক্ষার মান উন্নততর করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং পুনরায় পরিমাপ করিয়া তাহা আশানুরূপ স্তরে পৌঁছিয়াছে কিনা স্থির

করা হইবে, ইহাই বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের প্রণালী। সবগুলি বিষয়ের পরীক্ষা এক সঙ্গে গ্রহণ না করিলে চলে না—এই ধারণা যে আমাদের কোথা হইতে আসিল তাহা চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না। ৭। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় করার কালে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলকে যথাযথ স্থান দিতে হইবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন ছাত্রের কোন বিষয়ে শিক্ষার পরিমাপ উপযুক্তভাবে করা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রশ্নপত্র রচনাপদ্ধতিরও সংস্কার করিতে হইবে। ১। প্রথমেই পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য কি তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া উহার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে। ২। প্রশ্নপত্রের ভাষা এমন হওয়া প্রয়োজন যে, ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে সে সম্বন্ধে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মনে যেন কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ৩। প্রশ্নপত্রে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত-উত্তর, নৈর্ব্যক্তিক এই তিন ধরণের প্রশ্নই থাকিবে (উত্তর করার জন্য পরীক্ষার্থীকে তিন ধরণের প্রশ্ন তিন বিভিন্ন সময়ে আলাদাভাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়)। ৪। যে ধরণের প্রশ্নপত্রই হউক না কেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র-রচনা করার যেসব নীতির ধারাবাহিকতা আছে (পূর্বে আলোচিত) তাহাদের অনুসরণ করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রথমে উদ্দেশ্য নিরূপণ, তারপর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপ, তারপর উত্তরদানের জন্য প্রদত্ত সময়ের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নমুনাস্বরূপ বিষয়বস্তু বাছাই এবং সর্বশেষে কোন বিষয়বস্তুর শিক্ষা পরিমাপের জন্য কোন্ ধরণের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা স্থির করণ। ৫। কিছু কিছু আদর্শীকৃত এবং প্রয়োগসিদ্ধ প্রশ্নপত্রের ব্যবহারে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করিবে।

নম্বরদান পদ্ধতির সংস্কার না করিলেও স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ১। প্রতি উত্তরপত্রে একশত একটি নম্বরের মধ্যে যে-কোন নম্বরদানের সুযোগ পরীক্ষককে না দিয়া তাঁহাকে নির্দিষ্ট পাঁচটি বিভাগের যে-কোন একটিতে উত্তরপত্রটির স্থান নির্দেশ করিতে বলিলে উহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হইবে সন্দেহ নাই। ২। কোন প্রশ্নের কি ধরণের উত্তর লিখিলে পরিমাপ-যন্ত্রের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে কোন বিভাগে তাহার

স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা প্রশ্ন-রচনার কালেই যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিলে ভাল—যত নৈর্ব্যক্তিকভাবে ঐ কাজ করা যাইবে পরিমাপও তত নির্ভরযোগ্য হইবে। রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মান নৈর্ব্যক্তিকভাবে নির্দেশিত হয় বলিয়া ঐ ধরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে এই নীতির কথা উঠে না)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড

আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংস্কার—পূর্ব পরিচ্ছেদে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার (বাহ্যিক-পরীক্ষা) সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক পরীক্ষা-গ্রহণের যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে সেগুলি হইতেছে (ক) ছাত্রেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে তাহার পরিমাপ (Evaluation) করা, (খ) কোন ছাত্র আশানুরূপভাবে শিক্ষাগ্রহণ না করিয়া থাকিলে তাহার কারণ নির্ণয় (Diagnosis) করা, (গ) শিক্ষাদান পদ্ধতির ভাল-মন্দের পরিমাপ (Evaluation of the Methods of Teaching) করা। বর্তমানে আমরা শুধু প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের কথাই আলোচনা করিব। বাহ্যিক-পরীক্ষায় প্রশ্নরচনা ও নম্বরদান পদ্ধতি-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, আভ্যন্তরিক-পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাহা সমানভাবে প্রযোজ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ছাত্রদের শিক্ষার আভ্যন্তরিক পরিমাপের জন্য শিক্ষক রচনামূলক প্রশ্ন যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করিবেন ; সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উপরই তাঁহার বিশেষভাবে নির্ভর করা উচিত। নম্বরদানের ক্ষেত্রেও তাঁহাকে ছাত্রদের উত্তরপত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে মোটামুটি পাঁচভাগে (পূর্বে আলোচিত) বিভক্ত করার চেষ্টা করা সঙ্গত। আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মূল্য বাহ্যিক পরীক্ষা অপেক্ষা বেশী, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন শুধু পরিমাপেরই মাধ্যম নহে. উহা শিক্ষার একটি পদ্ধতিও বটে—পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা শিক্ষা লাভে সাহায্য করিবে।

কিন্তু আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় পরিমাপযন্ত্রের নির্ভরযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেমন প্রয়োজন পরিমাপগুলিকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজনও তাহার চাইতে কম নহে। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আভ্যন্তরিক

পরিমাপগুলিকে সাধারণতঃ প্রগতিপত্রে (Progress Report) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বিভিন্ন ধরণের প্রগতিপত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংস্কারের বিষয় বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ আমরা পাইব।

প্রগতিপত্র (Progress Report)—প্রত্যেক ছাত্রের জন্যই বিদ্যালয়ে প্রগতিপত্র রাখা হয়। ছাত্রদের পড়াশোনার উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবকদের দেওয়াই প্রগতিপত্র রাখার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই নিজ কাজে প্রগতিপত্রের কোন ব্যবহার করে না; সাধারণতঃ বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্রদের একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করানো হয়। যদি কোন ছাত্র বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারে তবেই শুধু তাহার পূর্ব পূর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গতঃ বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ই বৎসরের সবকয়টি পরীক্ষার ফলাফল একত্র করিয়া তাহার ভিত্তিতে ছাত্রদের উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করে। ছাত্রদের পড়াশুনায় উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবকদের দেওয়া যে প্রয়োজন তাহা সকল বিদ্যালয়ই স্বীকার করে। অভিভাবকগণও ইহা বিদ্যালয় হইতে তাঁহাদের প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। প্রগতিপত্র অভিভাবকদের কাছে পাঠাইয়া বিদ্যালয় যেন ছাত্রের পড়াশুনার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দায়মুক্ত হইয়া পড়ে। "আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভাল করিতেছে না, এখন আপনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন" এই ধরণের একটা মনোভাব লইয়া প্রগতিপত্র অভিভাবকদের নিকটে পাঠানো হয়; যেন পড়াশুনায় ছাত্রদের উন্নততর করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নহে। বিদ্যালয় বৎসরশেষে প্রয়োজনবোধে ছাত্রকে "ফেইল" করাইয়া (পর পর ২।৩ বৎসর ফেইল করিলে বা তাহাকে শিক্ষাদানযোগ্য নহে বলিয়া বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া) তাহার সম্বন্ধে নিজ দায়িত্ব পালন করে। বস্তুতপক্ষে ছাত্রের শিক্ষালাভ কার্য অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করিতে পারিলে এবং বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতার সোপান রচনা করিতে পারিলে প্রগতিপত্র রক্ষা করা সার্থক হয়। ইহাই প্রগতিপত্র রক্ষা করার মূল উদ্দেশ্য। বৎসরে কয়বার প্রগতিপত্র রক্ষা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কোন ঐক্য নাই। কোন

কোন বিদ্যালয় প্রতিমাসেই (লম্বা বন্ধগুলি বাদ দিয়া) ছাত্রদের প্রগতিপত্র প্রস্তুত করে, আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে বৎসরে একবার বা দুইবার মাত্র প্রগতিপত্র প্রস্তুত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রগতিপত্রকে বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সহযোগিতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা অন্ততঃ দুইমাস অন্তর প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এক বৎসরের মধ্যে যতগুলি প্রগতিপত্র প্রস্তুত হইবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ প্রগতিপত্রে ছাত্র কোন বিষয়ে যে নম্বর পাইয়াছে তাহার উল্লেখ দ্বিতীয় প্রগতিপত্রের ঐ বিষয়ের নম্বরের পাশে থাকা উচিত। তাহা হইলে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে অভিভাবকগণ আরও স্পষ্ট ধারণা পাইতে পারেন। মোটকথা একটি ছাত্রের একবৎসরের সবগুলি পরিমাণ আলাদা আলাদা কাগজে আলাদা আলাদা প্রগতিপত্র হিসাবে না রাখিয়া একখানা কাগজে একটি সামগ্রিক-প্রগতিপত্ররূপে (বৎসরে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি-অবনতির পরিমাপের হিসাবে) রাখিলে ভাল হয়। এক বৎসরে কোন বিষয়ে ছাত্রের শিক্ষার যতগুলি পরিমাপ গ্রহণ করা হইবে তাহা পাশাপাশি লেখা থাকিবে। দুঃখের বিষয় প্রগতিপত্র প্রস্তুত করার সময় খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ই উপরি-উক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রগতিপত্রের মাধ্যমে ছাত্রসম্বন্ধে অভিভাবকদের কি ধরণের সংবাদ জানানো হইবে তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে প্রগতিপত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু সকল বিদ্যালয়ই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছাত্র কি পরিমাণ আয়ত্ত করিতে পারিল তাহার পরিমাপকে প্রগতিপত্রের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করে। তাই ছাত্রের পরীক্ষার নম্বর প্রগতিপত্রে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়গুলি বুঝিতে পারে না, শুধু নম্বর হইতে ছাত্রের পড়াশুনার উন্নতি-অবনতির সম্যক চিত্র পাওয়া যায় না।

ধরা যাউক, বৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় কোন ছাত্র ইংরেজিতে যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ নম্বর পাইল। দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রশ্ন প্রথম পরীক্ষার প্রশ্ন হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ার জন্য ঐ পরীক্ষায় হয়ত নম্বর উঠিয়াছে বেশী; তাই ৫০ নম্বর পাইয়াও প্রথম পরীক্ষায় ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে সে হয়ত দ্বাদশস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ প্রথম পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পাইয়া সে

হয়ত ঐ বিষয়ে দশমস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় সে পিছাইয়া পড়িতেছে কিন্তু শুধু নম্বর দ্বারা বিচার করিলে আমাদের মনে বিপরীত ধারণারই স্বষ্টি হইবে। তাই প্রগতিপত্রে কোন বিষয়ের নম্বর লিপিবদ্ধ করিলে তাহার পাশে ঐ বিষয়ে ছাত্র শ্রেণীতে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

ছাত্রেরা পড়াশুনায় উন্নতি হইতেছে না অবনতি হইতেছে শুধু এইটুকু সংবাদই বিদ্যালয়ের সহিত অভিভাবকদের সহযোগিতা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। যেসব ছাত্র পড়াশুনায় উন্নতি করিতে পারিতেছে না তাহারা কোন্ বিষয়ে কেন উন্নতি করিতে পারিতেছে না ইহা অভিভাবকদের জানাইতে না পারিলে তাঁহারা ছাত্রদের পড়াশুনার উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন না (একমাত্র গৃহশিক্ষক রাখা ব্যতীত)। তাই প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিমাপকারী (Evaluative) পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কারণ নির্ণয়কারী (Diagnostic) পরীক্ষা গ্রহণ করা ভাল। কারণ নির্ণয়কারী পরীক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের মান নির্ণয় করিতে পারিবে অপরদিকে উহা কি কি কারণে সে ঐ বিষয়ে আশানুরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না তাহারও ইঙ্গিত দিবে। ধরা যাউক, কোন অভিভাবক যদি জানিতে পারেন যে, ছাত্রের অঙ্ক-শিক্ষা আশানুরূপভাবে চলিতেছে না, তাহার কারণ এই যে, যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগের গাণিতিক তাৎপর্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তিনি ঐক্ষেত্রগুলিতে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে পারেন। কাজেই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় পরিমাপকারী (Evaluative) পরীক্ষার পরিবর্তে কারণ নির্ণয়ণকারী (Diagnostic) পরীক্ষার অধিকতর প্রচলন হইবে ইহাই আশা করা যাইতেছে।

বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত প্রগতিপত্রে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হিসাবও থাকে। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ইহার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় সামান্য কারণে, এমনকি বিনা কারণেও ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। অথচ একদিনের অনুপস্থিতিও ছাত্রের শিক্ষাকার্যে গুরুতর বাধার স্বষ্টি করে। ইহার প্রতিকার অনেকখানিই অভিভাবকদের হাতে। তাই বিদ্যালয়ে

অনুপস্থিতির জন্য যে ছাত্রের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে এ বিষয়ে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিনাকারণে অনুপস্থিতি সমস্যার মধ্যে গণ্য নহে সে বিদ্যালয়ে ইহার হিসাব প্রগতিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

ছাত্রের চরিত্র (Conduct) সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণাও প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'চরিত্র' বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকার দরুণ প্রগতিপত্রে চরিত্রের ঘরে প্রায় সকল ছাত্রই "ভাল" (good) মন্তব্য পায়। বিদ্যালয়ের দৃষ্টিতে খুব গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে "মন্দ" মন্তব্য কোন ছাত্রই পায় না। কোন ছাত্র সম্বন্ধে ঐ ধরণের মন্তব্য করিলে স্বাভাবিক কারণেই অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইয়া বিবাদের ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়। কাজেই "চরিত্র" নামে কোন অনির্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে সব চারিত্রিক গুণাবলী বা অভ্যাস গঠিত না হইলে ছাত্রের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে (আত্মবিশ্বাস, সত্যতা, পরিশ্রমশীলতা প্রভৃতি) সেগুলির পরিমাপের (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) ফলাফল প্রগতিপত্রে অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে এবং অভ্যাস গঠনে গৃহের (Home) অবদানও খুব বেশী। কিন্তু এক্ষেত্রেও ছাত্রের কোন চারিত্রিক গুণ বেশী আছে কি কম আছে—এ সংবাদ অভিভাবককে দেওয়াই যথেষ্ট নহে। কি কারণে কোন চারিত্রিক-গুণ অল্প বিকশিত হইয়াছে—সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত না দিতে পারিলে অভিভাবক বিদ্যালয়ের সহিত আশানুরূপ সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। কাজেই ভবিষ্যতে চারিত্রিক-গুণাবলীর ক্ষেত্রেও আমাদের কারণ নির্ণয়ণকারী পরীক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত তথ্যগুলি ব্যতীতও ছাত্র সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ প্রগতিপত্রে দেওয়া হইবে কি না (স্বাস্থ্য, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি) তাহা নির্ভর করিবে বিদ্যালয়ের সঙ্গতি এবং অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষার উপর। ধরা যাউক, যে বিদ্যালয়ে ডাক্তারের সাহায্যে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ আছে, সে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রগতিপত্রের অংশ হিসাবে অবশ্যই অভিভাবকের নিকট পাঠাইবে। কিন্তু

প্রতিবার প্রগতিপত্র প্রস্তুত হওয়ার পর শিক্ষক এবং অভিভাবকের মিলিত আলোচনার দ্বারা কিভাবে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে প্রগতিপত্র প্রস্তুত করা সার্থক হইতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক শাখার (Section) জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন করিতে না পারিলে প্রগতিপত্র রক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

কিউমিউলেটিভ্‌ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card) বর্তমানে ছাত্র সম্বন্ধে এক নূতন ধরণের প্রগতিপত্র বিদ্যালয়ে প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। ইংরেজিতে ঐ ধরণের প্রগতিপত্রকে কিউমিউলেটিভ্‌ রেকর্ড কার্ড বলে। 'কিউমিউলেটিভ্‌' শব্দের মোটামুটি অর্থ "একের উপরে আর"। এই ধরণের প্রগতিপত্রে ছাত্র সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পরিমাপের ফলাফল পাশাপাশি লিপিবদ্ধ থাকে। একটি পরিমাপের ফলের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ছাত্রের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে না। ধরা যাউক, কোন ছাত্র ইংরেজিতে তিনমাস অন্তর গৃহীত তিনটি পরীক্ষায় যথাক্রমে ৫০, ৫০ ও ৫৫ নম্বর পাইল। কিউমিললেটিভ্‌ রেকর্ড রাখার নীতি অনুসারে ঐ নম্বর নিম্নপ্রদত্ত নক্সার আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।
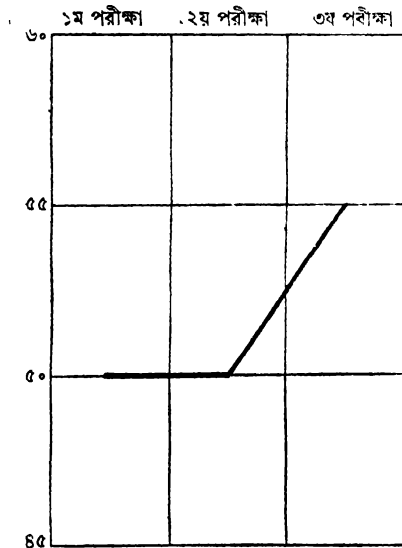
"একের উপরে আর" এই নীতি অনুসরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করার ফলে আমরা ছাত্রের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক সংবাদ পাইলাম ; আমরা জানিতে পারিলাম যে, ছাত্রের ইংরেজি শিক্ষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দুই পরীক্ষায় সে ইংরেজিতে সমান নম্বর পাইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় পরীক্ষার ফল তাহার ইংরেজি জ্ঞানের উন্নতি সূচিত করিতেছে। এই সংবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ বিষয়ে, বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্র কত নম্বর পাইতেছে, তাহা জানা অপেক্ষা এক পরীক্ষা অপেক্ষা অপর পরীক্ষায় সে বেশী বা কম নম্বর পাইতেছে তাহা জানা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় সকলে সমান নম্বর পাইবে ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু প্রতি ছাত্রই শিক্ষার ফলে উন্নত হইতে উন্নততর হইবে—সে প্রগতির পথে অগ্রসর হইবে ইহা সকলেই আশা করে। ছাত্র প্রথম পরীক্ষায় যে নম্বর পাইয়াছে, দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাহার চাইতে কিছু বেশী পাইবে এবং এইভাবে সে ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া চলিবে। কিন্তু যখনই তাহার উন্নতির গতি রুদ্ধ দেখা যাইবে—যখনই সে পর পর পরীক্ষায় সমান নম্বর পাইতে থাকিবে তখনই তাহার সম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে ; যখন বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তাহার অবনতি সূচিত করিবে তখন তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আর চলিতেছে না এসম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে হইবে।

আবার, কিউমিউলেটিভ্ সংজ্ঞা সার্থক করিতে হইলে একটি মাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে কোন ফলাফল কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা চলে না। ঐ রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি পরিমাপ একাধিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফল। আমরা যতই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করি না কেন নানা কারণেই মানুষকে পরিমাপ করার চেষ্টায় ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে ; তাই কয়েকটি পরিমাপের সমষ্টিগত ফল একটি পরিমাপের ফল হইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাজেই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড এমন এক ধরণের প্রগতিপত্র যাহাতে ছাত্রের শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয়ের সমগ্র বিদ্যালয় জীবন ব্যাপিয়া ধারাবাহিক পরিমাপের ফল (প্রতিটি লিপিবদ্ধ ফল একাধিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফল) পাশাপাশি ("একের উপরে আর") লিপিবদ্ধ করা হয়। ছাত্র

বিদ্যালয় পরিবর্তন করিলে তাহার রেকর্ড কার্ডও সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সমগ্র বিদ্যালয় জীবনকে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার উদ্দেশ্যে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়-জীবনের জন্য একখানা, মাধ্যমিকের জন্য একখানা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আর একখানা রেকর্ড কার্ড রাখা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরীক্ষা সংস্কারের জন্য যে উপদেষ্টা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন উহার পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপর্ষদ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য একখানা রেকর্ড কার্ড এবং নবম দশম এবং একাদশ শ্রেণীর জন্য আর একখানা রেকর্ড কার্ড রাখা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ই ঐ ধরণের রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিতেছেন।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card) ও অভিভাবকদের নিকট প্রেরিত প্রগতিপত্র (Progress Report)—কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ও অভিভাবকদের নিকট প্রেরিত প্রগতিপত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপকতর (পরে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে)। প্রগতিপত্রের মত উহা অভিভাবকদের নিকট পাঠান হয় না। ইহা সাধারণতঃ, গোপনীয় রাখা হয়। যিনি এই রেকর্ড কার্ড ব্যবহার করিবেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও ইহা সচরাচর দেখিতে দেওয়া হয় না। অভিভাবকদের মধ্যে কেহ যদি ইহা দেখিতে চান তবে তিনি বিদ্যালয়ে আসিয়া তাহা দেখিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে যতগুলি পরিমাপ লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের প্রত্যেকটি একাধিক পরিমাপের সমষ্টি ; কিন্তু প্রগতিপত্রের ক্ষেত্রে এরূপ নাও হইতে পারে। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু প্রগতিপত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেক ব্যাপকতর ; প্রকৃতপক্ষে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের অংশবিশেষ লইয়া প্রগতিপত্র রচিত হয় (পরে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে)।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার উদ্দেশ্য—কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড নিষ্ঠা সহকারে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রক্ষিত হইলে ইহার

ব্যবহার বহুবিধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ভালভাবে রক্ষিত হইলে উহা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা সংস্কারের কাজে লাগিবে। এক সঙ্গে সমগ্র স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া ছাত্রের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে ঐ পরীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ অধুনা কিছুটা কার্যকরী করা হইয়াছে—উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নবম শ্রেণীর শেষে, হিন্দি ও শিল্পের (craft) এবং দশম শ্রেণীর শেষে সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) ও অঙ্কের (Mathematics) পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ হয়ত বিদ্যালয়কে ঐসব বিষয়ের নম্বর পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করিয়া না পাঠাইয়া ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ভিত্তিতে পাঠাইতে নির্দেশ দিবেন। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের লিপিবদ্ধ নম্বর (একাধিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রদত্ত) যে ঐ এককালীন গৃহীত পরীক্ষার নম্বর হইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন পরে হয়ত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি সকল বাধ্যতামূলক বিষয়ের (Compulsory Subjects) পরিমাপই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের মাধ্যমে হইবে; শুধু বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষয়গুলির জন্য বাহ্যিক (External) পরীক্ষা গৃহীত হইবে। শেষ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে বাহ্যিক পরীক্ষা থাকিবে তাহাদেরও আংশিক নম্বর (হয়ত শতকরা ২৫) কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের নম্বরের ভিত্তিতে প্রদত্ত হইবে। যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না তাহাদের স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য হয়ত বাহ্যিক পরীক্ষা লইবার প্রয়োজনই অনুভূত হইবে না। কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডকেই মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ স্কুল-ফাইন্যাল সার্টিফিকেট বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। নিষ্ঠাসহকারে সকল বিদ্যালয় এক পদ্ধতিতে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পরিমাপের মানে খুব বেশী পার্থক্য হইবে না (কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড প্রস্তুত করার পদ্ধতি পরে আলোচনা করা হইবে)। তাহার পরও যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে তাহা গাণিতিক (Statistical) পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা অসম্ভব নয়। এককথায় কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের সাহায্যে আমাদের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার দোষত্রুটির অনেকখানি প্রতিকার হইতে পারে, এমন কি একদিন

হয়ত ঐ ধরণের পরীক্ষার হাত হইতে আমরা একেবারেই রেহাই পাইতে পারি।

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড আরও নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে। বেকারসমস্যা আমাদের সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উপযুক্ত বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের দ্বারা এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। আবার বৃত্তিবিষয়ক-পরামর্শ দিতে হইলে—কে কোন্ বৃত্তির উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে হইলে, বৃত্তিপ্রার্থীর ক্ষমতা (ability), অর্জিত জ্ঞান (attainment), আগ্রহ (interest), চারিত্রিক গুণাবলী (personality-traits) প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পরামর্শদাতার হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। একমাত্র কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডই ঐসব তথ্য বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদাতাকে যোগাইতে পারে। ভবিষ্যতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange)-গুলির মাধ্যমেই চাকুরীতে লোক নিযুক্ত হইবে। কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড বিদ্যালয়ে রাখা আরম্ভ হইলে ঐ কার্ড ব্যতীত কাহারও নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় লেখা হইবে না। কারণ, প্রধানতঃ ইহার ভিত্তিতেই কে কোন্ কাজের উপযুক্ত এক্সচেঞ্জ তাহা স্থির করিবেন। নিয়োগকারীরাও নিজ প্রয়োজনেই কর্মচারী নির্বাচনকালে প্রার্থীর কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে সংগৃহীত তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবেন। এককথায় বৃত্তি-সংস্থানের প্রয়োজনে নানাভাবে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড ব্যবহৃত হইবে।

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। শিক্ষা দিতে হইলে অন্ততঃ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের যথোচিত মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা খুব সামান্য বলিয়া ছাত্রের কাছে তাহার মর্যাদা রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তারপর নিজ কার্যের যথোচিত মর্যাদা না পাইলে ইহা নানাভাবে ব্যক্তিত্বের অধোগতি ঘটাইয়া থাকে। তাই বর্তমানে নানাভাবে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হইতেছে। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে এবং বৃত্তি সংস্থান দেওয়ার কার্যে যদি কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তবে যে শিক্ষক এই

রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করিতেছেন তাহার সামাজিক মর্যাদা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষাদান কার্যে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্র সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য সর্বদা শিক্ষকের সম্মুখে থাকা প্রয়োজন। তারপর নবম শ্রেণীতে উঠিলে কোন ছাত্র কি বিশেষ বিষয় লইয়া পড়াশুনা করিবে তাহা স্থির করিতেও কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের একান্ত আবশ্যক। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠশেষে কে কোন্‌দিকে পড়াশুনার চেষ্টা করিবে সে বিষয়ে মনস্থির করিতেও কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড সাহায্য করিবে। অবশেষে, শিক্ষক যখন ছাত্রকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেছেন তখন কিছু দিন পরপরই তাঁহার চেষ্টার ফলাফল বিধিবদ্ধভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান-প্রচেষ্টার পরিবর্তন না করিলে শিক্ষাদান-কার্য কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। ফলাফল নিরূপণের চেষ্টা না করিয়া আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আমাদের প্রচেষ্টা এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইতেছে।

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের বিষয়বস্তু—উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য-গুলি সার্থক করিতে হইলে বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে উহা ত্যাগ করা পর্যন্ত ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশের হিসাব কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি-ভাবে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেশের সকল শিক্ষাবিদ্‌ই প্রায় একমত।

১। সর্বপ্রথমই ছাত্রের নাম, ঠিকানা, বয়স প্রভৃতি কতকগুলি 'সাধারণ তথ্য' কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে রাখিতে হয়। মোটামুটিভাবেও ইহা ছাত্রের সাধারণ পরিচিতি।

২। ছাত্রের শারীরিক বিকাশ এবং তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শারীরিক বিকাশ আশানুরূপভাবে না চলিলে এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে ছাত্রকে শিক্ষাদান সম্ভব নহে। তারপর, বিদ্যালয়কে শুধু মানসিক বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই চলে না; তাহাকে ছাত্রের

শারীরিক বিকাশের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু, ছাত্রের ভবিষ্যৎ শিক্ষা, বৃত্তি প্রভৃতিও তাহার শরীর এবং স্বাস্থ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই শারীরিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড-কার্ডে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (abilities)-গুলিব বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যও রেকর্ড কার্ডে রাখা প্রয়োজন। অধুনা ঐগুলি পরিমাপের জন্য প্রয়োগসিদ্ধ (standardised) নানা ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological-Tests) বাহির হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষমতা অন্তর্নিহিত হইলেও তাহাদের উপরও যে শিক্ষার প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আশানুরূপ ভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে; আবার শিক্ষার সাহায্যে বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই যখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রভাব খুব বেশী তখন উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।

৪। বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ যে রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

৫। ছাত্রের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাহার আগ্রহের (interest) মূল্য খুব বেশী। স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ না থাকিলে কোন বিষয়ের শিক্ষায় বা কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়। আবার আগ্রহ এমন জিনিস যে, শিক্ষার সাহায্যে তাহার বিকাশসাধন সম্ভব। আজকাল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আগ্রহ (interest) জাগাইয়া তুলিবার জন্য পাঠদানের মতই বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাই ছাত্রের আগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য রেকর্ড কার্ড থাকা প্রয়োজন।

৬। ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলী (Personality-traits) সম্বন্ধে তথ্যও রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক-গুণাবলী বিকাশকরণের দায়িত্ব আজকাল বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইতেছে। পরিবার ও সমাজ আজকাল আশানুরূপভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতেছে না। অপর দিকে শিক্ষাব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে চারিত্রিক-

গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি শিক্ষকের যতখানি জানা থাকা সম্ভব অপরের ততখানি সম্ভব নহে। চারিত্রিক-গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে হইলে তাহাদিগকে বিধিবদ্ধভাবে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। জীবনের প্রতিটি কার্যের সফলতা চারিত্রিক গুণাবলীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। শিক্ষাবিষয়ক বা বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দিতে হইলেও ছাত্রের চারিত্রিক-গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৭। ছাত্রের পারিবারিক জীবনের প্রভাব তাহার শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তিনির্ধারণে এত বেশী যে, ঐ জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাতাপিতার সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ বা মাতাপিতার সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ বা মাতাপিতার আর্থিক ক্ষমতা প্রভৃতি ছাত্রের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

৮। খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা প্রভৃতির সুযোগও ছাত্রদের দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে-কোন কার্যের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তাহারই পরিমাপের প্রয়োজন। আবার ঐসব বিষয়ে দক্ষতার কিছুটা সামাজিক গুরুত্বও আছে। তাই ঐসব ক্ষেত্রে কে কতখানি দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে আরও অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে। কোন বিষয় রেকর্ড কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বে শুধু আলোচিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে উহা কোন্‌টি সার্থক করিতে সাহায্য করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ কর্তৃক কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের প্রবর্তন—১৯৫৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড রাখার জন্য নির্দেশ দেন। ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের সহিত সংযুক্ত, বুরো অব এডুকেশনেল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ একখানা কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ডের 'ছক' (form) প্রস্তুত করেন; মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে উপদেষ্টা সমিতি ঐ ছক

পরীক্ষা করিয়া উহার সামান্য কিছু অদল বদল করেন এবং সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই যাহাতে ঐ ছকে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড রক্ষা করে সেরূপ নির্দেশ দিতে পর্যদ্‌কে পরামর্শ দেন। পর্ষদ্ শ্রীকালী প্রেসের (৬৫ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫) সাহায্যে ঐ ছক ছাপাইয়া লন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ঐ প্রেস হইতে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড কিনিতে পরামর্শ দেন (মূল্য প্রতি ১০০ খানা ১০ টাকা ৬৯ পয়সা; বিক্রয়কর অতিরিক্ত)। যেসব উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গুলিতে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড রাখা হইতেছে তাহা সার্থক করিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিদ্যালয়কে একই ছকে রেকর্ড কার্ড রাখিতে হইবে। কোন বিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে রেকর্ড কার্ডে অতিরিক্ত তথ্য রাখিতে পারে, কিন্তু পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের ছকে যেভাবে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সকল বিদ্যালয়কেই তাহা পালন করিতে হইবে। বিদ্যালয়গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত বর্তমান ছকের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হইবে; কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ছক রাখা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন ছকে রেকর্ড কার্ড রাখিলে উহাদ্বারা জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ডের ছক
(ইংরেজীতে যে ভাষায় পর্ষদ্ ছাপাইয়াছেন সেই ভাষায় প্রদত্ত হইল)।

CONFIDENTIAL

Introduced on____________________

Junior / Senior Higher School Stage

Class____________________

CUMULATIVE SCHOOL RECORD

NAME AND ADDRESS OF SCHOOL____________________

GENERAL DATA

Name of pupil____________________ Boy/Girl
(surname first)

Date of birth ____________________
(year) (month) (day)

Father's/Guardian's name____________________

Address____________________
(any change to be noted)

Admission Register No.____________________

Date of entry____________________

Transferred to____________________

Date____________________

Transferred from____________________

Date____________________

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL,
105/7A, Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-14

(All entries in the school record are to be made *once*, at the *end of each academic year*)

1. HEALTH RECORD

Year	General health rating			Any physical defect	Serisuo illnesses	Any special remark
	Good	Average	Poor			
195 ...						
195 ...						
196 ...						

2. POSITION OF RESPONSIBILITY HELD IN SCHOOL AND AWARDS, ETC., OBTAINED*

Year	
195 ..	
195 ...	
196 ...	

* A position of responsibility means a position like that of a monitor, a captain, etc., and awards include prizes, stipends.

3. INTEREST*

Categories	195			195			196		
	Marked	Average	Poor	Marked	Average	Poor	Marked	Average	Poor
(*i*) Linguistic									
(*ii*) Scientific									
(*iii*) Technical									
(*iv*) Artistic									
(*v*) Musical									
(*vi*) Agricutural									
(*vii*) Commercial									
(*viii*) Interest in house-hold work and management									
(*ix*) Any other noted interest									

* Rate the pupil's interests on a three-point scale and check (√) in the appropriate column. Do *not* rate an interest for which there is no opportunity of manifestation in school.

5. CO-CURRICULAR ACTIVITIES*

Groups	195			195			196		
	Above average	Average	Below average	Above average	Average	Below average	Above average	Average	Below average
(*i*) Games and sports									
(*ii*) Intellectual and literary									
(*iii*) Recreational									
(*iv*) Social service									
(*v*) Others (N. C. C., Scouting, etc.)									

* Rate the pupil for each group of activities on a three-point scale and check (√) in the appropriate column.

6. PERSONALITY*

Traits	195			195			196		
	Above average	Average	Below average	Above average	Average	Below average	Above average	Average	Below average
(*i*) Initiative ...									
(*ii*) Industry ...									
(*iii*) Responsibility									
(*iv*) Co-operativeness									
(*v*) Emotional balance									
(*vi*) Self-confidence									
†(*vii*) Work-habits									
(*viii*) Any other trait									

* Rate the pupil for each trait on a three-point scale and check (√) in the appropriate column.

† [illegible] the pupil is systematic, methodical, careful or neat in work.

7. OTHER INFORMATION

1. State the nature of the behaviour-problem, if any, shown by the pupil :
   (195)
   (195)
   (196)

2. Name if the pupil possesses any outstanding skill or disability :

Year	Skill	Disability
195 ...		
195 ...		
196 ...		

*3. What course of study you recommend for the pupil : General/Scientific/Technical etc.

*4. Briefly state the grounds for your recommendation

*5. What type of vocation you consider most suitable to the pupil

*6. Briefly state grounds for your consideration

*7. Any other information about the pupil you think relevant for guidance

*To be filled in only at the end of the final year of each school stage, i.e., Junior—VIII, Senior—XI or X

195 195 196

Signature of the Headmaster/Headmistress.

Sakti Press, Cal. 6

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, ইহাতে ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার (abilities) পরিমাপ এবং তাহার গৃহ (home) সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেসব তথ্য নিতান্ত লিপিবদ্ধ না করিলে চলে না এবং যেসব তথ্য মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে শিক্ষকগণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করা যায় শুধু সেইগুলিই আপাততঃ কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য এখনও আমাদের প্রয়োগসিদ্ধ (standardised) বুদ্ধিপরীক্ষার প্রশ্নপত্র (Intelligence Test) প্রস্তুত হইতে কিছুদিন সময় লাগিবে, তাই ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিমাপ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডে করা হয় নাই। আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রের গৃহের যোগাযোগ এত অল্প যে, বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের গৃহ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই ছাত্রের গৃহ সম্বন্ধে তথ্য রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করার দাবীও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও আমরা নম্বরদান বিষয়ে আলোচনাকালে বলিয়াছি যে, পরিমাপ-যন্ত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদের পাঁচ ধরণের নম্বর দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তথাপি অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডে অর্জিত জ্ঞানের (Scholastic attainment) পরিমাপ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে পরিমাপ-যন্ত্রকে মাত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পরিমাপ যন্ত্র

Below average   Average   Above average
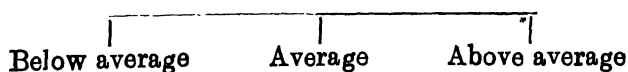
এই ব্যবস্থাও আমাদের বিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়াই করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করার সুযোগ শিক্ষকদের না থাকায় তাহাদের চারিত্রিক-গুণাবলী, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; ঐরূপ চেষ্টা করিলে পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নততর হইলে এবং শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে

রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু এবং তাহাদের পরিমাপের পদ্ধতি উন্নততর করা যাইবে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার প্রণালী—মাধ্যমিক পর্ষদের অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের ছক্ অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রের তিন বৎসরের রেকর্ড এক সঙ্গে থাকিবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রেকর্ড কার্ড রাখা আরম্ভ করা হইবে তাহা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলিবে; দ্বিতীয় রেকর্ড কার্ড নবম শ্রেণীতে আরম্ভ হইয়া একাদশ শ্রেণীতে শেষ হইবে (দশম-শ্রেণী বিদ্যালয় হইলে দশম শ্রেণীতেই শেষ হইবে)। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু বিভিন্ন। উহাদিগকে পরিমাপ করিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন হইবে। যে-কোন একজন শিক্ষকের দ্বারা সব কয়টি বিষয়ের পরিমাপ গ্রহণ করাও সম্ভব হইবে না। তথাপি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এবং শাখার (Section) ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার জন্য একজন করিয়া শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। অপরাপর যেসব শিক্ষক শাখার (Section) ছাত্রদের (বিভিন্ন বিষয়ে) পরিমাপ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে তাঁহাদের পরিমাপের ফলাফল পাঠাইবেন এবং তিনি ঐসব ফলাফল যথানির্দেশিতভাবে রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করিবেন। যে শাখায় যে শিক্ষক সর্বাপেক্ষা অধিক ক্লাস নেন (সম্ভবতঃ শ্রেণীশিক্ষক) তিনিই সাধারণতঃ ঐ শাখার ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এখন আমরা পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের প্রত্যেকটি বিভাগের কোন্‌টির পরিমাপ কিভাবে করা হইবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব।

General Data :

এই বিভাগে ছাত্রের নাম, ধাম প্রভৃতি সাধারণ পরিচিতি মাত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। সময় থাকিলে বিদ্যালয়ের অফিসও ঐ বিভাগ পূরণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি রেকর্ড কার্ড তিন বৎসর ধরিয়া চলিবে; ফলে প্রতি বৎসর শুধু ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রদের রেকর্ড কার্ডে এই বিভাগ পূরণ করিতে হইবে।

1. Health Record :

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্যতীত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তথ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। কিন্তু, খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েই ডাক্তার দ্বারা ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেসব বিদ্যালয়ে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাদের ভারপ্রাপ্ত-ডাক্তারই এই বিভাগ পূরণ করিবেন এবং ইহার সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টও সংযুক্ত করিয়া দিবেন। যেসব বিদ্যালয়ে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই তাহাতে প্রতি শ্রেণীর রেকর্ড কার্ডের জন্য ভারপ্রাপ্ত-শিক্ষক এই বিভাগ পূরণ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে (চেহারা, শারীরিক-শক্তি, গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে নহে) শিক্ষক তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তিনি যে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রেণী-শিক্ষক হিসাবে ছাত্রের অনুপস্থিতি এবং অসুখের সংবাদের ভিত্তিতেই ছাত্রদের স্বাস্থ্যের বিচার করিয়া তিনি তাহাদের তিনভাগে বিভক্ত করিবেন (Good, Average, Poor)। প্রয়োজনবোধে তিনি কোন কোন ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানও করিতে পারেন। ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ত্রুটি থাকিলেও তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে এখানে এমন ধরণের ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে যাহা বিশেষজ্ঞ না হইলেও শিক্ষকের চোখে সন্দেহাতীতভাবে ধরা পড়ে। ধরা যাউক, কোন ছেলে চশমা ব্যবহার করে; চশমার প্রচলনের ফলে চোখে কম দেখাকে এখন আর গুরুতর শারীরিক ত্রুটি বলা চলে না; অধিকন্তু বিশেষজ্ঞ নহেন বলিয়া কোন্ ছাত্র কত 'পাওয়ার' (power)-এর চশমা ব্যবহার করিতেছে ইহা জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই চশমার ব্যবহারকে গুরুতর শারীরিক ত্রুটি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত নহে। কিন্তু কোন ছাত্র যদি বিশেষভাবে কানে কম শোনে বা কোন ছাত্রের হাত ভাঙ্গিয়া তাহা যদি অনেকটা অকেজো হইয়া থাকে তবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন বৎসর যদি কোন ছাত্র গুকতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে সংবাদও সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন নহে। বৎসরে একবার মাত্র এই বিভাগ পূরণ করিতে হইবে।

2. Position of Responsibility held in School and awards etc. obtained :

বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বিদ্যালয় জীবনের অনেক দায়িত্বই ছাত্রেরা বহন করিয়া থাকে ; ভবিষ্যতে তাহারা শ্রেণীকক্ষের ভিতরেও অনেক দায়িত্ব বহন করিবে ইহা আশা করা যাইতেছে। ছাত্রেরা বিদ্যালয় জীবনের দায়িত্ব যত বেশী গ্রহণ করিবে ততই তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে এবং তাহাদের শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইবে। তাই প্রথমেই বিদ্যালয় জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রচুর সুযোগ ছাত্রদের দিতে হইবে—প্রত্যেক শাখার ছাত্রই যেন ক্ষমতা ও আগ্রহের পার্থক্য হিসাবে কোন-না-কোন ধরণের দায়িত্ব-গ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যেসব দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ আছে তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টিকে এই বিভাগ পূরণের সময় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নেতৃত্বে সকল শিক্ষক মিলিয়া স্থির করিয়া লইবেন। পুরস্কার বা বিশেষ স্বীকৃতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বৎসরে একবার এই বিভাগ পূরণ করিবেন।

3. Interests :

ছাত্রের আগ্রহ জাগাইয়া তোলাকে বর্তমানে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই কার্যের জন্য 'হবি ক্লাব' (Hobby Club) স্থাপনের প্রয়োজন। সরকার ঐ ধরণের ক্লাব স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ঐ ধরণের একাধিক ক্লাব স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই বিভাগে বিভিন্ন আগ্রহের ক্ষেত্রের যে নাম দেওয়া হইয়াছে সেই অনুসারে হবি ক্লাবগুলি স্থাপিত হইলে বাস্তবক্ষেত্রে সুবিধা হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে যেসব 'বিশেষ বিষয়' (Special subjects) পড়িবার সুযোগ আছে এবং সমাজে যেসব বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি আছে, প্রধানতঃ সেই অনুসারেই এখানে আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ 'হবি' (Hobby) বলিতে আমরা আরও সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রেরণায় কাজ করা

বুঝিয়া থাকি। ফটো তোলা, ডাকটিকিট সংগ্রহ করা প্রভৃতিকে আমরা হবি আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু কাহারও ফটো তোলার আগ্রহকে শিক্ষার এবং জীবনের প্রয়োজনে আরও সুনির্দিষ্টভাবে লাগাইতে হইলে, তাহাকে বিজ্ঞান বা চারুকলা ক্লাবের সভ্য করিয়া দিলে ভাল হয়। ফটো তোলায় যাহার আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহার বিজ্ঞান বা চারুকলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যেও আগ্রহ জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছাত্রের আগ্রহকে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেকর্ড কার্ডে উল্লিখিত সব রকমের 'হবি ক্লাব' থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ২।৩ রকমের 'হবি ক্লাব' থাকিবে আশা করা যাইতে পারে। যে বিদ্যালয়ে যে বিশেষ-বিষয় পড়িবার সুযোগ আছে সে বিদ্যালয়ে সেই সেই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট 'হবি ক্লাব' অবশ্যই থাকিবে। কোন বিষয়ে 'হবি ক্লাব' না থাকিলে বিদ্যালয় সেই বিষয়ের আগ্রহের পরিমাপের চেষ্টা করিবে না।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজে 'হবি ক্লাবের' সভ্যদের আগ্রহের পরিমাপ করিবেন। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত 'হবি ক্লাবের' সদস্যসংখ্যা সাধারণতঃ ৩০ জনের উপর হওয়া উচিত নহে। প্রয়োজনবোধে এক বিষয়ে একাধিক 'হবি ক্লাব' পরিচালিত হইতে পারে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য হয়ত একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সব কয়টি 'হবি ক্লাবের' সদস্য মিলিত হইবে ; ফলে এক ছাত্রের একাধিক 'হবি ক্লাবে' যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আগ্রহের একটি মাত্র ক্ষেত্রে ছাত্রকে পরিমাপ করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন 'হবি ক্লাবের' ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাঁহার ক্লাবের কোন সদস্যের যদি অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান তবে তাহাও তিনি পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

আগ্রহ পরিমাপ করিবার কালে আগ্রহ এবং দক্ষতার (efficiency) মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। যাহার যে ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে তাহার সে ক্ষেত্রে দক্ষতা জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সব সময়ে ঐরূপ নাও হইতে পারে। কোন ছাত্রের সঙ্গীতে প্রচুর আগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাহার দক্ষতা মোটেই জন্মাইতে না পারে।

বাংলা পরীক্ষায় ভাল নম্বর না পাইয়াও কোন ছাত্রের প্রচুর সাহিত্যিক (Linguistic) আগ্রহ থাকিতে পারে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড রাখার নীতি অনুসরণ করিয়া 'হবি ক্লাবের' ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছয় মাস অন্তর তাঁহার ক্লাবের সদস্যদের আগ্রহের পরিমাপ করিবেন। বৎসরের শেষে দুইটি পরিমাপের ফলাফল বিবেচনা করিয়া তিনি ছাত্রের আগ্রহের পরিমাণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। তার পর তিনি ঐ সিদ্ধান্ত এবং তাহার পূর্বের পরিমাপ দুইটির ফল ছাত্রের রেকর্ড কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমাপকারী শিক্ষকের শেষ সিদ্ধান্ত রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন ক্ষেত্রে আগ্রহের ক্ষেত্র বলিতে কি বুঝায় ইহা স্পষ্টতর করিবার জন্য ছাত্রের মধ্যে ঠিক কি ধরণের ব্যবহার প্রকাশ পাইলে, তাহার কোন্ ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে বুঝিতে হইবে এ সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ নিম্নলিখিত রূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

Linguistic : Participates in debate meetings, in literary gatherings. Has interest in the school journal. Reads literary books. Enjoys writing prose and/or poetry.

Scientific : Handles scientific apparatus. Reads literature on Science. Enjoys little scientific experiments. Desires to know about things around.

Technical : Works with machines and tools. Has interest in repairing things, in visiting industrial centres and large machine installations. Enjoys craft work.

Artistic : Draws and/or paints. Enjoys artistic handicraftwork. Has interest in photography, in visiting picture-exhibitions. Reads writings on fine arts.

Musical : Has interest in instrumental and/or vocal music. in dancing. Handles musical instruments. Attends musical concerts, etc. Reads literature on music and dancing.

Agricultural : Has interest in plants and vegetables, in animals, in gardening. Reads literature on agriculture. Visits agricultural shows, etc.

Commercial : Has interest in keeping accounts at home or at school. Reads literature on trade and commerce. Interested in knowing market prices. Enjoys marketing.

Household work and management : Interest in cooking, laundry, nursing, needle-work, house arrangement and decoration and in children.

4. School Achievements :

এ ক্ষেত্রে ছাত্রকে পরিমাপ করিতে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন হইতে অভ্যস্ত। কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির যেসব দোষ-ত্রুটি আছে শিক্ষকদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্রে নম্বরদান সম্বন্ধে যেসব সংস্কারের কথা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে তাহা সকল বিদ্যালয়কেই প্রবর্তন করিতে হইবে, তারপর, বৎসরে ঠিক কয়টি পরিমাপের ফল একত্র করিয়া (গড় নির্ণয় করার পর) রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হইবে, এ সম্বন্ধেও সকল বিদ্যালয়কে একমত হইতে হইবে। কারণ, এইসব কার্য সকল বিদ্যালয় একভাবে না করিলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পরিমাপের মানের পার্থক্য হইবে এবং বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের পরিমাপকে তাহার স্থলে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না। বর্তমানে সকল বিদ্যালয় বৎসরে সমান সংখ্যক পরীক্ষা গ্রহণ করে না;—মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক এবং ষাণ্মাষিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে চালু আছে। বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ এখনও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ দেন নাই। বর্তমানে শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, বিষয়শিক্ষক একাধিক পরীক্ষার ফলাফল একত্র করিয়া গড় নির্ণয় করিবার পর তাহা রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে পাঠাইবেন। কোন্ বিদ্যালয়ে কয়টি পরীক্ষার ফল একত্র করা হইবে তাহা বিদ্যালয়ই স্থির করিবে। ছাত্র যদি কোন পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে তবে ঐ পরীক্ষা বাদ দিয়াই তাহার নম্বরের গড় নির্ণয় করিতে হইবে। অবশ্য বিনা কারণে যাহাতে কোন ছাত্র পরীক্ষায় অনুপস্থিত না থাকিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটি কথা, পূর্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, শুধু 'নম্বর' দ্বারা পরিমাপের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তাই প্রতি বিষয়ে নম্বরের

পাশে শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে ছাত্র কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে (২য়, ৫ম, ১০ম ইত্যাদি) তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণতঃ আমরা ছাত্রের সকল বিষয়ের নম্বর একত্র যোগ করিয়া শ্রেণীতে তাহার স্থান নির্ণয় করি। কিন্তু শুধু পুরস্কার বিতরণ ব্যতীত (প্রথম ২।৩টি ছাত্র ব্যতীত অন্য ছাত্রেরা পুরস্কার পায় না) ঐরূপ স্থান নির্ণয় করার অপর কোন সার্থকতা নাই। প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেণীতে ছাত্রের স্থান পৃথকভাবে নির্ণয় করিলে তবে ঐ বিষয়ে পড়াশুনায় উন্নতি কি অবনতি করিতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

5. Co-Curricular Activities :

বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, আবৃত্তি, বিতর্ক, গানবাজনা, অভিনয়, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যের সুযোগও ছাত্রদের দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করাই ঐসব সুযোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে ঐসব বিষয়ের পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারিলে তাহার প্রত্যক্ষ সামাজিক মূল্যও খুব কম নহে। অধিকন্তু যে সুযোগ ছাত্রকে দেওয়া হইতেছে সে উহাদ্বারা উপকৃত হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য পরিমাপের প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, এইসব ক্ষেত্রে আগ্রহের পরিমাপ না করিয়া পারদর্শিতার পরিমাপ করিতে হইবে। খেলাধূলায় কাহারও খুব আগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু পারদর্শিতা নাও থাকিতে পারে। পরিমাপের সময় আগ্রহকে বিবেচনার মধ্যে না আনিয়া পারদর্শিতারই পরিমাপ করিতে হইবে ; তাহা না হইলে একের বদলে অপরকে পরিমাপ করিয়া আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইব। যে শিক্ষক যে কো-ক্যারিকোলার একৃটিভিটির ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন তিনি ছাত্রদের সেই একৃটিভিটি পরিমাপ করিবেন। আগ্রহের পরিমাপের মত ঐসব ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিমাপও ছয় মাস অন্তর, বৎসরে দুই বার করিতে হইবে এবং দুইটি পরিমাপের ফলের ভিত্তিতে শেষ পরিমাপ করিয়া ছাত্রের রেকর্ড কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে সকল ছাত্র কার্যগুলিতে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় তাহার জন্য ছাত্রদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া (৩০।৪০ জনের দল) ঐসব কার্যের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। যে বিষয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়ে

যথেষ্ট সুযোগ নাই সে বিষয়ে ছাত্রদের পারদর্শিতার পরিমাপ করার চেষ্টা না করাই ভাল।

6. Personality :

আজকাল, বিদ্যালয়কে ছাত্রদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হয়। যে-কোন কিছু বিকাশের বিধিমত চেষ্টা করা হইলে, উহাকে বিধিমত পরিমাপের চেষ্টাও করিতে হয়। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে যেসব চারিত্রিক গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকটির গুরুত্বই খুব বেশী ; বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়াই ঐসব গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু চারিত্রিক গুণাবলী পরিমাপ করিতে গেলে কতকগুলি বিশেষ সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমেই কোন চারিত্রিক গুণ বলিতে আমরা ঠিক কি ধরণের ব্যবহার বুঝি তাহা স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে ; তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক একই গুণের পরিমাপ করিতেছেন মনে করিলেও হয়ত প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গুণেরই পরিমাপ করিয়া বসিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এক আলোচনা সভার মাধ্যমে ছাত্রদের নেতৃত্ব ক্ষমতা (Leadership) পরিমাপ করিতে গিয়া দুইজন শিক্ষকের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ঘটে। কোন ছাত্রকে এক শিক্ষক 'মাঝারি হইতে উপরে' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন অথচ অপর শিক্ষকের মতে সে 'মাঝারি হইতে নীচে'। আলোচনা-কালে প্রকাশ পায় যে, আলোচনা সভায় ছাত্রটি সর্বাপেক্ষা অধিক কথা বলিয়াছে বলিয়া প্রথম শিক্ষক তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিক্ষক বুঝাইয়া দিলেন যে, ছাত্রটি আলোচনা সভায় যথেষ্ট কথা বলিলেও অপর কেহ কোন বিষয়েই তাহার মতামত সমর্থন করে নাই, বরং সকলে তাহার মতের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে। এই বিবেচনায় নেতৃত্ব ক্ষমতায় ছাত্রটি 'মাঝারি হইতে নীচে' বলিয়া তিনি অভিমত পোষণ করিয়াছেন। এই স্থলে নেতৃত্ব ক্ষমতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় সে বিষয়েই প্রধানতঃ শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল। যাহাতে এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ রেকর্ড কার্ডে প্রদত্ত প্রত্যেকটি চারিত্রিক গুণের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

DESCRIPTION OF THE PERSONALITY TRAITS (TO BE RATED) SCALE-WISE IN TERMS OF BEHAVIOURS

	Above average	*Average*	*Below average*
Initiative ...	Usually does things of his own accord; does not wait for others' instruction.	Only occasionally does things of his own accord; almost always waits for others' instructions.	Never does things of his own accord; always waits for others' instructions.
Industry ..	Very hard-working, works in spite of difficulties.	Moderately hard-working. Does not usually work in the face of difficulties.	Lazy. Would at once give up in the face of difficulties.
Respon-sibility ...	Absolutely dependable in trying circumstances Shoulders responsibility in his own accord.	Dependable in ordinary circumstances. Does not shirk responsibility.	Not dependable. Shirks responsibility.
Co-operativeness ...	Always eager to lend a helping hand without being obtrusive; enjoys working with others.	Sometimes lends a helping hand to others without being obtrusive. Does not dislike working with others.	Does not lend a helping hand to others; does not like to work with others.
Emotional balance ...	Never gives way to extreme emotions; always cool and composed; always has a buoyancy of spirit	Sometimes gives way to extreme emotions! not always cool and composed; does not always have a buoyancy of spirit.	Easily gives way to exreme emotions; always restless and disturbed; does not have buoyancy of spirit.
Self-confidence ...	Relies on own judgement and powers; always faces new problems boldly.	Cannot always rely on own judgement and power; cannot always face new problems boldly.	Cannot rely on own judgement and power; cannot face new problems boldly.
Work habits ...	Always systematic and correct in work; has developed a 'style' of his own.	Not always neat, systematic and correct. Has not quite succeeded in developing a 'style' of his own.	Not neat, systematic and correct. Has no 'style' of his own.

দ্বিতীয়তঃ, পারিপার্শ্বিকের বিভিন্নতার ফলে একই মানুষের ব্যবহার বিভিন্ন হইতে পারে। ধরা যাউক, যে ছাত্রের ইংরেজির ক্লাসে প্রচুর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, খেলার মাঠে হয়ত তাহারই আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে ছাত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া তবে তাহার চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়। একজন শিক্ষক দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। ছাত্রদিগকে ৭০।৮০ জনের দলে বিভক্ত করিয়া দুই বা তিনজন শিক্ষকের উপর তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলী পরিমাপের দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষক এমন হইবেন যাহার শ্রেণী কক্ষের ভিতর ছাত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার প্রচুর সুযোগ আছে। অপর শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ছাত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার সুযোগ থাকিবে। প্রত্যেক শিক্ষকই ছয়মাস অন্তর ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী স্বাধীনভাবে পরিমাপ করিয়া ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন। তারপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ (২ বা ৩জন) একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের স্বাধীন পরিমাপের ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া কোন্ ছাত্রকে কোন্ চারিত্রিক গুণে পরিমাপ যন্ত্রের কোন্ বিভাগে ফেলিবেন (Above average, Average, Below average) সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বৎসরের শেষে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ আবার ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী স্বাধীনভাবে পরিমাপ করিয়া দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একত্র মিলিত হইবেন। তারপর দুইটি "চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের" ফলাফল একত্র করিয়া বিবেচনা করিয়া তবে ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলীর পরিমাপের ফল নিশ্চিতরূপে স্থির করিবেন এবং তাহা ছাত্রের রেকর্ড কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইবেন।

শ্রেণীকক্ষের ভিতর ছাত্রেরা আমাদের পড়ানোর ত্রুটির জন্য অধিকাংশ সময়ই চুপচাপ বসিয়া থাকে ; ফলে তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ শ্রেণীকক্ষের ভিতরে খুব বেশী হয় না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকগণ যদি অন্ততঃ কিছুটা 'একটিভিটি' (Activity) পদ্ধতিতে পড়ান এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে একটি করিয়া শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সমাধান (কোন প্রশ্নের উত্তর করিতেও বলা যাইতে পারে) করিতে বলেন (Group method) তবে একদিকে

শিক্ষাদান কার্য যেমন উন্নততর প্রণালীতে চলিবে, অপরদিকে ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশেরও সুযোগ তেমনি পাওয়া যাইবে। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য চলিলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধও অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে এবং ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী আপনা হইতেই শিক্ষকদের নিকট প্রকাশিত হইবে।

সর্বশেষে মনে করিতে হইবে যে, একটি ছাত্রের সবগুলি চারিত্রিক গুণের পরিমাপ একসঙ্গে করিলে চলিবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ করিলে কোন ছাত্রকে কোন চারিত্রিক গুণের পরিমাপে একবার উপরের বা নীচের বিভাগে ফেলিলে অপর গুণগুলির পরিমাপের সময়ে তাহাকে একই বিভাগে ফেলিবার একটা দুর্বলতা পরিমাপকের মনে সৃষ্টি হয়। তাই ছাত্রদের একটি দল (group) লইয়া তাহাদের সকলকে একবারে একটিমাত্র চারিত্রিক গুণের সম্বন্ধে পরিমাপ করিতে হয়।

7. Other Informations :

এখানে প্রথমেই ছাত্রের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যবহার-সমস্যার (behaviour-problem) সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ করিতে বলা হইয়াছে। কোন ব্যবহার-সমস্যা খুব গুরুতর না হইলে—ইহার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্যই অত্যাবশ্যক মনে না করিলে উহার উল্লেখ রেকর্ড কার্ডে না করা উচিত। ছাত্রদের অযোগ্যতার (Disability) উল্লেখ করা সম্বন্ধেও ঐ একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, (নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, খোঁড়া, খুব তোৎলা এইসব উল্লেখ করা যাইতে পারে)। ছাত্রের বিশেষ পটুতার (skill) উল্লেখ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ পটুতা এমন ধরণের হওয়া চাই যে, ঐ বয়সের ছাত্রদের মধ্যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে যে সাতটি বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ আছে তাহাদের মধ্যে ছাত্র কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িবে সে সম্বন্ধে রেকর্ড কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে মতামত দিতে হইবে। রেকর্ড কার্ডে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতেই শিক্ষক ঐ মতামত দিবেন। তবে এইমত ছাত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত নহে। কারণ এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে আরও নানারকমের তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গাইডেন্স কমিটি (Guidance

Committee) গ্রহণ করিয়া থাকেন (শেষ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এই বিভাগে যতগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করার কথা আছে তাহার সবগুলিই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিজের বিবেচনা হইতে লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে প্রয়োজনবোধে তিনি ঐ সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক ও টিচার কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার অসুবিধা—মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে অনেক বিদ্যালয় কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আবার অনেক বিদ্যালয় এখনও একার্যে অগ্রসর হইতে ইতস্তত: করিতেছে। প্রথমেই সকলের মনে হইতেছে যে, শিক্ষকগণ কর্মভারে যেভাবে ভারাক্রান্ত তাহাতে রেকর্ড কার্ড সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা পাইবেন না। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখাকে তাঁহারা 'অতিরিক্ত কাজ' বলিয়া মনে করিতেছেন। অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা এবং শিক্ষাদান কার্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ইহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কিছুদিন পরপরই শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ফলাফল ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ হইল তাহা জানিতে না পারিলে অন্ধের মত আর অগ্রসর হইয়া লাভ কি ? বর্তমান জগতে সময় ও কার্যের পরিমাণের মধ্যে কেহই সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেছেন না ; তাই কোন্ কার্যটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোন্‌টি বা একটু গৌণ এই বিচার করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হয়। এই বিবেচনায় কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করা যে আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক কার্য হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজন হইলে অন্য কার্যের বিনিময়েও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করার জন্য সময় দিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত:, অনেকে মনে করেন যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখা সম্ভব নহে এবং রাখিয়াও বাস্তবক্ষেত্রে কোন লাভ হইবে না। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, ছাত্রদের আগ্রহ, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতির পরিমাপ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নহে। কিন্তু এই পাপচক্রের (vicious circle) অবসান যদি ঘটাইতে হয় তবে কোথাও না কোথাও ত আমাদের

কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিবে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও ঐরূপ পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং কোন দিকেই (এমন কি স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলের কথা বিচার করিলেও) উহা ক্ষতিকর হইবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই যদি নিম্নলিখিত কার্যগুলি কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষার আনুসঙ্গিক হিসাবে আরম্ভ হয় তবে সুষ্ঠুভাবে রেকর্ড কার্ড রক্ষা করাও হয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যও অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়—১। হবি ক্লাব স্থাপন, ২। পাঠ্যসূচীর-আনুসঙ্গিক-কার্যাবলী (Co-curricular activities) ছাত্রদের ছোট ছোট দলে অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করণ, ৩। শ্রেণীকক্ষের ভিতর কিছু কিছু কর্মপ্রধান (activity) এবং দলগত কর্মপদ্ধতির শিক্ষা প্রচলন করণ। বস্তুতপক্ষে আমাদের অনেকে প্রগতিশীল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ঐ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাদের স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফলও ভাল হইতেছে। উপরি-উক্ত ধরণের কার্য বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হইলে ছাত্রদের আগ্রহ, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতির পরিমাপ শিক্ষাদান কার্যের সঙ্গে সঙ্গেই চলিবে; উহার জন্য তেমন কিছু পৃথক সময় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। শিক্ষকদের পরস্পরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিবার জন্য এবং পরিমাপগুলি কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় লাগিবে মাত্র। একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রবর্তনের জন্য একজন শিক্ষকের সমগ্র বৎসরে ২৫।৩০ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে ঐ সময় শিক্ষকের গতানুগতিক কর্মসূচীর কিছুটা অদল-বদল করিয়া বাহির করা অসম্ভব নহে। আর একটি কথা, নানা সময়ে নানা ধরণের পরিমাপের জন্য ছাত্রদের নাম শিক্ষকের বার বার প্রয়োজন হইবে। তাই বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের নাম ছাপাইয়া লইলে কাজের অনেকটা সুবিধা হয়। ঐরূপ ছাপার ব্যয়কে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ "অনুমোদিত ব্যয়" বলিয়া গণ্য করিবেন আশা করা যায়। রেকর্ড কার্ড রক্ষার কার্যে নিষ্ঠাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা। নিষ্ঠা থাকিলে কোনরূপ পরিমাপ করাই অসম্ভব হইবে না। আবার কখনও যদি কোন পরিমাপ

সম্বন্ধে শিক্ষকের মনে সন্দেহ থাকে তবে পরিমাপের ফল লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে তিনি নিজ মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের সকল পরিমাপের পাশেই ঐরূপ মন্তব্য লেখা চলে।

অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর শিক্ষকগণ কিউমিউ-লেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার গুরুত্ব এবং উহা রক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন বলিয়াও বিদ্যালয়ে ঐ ধরণের রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার অসুবিধা হইতেছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত এক্সটেশন সার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট (Extension Service Department) ও ব্যুরো অব এডুকেশনেল এণ্ড সাইকোল-জিক্যাল রিসার্চ (Bureau of Educational & Psychological Research) শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্নস্থানে, আলোচনা সভায় মিলিত হইয়া কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার ব্যাপারে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে উপরি-উক্ত ব্যুরোর সহিত আলোচনা করিতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত বাস্তবধর্মী আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে কলমে কাজের (practical work) অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন—স্বাধীনতা লাভের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ভারত অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন ব্যতীত দেশ যে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই স্থিরনিশ্চয়। তাই শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। এই পরিবর্তনগুলি এত যুগান্তকারী এবং তাহাদিগকে এত দ্রুত রূপায়িত করার চেষ্টা চলিতেছে যে, অনেক সময় আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, আমরা ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছি কিনা। দীর্ঘদিনের সংস্কার আপনা হইতেই আমাদের মনে নূতন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইতেছে। পরিবর্তনগুলির সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চলিতেছে। জাতি হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সম্পূর্ণ-রূপে এখনও মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ পরিবর্তনগুলির মাত্র সূচনা হইয়াছে। উহারা পূর্ণতালাভ করিয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নব কলেবর দিতে হইলে প্রতিক্ষেত্রেই আরও অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং ঐ পরিবর্তন সুচিন্তিত আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে যে সব পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা অপরিহার্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক জগতে জাতির উন্নতি বা অবনতি প্রধানতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠু ও উন্নত হইলে জাতির অগ্রগতি অনিবার্য। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ভালমন্দ, ভ্রম-প্রমাদ অবিলম্বে ধরা পড়ে না। কোন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া বিচার করিতে হইলে অন্ততঃ পনের বিশ বৎসর অপেক্ষা করিতেই হইবে। অধিকন্তু দীর্ঘদিন পরে ভ্রম-প্রমাদ প্রত্যক্ষ হইলেও সংশোধন কঠিন হইয়া

দাঁড়ায়। খুব গভীরভাবে চিন্তা বা আলোচনা না করিয়া এবং ফলাফল সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্থিরনিশ্চয় না হইয়া শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাই, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে শিক্ষা সংস্কারের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা—ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে তিন রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। টোলের মাধ্যমে সংস্কৃত, মক্তব ও মাদ্রাসার সাহায্যে আরবী ও ফারসী এবং পাঠশালায় মাতৃভাষায় মোটামুটি লিখন-পঠন ও ব্যবহারিক গণিতের জ্ঞান দেওয়া হইত। উপরি-উক্ত তিন প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না—টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা এবং পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ ছিল। একের শিক্ষার বিষয়বস্তু অপর হইতে পৃথক ছিল। কোন শিক্ষাব্যবস্থাতেই ভারতের জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরাই টোলের শিক্ষার সুযোগ পাইতেন। অধিকাংশ মুসলমানই দুই এক বৎসর মক্তবে যাতায়াত করিতেন বটে কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই মক্তবের পাঠ শেষ করিয়া মাদ্রাসার পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠশালার শিক্ষা অধিকতর সার্বজনীন ছিল বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীরা এবং সমৃদ্ধ চাষীরাই জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে এই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিত। টোল এবং মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ খুবই অল্প ছিল। ব্রাহ্মণগণের যাজন কার্যে এবং মুসলমানদের মক্তবে মৌলবী হওয়া ব্যতীত সংস্কৃত, আরবী এবং ফারসী শিক্ষার দৈনন্দিন জীবনে আর কোন সার্থকতা ছিল না। অবশ্য যাঁহারা কবিরাজী বা হকিমিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতেন তাহাদের এই শিক্ষা কাজে লাগিত। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আধুনিক জগৎ যে উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল এবং তাহার ফলে যন্ত্র সভ্যতার যে প্রসার ঘটিতেছিল টোলের বা মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষায় তাহার কোন পরিচয়ই মিলিত না। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক জগতের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। তাই ইহার প্রসার দিনদিনই সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। পাঠশালার শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ইহা প্রাথমিক জ্ঞানদান ব্যতীত বেশী কিছু করিতে পারিত না। মোট কথা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে জনসাধারণের জীবনের চাহিদা মিটাইতে

পারে, দেশকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিতে পারে এমন কোন শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে চালু ছিল না।

ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতে সাদরে বরণ—ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৩২ খ্রীঃ) মেকলে সাহেব (Macaulay) কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী উহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ইতিহাসকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। যে ইংরেজ শাসনকর্তাগণ ইহার প্রবর্তন করেন অল্পদিন মধ্যে তাঁহারাই এই শিক্ষার অপ্রার্থিত ফল দেখিয়া উহার প্রসার চেষ্টায় উদ্যমহীন হইয়া পড়েন। তথাপি আমাদের আপ্রাণ চেষ্টায় (কখনও কখনও ইংরেজ শাসনকর্তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) আশাতিরিক্ত দ্রুত-গতিতে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রসার লাভ করিল। অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন সম্বন্ধই ছিল না। বিদেশী শাসনকর্তাগণ ইংরেজি জানা কর্মচারী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য-ভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজ-রাজত্বের একদল ভারতীয় সমর্থক সৃষ্টি করাও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইত। আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাস, ভূগোল (পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয়) প্রভৃতি বিষয় সামান্য সামান্য শিক্ষা দেওয়া হইত। এক কথায় ইওরোপে যাহাকে 'লিবারেল এডুকেশন' (Liberal Education) বলে তাহাই আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের 'গ্রামার স্কুল'-এর ছাঁচে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিতেছিল।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য যাহাই থাক না কেন ভারতীয়গণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কৃষির অধোগতি এবং কুটির-শিল্পের ধ্বংশের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃত্তিহীন এবং দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইংরেজি শিখিয়া সরকারী চাকুরি এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কাজ তাহাদিগকে আর্থিক সংকট হইতে রক্ষা করে। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ এবং চেষ্টার ফলেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা ছিল এই যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই শিক্ষার

সমান সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিত। ইংরেজি শিক্ষা যুক্তিবাদী এবং আধুনিক জীবন দর্শনেব উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার অনুপযুক্ততা—অল্পদিন মধ্যেই কিন্তু প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার দোষ-ত্রুটি সকলের চোখেই ধরা পড়িতে লাগিল। প্রধানতঃ যে চাকুরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাকে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। ইংরেজি শিক্ষিত বেকার যুবক অন্য কোন কাজ সংস্থান করিতে না পারিয়া ইংরেজি স্কুল খুলিল এবং ইংরেজি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত কোনকালেই এই শিক্ষার কোন যোগসূত্র ছিল না। অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রজগতের অগ্রগতির সহিত এই শিক্ষা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিল না। চাকুরি সংগ্রহ করিতে না পারিলে বাস্তবজীবনে এই শিক্ষার আর কোন সার্থকতাই ছিল না। আবার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকিলেও এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবণতার বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগ না থাকায় অনেকেই এই শিক্ষালাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইতে লাগিল—ফলে প্রতি পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন—এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার সংস্কারের কথা ভাবিতেছিলেন। এ বিষয়ে পরামর্শ দেওরার জন্য সময়ে সময়ে আমাদের ইংরেজ শাসনকর্তাগণ নানা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। এই কাজে 'হাণ্টার কমিশন' (১৮৮২ খ্রী:), ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯০২ খ্রী:), কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯১৭ খ্রী:), হার্টল কমিটি (১৯২৯ খ্রী:)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি কমিশন নিজ নিজ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া সংস্কারের জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন কমিশনের সুপারিশই আংশিকভাবে ব্যতীত সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হয় নাই। শিক্ষা-সংস্কারের কাজ এত জটিল, এত অর্থ ও পরিশ্রমসাধ্য এবং ইহা সমাজ সংস্কার ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, বিশেষ করিয়া বিদেশী সরকার এই কাজে অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সকলেই বুঝিল যে, শিক্ষা সংস্কার ব্যতীত আমাদের জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়—আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চেষ্টা, পাঁচশালা পরিকল্পনা, নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উদ্যম সবকিছুই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে ব্যর্থ হইবে। তাই স্বাধীনতালাভের পরই ভারত সরকার ইউনিভারসিটি এডুকেশন কমিশন (১৯৪৮ খ্রী:) ও সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন (১৯৫৩ খ্রী:) নিয়োগ করেন এবং যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ঐ কমিশনগুলির সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনকে সংস্কারের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল।

শিক্ষাব্যবস্থায় ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড—আমরা যখন নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে বদ্ধপরিকর, তখন শিক্ষাব্যবস্থার ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা আমাদের শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টাকে ঠিক পথে চালিত করিতে সাহায্য করিবে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক স্তরে ইহা হইবে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। কিছুটা জ্ঞানলাভ না করিলে কেহই বর্তমান সমাজে নিজের প্রকৃত স্থান করিয়া লইতে পারে না বা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হইতে পারে না। কাজেই ব্যক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই হউক আর দেশের উন্নতির জন্যই হউক অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে সার্বজনান ও বাধ্যতামূলক করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক শিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে উহা ভবিষ্যৎ শিক্ষার বা সমাজ-জীবনের বুনিয়াদ গঠন করিতে পারে। এই বুনিয়াদ আবার ধনী-দরিদ্র সকলের পক্ষে সমান হওয়া উচিত। তাহা না হইলে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার উপরই জীবনের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-অর্থ-প্রবণতা-নির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ ন পাইলে কিছুতেই গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা উপরি-উক্ত নীতি কতখানি কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে ইহা তাহার ভালমন্দ বিচারের দ্বিতীয় মানদণ্ড।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার একস্তরের সহিত অপর স্তরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার কোন স্তরই অন্ধগলি হইবে না—এক স্তর হইতে উন্নততর

স্তরে উন্নীত হইবার স্বাভাবিক সুযোগ থাকিবে। প্রাথমিক স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবেশ করিবার স্বাভাবিক সুযোগ ছাত্রদের থাকিবে, তা তাহারা যে বিষয়েই পড়াশুনা করুক না কেন। ঐরূপ না হইলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে—উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা প্রত্যেককে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে না পারিলে সে শিক্ষা ব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আবার, প্রতিদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে কতকগুলি মূল উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের ভিতর দিয়াই উহাদিগকে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। তাই শিক্ষার এক স্তরের সঙ্গে অপর স্তরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, একদিকে শিক্ষার এক স্তরের সঙ্গে অপর স্তরের যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিবে অপর দিকে আবার তেমনি শিক্ষার প্রত্যেক স্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। শিক্ষার একস্তর শেষ করিয়া ছাত্র যদি অপর স্তরে প্রবেশ নাও করে তবুও যেন তার শিক্ষা ব্যর্থ না হয়। সে সরাসরি সংসারে প্রবেশ করিলেও লব্ধ শিক্ষা যেন তাহার কাজে লাগে। তাই প্রতিস্তরের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সহিত জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। স্তর-নির্বিশেষে শিক্ষার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আত্মোন্নতিকারক হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রতি স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভালমন্দের বিচার তাহার নিজের পরিধির মধ্যেও করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার ভালমন্দের বিচার করিতে হইলে উহারা ছাত্রদের সমাজ-জীবনের জন্য কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে তাহা যে বিবেচনা করা প্রয়োজন এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। বিদ্যালয় সমাজ দ্বারাই পরিচালিত এবং সমাজকে উন্নততর করিয়া তাহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও যে শিক্ষা তাহাকে সমাজের মধ্যে সার্থক জীবন যাপনে সাহায্য করিবে না, তাহা তাহার নিকট অনেকখানিই অর্থহীন। ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই তাহা সার্থক হয়।

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রকে সমাজে জীবন যাপনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে অপরদিকে উহা তেমনি তাহাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ

দিবে। সমাজে সার্থক জীবন যাপনের প্রস্তুতি এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের অনুকূল অভিজ্ঞতা লাভ, শিক্ষাব্যবস্থায় একে অপরের পরিপূরক। সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় আবার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশপ্রাপ্ত মানুষই সমাজে সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতা ছাত্রের (বর্তমান) জীবনের প্রয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে উহা ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাহায্য করে। ছাত্রের (বর্তমান) জীবনের চাহিদার (needs) ভিত্তিতেই বিদ্যালয়ের কর্মসূচী ঠিক করা উচিত।

সপ্তমতঃ, 'শিক্ষা' অর্থই যখন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্রদের ব্যবহার পরিবর্তনের বিধিমত চেষ্টা করা, (Education is the systematic attempt at modification of behaviour with an end in view) তখন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিচারে তাহার মূল উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিই বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে নিজের সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়। জাতীয় জীবন-দর্শনের সহিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। উহা একদিকে জাতীয় জীবন-দর্শনের পরিপোষণ করিবে, অপর দিকে আবার তাহাকে উন্নততর করিতেও চেষ্টা করিবে।

অষ্টমতঃ, শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হইবে জাতির প্রত্যেক সভ্যের আপন আপন আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুসারে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভে সাহায্য করা এবং দেশের সমৃদ্ধি, জাতির জীবন-দর্শন, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উন্নততর স্তরে লইয়া যাওয়া। শিক্ষার স্তরে স্তরে উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকিলেও প্রতিস্তরের শিক্ষাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপোষক হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাপদ্ধতির উপর শিক্ষার ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা না পাইলে একক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জ্ঞানের সংক্রমণ (Transfer of Learning) হয় না। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ জ্ঞানের প্রয়োগ হয় না, ব্যক্তিত্বের বিকাশেও উহা সাহায্য করে না। এইরূপ জ্ঞান সংগ্রহকে অর্থ, সামর্থ্য ও সময়ের অপচয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না উহা আধুনিক জগতে অচল।

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার—উপরে আলোচিত মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে আমাদের কোন স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই সন্তোষজনক মনে হয় না।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাধীনতালাভের দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে পারি নাই। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরূপে কাজ করিতে হইলে যে নিম্নতম শিক্ষার প্রয়োজন তাহাব ব্যবস্থাও আমরা আজ পর্যন্ত সকলের জন্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। অধিকন্তু প্রাথমিক স্তরে আমরা যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছি তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। একশত বৎসর পূর্বে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে হয়ত ঐ শিক্ষা জীবনে সরাসরি কাজে লাগিত; কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজের সহিত পাঠশালার শিক্ষার সম্বন্ধ খুবই সামান্য। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ চালাইতে না পারিলে ছাত্রের কাছে গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন সার্থকতাই থাকে না। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ভিন্ন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রাথমিক শিক্ষার কাল বর্ধিত করিতে না পারিলে এই ত্রুটির সংশোধন হইবে না।

গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাকে সংস্কারের উদ্দেশ্যেই মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হইয়াছিল যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সরাসরিভাবে জীবনে কাজে লাগে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষভাবে গ্রাম্যজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত। শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে ইহার সার্থকতা ততটা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কুটির-শিল্প বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে তাহা বেমানান। আবার যে জীবন-দর্শন বা সমাজ-কল্পনার ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পিত, নাগরিক জীবন-দর্শন তার অনেকখানি বিপরীত। যেমন প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে বাস করার উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে যেখানে একই বাড়ীর বাসিন্দা একে অন্যকে হয়তো চেনেনও না, সেখানে ঐরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাসের কথা একেবারেই অবান্তর। মোট কথা বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুটা পরিবর্তন না হইলে উহাকে নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তারপর, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে,

অপরদিকে উহা তেমনই ছাত্রদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে। বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এরূপ ধারণা যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে কাজের উপর জোর দেওয়ার জন্য জ্ঞানের দিক অবহেলিত হয়। ফলে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাশেষে, ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত হয় না। হইতে পারে ইহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রুটি—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিতভাবে পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর দেওয়ার জন্য ঐরূপ হয়। তবু যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কার না হইতেছে, বাস্তব ক্ষেত্রে ততদিন অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। সব চাইতে আপত্তি-কর কথা হইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী এবং অবুনিয়াদী দুইরকম বিদ্যালয়ই বর্তমানে কাজ করিতেছে। সাধারণতঃ গ্রামে দরিদ্রের ছেলেমেয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইতেছে এবং সহরে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের ছেলেমেয়ে অবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। যাহারা মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবে না, বুনিয়াদী শিক্ষা তাহাদেরই জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত বলিয়া লোকের ধারণা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে অসুবিধা হইতেছে। কিছু সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং কয়েকটি গ্রামীণ (Rural) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও বুনিয়াদী বিদ্যালযের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মিটাইবার জন্য উহারা যথেষ্ট নহে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগ পাইতেছে না। গণতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরণের বিদ্যালয় থাকিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা সকলে একই ধরণের বিদ্যালয় একইভাবে গ্রহণ করিবে, ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরণের বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া, সকল বিদ্যালয়কে মোটামুটি একই আদর্শ, একই শিক্ষনীয় বস্তু এবং একই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। অবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি পুস্তক-কেন্দ্রিক এবং সমাজের সহিত সম্বন্ধহীন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়, শিক্ষার আদর্শ, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা-পদ্ধতির দিক হইতে অবুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে শ্রেষ্ঠ। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র ভবিষ্যতে সকল বিদ্যালয়ই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, সরকারও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজন মিটাইতে হইলে

শিক্ষার কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নাই। মহাত্মাজী পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থা হইতে দেশ অনেকদূর সরিয়া আসিয়াছে এবং পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হইলে ঐ দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদী শিক্ষা সংস্কারের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কারের কথা পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে বুনিয়াদী শিক্ষা আপনা হইতেই কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন জীবন-দর্শন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সুচিন্তিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে আনা প্রয়োজন। এই কাজে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শের পার্থক্যই সর্বপ্রধান বাধা বলিয়া মনে হইতেছে। সম্পূর্ণরূপে মনস্থির না করিয়াই আমরা যেন নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রসর হইয়াছি। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার নবরূপ পরিকল্পনায়—আমরা এখনও দ্বিধা করিতেছি। তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর আবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে—অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন করার সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে চাই। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই এবং নূতন বিদ্যালয়ের অধিকাংশই হইবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়। কিন্তু অবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদীকরণ বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুনর্গঠন করার কোন চেষ্টা হইবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন এবং নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করার জন্য আর একটি শিক্ষা কমিশনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার—মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা বেশী। বুনিয়াদী শিক্ষার মত কোন সংস্কার আন্দোলন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করে নাই। অথচ ঐ স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের অপেক্ষা বেশী। রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দুর্বলতম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self-sufficiency) একেবারেই নাই। পাশ্চাত্ত্যদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা

শেষ করিয়া অধিকাংশ ছাত্রই সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করে বা কোন বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করে। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। আমাদের দেশে গ্র্যাজুয়েট না হইলে বা অন্ততঃ ইণ্টারমিডিয়েট পাশ না করিলে জীবনে প্রবেশ করা বা কোন বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করার সুবিধা হয় না। উচ্চতর শিক্ষা না পাইলে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন হইয়া পড়ে। উহার নিজস্ব কোন মূল্য নাই। এই অবস্থায় এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এতদিন পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার কোন নিজস্ব সত্তাই ছিল না। ফলে, নানা সুযোগে নানাভাবে ইহার মধ্যে গলদ ঢুকিয়াছে। সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে যখন যেখানে গিয়াছেন যাঁহার সঙ্গেই আলোচনা করিয়াছেন তিনিই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার নানারূপ দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া উহা সংস্কারের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়াছেন। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গলদগুলির দিকে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

প্রথমেই বলিতে হয় যে, আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদের পাঠ্য ও পড়ানোর পদ্ধতি এমন যে প্রত্যক্ষ জীবন যাপনে ঐ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন কাজেই লাগে না। ফলে, শিক্ষাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে ছাত্রগণ নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায় মনে করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী। জ্ঞানদান-চেষ্টা ব্যতীত ইহা ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে না। ছাত্রের চরিত্রের বিকাশ, তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও অনুরাগের স্ফূর্তি প্রভৃতির জন্য বিদ্যালয়গুলিতে কোন আয়োজনই নাই। যতদিন পর্যন্ত পরিবার এবং সমাজে ঐ সবের সুযোগ কিছুটা ছিল ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জ্ঞানদান-প্রচেষ্টা কিছুটা সফলতা লাভ করিত। কিন্তু বর্তমানে পরিবার এবং সমাজের যে অবস্থা তাহাতে শিশুর চরিত্রগঠন, তাহার ক্ষমতা এবং অনুরাগের বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে উহাদের নিকট হইতে বিশেষ কোন সহযোগিতা আশা করা

যায় না। ফলে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রচেষ্টা আরও ব্যর্থতায় পরিণত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রগঠন এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও অনুরাগের বিকাশ না হইলে জ্ঞানদান চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাদান করিতে হইলে সমগ্রভাবে মানুষকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অল্পদিন পূর্ব পর্যন্তও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়েই (গণিত ব্যতীত) এমনভাবে প্রশ্ন রচনা করা হইত যাহাতে প্রকৃতপক্ষে ভাষাজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই বড় একটা পরীক্ষিত হইত না। ফলে, ভাষা শিক্ষায় যাহাদের বিশেষ ক্ষমতা (Special aptitude) ছিল না তাহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না। ছাত্রদের ক্ষমতা বা আগ্রহের বিভিন্নতার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী নির্বাচনের কোন সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় খুবই বেশী হইত।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। জ্ঞান আহরণের কৌশল (Skill)গুলিকে ছাত্রদের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া প্রধানতঃ মুখস্থ করাকেই বিদ্যা আয়ত্ত করার একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন চিন্তাশক্তি জাগরিত করণ, বিদ্যালাভের অনুকূল অভ্যাসগঠন, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহকে বিকশিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলী ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের চেষ্টা না করিয়া অর্থহীনভাবে একই জিনিস বারবার পড়াইয়া ছাত্রদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানের সংক্রমণ একেবারেই হয় না। ছাত্রেরা যাহা শিক্ষা করে, "পরীক্ষা"পাশ করা ব্যতীত জীবনের আর কোন প্রয়োজনে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের কোন স্বাভাবিক আনন্দ নাই। শাস্তির ভয়, পুরস্কারের প্রলোভন বা প্রতিযোগিতার মাদকতা তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট করা হয়। তারপর, স্কুলের কাজ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই এমন যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা উভয়ের পক্ষেই অপ্রীতিকর। ছাত্রের নিকট শিক্ষক শাস্তির প্রতীক বা পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট পুরস্কারদাতা; শিক্ষকের নিকট ছাত্র পাঠবিমুখ

ফাঁকিবাজ। এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে কোন শিক্ষাকার্য চলিতে পারে না। সর্বশেষে প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশ করানোই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকাও যেন তেন প্রকারেণ মুখস্থ করাইয়া ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ করানোর জন্য বিদ্যালয়ের যত চেষ্টা। এ অবস্থায় শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যে কোন স্বাধীনতা নাই। আর্থিক অভাবেও শিক্ষকগণ জর্জরিত। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব নহে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারে অগ্রসর হইতে হইলে ঐ স্তরের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথমেই আলোচনা করা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিশদভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রদিগকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলী শিক্ষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ হইবে, তাহাদের পক্ষে সমাজের নেতৃত্ব করা সহজ নয়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত যাহারা পৌঁছিবে তাহাদের সংখ্যাও খুব বেশী হইবে না। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা কর্মজীবনে প্রবেশ করিবে তাহারাই হইবে সমাজের মেরুদণ্ড—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির দায়িত্ব তাহাদেরই বিশেষভাবে বহন করিতে হইবে। ফলে শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে দেশের নেতৃত্বের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা বর্তমানে আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা। আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির সফলতা উপযুক্ত লোকের অভাবে ব্যাহত হইতেছে। দেশের অর্থনীতির সহিত এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধই ছিল না। নূতন ভারতে প্রত্যেক ছাত্রই যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে আপন অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের প্রস্তুত

করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার ক্ষমতা ও আগ্রহের (Interest) অনুকূল বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা। চতুর্থতঃ, ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ না হইলে তাহাকে শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ছাত্রদের অন্তর্নিহিত স্বজনী শক্তি জাগাইয়া তোলার বিষয়ই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে দেশের সংস্কৃতি (নৃত্য, গীত, কারুশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি) অন্তর দিয়া উপলব্ধি করার যোগ্যতা ছাত্রদের জন্মান প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়া মানুষকে যেন অমানুষ করিয়া তোলা না হয় সেদিকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। উপরি-উক্ত চারিটি উদ্দেশ্যের কথা মনে না রাখিয়া আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের চেষ্টা আলোচনা করিতে পারি।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রথম পরামর্শই হইল এই স্তরের শিক্ষা-কালকে একবৎসর বৃদ্ধি করা। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে প্রয়োজনবোধে কিছুটা শিক্ষানবিশি করিয়া বা কোন বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্র জীবনে প্রবেশ করিবে, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্র সমাজের উচ্চ বৃত্তিগুলির প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। বর্তমান স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয় ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর হইতে। একটু উন্নত ধরণের শিক্ষানবিশিতে বা বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে হইলেই ইণ্টারমিডিয়েট পাশের প্রয়োজন হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ছাত্রদের বয়সের বা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলেও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। ১৪, ১৫ বা ১৬ বৎসর বয়সে (যে বয়সে সাধারণতঃ ছেলেরা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয়) ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণ করার মত মানসিক বিকাশ হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং নিয়মকানুন

(discipline) ও তাহাদের মানসিক বিকাশের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উপযুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। তাই সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট অবধি শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ মোটেই নূতন নহে; ১৯১৭ সালে কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৮ সালের রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন পর্যন্ত যে কোন কমিশন বা রিপোর্ট এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছে, উহাই ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুইস্তরে ভাগ করিয়াছেন—(ক) ১২ বৎসর বয়স (ষষ্ঠ শ্রেণী) হইতে ১৪ বৎসর (অষ্টম শ্রেণী) বয়স পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং (খ) ১৫ বৎসর বয়স (নবম শ্রেণী) হইতে ১৭ বৎসর (একাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে একথা কমিশন বিস্মৃত হয় নাই। তাই তাহাদের মতে ১২ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী পদ্ধতিতেও শিক্ষা চলিতে পারে এবং ঐ শিক্ষাস্তরকে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে দুই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে নামের পার্থক্য থাকিলেও শিক্ষার কোন পার্থক্য থাকিবার কথা নহে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও অবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ বা শিক্ষা-পদ্ধতির খুব গুরুতর পার্থক্য বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আশা করা যাইতেছে যে, একদিন উন্নততর দেশগুলির মত ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে এবং ঐ বয়স পর্যন্ত সকলে এক ধরণের শিক্ষা পাইবে। তাহা হইলে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা সম্ভব নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থানাভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি প্রভৃতি অসুবিধা অনেক স্কুলের পক্ষেই অল্পদিনের মধ্যে দূর করা সম্ভব নহে। তাই প্রথম প্রথম কিছুদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১০ বৎসর) ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১১ বৎসর) এক সঙ্গেই

চলিবে তারপর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে যেগুলি যোগ্যতর তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিবর্তিত হইবে এবং যেগুলি উন্নতি করিতে পারিবে না সেগুলি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে কাজ করিবে। ঐসব বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা ও অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী ছাত্রেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৃত্তিবিষয়ক স্কুল বা কোন ধরণের শিক্ষানবিশির কাজে ঢুকিবে। যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল একসঙ্গে চলিবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য এক বৎসরের প্রি-ইউনিভারসিটি বা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশ খুলিবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা পাশ করিয়া সরাসরি তিন বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাশে প্রবেশ করিবে আর মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রগণ একবৎসর প্রি-ইউনিভারসিটি ক্লাসের পড়া শেষ করিয়া তবে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হইতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে আমাদের যেসব বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে (ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি) সে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য এক বৎসরের প্রিপেরেটরি ক্লাস খোলা হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর বা প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্র প্রিপেরেটরি ক্লাসে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে শিক্ষার পরিবর্তে (ইণ্টারমিডিয়েট) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিপেরেটরি ক্লাসে ঐ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতির মূল্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

বহুমুখী বিদ্যালয়—পূর্বে আলোচিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে শুধু একবৎসর বর্ধিত করিয়া দিলেই চলিবে না। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যতালিকাকেও আবার নূতন করিয়া সাজাইতে হইবে। এই কাজে সর্বপ্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্যও কিছুটা প্রস্তুত হইতে হইবে। তারপর ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের পার্থক্য থাকার জন্য সকলেই এক বিষয়ে পড়াশুনা করিবে এরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্ষমতা ও আগ্রহের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এতদিন ছিল না। ইহার ফলে অনেকেরই সহজাত ক্ষমতা চাপা পড়িয়া থাকিত এবং নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের প্রতিকূলে পড়াশুনার চেষ্টা করিয়া অনেককেই বিফ

মনোরথ হইতে হইত। অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। ইতিপূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার দরুণ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিতেছে; দেশের শিল্পোন্নতির জন্য আমাদের হয়ত বড় ইঞ্জিনিয়ারের বা সাধারণ শ্রমিকের অভাব নাই, কিন্তু মধ্যস্তরের কারিগরের একান্ত অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বহুমুখী করিতে না পারিলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। উপরি-উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাত রকমের বিশেষ বিষয়ের মধ্যে যে-কোন একটি বাছিয়া লইবার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হইয়াছে। এই সাত রকমের বিশেষ বিষয় হইল—১। সাহিত্য, ২। বিজ্ঞান, ৩। কারিগরি, ৪। ব্যবসায়-বাণিজ্য, ৫। কৃষি, ৬। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ৭। চারুকলা। বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি উপরি-উক্ত সাতটির মধ্যে যে-কোন দুই বা ততোধিক বিষয় তাহার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইবে। সাধারণতঃ বহুমুখী বিদ্যালয়ে দুই বা তিনটি বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ থাকে, তবে এমন বহুমুখী বিদ্যালয়ও আছে যাহাতে ৪টি পর্যন্ত বিশেষ বিষয় পাঠের ব্যবস্থা আছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা—পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে ভারত বিশেষ করিয়া শিল্পবিস্তারের উপর জোর দিতেছে। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেশকে শিল্পপ্রধান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই কাজে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইতেছে যন্ত্রবিষয়ক কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব। এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাতে-কলমে কাজের উপর একেবারেই জোর না দেওয়ার জন্যই আমাদিগকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন তাই এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়াছেন।

১। যে সব ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না—যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের অনুপযুক্ত বা যাহাদের তাড়াতাড়ি অর্থোপার্জন আরম্ভ করা প্রয়োজন তাহাদের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পরই জুনিয়র টেকনিক্যাল

স্কুলে বা শিক্ষানবিশির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর (উচ্চ মাধ্যমিক নহে) যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না তাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের বৃত্তি-মূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

নবপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা—আমাদের দেশের অনেকেই নবপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছেন। বাংলাদেশে ইহার সমালোচনা হয়ত অন্যান্য ষ্টেটের চেয়ে তীব্রতর হইয়াছে। প্রথমেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত এক বৎসরের শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত যোগ করিয়া দিলে শিক্ষার মান আরও নামিয়া যাইবে বলিয়া অনেকের আশঙ্কা। কিন্তু বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির দুর্দশা ব্যতীত এই আশঙ্কার আর কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। বরং বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন এবং শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রের এই বয়সে মানসিক বিকাশের অধিকতর অনুকূল বলিয়া এবং একসঙ্গে একই বিষয় একটানা ৩ বৎসর পড়িবার সুযোগ পাইবে বলিয়া শিক্ষার মান উন্নততর হইবে আশা করা যাইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বর্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিতে হইলেও উহাদিগকে একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত করা প্রয়োজন। বর্তমান দশম শ্রেণী বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষান্তরকে সমাপ্ত করে না। মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি হয় কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী দুইটির পাঠ শেষের পর ; তাই সমাজের নিকট হইতে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতীত ঐরূপ বিদ্যালয়ের পাঠের আর কোন পার্থক্য নাই। নূতন পরি-কল্পনার মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি কলেজে না হইয়া বিদ্যালয়ে হইবে। ফলে, তাহাদের সামাজিক গুরুত্ব বাড়িবে এবং সমাজ উহাদের জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে ব্যধ্য হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, শিক্ষকের বেতনের হার, তাঁহাদের যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা বর্তমান কলেজ হইতে ন্যূন হইলে চলিবে না। ফলে, নূতন পরিকল্পনায়

শিক্ষার মান না কমিয়া বরং নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উভয় স্তরেই বৃদ্ধি পাইবার কথা। বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির যে অবস্থা তাহাতে উহাদিগকে উন্নততর করিতে না পারিলে উহাদের পক্ষে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও নিম্ন-মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব নহে। আবার সমাজের কাছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজের গুরুত্ব যথেষ্ট বলিয়া 'বিবেচিত' না হইলে ইহাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা উদ্যম কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী করার প্রচেষ্টাও বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, এত অল্প বয়সে (১৪ বৎসর) ছাত্রদিগকে বিশেষ পাঠ্যাভিমুখী করা বা বিশেষ বৃত্তির জন্য শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশ দীর্ঘদিন "সাধারণ শিক্ষায়" অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। ১৬।১৭ বয়সে ছেলেমেয়ে উপার্জনক্ষম না হইলে আমাদের দেশের শতকরা নব্বইটি পরিবারের চলে না। অথচ আজকালকার বৃত্তিগুলি এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা না করিলে কোন বৃত্তিরই উপযুক্ত হওয়া যায় না। সমগ্র শিক্ষাকাল আরও বাড়াইয়া দিতে না পারিলে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ করার সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর, বিদ্যালয় সচেষ্ট হইলে ১৪ বৎসর বয়সের ভিতর ছাত্রদের নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের অন্ততঃ কিছুটা বিকাশ না হওয়ার কোন কারণ নাই। সর্বশেষে বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয় পাঠকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। বিশেষ বিষয়গুলির পাঠ্যতালিকা এত "সাধারণ" যে, উহাদের যে-কোন একটি বিশেষভাবে পড়িলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ পাঠ এবং বৃত্তি একেবারে নির্দিষ্ট হইয়া পড়িবে এমন নয়। বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠ, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট (specific) বিষয় পাঠ বা বৃত্তি গ্রহণের ভূমিকামাত্র। বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা এক বিশেষ পাঠ্যাভিমুখী হইলে ইহা তাহাদের বর্তমান শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি উভয়েরই সহায়ক হইবে। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী করিতে গেলে উপযুক্ত পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রভৃতি

বিষয়ে যে সব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাদের সমালোচনাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যতম গুরুতর সমালোচনা এই যে, দেশের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। কালক্রমে অনেক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক হইতে নিম্ন-মাধ্যমিকে পরিণত হইতে হইবে, ফলে দেশবাসীর শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হইবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্ন-মাধ্যমিকে পরিণত হইলে তাহাকে শিক্ষার সংকোচন বলা যাইতে পারে না, যদি ইহার পরিবর্তে ঐ দুই বৎসরের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক জুনিয়ার পলিটেকনিক বা ঐ ধরণের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে (অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঐ ধরণের বিদ্যালয়েও পরিণত হইতে পারে)। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের যে সব ছাত্র ক্ষমতা এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহারাই শুধু ঐ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। তাহারা যে ধরণের বিদ্যালয়েই পড়ুক না কেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে এবং অন্যান্য ছাত্রেরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও অর্জিত জ্ঞান ও আগ্রহের ভিত্তিতে কোন বৃত্তি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বৃত্তির শিক্ষানবিশিতে প্রবেশ করিবে। নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক ভিত্তিতে, একই শিক্ষা স্তরের বিভিন্ন অংশ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে মাধ্যমিক স্তরের কোন ছাত্রেরই শিক্ষার সুযোগ কমিবে না বরং প্রত্যেক ছাত্র নিজের যোগ্যতা হিসাবে পাঠের ক্ষেত্র পাইয়া অধিকতর সফলতা লাভ করিবে। যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হইতে হইবে তাহাদের শিক্ষকদেরও কোনরূপ ক্ষতি হওয়া উচিত নহে। কোন স্তরের শিক্ষাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কম-বেশী হওয়া উচিত নয়। শিক্ষকের বেতন হইবে তাঁহার নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন্ স্তরে তিনি শিক্ষা দিতেছেন সেই ভিত্তিতে নহে। কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্ন-মাধ্যমিক বদ্যালয়ে পরিণত হইলে তাহার শিক্ষকদের বেতন হ্রাস করিবার কোন কারণই নাই।

নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার সমালোচনাকালে একথা মনে রাখিতে হইবে যে,

আমাদের দেশে যতগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই নূতন পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে (কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন, হারটগ কমিটি, সাপ্রু কমিটি, উড-এবৃবট রিপোর্ট, সার্জেণ্ট রিপোর্ট, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইউনিভারসিটি কমিশন)। এক কথায়, বিশেষজ্ঞদের মত নূতন পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে প্রথম প্রথম যে গুরুতর বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু আর আমাদের অপেক্ষা করিবার বা ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। করণ যাহাই হউক আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে দ্রুত অধোগতি হইতেছে এ সম্বন্ধে অমরা সকলেই একমত। শিক্ষার ক্ষেত্রে উধ্বর্গতি বা অধোগতি একদিনে ধরা পড়ে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গলদ সঞ্চিত হইতে হইতে আজ তাহার পরিণতি সকলের কাছেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে ঐ সব গলদ দূর করিয়া অন্ততঃ অবনতি রোধ করিতে না পারিলে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে দেশকে যে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতি চক্রবৃদ্ধি সুদের মতই দ্রুত চলে—অবাঞ্ছিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান এবং শিক্ষকের ছাত্র যে আরও অনেকগুণ অবাঞ্ছিত শিক্ষা পরিস্থিতির ভিতর দিয়া বড় হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে পুরুষানুক্রমে শিক্ষার অধোগতি দ্রুততর হইতেছে। তাই কাজ যতই কঠিন হউক দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমাদের শিক্ষা-সংস্কারে অগ্রসর হইতেই হইবে।

তারপর, দেশের শিল্পোৎপত্তি, এবং শিক্ষাসংস্কার যে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত এ সত্য আমরা গত দুই পাঁচশালা পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছি। আর কিছুর জন্য না হইলেও দেশের শিল্পোন্নতির জন্যও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের আর বিলম্ব করা চলে না। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে বাস্তবক্ষেত্রে বাধা যত বেশীই আসুক না কেন, দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইলে কোন বাধাই আমাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় নবধারা

(New Trends in Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নবধারা প্রবর্তনের প্রয়োজন—মাধ্যমিক শিক্ষার গঠন ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করিলেই যে শিক্ষার রূপ পরিবর্তিত হইবে এমন আশা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ না করিলে এবং শিক্ষাসংস্কারের ফলে যে সব নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের সমাধানের চেষ্টা না করিলে আমাদের শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মত এই যে, আমরা কি শিখিলাম ইহা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কি ভাবে শিখিলাম ইহাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যে জ্ঞান অর্জন করিলাম, জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে না পারিলে উহা ব্যর্থ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগকে শিক্ষা-বিজ্ঞানে 'শিক্ষায় সংক্রমণ' (Transfer in Learning) আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি, শিক্ষায় সংক্রমণের অভাব। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় অধিকতর কষ্ট বরণ করি এবং হয়ত অধিকতর পরিশ্রমও করি। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্র এবং আমাদের দেশের ছাত্রের মধ্যে যে খুব বেশী পার্থক্য থাকে এমন মনে হয় না। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান যথোচিত সংক্রামিত হয় না বলিয়া, কার্যকরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ছাত্রেরা পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইলেই জ্ঞানের সর্বোচ্চ সংক্রমণ সম্ভব হয়। "মুখস্থ করা" জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি হইলে ঐরূপ পদ্ধতিতে লব্ধজ্ঞানের প্রায় কোন সংক্রমণই হয় না। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের বিদ্যালয়ে জ্ঞানদানের চেষ্টা হয় বলিয়াই আমরা উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কাজেই শিক্ষাদান-পদ্ধতির সংস্কার আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত

প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়-বস্তুর যুগান্তকারী পরিবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান-পদ্ধতিরও যদি সংস্কার না হয় তবে শিক্ষার মান উন্নততর না হইয়া অবনততর হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইতেছে তাহাদের প্রধান কারণ আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কম। গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা-দান কার্য চলিলে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যে খুব জটিল হইয়া পড়িয়াছে ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

আবার শুধু ক্লাসের ভিতরেই শিক্ষা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক করার কথা ভাবিলে চলিবে না। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিতে হইবে এবং প্রতিটি কার্য বিজ্ঞানসম্মত কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করিয়া এমন অনেক কাজ করিতেছি যেগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপোষক বলিয়া মনে না হইয়া ক্ষতিকর বলিয়াই মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া পুরস্কার বিতরণ উৎসব করিয়া প্রতি শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুই-তিনটি ছেলে বা মেয়েকে পুরস্কার দিয়া আসিতেছি—উদ্দেশ্য ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহ বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি শ্রেণীতে প্রথম দিকের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ভিন্ন ঐ ধরণের পুরস্কার বিতরণ অন্যান্য ছেলে-মেয়ের মনে পড়াশুনার প্রেরণা যোগাইবে এই আশা করা বাতুলতা মাত্র। অপরদিকে ঐরূপ পুরস্কার বিতরণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে যে, বাধ্যতামূলক, বাড়ীর কাজকে (Home Task) আমরা শিক্ষাদান চেষ্টার একরূপ অঙ্গ করিয়া লইয়াছি। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ বাড়ীর কাজ করানোর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় না। আধুনিকতম শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে ওয়াকিবহাল নই বলিয়া আমরা শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সমস্যার সম্মুখে নিজেদের অনেক সময় একেবারে অসহায় মনে করি। প্রাণান্ত করিয়া ছেলেদের 'ক্লাসে পড়াইতেছি', সাধ্যমত তাহাদিগকে

অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছি—কত বক্তৃতা, কত উপদেশ দিতেছি, কতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছি, নানারকমের শাস্তি দিতেছি, নানারূপ পুরস্কারের লোভ দেখাইতেছি—তবু ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেছে না। যাহা বলিতেছি তাহা করিতেছে না, বরং নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার তাহাদের মধ্যে দেখা দিতেছে। ইহার পর আর কি করিতে পারি! গত বিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ জ্ঞান এখনও আমরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে শিখি নাই। তাই শিক্ষাদান সমস্যার সম্মুখে আমরা এত অসহায়। অপরদিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় চরিত্রগঠন, আগ্রহ ও ক্ষমতার বিকাশ প্রভৃতি অনেক নূতন দায়িত্ব বিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের, শিক্ষকদের মধ্যে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবেশনের, শিক্ষা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান অন্বেষণের এবং শিক্ষাদানের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক 'যন্ত্রপাতি' (যথা, মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা) প্রস্তুত-করণের নিমিত্ত কোন কোন রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'ব্যুরো অব এডুকেশন এ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ' ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

শিক্ষার নবধারা—বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই, শিক্ষাক্ষেত্রে নব নব ধারা প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই নবযুগের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোর (Structure) পরিবর্তন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা নিয়াই পূর্বে ছিল শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে প্রথম এবং শেষের দিকে এক একটি স্তর যুক্ত হইয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দীর্ঘতর করিয়াছে। আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং আক্ষরিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে শিশুর দুই তিন বৎসর বয়স হইতে নার্শারি শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার শিক্ষার নিমিত্ত নার্শারি স্কুলের সংখ্যা পৃথিবীতে সকল দেশে

শিক্ষার কাঠামোতে নবধারা

দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। মাকে ঘরের বাহিরে কর্মে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ, নার্শারি স্কুলের প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। শুধু প্রথম দিকেই নহে, শিক্ষা-ব্যবস্থার শেষের দিকেও বয়স্কদের জন্য নানা ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে আনুষ্ঠানিক (formal) শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে, না হইলে কখন যে তাহার সুশিক্ষা, কুশিক্ষায় পরিণত হইবে তাহার ঠিকানা নাই; বিশেষ করিয়া সকল মানুষের সকল বয়সেই জানিবার আগ্রহ এবং বিষয়বস্তু প্রচুর থাকে। যে সব দেশে অল্পবয়সে সকল মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায় না সেই সব দেশে বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশী। ফলে, শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিধি অনেকখানি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপকেও বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি নূতন ধারা বলা যাইতে পারে। এতদিন পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার উপরই আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলাম। অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশগুলি, গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বহু বৎসর হইতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়াছিল এবং উহার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতেছিল। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মধ্যে কেবলমাত্র একটি সেতু বলিয়া বিবেচনা করার দরুণ উহার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে আমরা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের দেশের শিক্ষাস্তরগুলির মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা যে দুর্বলতম এবিষয়ে রাধাকৃষ্ণান্ কমিশন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই অনুভব করিতেছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে নেতা প্রস্তুত করার জন্য আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই বেশী নির্ভর করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষায় যাহারা যাইবে, তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা লইয়াই জীবন কাটাইবেন ইহা বাঞ্ছনীয়। সমাজসেবক, রাজনীতিক ইত্যাদি গড়িয়া তোলার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। দেশের ধনসৃষ্টির জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেশবাসীর নেতৃত্ব একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বশেষে, উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জন করিতে হইলেও মাধ্যমিক

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ

শিক্ষা যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। তাই, আমাদের দেশেও বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নততর করার চেষ্টা চলিতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বর্ধিত করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে। উন্নততর দেশগুলিতে ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেও সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চলিতেছে।

বৃত্তি অভিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা

শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আমরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাই। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তি শিক্ষার প্রবর্তন। যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তারের ফলে, প্রত্যেক দেশেই আমাদের বহুবিধ যন্ত্রবিদের প্রয়োজন হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকেই ঐসব যন্ত্রবিদ্ (Technicians) প্রস্তুতের দায়িত্ব লইতে হইতেছে। অধিকন্তু, মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা বাহির হওয়ার পর দেখা যাইতেছে, সকল ছাত্রের উচ্চশিক্ষা বা তত্ত্বগত মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা নাই। উহাদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিগত হওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে উন্নততর দেশগুলিতে এমন কোন বৃত্তি প্রায় নাই, যাহা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী না জানাইতেছে (যথা ধোপার কাজ, হোটেলের কাজ ইত্যাদি)।

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

তাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও ছাত্রদের ক্ষমতা ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন শিক্ষা ধারার (যথা, কলাবিজ্ঞান ইত্যাদি) প্রবর্তন মাধ্যমিক স্তরে দেখিতে পাই। তাই, বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যত বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তত হয় নাই। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, একই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা ধারার প্রবর্তন হইতেছে। ঐ সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় (Comprehensive schools) আখ্যা দেওয়া হইতেছে। ফলে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সকল দিক হইতেই বৃহৎ হইয়া পড়িতেছে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ত এক একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১,০০০ হইতে ২,০০০ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী পাঠ করে এবং উহাতে পনের-বিশটি বিশেষ ধারায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরও নূতন নূতন দাবী

উঠিতেছে। বর্তমান সমাজে নীতিবোধ অতি দ্রুত কমিয়া যাইতেছে, নীতি শিক্ষার জন্য পূর্বে যে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল (পড়িবার মন্দির ইত্যাদি) তাহারা বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে—বিশেষ করিয়া কৈশোর কাল (মাধ্যমিক শিক্ষার সময়) আদর্শবাদ গড়িয়া তোলার ও নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধভাবে নীতিশিক্ষার দাবী উঠিয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে। কৈশোর কালেই আন্তর্জাতিকতার বীজ ছাত্রদের মনে বপন করিতে হইবে—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি গড়িয়া উঠার জন্য কিছুটা জ্ঞান এবং তাহাদের অনুকূলে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। অগ্রসর দেশগুলিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই বিষয়ে একটা আদর্শবাদ ছাত্রদের মনে গড়িয়া উঠা একান্ত আবশ্যক, যৌনবিষয়ক প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে কৈশোরকালে ছাত্রেরা বিভ্রান্ত হইয়া অনেক সময় নিজের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যৌনবিষয়ক কিছুটা শিক্ষাদানের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশনের দাবীও উঠিয়াছে। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ছাত্র বা অভিভাবকেরা ঐ সব নূতন নূতন বৃত্তি বা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত নহেন। তাই, বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সংক্ষেপে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি দিন দিনই বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি বিস্তার

বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত অনেক নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। পূর্বে শ্রেণীকক্ষই ছিল বিদ্যালয়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তারপর বিজ্ঞান শিক্ষাদানের নিমিত্ত ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে লাইব্রেরীও বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষাদানের অন্যতম প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া

উঠিতে লাগিল। অধুনাতম কালে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যের নিমিত্ত লাইব্রেরীর ব্যবহারের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিদ্যালয় লাইব্রেরী ব্যতীত শ্রেণীতে শ্রেণীতে পৃথক লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা করা হইতেছে, লাইব্রেরী পাঠের নিমিত্ত বিদ্যালয়ের সময় পঞ্জিকায় পৃথক সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে প্রদর্শনী স্থান (Exhibition space) এবং চলচ্চিত্র ঘর নামে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে গড়িয়া উঠিতেছে। বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়—প্রদর্শনীর উপযুক্ত আসবাব, অলোক সজ্জা প্রভৃতির ব্যবস্থা ঐ ঘরে থাকে। নির্দিষ্ট বিষয়ে (সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর (বাংলার বিংশ শতাব্দীর কবি ইত্যাদি), নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য (নবম্ ও দশম্ শ্রেণী ইত্যাদি) সব সময়েই ঐ ঘরে কোন না কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার প্রদর্শনীর বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রদের প্রদর্শনী দেখিবার সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র প্রদর্শনও একই নীতিতে বিধিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, পাঠ্যতালিকার পরিপূরক বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য বহু প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়ে স্থাপিত হইতেছে এবং তাহাদিগকে শিক্ষাকার্যের জন্য বিধিবদ্ধভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলিতেছে (বিদ্যালয় সমবায় সমিতি, বিভিন্ন ধরণের ছাত্র সংঘ, এবং এন. সি. সি. ইত্যাদি)

নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও তাহাদের ব্যবহার

এই প্রসঙ্গে দুইটি প্রতিষ্ঠানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদান সমিতি। মাধ্যমিক শিক্ষা বহুমুখী হওয়ার পর হইতে ইহার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। তাই প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই একজন বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাহায্যে উপরি-উক্ত সমিতি গঠন করিয়া, ছাত্রদের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্যদানের নিমিত্ত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলিতেছে। ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করার প্রয়োজনও বর্তমানে অনুভূত হইতেছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং শিক্ষার অনুকূল পাঠাভ্যাস

শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদান সমিতি ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংস্থা

গঠনের নিমিত্ত ইহা একান্ত আবশ্যক। তাই যে সব ছাত্রের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয় তাহাদের সাহায্যদানের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় মনস্তাত্ত্বিক (School Psychologist) নিযুক্ত হইতেছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংস্থা গড়িয়া উঠিতেছে।

পড়াশুনায় পিছিয়ে-পড়া (backward) ছাত্রদের সাহায্যদানের ব্যবস্থাও বিদ্যালয়কে করিতে হইতেছে। এই বিষয়ে অধুনা প্রচুর জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছে। তাই, সংশোধনমূলক শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠান (Remedical Education Centre) নাম দিয়া, কয়েকটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করিয়া এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান অগ্রসর দেশগুলিতে স্থাপিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের মানসিক স্বাস্থ্য-সংস্থা, জটিল অবস্থার উদ্ভব হইলে, তাহা সমাধান করিতে পারে না। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক চিকিৎসার জন্য School guidance clinic নাম দিয়া কয়েকটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করিয়া বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইতেছে।

সংশোধনমূলক শিক্ষা-দান প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় মনস্তাত্ত্বিক

ছাত্রদের শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপরও বর্তমানে খুব গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। তাই প্রগতিশীল দেশগুলিতে ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ক্লিনিক স্থাপিত হইতেছে। এই ক্লিনিক ছাত্রদের শুধু রোগ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, তাহাদের সাধ্যমত বিনা ব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতেছে।

বিদ্যালয় ক্লিনিক

দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা করাও শিক্ষাক্ষেত্রে নবধারার অন্যতম। বিদ্যালয় নানা ধরণের কর্মে লিপ্ত হওয়ার ফলে, দিন দিনই বিদ্যালয়ের কার্যের সময় বর্ধিত হইতেছে। দীর্ঘসময় ছাত্রদের উপযুক্ত খাদ্য না দিয়া বিদ্যালয়ে রাখা, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে দরিদ্র পিতামাতার বাড়ীতেও ছেলে-মেয়েরা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না; আবার বাড়ীর রন্ধনপ্রণালী যথাযথ খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে। এই অবস্থায় ছাত্রদের যদি দ্বিপ্রহরে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায়,

বিদ্যালয়ে আহারের ব্যবস্থা

তবে তাহাদের স্বাস্থ্য সুগঠিত হইবে এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রেও ইহাতে লাভ হইবে। তাই প্রগতিশীল দেশগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী ব্যয়ে ছাত্রদের দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কোন কোন বুনিয়াদি বিদ্যালয় এই ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ছাত্রদের চাঁদার সহিত সরকারী সাহায্য মিলাইয়া ছাত্রদের দুপুরে সামান্য আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিন দিনই এই ব্যবস্থা আরও প্রসারলাভ করিবে, ইহা আশা করা যায়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রেরা পুষ্টিকর আহারের সহিত আত্মনির্ভরতা, শৃঙ্খলা, সেবাকর্ম ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগ পায়। এই সুযোগে খাদ্যাখাদ্য বিচারের অভ্যাসও তাহাদের মধ্যে গড়িয়া তোলা যায়।

কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বড় পরিবর্তন হইতেছে শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শিখনতত্ত্ব (Theory of Learning) সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহার প্রধান কথা হইতেছে যে, শিক্ষার ব্যাপারে সংক্রমণকে (Transfer in Learning) অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা না হইলে শিক্ষায় আশানুরূপ সংক্রমণ সম্ভব নহে। তাই আধুনিক বিদ্যালয়-গুলিতে নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হইতে দেখি। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ছাত্রদের শিক্ষায় আনন্দ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়—স্বতঃপ্রবৃত্ত পাঠের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধ মনোভাব না জন্মায়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মানোও একান্ত প্রয়োজন এবং লব্ধজ্ঞান তাহারা যাহাতে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে নানাধরণের কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে খেলা-ভিত্তিক ও প্রজেক্ট-ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া, যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষার সংক্রমণের নিমিত্ত নবতম শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ

ছবি, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষণ অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষতর করার নিমিত্ত, বর্তমানে মডেল, ছবি, চলচ্চিত্র, নক্সা প্রভৃতির মাধ্যমে

শিক্ষাদানের চেষ্টা হইয়া থাকে। প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র দেখানোর কক্ষ যে থাকে একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমস্যা সমাধানে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ পাইলে ছাত্রদের শিক্ষা দ্রুততর হয় এবং সার্থক হয়, শিক্ষণ তত্ত্বের এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া আধুনিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের দলবদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতির (Group Methods) প্রবর্তন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রজেক্ট-পদ্ধতি ও ওয়ার্কসপ্-পদ্ধতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দলবদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি

এখানে ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিতে কুটির শিল্পের বিশিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ করিতে হয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন, সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপন, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অবসর বিনোদনের শিক্ষা প্রদান এবং চরিত্রগঠনের মাধ্যম হিসাবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে একটি কুটির শিল্প বাধ্যতামূলক করা হইতেছে।

বিদ্যালয়ে কুটির শিল্পের স্থান

আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীরও বিশিষ্ট স্থান দেখিতে পাই। পূর্বের বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুরই উপর গুরুত্ব দিত না। এখন খেলা-ধুলা, প্রাচীর পত্র, বিতর্ক সভা, প্রমোদ ভ্রমণ (Excursion), এন্. সি. সি. প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যে বিদ্যালয়ের অনেক সময় ব্যয়িত হয়। চরিত্র-গঠনের নিমিত্তই ঐসব অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে ছাত্রদের দেওয়া হয়। তবে, একথাও বিশ্বাস করা হয় যে, ঐসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধশিক্ষা ছাত্রদের তাত্ত্বিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হইবে।

পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কার্যাবলীর বিদ্যালয়ে স্থান

গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা (Democratic Discipline) প্রবর্তন, আধুনিক বিদ্যালয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে পূর্বের মত সব কিছু আর চুপ্‌চাপ্ দেখা যায় না—বরং প্রাণের উচ্ছলতাই চোখে পড়ে; কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয় তখনই ছাত্রেরা নিজেদের সংযত করিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করে। শিক্ষক পাঠদান আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত হয়ত গুরু কথা ও গল্প

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা

চলিতেছে, কিন্তু শিক্ষক পাঠদান আরম্ভ করা মাত্র সব চুপ্ চাপ্ হইয়া পড়ে। অপর দিকে ছাত্রেরাই শিক্ষকের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সংস্থা গড়িয়া তুলিয়া বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এমনকি ছাত্রদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধের বিচারের নিমিত্ত, ছাত্রেরা নিজেদের বিচার সভা স্থাপন করে। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেকখানিই নিজ স্কন্ধে বহন করে। বিদ্যালয়ের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী, ছাত্রেরাই তাহাদের নিজস্ব বিভিন্ন গণতান্ত্রিকসংস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করিয়া থাকে।

আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ (Tools)-ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহা পূর্বেকার শিক্ষকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। প্রথমেই মানসিক অভীক্ষার (Mental Test) উল্লেখ করিতে হয়। ছাত্রদের শিক্ষালাভের যোগ্যতা পরিমাপ করার নিমিত্ত এবং তাহাদের মানসিক এবং চারিত্রিক বিকাশ যথাযথভাবে অগ্রসর হইতেছে কি-না জানিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষায় আধুনিক উপকরণ

ইহা ছাড়া, বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ (ছাত্র-ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষক প্রভৃতি)-গুলি যথাযথভাবে গড়িয়া উঠিতেছে কি-না, তাহা জানিবার নিমিত্তও সমাজতাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। ছাত্রেরা, কি কারণে কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ (Backward) হইয়া আছে, ইহা জানিবার নিমিত্তও বিশেষ ধরণের অভীক্ষার প্রয়োগ আধুনিক বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। অভীক্ষা ব্যতীত, মডেল, চলচ্চিত্র, ছবি, ম্যাপ, নক্সা প্রভৃতি আরও বিভিন্ন ধরণের উপকরণ শিক্ষা নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে।

এক কথায়, বিদ্যালয় বর্তমানে সম্পূর্ণ নূতনরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। কোন রিপ ভান্ উইলকল যদি, দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের পর কোন আধুনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তবে সে যে কোথায় আসিয়াছে, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

শিক্ষায় সাহায্যকারী চক্ষু ও কর্ণাশ্রয়ী উপকরণ (Audiovisual Aids in Education)—অভিজ্ঞতাই শিক্ষার নিয়ামক এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই আমরা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে, চক্ষু ও কর্ণকেই আমরা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত

বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। চক্ষুর সাহায্যে পুস্তকের মধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং কর্ণের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয়ের মুখনিঃসৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ, ছাত্রেরা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, চক্ষু ও কর্ণের মাধ্যমে লব্ধ এই দুই ধরণের অভিজ্ঞতাই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

শিক্ষাক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণাশ্রয়ী উপকরণের প্রয়োজন

পুস্তকলেখক যে অভিজ্ঞতার বিবরণ বা জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা নহে; তিনিও কোন অপরোক্ষ মাধ্যমে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। শিক্ষক ও বক্তৃতার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতার বিবরণ বা জ্ঞান পরিবেশন করেন, তাহাও অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগৃহীত। অনেক ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা যখন ছাত্রের নিকট আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহার তিন চার বারেরও বেশী হাত বদল হইয়া গিয়াছে। ফলে, পাঠ এবং শিক্ষকের মুখে শোনা অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাত্রের নিকট নিতান্ত অবাস্তব মনে হয়—উহাকে নিজস্ব অভিজ্ঞতারূপে উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে, সে অভিজ্ঞতার বিবরণ মুখস্থ করিয়া (উপলব্ধি না করিয়াই) পরীক্ষায় পাস করিতে চেষ্টা করে; ইহাতে তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসে। সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, উপলব্ধি ব্যতীত অন্তর্দৃষ্টি আসে না এবং অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত জ্ঞানের সংক্রমণ হয় না। তাই, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে যথাসাধ্য ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের জ্ঞান বিধিবদ্ধ ও সুসংহতভাবে, পাঠ্যসূচির ক্রমঅনুসারে দিতে হয়; অপরদিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের মাধ্যমস্বরূপ অভিজ্ঞতাগুলি অনেকক্ষেত্রে এত জটিল থাকে যে, বাস্তবে ছাত্রদের প্রত্যক্ষভাবে ঐ সব অভিজ্ঞতা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই, পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ ও শিক্ষকের মুখনিঃসৃত অভিজ্ঞতার বিবরণকে কিছুটা বাস্তব করার নিমিত্ত বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকমের উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয় ভিত্তিক, তাহাদিগকেই আমরা চক্ষু ও কর্ণাশ্রয়ী উপকরণ (Audiovisual Aids) নাম দিয়াছি। এই উপকরণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাদের মাধ্যমে একই সঙ্গে বহু ছাত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে পারে। অধুনা, নানাধরণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে, এই সুবিধা

আরও বিস্তার লাভ করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রের সংখ্যা দিন দিনই এমনভাবে বাড়িতেছে যে, একসঙ্গে (একই উপকরণের সাহায্যে) বহু ছাত্রকে অভিজ্ঞতা আহরণের সুযোগ করিয়া দিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাই শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপকরণের গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিভিন্ন ধরণের উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহাদের উপকারিতা এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হইল।

উপকরণ হিসাবে মডেলের ব্যবহার এখন শিক্ষাক্ষেত্রে বহুলভাবে হইতেছে। মডেল বাস্তবের হুবহু অনুকরণ ; প্রয়োজন অনুসারে এই অনুকরণ বাস্তব হইতে বহুলাংশে বড় বা ছোট হইতে পারে। ধরা যাক, একটি মশার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন ছাত্রদের পাঠের বিষয়বস্তু তখন মশার দেহের মডেল, বাস্তব হইতে বহুগুণ বড় হইলে, ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ সহজতর হইবে ; আবার যখন দামোদরের বাঁধের মডেল করিতে হইবে, তখন প্রকৃত বাঁধ অপেক্ষা বাধ্য হইয়াই আমাদের উহাকে বহুগুণে ছোট করিতে হইবে।

শিক্ষার উপকরণ হিসাবে মডেল

কিন্তু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়াইতে গেলে, মডেলই বড় বা ছোট না হইয়া একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের অনুরূপ হইলেই হয়ত ভাল হয়। মডেল, বাস্তবের হুবহু অনুকরণ বলিয়া, উহার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রায় সমপর্যায়ের হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বাস্তব-জগতের বস্তু, মানুষের অভিজ্ঞতার সামান্যতম অংশ মাত্র, বস্তুতে বস্তুতে বা জীবে জীবে পারস্পরিক সম্বন্ধই মানুষের অভিজ্ঞতার বৃহদাংশের জনক। কিন্তু মডেলের মাধ্যমে উহা রূপায়ণ করা দুরূহ। তাই মডেলের শিক্ষাদান ক্ষমতা, অনেকখানি সীমাবদ্ধ। যাহা হউক, বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের কোন কোন ক্ষেত্রে, মডেলের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান খুবই কার্যকরী হয়। বাস্তব জিনিস, সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া, ঐসব বিষয় শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয় মিউজিয়াম বর্তমানে অনেকাংশে মডেলের দ্বারা গঠিত হয়। বিজ্ঞান ও ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবকে অনেক সময় বড় বা ছোট করিয়া দেখাইতে হয় বলিয়া এই দুই বিষয়ে মডেলের উপকারিতা আরও বেশী। মডেলগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যথাযথ নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিলে, উহারা আরও

শিক্ষাপ্রদ হয়। মিউজিয়ামে মডেলগুলি, বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ অনুসারে সজ্জিত থাকিতে পারে এবং শিক্ষক পাঠদান কালে উহাদের বাহির করিয়া আনিয়া শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতে পারেন। আবার কয়েকটি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে (যাহা সকল শ্রেণীর ছাত্রেরই শিক্ষণীয়, যেমন, যানবাহনের ক্রমোন্নতি), মডেলগুলি মিউজিয়ামে গিয়া ছাত্রেরা সজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবের নিমিত্ত, মডেলগুলি বেশী করিয়া মিউজিয়ামে সজ্জিত রাখা কতখানি সম্ভব হইবে জানি না, তবে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান কালে, বিধিবদ্ধভাবে তাহাদের ব্যবহার করা উচিত। আবার যখন বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী হইবে, তখনও মডেলগুলির ব্যবহার চলিতে পারে। মাটি, কাগজের মণ্ড, প্লাস্টিসিন, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা মডেল প্রস্তুত করা চলে। মডেলের স্থায়িত্ব, মূল্য, সহজে রক্ষণ ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ জিনিষ দ্বারা মডেল প্রস্তুত করা হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। বর্তমানে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, যাহারা বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের মডেল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। কিছু সংখ্যক মডেল কিনিলেও, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারাও প্রতি বৎসর কিছু কিছু মডেল প্রস্তুত করাইতে হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি ভোগ করা চলে—(ক) মডেলের মূল্য কম পড়ে, (খ) ইহারা শিক্ষার অধিকতর উপযোগী হয়, (গ) মডেল প্রস্তুত করার মাধ্যমে ছাত্রেরা প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করে।

মডেলের মাধ্যমে এক ধরণের নাট্যরূপদানের রীতিও প্রচলিত আছে, তাহাকে পুতুল নাচ বলে। ঐ সব পুতুল বাস্তবের একেবারে হুবহু রূপায়ণ না হইলেও, কল্পনাপ্রবণ শিশুমন উহাদের বাস্তবের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিতে বিশেষ ইতস্ততঃ করে না। পুতুলগুলি যদি বাস্তবের ব্যঙ্গাত্মক (Cartoon) প্রতীরূপ হয়, তাহা হইলে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরাও উহাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না। ঘটনার নাট্যরূপদান, বস্তুর বাস্তবরূপ দান অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ হয়। কাজেই, প্রায় সকল বিষয়েই অনেক পাঠ, পুতুল নাচের মাধ্যমে প্রদান করা যাইতে পারে (যেমন, বিজ্ঞানে নানা ধরণের পাখী, তাহাদের আত্মকথা বলিতে পারে)।

পুতুল মডেলের সাহায্যে শিক্ষা

মডেলের পরই শিক্ষায় সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে ছবির উল্লেখ করিতে হয়। ছবির মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তাহা মডেলের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে অধিকতর অপ্রত্যক্ষ ; ছবি বাস্তবের প্রতিফলন হইলেও, উহার ঘনত্ব নাই বলিয়া (বাস্তব যে-কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব থাকে) উহাকে কিছুটা অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু তবু লিখিত বা কথিত ভাষার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ছবির মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা অনেক বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। শিক্ষার উপকরণ হিসাবে মডেলের যে ধরণের ব্যবহার হয়, ছবিরও সেই ধরণের ব্যবহার হইতে পারে। ছবি প্রস্তুত করা মডেল প্রস্তুত হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া, উপকরণ হিসাবে ছবি সহজলভ্য। আবার যেসব বস্তুর মডেল করা সম্ভব নহে সেসব বস্তুরও ছবি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তুলির সাহায্যে, পেন্‌সিলের সাহায্যে, বিশেষ ধরণের রঙ্গীন কাগজের টুকরা দ্বারা নানাভাবে ছবি আঁকা যাইতে পারে।

শিক্ষায় সাহায্যকারী উপকরণ হিসাবে ছবি

বর্তমানে ছবির নক্সা (Picture diagram) নামে এক বিশেষ ধরণের ছবির ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে বহুলাংশে হইতেছে। অনেক সময়ই বিদ্যালয়ের অনেক অভিজ্ঞতা বস্তুগত না হইয়া তত্ত্বগত (abstract) হওয়ার প্রয়োজন হয়। তত্ত্বগত অভিজ্ঞতাকে বস্তুর রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারিলে, ছাত্রদের নিকটই উহা কিছুটা বাস্তব বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মাইতে কিছুটা সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন পন্থার সাহায্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগানোর যে চেষ্টা আকবর করিয়াছিলেন তাহা একটি তত্ত্বগত অভিজ্ঞতা। ইহা ছবির রূপকের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

শিক্ষার সাহায্যের নিমিত্ত ছবির নক্সার বিশেষ প্রয়োগ

আকবর বাদ্‌শাহের দুইটি হাতের একটি হিন্দুর হাত অপরটি মুসলমানের হাতরূপে চিত্রিত করা যাইতে পারে, দুইটি হাত সামনের দিকে পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া রাখিলে তাহা হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের সংকেত হিসাবে কাজ করিতে পারে (কথাগুলি ছবিতে লিখিয়াও দেওয়া হইবে)। দুই হাতের মধ্যে অর্থাৎ আকবর শাহের বুকে দিন-ই-লাহি গ্রন্থের ছবি দিয়া,

"সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মমত প্রচার" এই কথাটি লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আকবরের হিন্দুদের উচ্চপদ দান, ইহা ঘোড়ার পিঠে মানসিংহের সেনাপতি হিসাবে একখানা ছবি, আকবরের বুকের অপর পার্শ্বে আঁকিয়া সংকেত করা যাইতে পারে। এইভাবে আকবর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের নিমিত্ত আর যেসব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইভাবে যে-কোন জটিল ভাবকে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া, ছাত্রদের তাহা প্রত্যক্ষীকরণ সহজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; এমন কি সাহিত্যে কঠিন কঠিন ভাবের ব্যাখ্যার জন্যও এই কৌশলের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে ভূগোলের পাঠদানের নিমিত্ত যেমন ম্যাপ প্রস্তুত হয়, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি অনুসারে ছবির নক্সা (Picture-diagram) প্রস্তুত হইয়া পাঠদান কালে অবশ্য ব্যবহার্য উপকরণের অন্যতম হওয়া প্রয়োজন। ছবি ও ছবির নক্সার একটি লাইব্রেরী বিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। ঐ লাইব্রেরীতে শ্রেণী, বিষয় ও পাঠ হিসাবে, ছবি এবং ছবির নক্সা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখা যাইবে। পাঠদান কালে শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় ছবি ও ছবির নক্সা লইয়া যাইবেন।

ব্ল্যাক্‌বোর্ডে বিভিন্ন ধরণের রেখাচিত্র আঁকিয়া, শিক্ষক পাঠকে প্রত্যক্ষীকরণে ছাত্রদের সাহায্য করিতে পারেন। ছাত্রদের চোখের উপর কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ গড়িয়া উঠিলে, উহা প্রত্যক্ষীকরণে সুবিধা হয় এবং ছাত্রদের মনোযোগও অঙ্কিত বস্তুর উপর স্বাভাবিক নিয়মেই আকর্ষিত হয়। এই কার্যে যষ্টি চিত্র (stick drawing) বিশেষ কার্যকরী হয়। যষ্টি চিত্র, কেবলমাত্র রেখা, বৃত্ত ও বিন্দুর সাহায্যে অঙ্কিত হয়। যাহারা চিত্রাঙ্কন জানে না তাহাদের নিকটও ঐ ধরণের ছবি আঁকা কঠিন মনে হইবার কারণ নাই।

ব্ল্যাকবোর্ডে চিত্রাঙ্কন, যষ্টি চিত্র

বর্তমানে প্রতিফলিত চিত্র (projected pictures) ও চলচ্চিত্রের (movie pictures) আবিষ্কার হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে চিত্রের ব্যবহারের সুযোগ বহুলাংশে প্রসারিত হইয়াছে। ছবি প্রতিফলিত (project) করিলেই, তাহাতে তৃতীয় আয়তনের (third dimension) অর্থাৎ ঘনত্বের যোগ হয়;

প্রতিফলিত চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান

ফলে উহা অধিকতর বাস্তব বলিয়া মনে হয়। প্রতিফলিত হইলে ছোট ছবি অনেক বড় বলিয়া দেখায়। তাই ছবি প্রতিফলনের যন্ত্র এপিডায়েস্কোপ, বিদ্যালয়ের অপরিহার্য আসবাবের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেক সময়, শিক্ষক সম্পূর্ণ একটি পাঠ, এপিডায়েস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন ছবি প্রতিফলিত করিয়া দিতে পারেন। এই ধরণের পাঠ-দান, অনেকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমান ফল দান করে।

শিক্ষার উপকরণ হিসাবে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা অধিকতর বাস্তব বলিয়া মনে হয়; উহা সবাক হইলে আরও ভাল হয়। ছবির সহিত শুধু যে তৃতীয় আয়তন যুক্ত হয় তাহা নহে; উহা চলিতে পারে, কথা বলিতে পারে ইত্যাদি—বাস্তবের সহিত উহার পার্থক্য প্রায় থাকে না। বিশেষ করিয়া ঘটনা, ভাব ইত্যাদিও এই মাধ্যমে রূপায়িত করা চলে। আর একটি সুবিধা এই যে, বহু ছাত্র একই সঙ্গে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন ধরণের চলচ্চিত্র নির্মিত হইতে পারে; বর্তমানে এমনও হইতেছে যে, এক একটি পাঠের বিষয়বস্তু নিয়া (যেমন মৌমাছি), এক একটি চলচ্চিত্র রচিত হইতেছে। কিন্তু চলচ্চিত্র যেমনই হউক, উহাদের লইয়া, শিক্ষক-ছাত্রে আলোচনা না হইলে, উহারা আশানুরূপ শিক্ষাপ্রদ না হইতে পারে। আমাদের দেশের পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর যথেষ্ট সংখ্যক চলচ্চিত্র এখনও রচিত হয় নাই; তাই শিক্ষার এই উপকরণের বহুল প্রয়োগ, আমাদের বিদ্যালয়ে এখনও সম্ভব নহে।

নক্সার ব্যবহার

নক্সা (Diagram) বাস্তবের সর্বাপেক্ষা অমূর্ত অনুকরণ। ইহার দ্বারা বাস্তবের যে-কোন সম্বন্ধ প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ম্যাপ একটি নক্সা: ইহাতে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্ব এবং দিক (Direction)-এর যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। গ্রাফ্ (graph) আর এক ধরণের নক্সা; উহাতে একটি জিনিষের বৃদ্ধির সঙ্গে, অন্য আর একটি জিনিষের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। ইতিহাসে বংশানুক্রম প্রকাশের যে রীতি আছে, তাহাও নক্সা। বর্তমান অনেক সময় ছবির মাধ্যমেও নক্সাকে প্রকাশ করা হয়। ধরা যাক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

বৎসরে বৎসরে ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি আমরা নক্সাকারে প্রকাশ করিতে চাই; গ্রাফের দুইটি লাইনের একটির পরিবর্তে একটি ছাত্রের ছবি দাঁড় করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং অপর লাইনের দ্বারা বৎসরে বৎসরে ছাত্রসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। নক্সা আঁকা সহজ বলিয়া শিক্ষক সহজেই উহা ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকিতে পারেন এবং ছাত্রেরা নিজ নিজ খাতায়ও নক্সা আঁকিতে পারে—ইহাতে ছাত্রদের অমূর্ত ধারণা মূর্ত হইতে সাহায্য করে।

এতক্ষণ যেসব উপকরণের আলোচনা হইতেছিল, উহাদের মাধ্যমে পরিবেশিত অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়; একমাত্র সবাক চিত্রে, চক্ষু ও কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়েরই প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু এমন ধরণের শিক্ষার উপকরণ বাহির হইয়াছে, যাহারা প্রধানতঃ কর্ণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা পরিবেশন করিয়া থাকে। ঐসব উপকরণের মধ্যে প্রথমেই রেডিওর উল্লেখ করিতে হয়। রেডিওতে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য, বিভিন্ন বিষয়ে, শিক্ষা-কুশলী শিক্ষকগণ পাঠদান করিয়া থাকেন। বিদ্যালয় চালু থাকাকালেই ঐসব পাঠদান বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রেডিওর মারফৎ এই সব আলোচনা যে বাস্তবরূপ ধারণ করে এমন নহে। তবে বিদ্যায় এবং শিক্ষাদান কৌশলে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌দের নিকট হইতে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তাই, বিদ্যালয়ের এইসব আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রেরা, এই সব আলোচনা শুনিবে এবং পরে, ইহার উপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিবে। যে বিষয়ে, আলোচনা হইবে সে বিষয়ে পূর্ব হইতে কিছু পড়াশুনা করিয়া রাখিলে, শিক্ষালাভ সহজতর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে, আমাদের রেডিওর আলোচনা যেমন শ্রেষ্ঠ লোকের দ্বারা করানো হয় না, তেমনি খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ই, ঐ সব আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে।

পাঠদানের সহায়ক রূপে রেডিও

গ্রামোফোন ও টেপ্ রেকর্ডার যন্ত্রও আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সহায়ক উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাষা শিক্ষায়, বিশেষ করিয়া ছন্দবোধ ও উচ্চারণ শিক্ষায় এই যন্ত্র দুইটির বিশেষ ব্যবহার হইয়া

থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আবৃত্তির রেকর্ড গ্রামোফোনে শুনিলে ভাষার উচ্চারণ সমস্যা অনেকটা দূর হয়—মাতৃভাষা ভিন্ন অপরাপর ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রযোজ্য। টেপ রেকর্ডারে, নিজের আবৃত্তি রেকর্ড করিয়া, তাহা শুনিলেও, উচ্চারণ শুদ্ধির সাহায্য হয়। কবিতার রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে, ভাল আবৃত্তি শুনিতে পারিলে অনেকটা সাহায্য হয়। বিদ্যালয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ আবৃত্তি করিতে পারেন (শিক্ষক বা ছাত্র) তাহার আবৃত্তি রেকর্ড করিয়া ছাত্রদের বারবার শুনাইতে পারিলে, কবিতা পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কবিতা উপলব্ধি করাও সহজ হয়।

পাঠদানে গ্রামোফোন ও টেপ রেকর্ডারের স্থান

বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দান সংস্থা (Educational and Vocational Guidance service in schools)—মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে, ছাত্রদের স্ব স্ব ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুসারে পাঠের জন্য বিশেষ বিষয় (Elective subjects) বাছিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহায্য দান করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাস্তব সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বিদ্যালয়ে, শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দান সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ বলিতে কি বুঝায়—শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ এই দুইটি বাক্যাংশকে আমরা প্রথম পৃথক পৃথক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে, ছাত্রের শিক্ষাজীবনে যখন যখন বিশেষ পাঠ্য নির্বাচনের সমস্যা আসে তখন তাহাকে মনস্থির করিতে সাহায্য করাকে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ বলা যাইতে পারে অর্থাৎ বহুমুখী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উঠিলে ছাত্রকে বিশেষ বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করা, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িলে বা ট্রেনিং লইলে ভাল হয় সে সম্বন্ধে তাহাকে পরামর্শ দেওয়াকে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ দেওয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শকে এইরূপ ভাবে শিক্ষার দুই স্তরে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ছাত্রের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একাজ আরম্ভ করিতে হয়। ধরা যাক, নবম শ্রেণীতে

উঠার পর দেখা গেল বেশীর ভাগ ছাত্রের সব বিষয়েই জ্ঞান এত কম জন্মিয়াছে যে, কোন বিশেষ বিষয় পড়িবার যোগ্যতাই তাহার নাই। শুধু তাহাই নহে, উপযুক্ত সুযোগের অভাবে কোন বিশেষ দিকে তাহার আগ্রহ ও ক্ষমতার বিকাশও ঘটে নাই। এ অবস্থায় কোন বিশেষ বিষয় নির্বাচনের পরামর্শই তাহাকে দেওয়া চলে না। তাই সমগ্র শিক্ষাদানের কাজকে উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে সংকীর্ণ অর্থেও শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ দেওয়া সফল হইতে পারে না।

উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজকেই শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া বলা যাইতে পারে। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে আমরা শিক্ষকরা ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারি বলিয়া মনে করি না। ছাত্র একমাত্র তার নিজের চেষ্টাদ্বারা শিক্ষালাভ করিতে পারে; আমরা এই কাজে তাহাকে পরামর্শ দিয়া উপযুক্ত সুযোগের সৃষ্টি করিয়া এবং আরও নানাভাবে সাহায্য করিতে পারি। শিক্ষালাভের ব্যাপারে আমরা ছাত্রকে সাহায্য করিবার যত প্রকারের চেষ্টা করি তাহাদের প্রত্যেকটিকেই শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ বলা যাইতে পারে।

উদার দৃষ্টিভঙ্গী

কাজেই শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার কাজ, ছাত্র স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, সহজাত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ছাত্র যেন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে পিছাইয়া না পড়ে। যদি কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ হিসাবে শিক্ষার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাই নানা ধরণের কাজকর্মের মাধ্যমে ছাত্রদের সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার অন্তর্গত। এক কথায় বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। নবম শ্রেণীতে উঠিলে বিশেষ বিষয় (Special Subject) নির্বাচনের পরামর্শের সহিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাদান চেষ্টার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্কুল ফাইন্যালের পর শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদানের সহিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাদান প্রচেষ্টা একইভাবে জড়িত। কাজেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ বলিতে আমরা

বুঝি—প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা আপন ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ লাভ করিয়া সমাজে সার্থক ও তৃপ্তিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতিতে সাহায্য করা। তাহা হইলে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাদান-বিষয়ক পরামর্শের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকে না।

বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদানের অর্থ হইতেছে, যে যে ধরণের বৃত্তিকে গ্রহণ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং যে বৃত্তিতে সে সর্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পাইবে তাহা নির্ণয় করিতে তাহাকে সাহায্য করিয়া সেই ধরণের বৃত্তি জোগাড় করিতে তাহাকে সাহায্য করা। ঐরূপ পরামর্শ ভালভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে লোকের বৃত্তিক্ষেত্রে কাজকর্মের মান উন্নততর হয়, তাহাদের উপার্জন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশংকা কম থাকে।

বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ

বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই উপকার করে। আমাদের দেশে কাজ সংগ্রহের ব্যাপারে যোগ্যতা এবং কাজে তৃপ্তি পাওয়ার কথা সাধারণতঃ উঠিতেই পারে না, কারণ আমাদের মধ্যে বেকারসমস্যা এত প্রবল যে ঐসব কথা না ভাবিয়া যে যে কাজে ঢুকিবার সুযোগ পাইতেছে, সে সেই কাজেই ঢুকিয়া পড়িতেছে। তবুও অনেকেই কাজ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এইভাবে কোনরূপ বিচার না করিয়া কাজে ঢুকিবার চেষ্টা করায় বেকারসমস্যা না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। কাজ সংগ্রহের জন্য যেখানে প্রতিযোগিতা প্রবল সেখানে প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন, কোন্ ধরণের কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া তাহার সফল হইবার সম্ভাবনা বেশী, কারণ উপযুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারিলে সফলতার আশা বেশী থাকে। তারপর কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কাজকর্মের জন্য ছোটাছুটি করার ফলে আমাদের দেশে এক নূতন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন অনেক কাজ আছে (সাধারণতঃ যেসব কাজের কথা মোটামুটি সকলের জানা আছে—যেমন, কেরাণীর কাজ) যেসব কাজের ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীর তুলনায় কাজের সংখ্যা অনেক কম। নিজের ক্ষমতা, অনুরাগ কোন কিছুর

আমাদের দেশে বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দানের প্রয়োজনীয়তা

বিচার না করিয়া সকলেই সেখানে ভিড় জমাইতেছে। আবার আরও অনেক কাজ আছে (যেগুলির গুরুত্বের কথা হয়তো এখনও অনেকে জানে না— যেমন, ড্রাফট্সম্যানের কাজ) যেগুলি উপযুক্ত লোকের অভাবে খালিই পড়িয়া থাকে। ফলে, একদিকে যেমন অনেকে কাজ পাইতেছে না, অপরদিকে আবার অনেক কাজের জন্য উপযুক্ত লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হওয়ায় এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িতেছে। এমন কি উপযুক্ত লোকের অভাবে অনেক সময় পাঁচসালা পরিকল্পনার সফলতা ব্যাহত হইতেছে। বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দ্বারা এই সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব। আধুনিক শিল্পপ্রধান দেশে বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আমাদের দেশও যেভাবে শিল্পপ্রধান হইতে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে এই ধরণের কাজের উপর গুরুত্ব দিতেই হইবে।

বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সার্থক করিতে হইলে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শের প্রয়োজন

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ ব্যতীত বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সফল হইতে পারে না। বর্তমানকালে কাজকর্মগুলি এমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া কোন নির্দিষ্ট কাজ শিক্ষা না করিলে সাধারণ শিক্ষা দ্বারা প্রায় কোন কাজ করার যোগ্যতা জন্মায় না। ফলে, শিক্ষা শেষে বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ কার্যকরী হয় না। ধরা যাক, কাহাকেও যদি বি. এ. পাস করার পর বলা হয় যে, সে যদি স্কুল ফাইন্যালের পর চার বৎসর কলেজে না পড়িয়া কারিগরী বিদ্যালয়ে তিন বৎসর ওভারসিয়ারী শিখিত তাহা হইলে বিনা চেষ্টায় সে ভাল কাজ পাইতে পারিত। সে পরামর্শ তাহার কোন কাজেই লাগে না। কারণ সে ত আবার তিন বৎসর নূতন করিয়া পড়িতে পারে না। এই পরামর্শ যদি সে স্কুল ফাইন্যাল পাসের পর পাইত তাহা হইলে হয়ত তাহার জীবন ভিন্ন পথে চালিত হইতে পারিত। কাজেই নিজ নিজ অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি স্কুল-কলেজ হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ ব্যতীত বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সফল হইতে পারে না।

অপরদিকে বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি ছাত্রের অনুরাগ

বৃদ্ধি করে। শিক্ষা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রের যত আন্তরিক হইবে শিক্ষালাভ তত সহজ হইবে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কৈশোর ও যৌবনে ছাত্রদের মনে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা জাগে ইহাও আমরা জানি। অর্থোপার্জন করিয়া সমাজে দশ জনের একজন হইয়া বাস করার স্বপ্ন তাহারা দেখিতে আরম্ভ করে। এই বয়সে ছাত্রেরা তাহাদের পাঠের সহিত তাহাদের বৃত্তির সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে পাঠে তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং উহা তাহাদের নিকট অধিক অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। ফলে, বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করে। এক কথায় শিক্ষা এবং বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। একের সহায়তা ছাড়া অপরটি সফল হইতে পারে না। তাই বর্তমানে আমরা শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ আলাদা-ভাবে না বলিয়া এক বাক্যাংশ (phrase) হিসাবে একই সঙ্গে শিক্ষা এবং বৃত্তিবিষয়ক কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। এক কথায় শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ বলিতে আমরা বুঝি যে, ছাত্রের বর্তমান শিক্ষাকে তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হিসাবে দেখিতে সাহায্য করা—তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। কার্যতঃ আমরা প্রত্যেক ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকাশের চেষ্টা করি। কোন্ দিকে তাহার ক্ষমতা ও অনুরাগের চরম বিকাশ লাভ হইতে পারে তাহা বুঝিতে তাহাকে সাহায্য করি। কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িলে তাহার সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী এবং ঐ বিষয় পড়িলে ভবিষ্যতে সে কি ধরণের কাজ পাইতে পারিবে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহার শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করিতে সাহায্য করি। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য; আনুষঙ্গিক কার্য হিসাবেই আমরা বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দিয়া থাকি। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নিজ নিজ অনুরাগ ও ক্ষমতা হিসাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষালাভে অধিকতর আগ্রহসৃষ্টি হইবে বলিয়াই আমরা তাহার শিক্ষার অনুকূল ভবিষ্যৎ বৃত্তির বিষয় আলোচনা করি। ফলতঃ শিক্ষা এবং বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ

শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের যথাযথ রূপ

আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও অনুরাগ হিসাবে বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া দেওয়া। বহুমুখী বিদ্যালয়ে যে সাতটি বিষয় পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কোনও-না-কোন বৃত্তির জন্য অন্ততঃ কিছুটা প্রস্তুতি হইতেছে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ-সংস্থা—স্বভাবতই বহুমুখী বিদ্যালয়ে ছাত্র নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহাকে বিশেষ বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ-সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের ধারণা যে, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের কাহার কোন বিষয়ে পাঠে আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে তাহা নির্ণয় করিয়া যথাযথ উপদেশ দিলেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। এই সম্বন্ধে প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যত বৈজ্ঞানিকভাবেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হউক না কেন মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং অনুরাগ নির্ভুল-ভাবে ধরা পড়িবে একথা বলে চলে না। আবার মানুষের কোন বিশেষ দিকে সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকিলে তাহাকে চর্চার দ্বারা জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে বাস্তবজীবনে তাহা কার্যকরী হয় না। তাই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ক্ষমতা ও অনুরাগের পরিমাপের চেষ্টার চাইতেও উপযুক্ত সুযোগ ও প্রয়োজনমত সাহায্যের ভিতর দিয়া ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং অনুরাগ জাগাইয়া তোলার উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ-সংস্থা অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ছাত্রের ক্ষমতা ও অনুরাগ জাগরিত হইয়া গেলে ইহা ব্যবহারের মধ্য দিয়া এমনভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, কোন্ দিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বা আগ্রহ তাহা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ছাড়াও ধরা পড়িয়া যায়। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে ছাত্র অনেকটা নিজ হইতেই আপন ক্ষমতা ও আগ্রহের অনুকূলে বিশেষ বিষয় বাছিয়া লইতে পারে। নিজ ক্ষমতা ও আগ্রহের অনুকূল কোন বিষয়ের পড়াশুনায় ছাত্র যদি কোন কারণে পিছাইয়া পড়িয়া থাকে, তবে

এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য

তাহাকে বিশেষ সাহায্য দিয়া অগ্রসর করিয়া না দিতে পারিলে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ তাহার ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে না। ধরা যাক, যে ছাত্র বাংলা বা ইংরাজীতে স্বাভাবিক কারণেই ভাল নহে, অথচ যে ছাত্র বিজ্ঞানে ভাল এবং অঙ্কে যাহার ক্ষমতা আছে সে যদি দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্যই হউক, অঙ্কের শিক্ষকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্যই হউক বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক অঙ্ক শিক্ষায় পিছাইয়া পড়িয়া থাকে তবে তাহার অঙ্কের জ্ঞানের উন্নতি করার পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ে কোন সার্থক পরামর্শ দেওয়াই চলে না। তাই সহজাত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে সব ছাত্র কোন বিষয়ে পিছাইয়া আছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়া ঐ বিষয়ে অগ্রসর করিয়া দেওয়া শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ-সংস্থার অন্যতম কাজ। শুধু তাহাই নহে অনেক সময় দেখা যায় যে, ছাত্রের ব্যবহারের পরিবর্তন করিতে না পারিলে তাহার পড়ার উন্নতি করাও সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অমনোযোগ, শিক্ষক-ঠকানো, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি অনভিপ্রেত ব্যবহার দূর করিতে না পারিলে ছাত্রের পড়াশুনায় উন্নতি করা সম্ভব নয়। আবার কোন কোন বিষয়ের (subject) পড়াশুনায় এবং কোন কোন বৃত্তির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক, বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জিজ্ঞাসু মন এবং খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হয়। তাই বিধিবদ্ধভাবে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং তাহাদের অনভিপ্রেত ব্যবহার দূরীকরণের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সংস্থার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—

১। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে বিশেষ পাঠ্য নির্বাচনে ছাত্রকে তাহার আগ্রহ, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্য করা হইল এই সংস্থার প্রধান কাজ। একাদশ শ্রেণীতে উঠিলে ছাত্রকে তাহার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বৃত্তিবিষয়ে মনস্থির করিতে সাহায্য করাও প্রয়োজন। যে ছাত্র নবম শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না বা যে একাদশ শ্রেণীতে পৌঁছিল না তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করাও একই সংস্থার কাজ।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ ছাত্রদের প্রত্যেকের সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে

পর্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সার্থক হইতে পারে না।

৩। ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের অনভিপ্রেত ব্যবহার দূরীকরণ এবং প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলী গঠনকার্যে সাহায্য করিতে না পারিলে উপরি-উক্ত উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে হইলে নিম্নলিখিতভাবে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে—

১। সর্বপ্রথমেই ছাত্রদের ক্ষমতা ও অনুরাগ বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'হবি ক্লাবে'র (Hobby Club) মাধ্যমে এই চেষ্টা করা যাইতে পারে। যার যে কাজে স্বাভাবিক ক্ষমতা, যার যে কাজ করিতে বিশেষ আগ্রহ, হবি ক্লাবে তাহাকে সে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। যাহার কোন কাজেই স্বাভাবিক দক্ষতা বা আগ্রহের প্রকাশ পায় নাই, তাহার সামনে বিভিন্ন ধরণের কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হইলে, ধীরে ধীরে সে কোনও-না-কোন দিকে আকৃষ্ট হয়—কোনও-না-কোন দিকে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। এমন লোক খুব কমই আছে যাহার কোন দিকেই স্বাভাবিক আগ্রহ বা দক্ষতা নাই।

এই সংস্থার কার্যক্রম

বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে যার যে কাজে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের বিকাশ হইতেছে তাহাকে ঐ কাজ সম্বন্ধে আরও জ্ঞান দেওয়ার জন্য নানারকমের বই তাহার হাতের কাছে যোগাইয়া দেওয়া হয়। তাহার মনের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয় এবং কাজে অধিকতর দক্ষতা অর্জনে তাহাকে সাহায্য করা হয়। যেসব স্থানে ঐসব কাজ উন্নত ধরণে হইতেছে, সেই সব স্থানে তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের ক্ষমতা ও আগ্রহের ক্ষেত্রে কি কি ধরণের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ধরণের শিক্ষাগ্রহণ করিলে কি কি ধরণের কাজকর্ম পাওয়া যাইতে পারে সে সব আলোচনাও ছাত্রদের সঙ্গে করা হয়।

২। তারপর প্রশ্ন হইল যে, কাহার কোন্ দিকে ক্ষমতা ও আগ্রহের বিকাশ হইতেছে, কে কোন্ বিষয় কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিল, কাহার চরিত্রে কি কি গুণাবলী বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদির সংবাদ

যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে রক্ষা করা। ছাত্রকে পরামর্শ দিতে হইলে তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য 'কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড' (Cummulative Record Card) রাখার ব্যবস্থা হইতেছে।

৩। শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ে পরামর্শ দিতে হইলে ছাত্রসম্বন্ধে যেমন সংবাদ রাখা প্রয়োজন, দেশে কি ধরণের শিক্ষাগ্রহণের এবং বৃত্তিগ্রহণের সুযোগ আছে সে সংবাদ রাখাও তেমনি প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা বা বৃত্তির জন্য বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। একদিকে ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ ও সংগৃহীত জ্ঞান অপর দিকে ভবিষ্যৎ শিক্ষা বা বৃত্তির প্রয়োজন এই উভয়কে সামনাসামনি না রাখিলে কি ধরণের শিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ করা ছাত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা স্থির। করা সম্ভব নহে। তাই দেশে যে সব বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ ও বৃত্তিসংস্থানের সুযোগ আছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। ছাত্র ও তাহার অভিভাবক যাহাতে ঐসব সংবাদ জানিতে পারেন নানাভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। ছাত্রদের জন্য 'কেরিয়ার টক' (Career Talk) নামে এক বিশেষ ধরণের আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর 'গাইডেন্স কর্ণার' (Guidance Corner) নাম দিয়া স্কুলের কোন স্থানে স্থায়িভাবে গাইডেন্স সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য পরিবেশণের ব্যবস্থা করা হয়। অভিভাবকদের জন্যও বিশেষ আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

৪। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ছাত্রের বিশেষ বিষয় নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উপরোক্ত ধরণের কাজ চলিতে থাকে। 'টিচার কাউন্সিলার' (Teacher Counsellor) বা 'কেরিয়ার মাষ্টার' (Career Master) নামে এক বিশেষ ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক স্কুলে ঐ ধরণের কাজের ভার প্রাপ্ত হন। অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে 'টিচার কাউন্সিলার' প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিয়া নিম্ন-মাধ্যমিক পাঠ শেষে কে কি করিবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যাহারা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইয়া যাইবে তাহারা নবম শ্রেণীতে উঠিলে কে কোন্ বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে আসিয়া সব সময়েই টিচার কাউন্সিলারের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে টিচার কাউন্সিলার নিজেই আলোচনার জন্য অভিভাবকদের আমন্ত্রণ করেন। আলোচনাকালে ছাত্র সম্বন্ধে একত্রিত সকল তথ্য এবং দেশে শিক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তি প্রাপ্তির সুযোগ সম্বন্ধে সংগৃহীত সকল সংবাদ টিচার কাউন্সিলার ছাত্র এবং অভিভাবকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ছাত্র ভবিষ্যতে কোন্ বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিবে বা কোন্ বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ, অর্জিত জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলীকে একদিকে রাখিয়া অপর দিকে সে যে বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিতে চায় বা যে বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করে তাহাতে সফলতা অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করিয়া দেখিতে হয়। ধরা যাউক, কোন ছাত্র বিশেষ বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান পড়িতে চায়। বিজ্ঞান শিক্ষায় সফলতা অর্জন করিতে হইলে সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করার ক্ষমতাকে (Numerical ability), বৈজ্ঞানিক প্রবণতা (Scientifiic aptitude), গণিতে জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস, প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। ছাত্রের ঐসব ক্ষমতা, জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে আছে কিনা বিচার করার পর তাহার বিজ্ঞান পাঠের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য টিচার কাউন্সিলার কখনও তাঁহার মতামত ছাত্র ও তাহার অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধে তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি ছাত্র ও অভিভাবকের কাছে উপস্থাপিত করিবেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার মতামতও জানাইবেন। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার দায়িত্ব ছাত্র ও তাহার অভিভাবকের উপরই থাকিবে।

৫। অষ্টম শ্রেণীতে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্র সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও নূতন তথ্য টিচার কাউন্সিলারকে, উপরি-উক্ত আলোচনার জন্য সংগ্রহ করিতে হয়। যেমন, অষ্টম শ্রেণীতে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা জানিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহার অভিভাবক

তাহাকে কোন্ বিশেষ বিষয় পড়াইতে ইচ্ছুক প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ লইতে হয়।

৬। ছাত্র নবম শ্রেণীতে উঠিয়া বিশেষ পাঠের বিষয় নির্ধারণ করিয়া লইবার পরও টিচার কাউন্সিলারকে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নবম শ্রেণীতে উঠিলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ব্যবধানে বারবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় যে, ছাত্র যে বিশেষ পাঠের বিষয় নির্বাচন করিয়াছে তাহা তাহার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা। নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভুলের সম্ভাবনা একেবারে এড়ানো যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত অসুবিধা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা হয়; কোন ছাত্রের নির্বাচনে ভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিলে নবম শ্রেণীতে পাঠের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে বিশেষ পাঠের বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দিতে হয়।

৭। দশম ও একাদশ শ্রেণীতে স্কুল ফাইন্যালের পর কে কি করিবে, কে কোন্ লইনে পড়াশুনা করিবে এ বিষয়ে মনস্থির করিবার উদ্দেশ্যে একই পদ্ধতিতে প্রস্তুতি চলে।

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ—শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দানের চেষ্টা আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে নূতন ধরণের কাজ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা এবং শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরাদর্শ দান দুই আলাদা ধরণের কাজ নহে—উহারা একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের কাজ ভাল ভাবে চলিলে, ইহা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নততর করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী পাঠের বিষয় নির্বাচনে ভুল না হইলে পাঠ ছাত্রের পক্ষে সহজতর হইবে এবং স্কুলের পাঠের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে পাঠে তাহার আগ্রহ অনেকগুণে বৃদ্ধি পাইবে। অপর দিকে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রাখিলে ইহা যেমন ছাত্রকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করিবে, তেমনি শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্যেও কাজে লাগিবে। তারপর বিদ্যালয়ে চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে এবং পিছাইয়া পড়া

ছাত্রদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাহায্য দিয়া আগাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহারা যেমন বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নততর করিবে তেমনি শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক সাহায্যদানে কাজে লাগিবে। এক কথায় ছাত্রের শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ একই কাজের দুই দিক; ইহারা একই সঙ্গে চলিবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়া ইহারা উভয়ই সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে।

শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন।—মুদালিয়র কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শসংস্থা গঠনে অগ্রণী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক ষ্টেটে একটি করিয়া 'ষ্টেট বুরো অব এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশন্যাল গাইডেন্স' (State Bureau of Educational & Vocational Guidance) স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন এবং দিল্লীতে 'সেণ্ট্রাল বুরো অব এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশন্যাল গাইডেন্স' স্থাপন করেন। প্রত্যেক ষ্টেটে শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়িয়া তোলার দায়িত্ব প্রধানতঃ ষ্টেট বুরোর উপর ন্যস্ত হয়। সকল ষ্টেটে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই এবং ষ্টেট বুরোও স্থাপিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেট বুরো স্থাপনে আর্থিক সাহায্যদানে অগ্রণী হইবার পূর্বেই পশ্চিম বাংলা সরকার আরও ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া ঐ ধরণের সংস্থা গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। শিক্ষাদান কার্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে না হইলে, শিক্ষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আধুনিকতম যন্ত্রপাতি (Tools) ব্যবহার না করিলে কোন শিক্ষাসংস্কারই সফল হইবে না; এ সম্বন্ধে আমাদের সরকার স্থিরনিশ্চয় হন এবং উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজে 'বুরো অব্ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ' স্থাপিত করেন। স্বভাবতই বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এই বুরোর উপর ন্যস্ত হয়—উহা তাহার অপরাপর কার্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার 'ষ্টেট বুরো অব্ এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশন্যাল গাইডেন্স', হিসাবে কাজ করিতে আরম্ভ করে। সব ষ্টেটের গাইডেন্স বুরো যে এককভাব কাজ

করিতেছে এমন নহে। পশ্চিম বাংলার গাইডেন্স বুরো যে সব কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এখানে শুধু তাহারই আলোচনা হইল।

পশ্চিম বাংলার ষ্টেট বুরোর কাজকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) ইহার প্রথম কাজ হইল স্কুলে স্কুলে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শের কাজ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools) প্রস্তুত করা। পশ্চিম বাংলার ষ্টেট বুরো সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছে :—

(ক) ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, অর্জিত জ্ঞান ও আগ্রহ মাপিবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। (খ) ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উপযুক্ত পুস্তক রচনা ও (গ) ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক তথ্য পরিবেশনের জন্য পোষ্টার প্রভৃতি এবং ফিল্ম ষ্ট্রিপ্।

(২) শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের কার্যে যে সব কর্মীর প্রয়োজন তাহাদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও ষ্টেট বুরোর উপর ন্যস্ত।

(৩) সমগ্র ষ্টেটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্য চলিতেছে কিনা সেদিকেও ষ্টেট বুরোর দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(৪) সর্বশেষে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদান কার্য যাহাতে নবতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং উন্নততম যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলিতে পারে তাহার জন্য ষ্টেট বুরোকে অবিরত গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইতে হয়।

শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্যের সংগঠনে ষ্টেট বুরোর পর আঞ্চলিক বুরোর স্থান। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ কুড়িটি স্কুলের শিক্ষা বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের কার্যে সহযোগিতা করার জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক বুরো স্থাপিত হইবে। আঞ্চলিক বুরোর দায়িত্ব নিম্নরূপ :—

(ক) আঞ্চলিক বুরো হইবে বিদ্যালয় ও ষ্টেট বুরোর মধ্যে যোগসূত্র।

ষ্টেট বুরোর প্রস্তুত 'যন্ত্রপাতি' আঞ্চলিক বুরোর প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হইবে।

(খ) আঞ্চলিক বুরো উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শদান সংস্থার বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করিবে। বিদ্যালয়ে গিয়া ঐ সংস্থার কাজে যখন যেমন প্রয়োজন তেমনই সাহায্য দানের চেষ্টা করবে।

(গ) ষ্টেট বুরোর সহিত ইহা সর্বপ্রকার গবেষণা কার্যে সহযোগিতা করিবে এবং নিজের প্রয়োজন অনুসারে গবেষণাকার্য চালাইবে। পশ্চিম বাংলায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য কলিকাতার একটি বেসরকারী বুরো ব্যতীত ঐরূপ আঞ্চলিক বুরো এখনও স্থাপিত হয় নাই। আশা করা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সরকার ঐ ধরণের বুরো স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। আঞ্চলিক বুরো স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারীভাবে এখনও গৃহীত না হওয়ার দরুণ ষ্টেট বুরো আঞ্চলিক বুরোর কর্মীদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনও করেন নাই।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য 'স্কুল গাইডেন্স কমিটি' (School Guidance Committee) নাম দিয়া এক বিশেষ সংস্থা গঠন করা হইতেছে। পশ্চিম বাংলায় স্কুল গাইডেন্স কমিটি নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইতেছে :—

১। প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা (সভাপতি)
২। শিক্ষকদের প্রতিনিধি (সভ্য)
৩। অভিভাবকদের প্রতিনিধি (সভ্য)
৪। টিচার কাউন্সিলার (সেক্রেটারী)

শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতিনিধির সংখ্যা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু স্থির হয় নাই। ঐ প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত কি মনোনীত হইবেন ইহাও নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। বিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতিনিধির সংখ্যা এবং তাঁহারা নির্বাচিত কি মনোনীত হইবেন তাহা স্থির করিবে।

স্কুল গাইডেন্স কমিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের দায়িত্ব বহন করিবে। বৎসরে ইহার অনূ্যন তিন বা চার বার অধিবেশন ডাকা হইবে। ঐ সব অধিবেশনে টিচার কাউন্সিলার ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে গাইডেন্স-সংক্রান্ত কাজকর্মের পরিকল্পনা পেশ করিবেন। পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর টিচার কাউন্সিলার অন্যান্য শিক্ষকের সাহায্যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদান

(Jean Jacques Rousseau)

রুশো ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা-নায়কদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। রুশো নিজে কখনও শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু সমাজ এবং শিক্ষা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সমাজ-বিপ্লবের কথা চিন্তা করিতে করিতে রুশোর দৃষ্টি শিক্ষার উপর পড়ে। কারণ তিনি দেখিলেন যে, সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইলে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

সমাজ বিপ্লব ও শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ

রুশো অনেক বই লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচখানা বইতে প্রধানতঃ শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে। ১। Project for the Education of M. de Sainte Marie ২। Discourses on Political Economy ৩। Nonvelle Acloise ৪। Considerations on the Government of Poland ৫। Emile. এই বইগুলির মধ্যে এমিল বইখানিই শিক্ষা জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং শিক্ষাতত্ত্ব ক্ষেত্রে রুশোর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু রুশো এই পুস্তকে শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কি করিয়া এমিল বলিয়া একটি ছেলে আদর্শ শিক্ষা লাভ করিল, রূপক হিসাবে ইহা আলোচনা করিতে গিয়া রুশো শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয়শিক্ষা সর্বসাধারণের শিক্ষা, বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এই বই-এ বিশেষ কোন আলোচনা নাই।

রুশোর লিখিত পুস্তক

প্রকৃতিতে রুশো ছিলেন বিদ্রোহী। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। ফলে তিনি ছিলেন কিছুটা একদেশদর্শী। তদানীন্তন ফরাসী সমাজের গ্লানিকর আবহাওয়ায় বাস করিয়া, সমাজ

সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই মনের গ্লানিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাট বিদ্রূপমাত্র ("Human institutions are one mass of folly and contradictions")। রুশোর মতে ভগবান সব কিছুই সুন্দর ও পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করেন, কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহারা মন্দ হইয়া যায় ("God makes all things good, men meddles with them and they become evil.")। সমাজের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য।

তাঁহার বিদ্রোহী মনোভাব

তাই ভগবান-সৃষ্ট সমাজ, অর্থাৎ প্রকৃতির সাহায্যেই মানুষকে গড়িয়া উঠিতে হইবে। রুশো স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেন যে, নাগরিক (citizen) গড়িয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ কুশিক্ষা না পাইলে, চরিত্রের অধঃপতন না হইলে "সুনাগরিক হওয়া যায় না"। রুশোর সামাজিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, শিক্ষার দ্বারা আমরা মানুষ গড়িব, না নাগরিক গড়িব, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া নিতে হইবে; মানুষ এবং নাগরিক এক সঙ্গে গড়া চলে না। ("you must make up your choice between the man and the citizen ; you cannot train both.)। রুশোর মতে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কাজেই সমাজ হইতে দূরে রাখিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রকৃতিই শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, প্রকৃতির সাহচর্যই শিশুর একান্ত কাম্য। সামাজিক বাধা-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করিতে না পারিলে শিশু প্রকৃত শিক্ষাপথে অগ্রসর হইতে পারে না। রুশো জীবনের প্রথম ১২ বৎসর শিশুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাই রুশোর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতবাদকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) আখ্যা দেওয়া হয়।

প্রকৃতিবাদের জন্ম

আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রকৃতিবাদী ছিলেন। অর্থহীন সামাজিক রীতিনীতি ও মুখস্থ বিদ্যার শৃঙ্খল হইতে শিশুকে রক্ষা করার জন্য, রুশোর মতই তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। গুরুদেব, তাঁহার আদর্শ বিদ্যালয় পাঠভবনকে (শান্তি-

নিকেতন) সমাজ হইতে দূরে প্রকৃতির কোলেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বাদের সাহিত তুলনা

শান্তিনিকেতন যাহাতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ছাত্রেরা মুক্ত প্রকৃতির সংসর্গে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, তাহার জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। অতটুকু পর্যন্ত রুশোর সহিত গুরুদেব সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু গুরুদেব বিশ্ব-প্রকৃতিতে ভগবানের, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ রূপের যেভাবে প্রকাশ দেখিয়াছেন, রুশো তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রকৃতি ও শিশুক পরস্পর পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই স্বীকৃতিও রুশোর ছিল না। অধিকন্তু গুরুদেবের শিশুর শৃঙ্খলমুক্তির ধারণা, রুশোর মত কেবলমাত্র নেতিবাচক (negative) ছিল না। প্রকৃতির সহিত একাত্মবোধেই, মানুষের প্রকৃত শৃঙ্খলমুক্তি ঘটিয়া থাকে। সমাজ-সম্বন্ধেও গুরুদেবের মনে রুশোর মত এত বিরুদ্ধ ধারণা ছিল না। যদিও গুরুদেবের আদর্শ বিদ্যালয় সমাজ হইতে দূরে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে ছিল, তথাপি সেখানে তিনি আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার নীতি সমর্থন করিতেন। বিদ্যায়তনের কাছাকাছি পল্লী-সমাজের সহিত শিশুদের সম্বন্ধ স্থাপনেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পুস্তক পাঠেও গুরুদেবের রুশোর মত নিষেধ ছিল না— না বুঝিয়া পড়ায়ই শুধু ছিল তাঁহার আপত্তি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদই ছিল রুশোর প্রকৃতিবাদের ভিত্তি। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে, ব্যক্তির অগ্রাধিকার তিনি এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রখ্যাত "সামাজিক চুক্তিবাদে" (Social Contract Theory),

রুশোর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ

ব্যক্তির প্রয়োজনেই যে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে এই মত তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সমাজ যদি ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহার টিকিয়া থাকিবার অধিকার নাই। শিশুর স্বাভাবিক শক্তি (abilities), প্রেরণা (urges), প্রক্ষোভ (emotions) প্রভৃতির বিকাশকেই রুশো শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। সমাজ যে শিক্ষাকে বাঞ্ছনীয় কিছু দিতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

রুশোর সময়ে মানবতাবাদীগণও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মানসিক ক্ষমতাবাদের (Faculty Theory) নীতিতে বিশ্বাসী

ছিলেন বলিয়া উহার দোহাই দিয়া, ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য এবং ব্যাকরণ পাঠ শিশুদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ দুই ভাষা ছাত্রদের মাতৃভাষা না হওয়ায়, উহাদের পাঠ ছাত্রদের নিকট অর্থহীন, ক্লেশকর ও পরিশ্রম পাঠ্য ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে ঐ ধরণের শিক্ষা শিশুর মানসিক বিকাশে সাহায্য না করিয়া প্রতিকূলতাই করিত। তাই, ঐ ধরণের শিক্ষার শৃঙ্খল হইতে শিশুদের মুক্তির নিমিত্ত রুশো বিশেষভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

মানসিক ক্ষমতাবাদের নীতির বিরুদ্ধাচরণ

রুশো শিক্ষা এবং জীবনকে পৃথকভাবে দেখিতেন না। বর্তমান জীবন ও তাহার বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষাকে নিয়োগ করার প্রয়োজন নাই বলিয়াই রুশো বিশ্বাস করিতেন। কারণ, তাহা করিতে গেলে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে শিশুর বর্তমানকে শৃঙ্খলিত করা হইবে। আধুনিকতম কালে আমরা যাহাকে বলি, প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা (Need centric education), রুশো অনেকটা তাহাই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনবোধ না থাকিলে, শিশুকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করিলেই, তাহাকে শৃঙ্খলিত করা হইল এবং তাহার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করা হইল। শিশুর বর্তমান প্রত্যক্ষ প্রয়োজনবোধের (Felt need) অনুকূলেই শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। জীবনের প্রয়োজন নিবৃত্তি করিতে গিয়াই শিশু শিক্ষা পাইবে এবং ঐ শিক্ষাই আবার তাহার জীবনে নূতন প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি করিবে এবং ঐ নূতন প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য সে আবার ছুটিবে। এইভাবে জীবন এবং শিক্ষা একসঙ্গে অগ্রসর হইবে।

প্রয়োজন-ভিত্তিক শিক্ষা

রুশো সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তির মতবাদে (Recapitulation theory) বিশ্বাস করিতেন। এই মতবাদ অনুসারে মানব সভ্যতা যেমন বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া, পূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিকশিত হইয়াছে, শিশুও তেমনি বাল্য হইতে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। অধিকন্তু রুশোর ধারণা ছিল যে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ এককালে

সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তির মতবাদে রুশোর বিশ্বাস

বিকশিত না হইয়া পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। তাই, শিশুর ক্রমবিকাশের স্তর অনুযায়ী শিশুর পারিপার্শ্বিক ও অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই তাহার শিক্ষা যথাযথভাবে অগ্রসর হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশুকালে ছেলে অসভ্য মানবের সমপর্যায়ে থাকে, ঐ সময় তাহার মানসিক বিশেষশক্তির কোনটিরই বিকাশ হয় না। তাই বাল্যে শিশুকে প্রচুর স্বাধীনতা দিতে হইবে। সামাজিক আইন-কানুন হইতে তাহার মুক্তি একান্ত আবশ্যক। লেখাপড়াও ঐ সময়ে চলিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে (প্রথম ১২ বৎসর) রুশো আবার দুইভাগে বিভক্ত করেন। জন্ম হইতে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার প্রথম পর্যায় ধরা যাইতে পারে। এই সময় শক্তিশালী দেহ গঠনই হইবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ বয়সে শিশু অসভ্য মানবের স্তরে থাকে, তাই জামা-কাপড় বেশী ব্যবহার না করিয়া মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে খেলাধূলা করিয়া সে বড় হইয়া উঠিবে, ইহাই ছিল রুশোর অভিমত।

শিক্ষার প্রথম পর্যায়: ১—৫ বৎসর

শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ ৫ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত, প্রধানতঃ "অবিশেষ শিক্ষার" (negative education) সময় তখন ভবিষ্যৎ শিক্ষা লাভের জন্য শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির কার্য ও অনুভূতি সাবলীল ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, শিশু ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে, কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাহাতে এই বয়সের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারে, সে চেষ্টাও করিতে হয়। কিন্তু, এই বয়সে পুস্তকের শিক্ষা, রুশো একেবারেই পছন্দ করিতেন না।

শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়: ৫—১২ বৎসর

বয়ঃসন্ধিকাল, অর্থাৎ ১২ বৎসরের পর হইতে, রুশোর মতে বিশেষ শিক্ষা (positive education) আরম্ভ করিতে হয়। এই বয়সে রুশো দৈহিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু দৈহিক শিক্ষা হইবে মানসিক শিক্ষার সহায়ক। এই বয়স হইতে শিশু জ্ঞানলাভ করিতেও আরম্ভ করিবে। ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুর কৌতূহল ও দূরদৃষ্টি বিশেষভাবে বাড়িয়া থাকে; উহাদের বিশেষভাবে শিক্ষার কাজে

শিক্ষার তৃতীয় পর্যায়; ১২—১৫ বৎসর

লাগাইতে রুশো পরামর্শ দিয়াছেন। তাই শিশুকে প্রথম "প্রকৃতি পরিচয়ের" শিক্ষা দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কোন বিষয়েই জ্ঞানার্জন এই বয়সে মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—আসল উদ্দেশ্য হইল, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই বয়সে শিশু হইবে অনেকটা আবিষ্কারক—"সমস্যামূলক পদ্ধতির" (problem solving) অনুসরণ করিয়াই শিশু শিক্ষা লাভ করিবে। এই স্তরেও শিক্ষা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর হইবে। কিন্তু পুস্তক পাঠের ব্যবস্থাও কিছু কিছু থাকিবে। এই স্তরে রবিনসন্ ক্রুশো বইখানা পাঠের জন্য রুশো বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়াছেন।

শিক্ষাদান কার্যে, রুশো শিক্ষার বিষয়বস্তু অপেক্ষা শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করিতেন। শিক্ষার বিষয় বস্তুত প্রকৃতিতেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা উদ্বুদ্ধ করাই প্রধান সমস্যা। এই ক্ষমতা উদ্বুদ্ধ হইলে শিশু নিজের চেষ্টায়, নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া চলিবে। শিক্ষকের কাজ হইবে, শিক্ষার প্রয়োজনে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং শিশুর সম্মুখে শিক্ষা গ্রহণের নূতন নূতন সুযোগ উপস্থিত করা। কাজেই শিক্ষা কার্যে, শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষার্থীর স্থান অগ্রে। এই হিসাবে রুশোকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম পথ প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় রুশোর বিশ্বাস

রুশো, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে শিশুর মানসিক বিকাশের স্তর হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া উহাকে মনস্তত্ত্ব নির্ভর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিশুর জীবনের প্রথম ১২ বৎসরকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর বলা যাইতে পারে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনা করিতে গিয়া রুশো শিক্ষাকে "বিশেষ শিক্ষা" (positive education) ও অবিশেষ শিক্ষা (negative education), এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। রুশোর নিজর ভাষায় বলিতে গেলে, "বিশেষ শিক্ষা" মনকে যথাযথ সময়ের পূর্বেই গড়িয়া তুলিতে চায় এবং শিশুকে বয়স্কদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চেষ্টা করে ("I call a

শিক্ষার স্তর বিন্যাস—বিশেষ ও অবিশেষ শিক্ষা

positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man.")। আবার যে শিক্ষা, মানুষের দেহযন্ত্রগুলির মধ্যে যেগুলি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, তাহাদের (প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ আরম্ভ করিবার পূর্বে) গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহাকে অবিশেষ শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ("I call a negative education one, that tends to perfect the organs that are instruments of knowledge, before giving the knowledge directly.")। "অবিশেষ শিক্ষা", মানুষের মনে যুক্তির পথকে প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ অভিজ্ঞতার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে ("Negative education endeavours to prepare the way for reason by the proper exercise of senses")। দুই ধরণের শিক্ষার মধ্যে রুশোর মতে "অবিশেষ শিক্ষাই" শ্রেষ্ঠতর। শিশু জীবনের প্রথম ১২ বৎসর বিশেষভাবে "অবিশেষ শিক্ষার" সময়।

সামাজিক, নীতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষা চলিবে চতুর্থ পর্যায়ে—১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই বয়সে রিপুগুলি বিশেষভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠে। উহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্যই নীতিগত ও সামাজিক শিক্ষার বিশেষভাবে প্রয়োজন। ধর্মকে নীতি শিক্ষাদানের ব্যাপারে রুশো গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করিয়াছেন—ধর্মের মাধ্যমেই নীতি শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তবে ধর্মের নামে যে সব কুসংস্কার ও গোঁড়ামি প্রচলিত ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের শিক্ষা ব্যবস্থায় রুশো উপলব্ধিকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। অন্তরের উপলব্ধি ব্যতীত (emotional appreciation) নীতি-শিক্ষা বা চরিত্র গঠন হইতে পারে না ইহাতে সন্দেহ নাই। রুশো, তাই প্রাচীন সাহিত্য পাঠকে, এই বয়সে শিক্ষার বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করিতেন। রঙ্গমঞ্চ ও মহৎ সাহিত্য শিক্ষার্থীকে সামাজিক শিক্ষা দিয়া থাকে বলিয়া রুশো মনে করিতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা গ্রহণকে তিনি সমর্থন করেন নাই। কারণ সাধারণ সমাজ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা কুশিক্ষার নিয়ামক বলিয়াই

শিক্ষার চতুর্থ পর্যায়; ১৫-২০ বৎসর

তাঁহার ধারণা ছিল। শিক্ষাকার্যে দেশভ্রমণকেও রুশো বিশেষ স্থান দিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপ্তির পর, শিক্ষার্থী বিবাহ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে ইহা রুশো আশা করিতেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আলোচিত হইল, তাহা শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নারীদের ক্ষেত্রে নহে। রুশো, স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে জন্মগত পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। নারীকে কেবলমাত্র সহধর্মিণী ও মাতৃরূপেই দেখিয়াছেন। কেবলমাত্র আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা হইয়া গড়িয়া উঠিবার জন্যই নারীর শিক্ষার প্রয়োজন। তাই স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে বলিয়াই রুশো অভিমত পোষণ করিতেন। ফলে, নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে রুশো বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। এমিল গ্রন্থের একেবারে শেষে, তিনি তাঁহার মানসকন্যা "সোফির" শিক্ষার সামান্য কিছু আভাষ দিয়াছেন মাত্র।

স্ত্রীশিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে, রুশোর অবদানের আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে নব-চিন্তাধারার পথিকৃৎ বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন, কেহ কেহ আবার রুশোকে অবাস্তব চিন্তা ও কল্পনার উৎস এবং শিক্ষাজগতের কুগ্রহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উপাদান প্রচুর রহিয়াছে বলিয়াই হয়ত এমন হইয়াছে। উভয় মতবাদের মধ্যেই যে কিছুটা সত্য রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মূল্যায়ণ

একথা সত্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। তাহার মৌলিক চিন্তা ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ যুক্তি অপেক্ষা আবেগের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল। বৈজ্ঞানিক দিক হইতেও কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য তাহা তিনি যাচাই করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই।

বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব

রুশোর চিন্তাধারার মূল সূত্র ছিল, তৎকালীন ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের কল্পনার মূলে রহিয়াছে

রুশোর এই বিদ্রোহী মনোভাব। তাই "ইতিবাচক" অপেক্ষা "নেতিবাচক"-এর উপরই রুশোর ঝোঁক ছিল বেশী। কাজেই তাঁহার প্রধান অবদান প্রকৃতিবাদ স্বতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্ব হিসাবে, নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে নাই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহার চিন্তাধারার কিছু কিছু প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র।

নেতিবাচক চিন্তার প্রাধান্য

প্রকৃতিবাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রুশো সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তির তত্ত্ব (Recapitulation Theory) প্রভৃতি কতকগুলি ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থনও করিয়াছেন। ১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে শিশুকে সামাজিক বা নীতিগত শিক্ষা দেওয়া চলে না, ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে পুস্তক পাঠ আরম্ভ করা উচিত নহে ইত্যাদি আরও অনেক ভ্রান্ত মতবাদও তিনি প্রচার করিয়াছেন। সামাজিক অভিজ্ঞতা যে মানুষকে সব সময় কু-শিক্ষা দিয়া থাকে এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে সুশিক্ষা পাওয়া যায় এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে।

ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থন ও প্রচার

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর মতামতও প্রমাদপূর্ণ। পুরুষ ও নারীর মানসিক শক্তির দিক হইতে পার্থক্য আছে এই ভ্রান্ত মত তিনি সমর্থন করিতেন। তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নাই।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

তথাপি আধুনিক শিক্ষাধারার প্রবর্তনে রুশোর বহুমুখী দান অনস্বীকার্য। প্রথমেই, তাহাকে শিশুকেন্দ্রিক (Child centric) শিক্ষা-ব্যবস্থার পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টা ছাড়া যে শিক্ষালাভ সম্ভব নহে এবং শিক্ষাকার্যে, শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষার্থীর গুরুত্ব যে অধিক এই সত্যের প্রতি তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষাকে যে শিশুর প্রয়োজন ভিত্তিক (Need centric) করিতে হইবে, এ সম্বন্ধেও রুশো দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। অর্থবোধহীন পুস্তক পাঠ যে শিক্ষা নহে, এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসও তিনি দূর করিতে চেষ্টা করেন।

শিশুকেন্দ্রিক ও প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা সমর্থন

শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি রুশো চালু

করিতে চেষ্টা করেন। আমরা যাহাকে আধুনিককালে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-(Activity centric education) ব্যবস্থা বলি, রুশো তাহাই সমর্থন করিতেন। অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিয়া পুস্তক পাঠের উপর তিনি খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মত রুশো জীবন ও শিক্ষাকে একই সূত্রে গাঁথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্রকৃতির সাহচর্যে মুক্ত জীবন যাপন করিতে করিতে শিক্ষালাভ করিবে ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশ্বাস

রুশোর মত শিশুর অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্‌ও খুব কমই আছেন। সামাজিক বন্ধন, পুস্তকের বন্ধন এবং শিক্ষকের শাসনের বন্ধন, শিশুর শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া রুশো বিশ্বাস করিতেন। কাজেই, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব নিজ আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইবার যে নীতি অনুসরণ করি, তাহারও পথিকৃৎ বলিয়া রুশোকে স্বীকার করিতে হয়। অর্থহীন "স্কলাষ্টিক্" শিক্ষা (scholastic) শিক্ষা যে পরিত্যাজ্য—"পণ্ডিত মূর্খ" প্রস্তুত করা যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, এই বিষয়েও রুশো আমাদের চক্ষু-উন্মিলিত করিয়াছেন।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার নীতি সমর্থন

শিক্ষার পদ্ধতির দিক হইতেও রুশো নূতন পথ-প্রদর্শন করেন। প্রকৃতির সাহচর্যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার যে পদ্ধতির তিনি আলোচনা করেন, আজ আমরা অনেকাংশে তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকি। বক্তৃতা, উপদেশ ও শাসনের মাধ্যমে যে নীতি শিক্ষা সম্ভব নহে, একথাও রুশোই প্রচার করেন। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও নীতিশিক্ষা

শিক্ষা যে শিশুর মনস্তত্ত্ব নির্ভর হওয়া প্রয়োজন এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্তর অনুসারে, শিক্ষার স্তরবিন্যাস হওয়া প্রয়োজন, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহাও রুশোর অন্যতম প্রধান অবদান।

মনস্তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা

রুশো ছিলেন বিপ্লবী চিন্তানায়ক। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। রুশোর চিন্তাধারা যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আনিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাতে

সন্দেহ নাই। পেস্তালৎসী ও ফ্রোয়েবেল শিক্ষা-জগতের পরবর্তী দুই দিক্‌পাল রুশোর চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তবু রুশোকে শিক্ষা-জগতের একজন নায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে মতামতের সত্য যেমন ছিল, প্রমাদও তাহার চাইতে কম ছিল না। অধিকন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার কোন ধারণা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অবাস্তব স্বপ্ন দেখিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

ফ্রোয়েবেল (১৭৮২—১৮৫২)

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির জনক—ফ্রোয়েবেল

জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল রুশোর শিষ্য ছিলেন এবং নব শিক্ষাধারার প্রবর্তকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তবে ফ্রোয়েবেল ছিলেন প্রধানতঃ দার্শনিক। তাঁহার শিক্ষানীতি দার্শনিক তত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হইয়াছিল; ঐ নীতি-গুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করিয়া ফ্রোয়েবেল কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করেন।

কাণ্ট (Kant), ফিচে (Fichte), স্কেলিং (Scheling) প্রভৃতি দার্শনিকের দ্বারা ফ্রোয়েবেল প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি আদর্শবাদী দার্শনিক ছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে এই মহাশক্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেন। তাঁহার লিখিত The Education of Man গ্রন্থে ফ্রোয়েবেল সর্বপ্রথমই তাঁহার দার্শনিক বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আধ্যাত্মিক (spiritual) এবং প্রাকৃতিক (natural) শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ করিতেন না—আধ্যাত্মিক শক্তি হইতেই প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভগবানই ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি—সমগ্র বিশ্ব এক ভগবানের অভিব্যক্তি; তিনিই বিশ্বের সব কিছুর নিদান—ভগবান ব্যতীত বিশ্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না। প্রতিটি মানুষই ভগবানের প্রতীক—বিশ্বসৃষ্টি হইতে সে পৃথক্ নহে। সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার একাত্ম অনুভবেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা।

ভগবৎ ইচ্ছা বক্ষে ধারণ করিয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং এই ইচ্ছার পূর্ণতায়ই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা—বীজের মধ্যে যেমন তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুপ্ত থাকে, মানুষের মধ্যেও জন্মের সময়ই তেমনি তাহার ভবিষ্যৎ সুপ্ত থাকে—উহা জীবনের স্তরে স্তরে ভিতর হইতে বিকশিত হইতে থাকে।

শিশুর অন্তরে ভগবৎ ইচ্ছার বীজ নিহিত থাকে—উহাই তাহার প্রকৃতি

ফ্রোয়েবেল তাঁহার Education of Man পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—শিশু ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা যত অঙ্কুরেই থাকুক না কেন, শিশুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং তাহা ভিতর হইতে বিকাশের দ্বারাই রূপ পরিগ্রহ করে ("All the child is ever to be and become, lies however slightly indicated, in the child, and can be attained only through development from within outward").

The Pedagogies of the Kindergarten নামক আর একটি বই-এ ফ্রোয়েবেল লিখিয়াছেন—বীজ যেমন নিজের অন্তরে গাছের সমগ্র প্রকৃতি ধারণ করিয়া রাখে, তেমনি প্রত্যেক জীবের বিকাশ এবং গড়ন জন্মকালেই তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে।

প্রতিটি জীবের একটি মাত্রই পরিণতি আছে তাহা হইতেছে, আপনার অন্তরে যে ভগবৎ অধিষ্ঠান রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা। মানুষের

শিশুর মনে নিহিত ভগবৎ ইচ্ছার বীজের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য

অন্তর্নিহিত প্রকৃতি যে ভাল, একথা ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করিতেন, কারণ, সেখানে ভগবৎ অধিষ্ঠান রহিয়াছে। মনুষ্যজীবন যদি বিকাশের স্তরে স্তরে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইতে পারিত—তাহাতে যদি অযথা সামাজিক প্রভাব না পড়িত, তাহা হইলে মনুষ্য চরিত্র, ভগবৎ চরিত্রের প্রতিচ্ছবিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিত ইহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, মানুষের মধ্যে ভগবৎ সত্তা জাগাইয়া তোলা।

কাজেই শিক্ষার নামে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া চলিবে না; মানুষের প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহা স্বাভাবিকভাবে

বিকশিত করিতে সাহায্য করিতে পারাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

শিশুকে প্রকৃতির অনুকূলে শিক্ষা দিতে হইবে—শিক্ষক বাগানের মালির মত

তাই ফ্রোয়েবেল যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন কিণ্ডারগার্টেন, অর্থাৎ শিশুদের বাগান। শিশুরা, চারাগাছের মত ভগবৎ নিয়মে সেখানে আপনা হইতেই বিকশিত হইবে এবং শিক্ষকেরা বাগানের মালির মত ঐ বিকাশে সাহায্য করিবেন মাত্র।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপরও ফ্রোয়েবেল প্রায় রুশোর মতই গুরুত্ব দিতেন। স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে, মানুষের অন্তর্নিহিত ভগবৎ ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা। শিশু যত স্বাধীনভাবে বড় হইবার সুযোগ পাইবে,

শিক্ষায় শিশুর অবাধ স্বাধীনতার স্থান

ততই তাহার বিকাশ ভগবৎমুখী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রোয়েবেল একথাও বিশ্বাস করিতেন যে, পারিপার্শ্বিকের দোষে, শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সব ক্ষেত্রে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চলে না, কারণ তাহা হইলে তাহাকে আপন অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতে দেওয়া হইবে। কাজেই রুশোর শিষ্য হইলেও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শন ও রুশোর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে। তিনি মনে করিতেন যে, মানুষের মধ্যে কখনও আদর্শ অবস্থা পাওয়া সম্ভব নহে, কারণ মাতৃগর্ভে থাকাকাল হইতেই শিশুর উপর পারিপার্শ্বিক কাজ করিয়া আসিতেছে। কাজেই যখন দেখিবে যে, শিশু তাহার আদর্শ অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াছে, তখন তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া চলিবে না—তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

শিশুর অন্তরে নিহিত ভগবৎ ইচ্ছার বীজের বিকাশে যদিও একটি অখণ্ড ধারাবাহিকতা রহিয়াছে তবু বয়স অনুসারে উহাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা

বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও শিক্ষা

চলে। ফ্রোয়েবেল রুশোর মত ঐ স্তরগুলিকে, অতি শিশুকাল (infancy), শিশুকাল (childhood), বাল্যকাল (boyhood) ও যৌবন (youth), এই চারি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এক স্তরের বিকাশে পূর্ণতা লাভ করার পর অপর স্তরে

প্রবেশ করিলেই বিকাশ সার্থক হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে, প্রতি স্তরের বিকাশে পূর্ণতা লাভ করিতে শিশুকে সাহায্য করা। শৈশব ও বাল্যকালের বিকাশ বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষার সহযোগিতা কিভাবে তাহাদের কাজে লাগাইয়া ঐ দুইটি বিকাশের স্তরকে সার্থক করা যায়, সে বিষয়ে ফ্রোয়েবেল বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। খেলাকে শিশুকালে বিকাশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট কর্ম (characteristic activity) বলিয়া তিনি অভিহিত করিয়াছেন।

খেলা, শৈশবের বিকাশ বৈশিষ্ট্য

এই খেলা শিশুকে, আনন্দ, স্বাধীনতা, সন্তোষ, শরীর ও মনের বিশ্রান্তি, এবং শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই ফ্রোয়েবেল খেলাকে শিশুকালের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কর্ম বলিয়া মনে করিতেন। খেলার সাহায্যেই শিশু তাহার অন্তরের সহিত বাহিরের যোগসাধন করিয়া থাকে এবং বাহিরের অভিজ্ঞতাকে অন্তরের সম্পর্কে পরিণত করে। খেলার প্রতি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ শিক্ষায় কাজে লাগাইতে পারিলে শিক্ষা স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয়। ফ্রোয়েবেল তাই খেলার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েক রকমের খেলা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। খেলা যেমন শৈশবের বিশিষ্ট ধর্ম, কর্মও (work) তেমনি বাল্যের বিশিষ্ট ধর্ম। খেলাও কর্ম বটে, কিন্তু খেলায় ফলাফল গৌণ থাকে; শিশুরা খেলার জন্যই খেলিয়া থাকে। বাল্যকালে কিন্তু মানুষ কর্মের ফলের উপরও আগ্রহশীল হয়, তাই খেলা কর্মে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বাল্যকালের কর্মেও উদ্দেশ্য বোধ থাকে বটে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য বয়স্কদের মত বস্তু-তান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে না। আত্ম-উপলব্ধির সহিত এই উদ্দেশ্যের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ এই উদ্দেশ্য আসে অন্তরের তাগিদে। তাই খেলা ও কর্ম শিশুজীবনে একই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শিশুর অন্তর্নিহিত ভগবৎ প্রকৃতির বিকাশ সাধন করিয়া থাকে। বাল্যকালের কর্ম সাধারণতঃ প্রজেক্টের (Project) রূপ পরিগ্রহ করে; অর্থাৎ কর্মে প্রণোদনকারী সমস্যা বা উদ্দেশ্য বাস্তবধর্মী হয়, পারস্পরিক সহযোগিতায় ইহার সমাধানের চেষ্টা করিতে হয় এবং ইহার মাধ্যমে বুদ্ধি এবং চারিত্রিক বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

শিক্ষায় "কর্মের" স্থান

শিক্ষার আধুনিক রূপায়ণে ফ্রোয়েবেলের অবদান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ

রাখিয়া যে শিক্ষাকে অগ্রসর হইতে হয়, এবিষয়ে ফ্রোয়েবেল বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশুর অবাধ স্বাধীনতা এবং শিক্ষার দ্বারা তাহা সংযত করিয়া শিশুর অন্তর্নিহিত বিকাশের অনুকূলে কিভাবে তাহা পরিচালিত করা যায়, সেবিষয়েও ফ্রোয়েবেল আমাদের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে খেলা এবং "কর্ম"কে কিভাবে শিক্ষাদানে ব্যবহার করা চলে তাহা হাতেনাতে দেখাইয়া ফ্রোয়েবেল আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, ফ্রোয়েবেলের নাম যে শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে অমর হইয়া আছে, তাহা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষা প্রচলনের জন্য।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি—নিজের প্রচারিত শিক্ষাতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে ফ্রোয়েবেল ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন নামে এক বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধরণের বিদ্যালয় এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উহা স্থাপিত হইতে থাকে। এখনও পৃথিবীর সর্বদেশে কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প নহে। আমাদের দেশেও অনেক কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় আছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিশেষ ধরণের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের বাগান। এই কথাটির মধ্যেই এই শিক্ষা-পদ্ধতির মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। ভগবৎ ইচ্ছায় শিশু তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ বুকে নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; মালির মত শিক্ষক এই বীজ রূপায়ণে সাহায্য করিবেন মাত্র।

প্রতিটি শিশুরই বিকাশের একটি স্বকীয় ধারা আছে; সেই ধারা অনুসারেই তাহার বিবর্তন (evalution) অগ্রসর হইবে। কিন্তু শিক্ষক এই বিবর্তনের স্বরূপ অনুধাবন করিয়া, এই কার্যে শিশুকে সাহায্য দান করিয়া তাহার বিবর্তনকে দ্রুততর এবং সার্থকতর করিয়া তুলিতে পারেন। বিদ্যালয়ে শিশুর বিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং প্রতিকূল পরিবেশের মূলচ্ছেদ করিতে পারিলেই শিশুর বিকাশে যথাযথ সাহায্য দেওয়া হইল বলিয়া ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করিতেন। তাই কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় শিশুর জন্য স্বাধীন, সুন্দর, আনন্দময় ও খেলাভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের কর্মময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা হয়।

খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি—খেলার মাধ্যমেই শিশুর অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তা যথাযথভাবে বিকশিত হইতে পারে বলিয়া ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করিতেন। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের জন্য তাই তিনি ২০টি খেলা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই খেলাগুলিকে তিনি ভগবানের "দান" (gift) বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই খেলাগুলিকে শিক্ষাবিষয়ক উপকরণও বলা যাইতে পারে। কারণ, এই খেলার উপকরণগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের যথাযথ বিকাশ হয়; ইহাদের সাহায্যে শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা গড়িয়া উঠে এবং বস্তুর আকৃতি সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। উপরি-উক্ত "দান"গুলির সাহায্যে যে সব বিভিন্ন ধরণের খেলা, খেলা যায় ফ্রোয়েবেল তাহাদের "কর্ম" (occupation) আখ্যা দিয়াছেন।

ফ্রোয়েবেল ২০টি দান উদ্ভাবন করেন, কিন্তু বর্তমান কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলিতে তাহাদের মধ্যে মাত্র ৭টি প্রচলিত আছে। "দান"গুলি সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবার নিমিত্ত দুইটি "দান" সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম দানে আছে ৬টি রঙীন পশমের বল। বলগুলিকে গড়িয়ে দিয়ে খেলা (কর্ম) করা হয়। তৃতীয় "দানের" মধ্যে আছে একটি বড় চৌকো কাঠের বস্তু যেটিকে ৮টি ছোট চৌকোতে পরিণত করিয়া খেলা খেলিতে হয়।

শিশুর আত্মবিকাশের জন্য, খেলা ছাড়া ফ্রোয়েবেল, গানের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ৫০টি গান নির্বাচিত করিয়াছিলেন। দলবদ্ধভাবে গানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিশুরা অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া চলে। কোন কোন গান, আবার, বিভিন্ন ধরণের খেলা ও কাজের সঙ্গে গাওয়া হয়। কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়ে, গান, খেলা এবং কাজ একসূত্রে গ্রথিত থাকে—যে বিষয়ে গান গাওয়া হয় তাহার অর্থ অনুসারে অঙ্গ সঞ্চালন করা হয় এবং ঐ বিষয়ে নানা রকমের জিনিসও গড়া হয়।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে না। গান, খেলা এবং বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়া শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হয় এবং শিশু প্রকৃতির যথাযথ বিকাশ ঘটে—সে বিশ্বঐক্যের অনুভূতি বা ভগবৎসত্তার অনুভূতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

ফ্রোয়েবেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষাবিদ্ হইলেও শিক্ষাকার্যে সামাজিক সম্বন্ধের অবদানকে স্বীকার করিতেন। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে শিশুদের দলবদ্ধ কাজের উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। পারস্পরিক মধুর এবং নিবিড় সম্বন্ধের মধ্য দিয়া শিশু-প্রকৃতির বিকাশ লাভ ঘটে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

উপরে বর্ণিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি ফ্রোয়েবেল প্রধানতঃ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের জন্যই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার নীতিগুলি পরবর্তী স্তরের শিক্ষায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির অনেকগুলি নীতিই যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশুর আত্মবিকাশে বা তাহার শিক্ষায় শিক্ষক যে সাহায্যকারী মাত্র, এই তথ্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছে। শিশু নিজে শিক্ষা না করিলে কেহ তাহাকে শিক্ষা দিতে পারে না—আত্মসক্রিয়তাই শিশুর বিকাশের মূল সূত্র এই নীতিও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতিতে স্থান পাইয়াছে। শিক্ষাকে যে আগ্রহ ভিত্তিক বা খেলা ভিত্তিক করিতে হইবে ইহাও আধুনিকতম শিক্ষানীতি। শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া যেমন উচিত, তেমনি প্রয়োজনবোধে তাহার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করাও প্রয়োজন এই সত্যকেও ফ্রোয়েবেল তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিতে স্থান দিয়াছেন। সর্বোপরি, ফ্রেয়েবেল আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদী শিক্ষাদর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—একদিকে তিনি যেমন, স্বাধীনভাবে শিশুর বিকাশের উপর জোর দিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি বিদ্যালযের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতির শিক্ষানীতিগুলি আধুনিকতম শিক্ষানীতি-সম্মত হইলেও, আধুনিকতম, প্রাক্-প্রাথমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, স্বাভাবিক নিয়মেই ফ্রোয়েবেলের প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি হইতে উন্নততর। ফ্রোয়েবেলের "দান" (gifts) বা খেলাগুলির রূপকতা খুব বেশী। উহাদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা সহজ নহে। ঐ খেলা অপেক্ষা শিক্ষাকে অধিকতর

কার্যকরী খেলার ব্যবস্থা করা কিছু অসম্ভব নহে। তারপর শিশুর খেলা এক ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—এক বিশেষ ধরণের খেলা ব্যতীত শিশুর বিকাশ যথাযথভাবে অগ্রসর হইতে পারে না, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়ের সঙ্গীত সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কোন নির্দিষ্ট সঙ্গীতের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বস্তুতপক্ষে ফ্রোয়েবেলের অনেক খেলা এবং অনেক গানই এখন কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে চালু নাই। সংক্ষেপে, আধুনিকতম বিদ্যালয়ে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। শিক্ষার মূলনীতিগুলি অনুসরণ করিয়া, প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যা-লয়ের কর্মগুলির পরিবর্তন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের এবং ভারতের দুইটি বিদ্যালয় একই শিক্ষানীতি অনুসরণ করিলেও, বিদ্যালয় দুইটির কর্মের মধ্যে হয়ত যথেষ্ট পার্থক্য থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সর্বাধিক হইলেও শিক্ষাবিদ্ হিসাবেও তাঁহার স্বীকৃতি অল্প হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার অন্যান্য লেখার সঙ্গে তুলনায় শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা তেমন বেশি না হইলেও আজীবন তিনি শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া গিয়াছেন এবং শান্তিনিকেতনে একটি আদর্শ শিক্ষায়তন গঠন তাঁহার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি হিসাবে তিনি যতই সম্মান পাইয়া থাকুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন শিক্ষক, আচার্য, গুরুদেব। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ গুরুদেব ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে ঋষিদের মতই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনা ও বক্তৃতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা তাঁহার শান্তিনিকেতন, তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য দিতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তাহাই পরীক্ষা করিয়া বর্তমানে

প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ভারতের আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের বিদ্যালয়ে অজ্ঞানিতে যতটুকু প্রবেশ করিয়াছে, তেমন আর কাহারও প্রবেশ করে নাই। মহাত্মা গান্ধীর "বুনিয়াদী" শিক্ষা সরকারী স্বীকৃতি না পাইলে, একটি বড় আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত সাহিত্য সভা, বৈতালিক সঙ্গীত, আলপনাদানের রীতি প্রভৃতি, তাঁহাদের নিজস্ব ক্ষমতায় অনেকটা অলক্ষিতে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। মহাত্মাজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষারীতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে—তাহাতে মনে হয় যে, গান্ধীজি শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করিয়াছেন বেশী; তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা বা বক্তৃতা খুব বেশী নাই। শিক্ষাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছেন এবং যত বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই তাঁহার শিক্ষা নামক পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের সংঘটন পরিচালনা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন নিজে শিক্ষা দিয়াছেন; যাঁহারা তাঁহার কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে শিক্ষা দিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে আজও জীবিত আছেন; তাঁহাদের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি (যথা,—কবিতা শিক্ষাদান-পদ্ধতি)। শান্তিনিকেতনের পাটভবনের শিক্ষকদের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে যে সব লিখিত উপদেশ দান করিতেন তাহা হইতেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় লেখার স্বল্পতার জন্যই শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে সে সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা জন্মায় না। কিন্তু যে-কোন শিক্ষাবিজ্ঞানী গুরুদেবের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হইবেন তিনিই যে গুরুদেবকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ হিসাবে স্বীকৃতি দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিবার সূত্র

নিজের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলে বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রথম আরম্ভ হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ না করিলেও রবীন্দ্রনাথের মত পণ্ডিত কবি সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাই রবীন্দ্রনাথের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ছাত্রেরা যেন জ্ঞান আহরণে বিমুখ না হয়—তাঁহার মত অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার হাত হইতে ভবিষ্যৎ ছাত্রেরা যেন রেহাই পায়। তাই শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা এবং একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা তাঁহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজস্র লেখার মাধ্যমে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা একটি জীবনদর্শন, যাহা হয়ত তাঁহার উপলব্ধির ভিতর আসিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত একত্বের অনুভূতিকেই রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই একত্বের অনুভূতির আকুতিই তাঁহার অজস্র কবিতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাথ এই একত্বের অনুভূতি লাভের উপায় খুঁজিতেছিলেন। তাই কবিতার মত শিক্ষাও তাঁহার জীবনের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল—শিক্ষার সহিত তাঁহার জীবন সত্তার পার্থক্য ছিল না। কাজেই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা তাঁহার জীবন উৎস হইতে স্বতই উৎসারিত হইত। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা—বেদ-বেদান্ত পাঠ হইতেই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রাচীন ঋষি এবং তাঁহাদের শিক্ষাধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তার উৎস

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাকে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ্ বলিয়া মনে হয়। কবি হিসাবে তিনি বিশ্ব প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াছিলেন। নিতান্ত শিশুকালে ঘরে প্রায় বন্দীর মত আবদ্ধ থাকিয়া তিনি যখন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেন প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে তখন হাতছানি দিয়া ডাকিতেন। সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস,

জল, গাছ, পাতা, ফল, ফুল, তাঁহার সৌন্দর্য পিপাসিত চিত্তকে ভরিয়া তুলিত। প্রকৃতি দেবীর অবাধ স্বাধীনতাও তাঁহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিত। প্রকৃতির অন্তহীনতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে অজানার ডাকে মুখরিত করিয়া তুলিত। তাই তিনি প্রকৃতির বন্দনায় বিভোর থাকিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি প্রকৃতিদেবীকে সর্বপ্রধান শিক্ষাদাত্রী মনে করিতেন। রুশোর মতই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে। কবিগুরু তাঁহার আদর্শ বিদ্যালয়কে শহর হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ও যত্নে বীরভূমের ডাঙ্গায় (শান্তিনিকেতন) বিদ্যালয়ের পরিবেশ হিসাবে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইট ও কাঠের পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিলে শিক্ষালাভ হইতে পারে না, এই ধারণা হইতে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের (পরে, পাঠভবন) জন্য ঘরবাড়ী তিনি অল্পই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সর্বদা মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গলাভ করার জন্য উৎসাহিত করা হইত; তাহারা যাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং প্রকৃতির সাহচর্যে যাহাতে তাহাদের সৃজনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের এইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইত। এমন কি পাঠ গ্রহণকালেও ছাত্রেরা উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতেন। এমন কি, সভাসমিতিও একইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইত। তাই শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ, শালবীথি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবাদ

কিন্তু গুরুদেবের প্রকৃতিবাদ এবং রুশোর প্রকৃতিবাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সমাজের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন না। সমাজের সংস্পর্শে যে শিশু নষ্ট হইয়া যাইবে, এ ধারণাও গুরুদেবের ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিত; শান্তিনিকেতনের ভিতরেও রবীন্দ্রনাথ একটি আদর্শ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর রুশো শিশুর প্রথম জীবনে তাত্ত্বিক শিক্ষা একেবারেই পছন্দ করিতেন না,

রুশোর সহিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই শিশুর তাত্ত্বিক শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন। অধিকন্তু প্রকৃতির সঙ্গ হইতে যে সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃজনীশক্তি বিকাশের দিকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্ব দিতে দেখি, রুশোর চিন্তাধারায় সেই গুরুত্বের স্থান দেখিতে পাই না। সমাজের অর্থহীন বাধা-নিষেধ হইতে শিশুর মুক্তি কামনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্ত শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়া শিশুর অবাধ স্বাধীনতার নীতি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নাই। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আইন-কানুন ছাত্রদের বিশেষ-ভাবে মানিয়া চলিতে হইত। রবীন্দ্রনাথ শারীরিক স্বাধীনতা অপেক্ষা মানসিক স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রুশোর চিন্তাধারার যে-সব ত্রুটি দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় তাহা দেখিতে পাই না। গুরুদেব একটি আদর্শ শিক্ষাদর্শন আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—যদিও তাহার মর্ম আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ্ বলিলে আমাদের ভুল হইবে। তিনি প্রধাতঃ ছিলেন আদর্শবাদী—আদর্শবাদই তাঁহার প্রকৃতিবাদের ভিত্তি। সমগ্র সৃষ্টির একটি মহান উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য মানুষের জীবনের তথা শিক্ষারও উদ্দেশ্য বটে। সমগ্র সৃষ্টি "অজানাকে" জানিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়া শ্রান্তি, ক্লান্তিহীন হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে-ই অজানা আবার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একীভূত। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারিলেই "অজানাকে" জানা হইবে এবং আত্মদর্শন হইবে—শিক্ষার উদ্দেশ্যও সফল হইবে। "অজানাকে" জানিতে হইলেই সৃজনীশক্তির বিকাশের প্রয়োজন। বন্ধনের মধ্যে তাহা সম্ভব নয়। তাই চাই মুক্তি—কিন্তু এই মুক্তি বিশেষ করিয়া মনেরই মুক্তি—চিন্তা ও উপলব্ধির মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি জড় প্রকৃতি নহে—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর ইহাকে ধরা যায় না—ইন্দ্রিয়সমূহের শিক্ষার দ্বারা উহাতে উপলব্ধির পথ সুগম হয় না। ইহার স্থান অতীন্দ্রিয়লোকে।

এই প্রকৃতি আবার সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—ইহা বিশ্ব সংসারের সবকিছুরই আধার। ইহার সহিত একাত্মবোধে শুধু মানবতারই বিকাশ নহে,

বিশ্বমানবতারও বিকাশ বটে। আমরা সকলে এক হইতে উদ্ভূত এবং একেই লয় প্রাপ্ত হইব। আমাদের সকলের অন্তরে একই সুর ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত সুর মিলাইতে পারিলেই ইহা আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে আমরা বিশ্বমানবতার শিক্ষাকে শিক্ষার অন্যতম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেখি। কবির অন্তরে বিশ্ব প্রকৃতির সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, তাই প্রথম হইতেই তাঁহার সৃষ্ট শিক্ষাতীর্থে সাদা-কালোর পার্থক্য ছিল না—দেশ, জাতি, ভাষা নিরপেক্ষভাবে সকলেরই আমন্ত্রণ ছিল তাঁহার শিক্ষায়তনে।

কবির শিক্ষাদর্শনে বিশ্বমানবতার স্থান

প্রকৃতিবাদ, আদর্শবাদ ও বিশ্বমানবতাবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায়, মানবতাবাদ (Humanism) বিশেষ স্থান পাইয়াছে। মনুষ্যত্বের বিকাশই জীবনের উদ্দেশ্য। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই উদ্দেশ্যে মানুষের আত্মার মুক্তি একান্ত আবশ্যক এবং ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহার জন্য প্রধানতঃ চাই "উদার শিক্ষা" (Liberal Education)। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, চারুকলা, সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমেই প্রকৃতিকে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আনা সম্ভব হইতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে, ঐসব বিষয়ের শিক্ষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে। শিক্ষা-পদ্ধতি যথাযথ হওয়ার উপরও গুরুদেব বিশেষ জোর দিতেন। শিক্ষা-পদ্ধতি গতানুগতিক না হইয়া এমন হইবে যে, অন্তরে যেন সৌন্দর্যবোধ এবং ছন্দবোধ জাগ্রত হয় এবং ছাত্রদের অন্তর্নিহিত স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং সৃজনীশক্তি যেন সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত হয়।

হিউমেনিষ্ট রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায়, সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দবোধ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারও মূল রহিয়াছে তাঁহার আদর্শবাদী চিন্তায়; যদিও কবি হিসাবে এই উভয়ের প্রতিই তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছন্দ এবং তাহার বহিঃপ্রকাশ, সৌন্দর্য সহজাত। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করিতে হইলে এই দুই-এরই উপলব্ধি একান্ত আবশ্যক। তাই শান্তিনিকেতনকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলা চলে; শান্তি-

শিক্ষায় সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দবোধের স্থান

নিকেতনের পথ-ঘাট সঙ্গীতমুখরিত, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি ছাত্রদের আবশ্যিক কার্যের অন্তর্ভুক্ত এবং কলাভবন এবং সঙ্গীতভবন, কবিগুরুর শিক্ষা-পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের উৎসবাদি, তাহাদের আল্পনা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিরও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য ও ছন্দোপলব্ধি।

আদর্শবাদ, শিক্ষায় যে ধর্মেরও একটি প্রকৃষ্ট স্থান আছে এই ধারণা রবীন্দ্রনাথকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সেই অসীম সৌন্দর্য পারাবারের সামান্যতম উপলব্ধি হইলেই মস্তক স্বতঃই ভগবানের প্রতি অবনত হইয়া আসে। তাঁহার প্রতি নতিস্বীকার, তাঁহার কাছে প্রার্থনা নিবেদন, তাঁহাকে উপলব্ধির সোপান। তাই "মন্দির" শান্তি-নিকেতন আশ্রমে বিশেষ স্থান পাইয়াছে এবং তাই সেখানে "বৈতালিক" সঙ্গীতের পূর্বে কোন শিক্ষা আরম্ভ হয় না।

শিক্ষায় প্রার্থনার স্থান

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তথা শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাচীন দর্শন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় প্রাচীন দর্শনানুসারে, জগতের অন্তর্নিহিত শক্তির (ঈশ্বর) সহিত নিজের একাত্মবোধ করা বা আত্মদর্শনকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের তথা শিক্ষার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন শিক্ষার আদর্শানুযায়ী শিক্ষাকার্যে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন এবং প্রাচীন আশ্রমিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেন।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা দর্শন ও পদ্ধতির স্থান

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাধারে শুধু প্রকৃতিবাদী, আদর্শবাদী এবং মানবতাবাদী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে সামাজিকতাবাদী শিক্ষাবিদও বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের মনীষা, শিক্ষা ক্ষেত্রে যেখানে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা একত্রিত এক পরিপূর্ণ উপলব্ধি দ্বারা আত্মকৃত করিয়া, এক ত্রুটিহীন শিক্ষাপরিকল্পনা আমাদের অভাগা দেশকে উপহার দেওয়ার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আদর্শ বিদ্যালয়কে কলিকাতা হইতে দূরে সরাইয়া আনিলেও, সামাজিক পরিবেশহীন শিক্ষার কথা তিনি কল্পনাও করিতেন না। বিদ্যা-

রবীন্দ্রনাথের সামাজিকতাবাদ

য়তনের মধ্যে এবং তাহার চারিদিকে এবং আদর্শ সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের সমপর্যায় গঠন করার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বিদ্যায়তনের ভিতরে থাকিবে ছাত্র, শিক্ষক এবং তাঁহাদের পরিবারকে নিয়া, শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক মহৎ সমাজ। আদর্শ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা আবাসিক হইবে বটে, কিন্তু তাহারা পরিবারের স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত হইবে না। অধ্যাপকের পরিবারের সহিত তাহাদের পারিবারিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্র-নাথ অধ্যাপকদের পরিবারকে বিদ্যায়তনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতেন। অধ্যাপকের পত্নী, গুরুমাতার এবং তাঁহার সন্তানরা গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ছাত্রেরা আপন গৃহ পরিত্যাগ করিলেও আর একটি বৃহৎ পরিবার গোষ্ঠীতে গৃহীত হইত। গুরু পরিবার প্রত্যক্ষ শিক্ষার (Formal education) অংশ গ্রহণ না করিলেও, অপ্রত্যক্ষ শিক্ষায় (Informal education) তাহাদের অংশ সামান্য ছিল না। উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, রোগে সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপক পরিবারের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। আধুনিকতম সমাজতন্ত্রবাদীদের মত, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শিক্ষা যে দ্রুত অগ্রসর হয়, একথা গুরুদেব বিশ্বাস করিতেন। তাই ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিতেন। পরস্পর অন্তরঙ্গ মেলামেশা, সহযোগিতা ও সেবা ব্যতীত, মেলা, উৎসব, নাট্যানুষ্ঠান, চড়ুইভাতি, ভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র ধরণের শিক্ষাপ্রদ পারস্পরিক সম্বন্ধ শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হইত। বিদ্যায়তনের সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণে গুরুদেব গণতান্ত্রিক নীতিও সমর্থন করিতেন। শিক্ষকেরা ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকে সম্মান প্রদান করিতেন এবং যথাসাধ্য তাহা-দিগকে আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী চলিতে দিতেন। শিক্ষকেরা ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজের নেতা; তাঁহারা এক নায়ক-সমাজের উপরিওয়ালা (Headman) ছিলেন না। ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া, নিজেদের শৃঙ্খলা নিজেরাই রক্ষা করিত। এমন কি পাঠভবনে ছাত্রদের নিজেদের বিচারসভা ছিল। আধুনিকতম সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি অনুসারে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন গঠন করার নিমিত্ত যে যে পন্থা অনুসরণ

করিতে বলা হয়, তাহার প্রায় সবগুলিই গুরুদেবের আদর্শ বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইতে দেখি। এমন কি, গুরুদেব স্বয়ং, বিদ্যালয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে একাত্মবোধ জাগানোর জন্য তাহা সর্বদা গীত হইত। বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ সমাজ গঠন ব্যতীত, বিদ্যালয়ের চারিপাশে সমাজ গঠনের পরিকল্পনাও গুরুদেবের ছিল। তাহার অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে "পূর্বপল্লী" গঠন। শিক্ষাবিদ্ ও জ্ঞানীগুণী লোকদের বসতি যাহাতে শান্তিনিকেতনের পাশে স্থাপিত হয়, তাহার জন্য, বিশ্বভারতী হইতে অল্পমূল্যে জমি বিতরণের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরুদেব তাঁহার ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাহিরের সমাজের সহিতও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিদ্যালয়কে, অনেক সময়ই তিনি সমাজে লইয়া যাইতেন। শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রামগুলিতে ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে নানা ধরণের সমাজ সেবা করিতে যাইত। তারপর শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্য প্রদর্শনী করিতে সহরে সহরে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের লইয়া যাইতেন। ইহাতে পাঠের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া গুরুদেব মনে করিতেন না, বরং সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন যে সমাজ এবং ছাত্র উভয়েরই শিক্ষার পরিপোষক ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। আবার সমাজকে বিদ্যালয়ে লইয়া আসার জন্যও রবীন্দ্রনাথ বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীনিকেতনের সৃষ্টি, সমাজকে বিদ্যালয়ের একেবারে ভিতরে প্রবেশের অধিকার দিয়াছিল। সমাজের দুইটি প্রধান কর্ম, কৃষি এবং কুটির-শিল্প, বিদ্যালয়ের কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া পৌষ মেলায়, সমাজ বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশের অবাধ অধিকার পাইত। এমন কি পৌষ মেলায় বিদ্যালয়ের তরফ হইতে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইত, তাহা সমাজের সাধারণ দশজন লোককে আনন্দ দানের কথা চিন্তা করিয়া করা হইত। মোট কথা, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেও, উহাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, ইহা গুরুদেব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন—এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা আধুনিকতম সমাজতন্ত্রবাদী শিক্ষাবিদের সমপর্যায়ের ছিল।

সমাজ ও বিদ্যালয়ে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস

সংক্ষেপে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বপ্রকার শিক্ষাসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঋষির সমতুল্য ছিলেন—শিক্ষা

জগতের সত্যগুলি রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির নিকট ধরা দিয়াছিল।

বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-চিন্তা-ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব

তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা এবং তাহার বাস্তবে রূপায়নে, এমন একটি জিনিসও দেখি না, যাহা আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত হইবে না। তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর দিয়া বুঝিয়া গ্রহণ করিলে, আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার যে সমাধান হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তার শক্তি এত প্রবল যে, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাহার কিছু কিছু আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, লেখা-পড়ার সঙ্গে যে সৌন্দর্যবোধের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে,—বিদ্যালয় যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিম্‌ছাম হইবে, তাহার প্রতিটি জিনিসে যে একটি রুচিবোধ থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে পূর্বে তেমন বোধ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিদ্যালয়কে "সুন্দর" করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি—এমন কি, কর্তৃপক্ষেরা অনেক স্থলে বিদ্যালয় সৌন্দর্যীকরণের পরিকল্পনা (school beautifying programme) গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সঙ্গীত এবং নৃত্য যে বর্তমানে স্থান পাইতেছে ইহাও রবীন্দ্র-চিন্তাধারার বিশেষ অবদান। প্রাচীন ভারতে যাহাই থাকুক, আমাদের দেশে এমন দিন আসিয়াছিল যখন সঙ্গীত ও নৃত্যকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হইত এবং ইহাদের প্রায় কুশিক্ষার সমতুল্য জ্ঞান করা হইত। ছন্দানুভূতি এবং তাহা প্রকাশের ক্ষমতা যে আমাদের সকলের মধ্যেই অল্প-বিস্তর রহিয়াছে, এ জ্ঞানও আমাদের ছিল না। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়েই বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গীত এবং নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে ; ইহাদের সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করা হইতেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে বিশেষ রীতি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। আল্‌পনা প্রভৃতির দ্বারা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মণ্ডপ সজ্জার পদ্ধতি আমরা শান্তিনিকেতনের অনুকরণে শিখিয়াছি। গীতিআলেখ্য, মহাজনদের জন্মতিথি বা মৃত্যু-বার্ষিকী পালন, ঋতু উৎসব, সাহিত্যসভা ইত্যাদি শান্তিনিকেতন জীবনের বহু অনুষ্ঠান, আমাদের বিদ্যালয় সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষাদান বাধ্যতা করায় হয়ত মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যক্ষ প্রভাব অধিকতর, কিন্তু

মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুদেব তাঁহার পূর্ব হইতেই শিল্প শিক্ষা আপন বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিল্প শিক্ষার পরিকল্পনা (শিল্পের মাধ্যমে সৃজনীশক্তি ও রুচিবোধের বিকাশ) হয়ত অধিকতর শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত।

গুরুদেবের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক কিছুই আমরা এখনও গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু একথা দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির সব কিছু যদি আমাদের বিদ্যালয় গ্রহণ করিতে পারিত তবে আমাদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইত।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা

আধুনিক ভারতের চিন্তানায়কদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। তিনি প্রধানতঃ ধর্মীয় নেতা এবং সমাজ-সেবক। কিন্তু ধর্ম এবং সমাজ-সেবার সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ এত অন্তরঙ্গ যে, তাঁহার বহু লেখা এবং অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে, শিক্ষা বিষয়ে বহু মন্তব্য রহিয়াছে। ঐ সব মন্তব্যের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে বহু শাশ্বত সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহা বর্তমান ভারতে শিক্ষা সংস্কারের কাজে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অধিকন্তু, বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন; প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার আলোচনা হইলে, সংশ্লিষ্ট সকলেরই এই বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সাহায্য করিবে, ইহা আশা করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন

স্বভাবতই স্বামীজীর চিন্তাধারা আদর্শবাদী ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবৎসত্তা রহিয়াছে এবং তাহার উপলব্ধিই মনুষ্য জীবন, তথা শিক্ষার উদ্দেশ্য। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতার বীজ (ভগবৎসত্তা) রহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশই শিক্ষা (Education is the manifestation of perfection

in man)। স্বভাবতই প্রাচীন ঋষিদের মত, স্বামী বিবেকানন্দ আত্মোপলব্ধিকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন নিজেকে জানিতে পারিবে তখন দেখিবে পৃথিবীর কোন কিছুই তোমার অজানা নাই (When you know yourself you know all)। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রতি যে স্বামীজীর দৃষ্টি ছিল না এমন নহে। তিনি বলিতেন যে, প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলাই (man making) শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই কাজে স্বামীজী জগতের ব্যবহারিক শিক্ষাকেও যথাযথ স্থান দিয়াছেন। শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আত্মনির্ভর করিতে হইবে। আত্মনির্ভর না হইতে পারিলে সে প্রকৃত মানুষ হইতে পারিবে না। এই আত্মনির্ভর হইবার উদ্দেশ্যে মানুষকে পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, কারিগরি কৌশল প্রভৃতি জীবন সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই শিক্ষা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, অধ্যাত্ম জীবনের জন্যই হউক বা সাংসারিক জীবনের জন্যই হউক, শরীরকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার শিক্ষাও গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই স্বামীজীর শিক্ষা-দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের মতই, সাংসারিক এবং অধ্যাত্ম উভয়বিধ জীবনের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাই।

স্বামীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষের মধ্যে পূর্ণতার বীজের বিকাশ

আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দানের প্রয়োজন

কিন্তু স্বামীজী মনে করিতেন, প্রকৃত আত্মনির্ভরতা আসিতে পারে, একমাত্র মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া। তাই তিনি ছাত্রদের মানসিক শক্তি (will) বৃদ্ধিকে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের মনের শক্তি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিলে, বিশ্বসংসারের জ্ঞানের ভাণ্ডার আপনা হইতে তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যত বিপদ-বাধাই আসুক না কেন, সাহস এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সম্মুখীন হইয়া মানুষ তাহাকে জয় করিবে ইহা সুনিশ্চিত।

মনের শক্তি বৃদ্ধি করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য

যদিও স্বামী বিবেকানন্দ, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে, আত্ম-নির্ভরতার জন্য বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শিক্ষাকে বৃত্তি শিক্ষায় পর্যবসিত করিলে যে উহা নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, সেদিকে তিনি

আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রচলিত শিক্ষাকে তিনি কেবলমাত্র চাকুরী সংগ্রহের শিক্ষা বলিয়া, শিক্ষালাভের যোগ্য নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে শিক্ষার দ্বারা নিজের প্রকৃত উন্নতি বা দেশের কোন উপকার হয় না ইহা শিক্ষা নামের যোগ্য নহে।

কেবল মাত্র বৃত্তি শিক্ষা শিক্ষা নহে

শুষ্ক জ্ঞান অর্জনও যে প্রকৃত শিক্ষা নহে, সে দিকেও স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জ্ঞান সংগ্রহই যদি শিক্ষা হইত, তাহা হইলে, গ্রন্থাগারের মত জ্ঞানী ত কেহই থাকিত না। প্রচলিত শিক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আমরা যে প্রকৃত জ্ঞানের গলা টিপিয়া হত্যা করিতেছি, সে বিষয়েও তিনি দৃঢ় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

জ্ঞান সংগ্রহ শিক্ষা নহে

নিজের মধ্যে জ্ঞানের উপলব্ধিকে স্বামীজী প্রকৃত শিক্ষা আখ্যা দিয়াছেন। বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারই আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। আত্মোপলব্ধি (self-realisation) হইলেই, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আপনা হইতেই আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। বেদান্তের শিক্ষা অনুসারে স্বামীজী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, নিজেকে জানিতে পারিলেই জগতের সব কিছু জানা হইয়া যাইবে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মাত্র একটি সত্য নিহিত রহিয়াছে—বিশ্বের বিভিন্নতার মধ্যে রহিয়াছে এক ঐকতান। আপন আত্মার মধ্যেই ঐ ঐকতান লুক্কায়িত রহিয়াছে। উহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে বিশ্ব সংসারে জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।

আত্মোপলব্ধি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা

আত্মোপলব্ধি হইলেই মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী যথাযথভাবে বিকশিত হইবে। চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করিতে না পারিলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জ্ঞান অর্জন বা বৃত্তি শিক্ষা কিছুই প্রকৃত শিক্ষা নহে, কারণ উহারা আমাদের প্রকৃত মানুষ করিতে পারে না, জীবনে শান্তি দিতে পারে না। একমাত্র চরিত্র শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করিতে পারে। তাই উহাকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

চরিত্র শিক্ষা, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য

ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা হইতে পারে না, এই অভিমতও স্বামীজী দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আমাদের চিন্তাধারা, বুদ্ধি, শিক্ষা সবই আধ্যাত্মিক—ধর্মকে ঘিরিয়া। আমরা বাহির অপেক্ষা অন্তরের উপরই সব সময় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছি। কাজেই শিক্ষাকে ধর্মনির্ভর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আত্মোপলব্ধি বা চরিত্র শিক্ষা কিছুই হইবে না। কিন্তু ধর্ম তাঁহাব নিকট সাম্প্রদায়িক ধর্ম ছিল না। চিরন্তন শাশ্বত সত্য, যাহা সর্ব ধর্মের সার তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন।

শিক্ষা ধর্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অপরের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যের নিকট হইতে আমাদের যে বহু জিনিষ শিক্ষণীয় আছে, একথা স্বামীজী সর্বদাই স্বীকার করিতেন। কিন্তু অপরের নকল করিয়া প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। মানুষ যদি তাহার নিজস্ব জিনিষ যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত বস্তুর সাহায্যে তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে তবেই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভারতবাসী যেন কখনও আপন আদর্শ এবং বহু যোগের সাধনা হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, পাশ্চাত্যের যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই ছিল স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। পাশ্চাত্যকে বরণ করিতে হইলে, আমাদের, আদরণীয় বরণীয় সবকিছুকে বিদায় দিতে হইবে, ইহা কখনও শুভকর হইতে পারে না। আমাদের সর্বপ্রধান আদর্শ আত্মোপলব্ধির পরিপূরক হিসাবেই আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে পারি; ইহা যদি আমাদের আদর্শের প্রতিকূল হয়, তবে তাহা সর্বথা বর্জনীয়। তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিও, কিন্তু নিজের জিনিষ কখনও ছাড়িও না।

ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান

পুস্তক পাঠে স্বামীজী উৎসাহ দিলেও, পুঁথিগত বিদ্যা যে বিদ্যানামযোগ্য নহে, ইহা তিনি বার বারই বলিয়াছেন। একমাত্র উপলব্ধি হইতেই প্রকৃত জ্ঞান আসিতে পারে। জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য মনন ও ধ্যানের একান্ত প্রয়োজন। মনের

মনকে একমুখী করার প্রয়োজন

ক্ষমতাকে একমুখী করিতে পারিলেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইবে। কাজেই মনকে একমুখী করার জন্যও বিশেষ শিক্ষা লইতে হইবে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা

স্বামীজী বিশ্বমানবের দুঃখে ব্যথিত ছিলেন ; তাই ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণের দুঃখে তাঁহার মন সর্বাধিক পীড়িত হইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উহাদের দুঃখ দূর করিবার প্রধান উপায়, উহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

জনসাধারণের মত, মেয়েদের মধ্য হইতেও অশিক্ষা দূর করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মনে করিতেন। ভারতের মেয়েদের উন্নয়ন সমস্যাগুলি একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই সমাধান হইতে পারে বলিয়া স্বামীজী মনে করিতেন। তাই তিনি সর্বত্র এমন কি, গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। নারীদের শিক্ষা যে বিশেষভাবে পুরুষদের শিক্ষা হইতে পৃথক হইবে এরূপ মনে না করিলেও, স্বামীজী নারী শিক্ষায়, ধর্ম এবং চরিত্র শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন।

নারী শিক্ষা

তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষা দ্বারা ভারতীয় মেয়েরা বীর সন্তানের জননী হইবার উপযুক্ত হইবে। শিক্ষা, মেয়েদের আত্মনির্ভর করিয়া তুলিবে, এমন কি বিপদে পড়িলে, নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষের ন্যায় সর্বপ্রকারের শিক্ষাগ্রহণ করিলেও, নারী প্রধানতঃ আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মাতা হইয়া স্বামী এবং সন্তানের শক্তির উৎস হইবেন।

জন ডিউই

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত। প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপি দীর্ঘ জীবনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় এই শিক্ষাবিদ্, শিক্ষাবিষয়ক বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে Problems of Men, Democracy and Education, School and Society এবং Experience in Education, এর নাম প্রত্যেক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই অবশ্য পাঠ্য বলিয়া উল্লেখ করা

যাইতে পারে। জন ডিউই কেবলমাত্র পুস্তক রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি নিজে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক ধারণাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ডিউই তাঁহার মতানুবর্তী এক শিষ্যমণ্ডলী গঠনেও সক্ষম হন ; ইহাদের মধ্যে প্রজেক্ট মেথডের আবিষ্কর্তা কিল প্যাট্রিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিউই এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রভাবে, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ডিউইর শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতি বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এই প্রাধান্যের অন্যতম কারণ, ডিউইর শিক্ষাদর্শন, আধুনিক জীবনদর্শন ও গণতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত।

শিক্ষাবিদ ডিউই

ডিউই প্রধানতঃ ছিলেন দার্শনিক এবং গণতান্ত্রিক। প্রয়োগবাদ (Pragmatism) ছিল তাঁহার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইল, সত্যের আপেক্ষিকতা (Relative) ; একজনের নিকট যাহা ভাল, অপরের নিকট তাহা মন্দ হইতে পারে। এক সমাজের জন্য যাহা হয়ত মঙ্গলকারক, অপর সমাজের জন্য তাহা হয়ত অমঙ্গলকারক। এমন কি একই মানুষের বেলায় একসময়ে যাহা ভাল, অপর সময়ে তাহা ভাল নাও হইতে পারে। আবার যাহা যাহার পক্ষে ভাল, তাহাই তাহার পক্ষে সত্য। এই মতবাদ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর বলিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই নীতিতে গণতান্ত্রিক আদর্শেরও সমর্থন পাওয়া যায়—প্রত্যেক মানুষ যে স্বতন্ত্র, তাহার ভাল-মন্দ যে পৃথক এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য যে তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, প্রগতিবাদ এই ধারণাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়া থাকে।

প্রয়োগবাদে বিশ্বাস

এই প্রয়োগবাদই ছিল ডিউইর শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রথমই তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা চলে না। কারণ, প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে, তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্য পৃথক হইবে। তারপর বয়সের, পাঠ্য বিষয়ের, সমাজের, প্রভৃতি নানা-ধরণের বৈষম্য মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। তাই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া কিছুকে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তবু যদি

অধিকতর শিক্ষার জন্য যোগ্যতর করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য

বলিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে. শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল, অধিকতর শিক্ষার জন্য যোগ্যতর করিয়া তোলা প্রগতিবাদী দর্শন অনুসারে মানুষ এবং তাহার পারিপার্শ্বিক প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল এবং প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে ছাত্রদের মধ্যেও জীবনের গতির ছন্দ সৃষ্টি করার নামই প্রকৃত শিক্ষা।

এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোন নির্দিষ্টতা নাই—অসীমের দিকে ইহা ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই এই ধরণের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ শিক্ষা দর্শন ঘেঁষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু, শিক্ষাবিদ্ হিসাবে ডিউইর শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে প্রগতিবাদ দর্শনের মাধ্যমে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্র-বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্টতর করিবার নিমিত্ত, ডিউই জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে পাঁচটি ভাগ করিয়াছেন ১। কর্মনৈপুণ্যের ক্ষেত্র, ২। সামাজিক ক্ষেত্র, ৩। সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্র, ৪। যৌদ্ধিক ক্ষেত্র, ৫। নৈতিক ক্ষেত্র। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ঐসব ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সার্থক হইল বলিয়া ডিউই মনে করিতেন।

পাঁচটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ

সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ডিউই যদিও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তবু সমাজতন্ত্রবাদীদের মত শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনি উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলেও শিক্ষার্থী তাহার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও সৃজনী-শক্তির সাহায্যে উহাকে নবরূপদানে সমর্থ হইলে তাহার শিক্ষালাভ সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তাই, ডিউইর মতে সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করাইয়া সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিয়া সমাজ রক্ষা করা যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য, অপরদিকে ঐ অভিজ্ঞতাগুলিকে নব রূপদানে সমর্থ করিয়া, সমাজের অগ্রগতির সাহায্য করাও শিক্ষার তেমনি উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতন্ত্র-

সমাজ রক্ষা এবং সমাজের অগ্রগতি-বিধান শিক্ষার উদ্দেশ্য

বাদীদের মধ্যে এই যে সামঞ্জস্যবিধান, ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউইর অন্যতম প্রধান অবদান।

গণতন্ত্র ও শিক্ষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

গণতন্ত্র বর্তমানযুগে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত আদর্শ। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপনের সহিত শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতি ডিউই বিশেষ-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে, শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জ্ঞান, বুদ্ধি, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতিতে যে উৎকর্ষের প্রয়োজন হয় তাহা লাভ করিলে মানুষ তাহার নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়া, আমৃত্যু আপন শিক্ষা চালাইয়া যাইতে পারে। কাজেই "গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষাকে" শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিলে ক্ষতির কোন কারণ নাই। অপর-দিকে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংস্থা (বিধানসভা, দায়িত্বশীল মন্ত্রী-মণ্ডলী প্রভৃতি) গড়িয়া তুলিলেই কোন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যতদিন পর্যন্ত মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি না হইয়াছে এবং তাহাদের জীবনদর্শন অনুরূপভাবে গঠিত না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কার্যের সফলতা সুদূরপরাহত। ডিউইর এই অভিমত যে কতখানি সত্য তাহা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা হইতে আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে পারি। তাই ডিউইর মতে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তাহার আপন সাফল্যের জন্য শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি যে শিক্ষাকে তাহাদের আপন দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে ডিউইর চিন্তাধারার প্রভাব সামান্য নহে। অপরদিকে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে ছাত্রদের বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে এবং বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে মক্ পার্লামেণ্ট প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্থান পাইতেছে, তাহাতে ডিউইর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

ডিউই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের আর একটি অতি মূল্যবান কথা শুনাইলেন,—কেহ কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে না; মানুষ আপন অভিজ্ঞতা

হইতে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করে। অবশ্য অভিজ্ঞতা নানা ধরণের হইতে পারে, বই পড়া বা শিক্ষকের পাঠ্যবিষয়ে ব্যাখ্যা শুনাও অভিজ্ঞতা বটে ; কিন্তু উহা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ছাত্র আপন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহাই অধিক ফলপ্রসূ হয়। ডিউইর মতে অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকেই শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ডিউইর এই মত যে আধুনিকতম শিক্ষণতত্ত্ব (Theory of Learning) দ্বারা সমর্থিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা

এখন সমস্যা দাঁড়াইল, কি করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে (Subjects) ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি বিষয় মানুষের সঞ্চিত এক একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার—বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহা সঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু যে ক্রমে (Sequence) অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, পাঠ্য পুস্তকে সেই ক্রম রক্ষিত হয় নাই ; আবার এই জ্ঞানগুলি বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতার ফল। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত ডিউই এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি বাহির করেন—উহা প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method) নামে বিখ্যাত। এই পদ্ধতি অনুসারে পাঠ্য বিষয় বা অর্জিতব্য জ্ঞানকে বিভিন্ন সমস্যায় বিভক্ত করিয়া, ছাত্রেরা যাহাতে আপন চেষ্টার দ্বারা সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যালয়ে দিন দিনই জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে এবং ইহাকে বিভিন্নভাবে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়া, বিদ্যালয়ের সর্বস্তরে এবং সর্ববিষয়ে উহার প্রয়োগ করা হইতেছে।

প্রজেক্ট পদ্ধতি

প্রজেক্ট পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু হইলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান এবং কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ডিউই ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। শিক্ষক আর শিক্ষাদাতা থাকিবেন না, তিনি শিক্ষাসহায়কে পরিবর্তিত হইবেন। কিন্তু এই হিসাবে বিদ্যালয়ে তাহার গুরুত্ব না কমিয়া আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষাসহায়কের দায়িত্ব এবং কর্মভার অনেক বেশী ;

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নবরূপ, নূতন দায়িত্ব

উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়া এই দায়িত্ব-পালন সম্ভব নহে। পাঠ্য বিষয়কে বিভিন্ন সমস্যায় বিভক্ত করিয়া শিক্ষককে ঐ সমস্যাগুলি ছাত্রদের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং উহাদের সমাধানের জন্য মালমসলা যোগাইতে হইবে এবং প্রতি মুহূর্তে সাহচর্যের দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতীয় গুরুগণও শিক্ষাদাতা ছিলেন না, শিক্ষাসহায়ক ছিলেন। শিষ্যকে গুরু প্রদর্শিত পথে, গুরুর সাহায্যে আপন উপলব্ধির দ্বারাই জ্ঞানশিখরে আরোহণ করিতে হইত।

শ্রেণীকক্ষের আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম পরিবর্তন

শুধু শিক্ষকের রূপ নহে, ডিউইর মতানুসারে বিদ্যালয় কক্ষের আসবাব ও সাজ-সরঞ্জামের রূপও পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষকে প্রজেক্টের রূপায়ণ অনুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হইবে, তাই উহাতে ভারি এবং বড় বড় আসবাব অচল; আবার বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্টের রূপায়ণের জন্য, পাঠ্যপুস্তক এবং কালিকলম ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন।

শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্ব

ডিউইর শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি বিশিষ্ট অবদান হইতেছে, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার পদ্ধতিকে যে পৃথক করিয়া দেখা চলে না ইহা উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য করা। একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশিত হইলে, উপলব্ধির তারতম্যের নিমিত্ত লব্ধ জ্ঞান এক থাকে না এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহার কার্যকারিতা সমান হয় না।

শিক্ষাগ্রহণের পাঁচটি স্তর

শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবে ইহাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া ডিউই মনে করিতেন—কাজেই তাহার মতে শিক্ষার পদ্ধতি হইবে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষা তাত্ত্বিক বলিয়া চিন্তার সাহায্যে ঐসব শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়। শিক্ষাথী যখন নিজ চেষ্টায় চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়—১। অভিজ্ঞতা (Experience) গ্রহণ, ২। মনে সমস্যার (problem) সৃষ্টি, ৩। সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তথ্য (Data) সংগ্রহ, ৪। প্রকল্প গ্রহণ (hypothesis),

৫। প্রকল্পের সত্যাসত্য নিরূপণ (verification)। ঐ স্তরগুলিকে শিক্ষা গ্রহণের স্তর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরি-উক্ত শিক্ষাগ্রহণের স্তরগুলি আধুনিকতম শিক্ষণতত্ত্ব শিক্ষার স্তর বলিয়া পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও ডিউইর মতামত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে চেষ্টা করিয়াছে। ডিউইর মতে শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন হওয়া চাই যাহাতে উহারা ছাত্রদের উদ্দেশ্য পূরণে সরাসরি কাজে আসিতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মত ডিউই বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর সহিত ছাত্রের মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনবোধের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকা উচিত—বয়স্কদের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয় এক হইতে পারে না। আবার ছাত্রদের উদ্দেশ্য সমাজের দ্বারাই সৃষ্ট; তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুর সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবেই। শিশুকে সমাজে সুনাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলার দায়িত্বও বিদ্যালয়ের, তাই, সমাজের প্রয়োজনের সহিত বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধেও ডিউই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পাঠের বিষয়বস্তু, ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশেও সাহায্য করিবে এবং উহা তাহাদের নিকট উপভোগ্যও হইবে। কাজেই পাঠের বিষয়বস্তুতে, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।

সামাজিক এবং ব্যক্তির উন্নতিকারক উভয় ধরণের বিষয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্থান

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে ডিউই বিশ্বাস করিতেন; উভয়ই উভয়কে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করিবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ সমাজরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে; এই সমাজে শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকিবে এবং এই পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শিক্ষা অগ্রসর হইবে। সমাজের প্রভাব যাহাতে বিদ্যালয়ের উপর যথাযথ পড়িতে পারে তাহার জন্য সমাজকে বিদ্যালয়ের বিশেষ অঙ্গরূপে দিতে হয় এবং পরিচালক সমিতি, অভিভাবক সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের সহিত বিদ্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অপর দিকে বিদ্যালয়ের প্রভাবও

সমাজ ও বিদ্যালয় পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিবে

সমাজের উপর পড়া প্রয়োজন। তাই নানাসূত্রে সমাজসেবার জন্য বিদ্যালয়কে সমাজে লইয়া যাইতে হয়।

বিদ্যালয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও ডিউই আমাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াছেন। শ্রেণীকক্ষে চুপ করিয়া অনড় হইয়া বসিয়া থাকা, আদর্শ শৃঙ্খলা-বোধ নহে। যখন যে কাজের জন্য যে ব্যবহার প্রয়োজন ছাত্রদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেইরূপ ব্যবহার প্রকাশ পাইলেই, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ দেখা দিয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার কালে ছাত্রেরা হয়ত চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া থাকিবে, কিন্তু কোন প্রজেক্টে কাজ করিতে হইলে হয়ত ক্লাসের মধ্যে চলাফেরা এবং পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও করিতে হইবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিজেকে নিজে নিয়মানুবর্তী করিয়া রাখার ক্ষমতার নামই শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা শাসন দ্বারা রক্ষা করা চলে না। ছাত্রদের মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগাইয়া তুলিতে হয় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা বিদ্যালয়ে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হয়।

শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আধুনিক বিদ্যালয়কে নবরূপ দানে ডিউইর অবদান সর্বাধিক। তাঁহাকে নিঃসন্দেহে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌ বলা যাইতে পারে।